P 2738

কল্পনা

সমালোচনী মাসিক পত্রিকা।

BENGALI MANUSCRIPT
Serial No. 202
UNIVERSITY OF CALCU

পঞ্চম বৎসর।

নব বর্ষ।

দেখ, আসিয়াছি। সে গিয়াছে, আমি আসিয়াছি। চাহিয়া দেখ, আঁখির পলক ফেলিতে না ফেলিতে ঐ পশ্চিমের ছায়া-পথ দিয়া সে কেমন করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল। আর তাহার কোন চিহ্নই নাই। যে যায়, সে এমনি করিয়াই যায়। পিছনে কোন চিহ্নই রাখিয়া যায় না। কেবল এক মাত্র স্মৃতি পড়িয়া হা হা করিতে থাকে। গান মিলাইয়া যায়, কেবল সুর পড়িয়া কাঁদিতে থাকে। ফুল ঝরিয়া পড়িয়া গলিয়া যায়, কেবল গন্ধটুকু বায়ুর উপর ভাসিয়া বেড়ায়। কিন্তু ঐ তো দোষ! যে যায়, সে যায়; কিন্তু যে থাকে, সে তার স্মৃতি লইয়া, বড় গোলে পড়ে। সে গিয়াছে, কিন্তু তার স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছে। তাই ঐ ছায়ান্ধকারতলে ম্লানমুখী দিক্‌বধূ বিষাদ-শয্যায় লুটাইয়া। ৯৩ গিয়াছে—কেমন করিয়া গেল জানি না—কিন্তু '৯৩ গিয়াছে। আমি আসিয়াছি। আমি নববর্ষ। '৯৪।

কিন্তু, সে যাইতে না যাইতে আমি কেন আসিলাম? পুরাতনের কথা না ফুরাইতে ফুরাইতে কেন নূতনের কথা পাড়িতে বসিলাম? কান্নার প্রথম উচ্ছ্বাস না মিলাইতে মিলাইতে, কেন হাসির বার্ত্তা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম? তা, তোমরা কেহ আমার দোষ লইও না। হাসি কান্না কি, সুখ দুঃখ কি তাহা ত বুঝি না। ও বুঝি কয়েকটা পৃথক্ পৃথক্ শব্দ মাত্র! বালকের বুলি। লোক হাসিতে হাসিতেও কাঁদিয়া ফেলে, কাঁদিতে কাঁদিতেও হাসিয়া ওঠে, সুখের উচ্চতম আসনে বসিয়াও দুঃখের ভয়ে ভীত হয়, আবার দুঃখের নিম্নতম কূপে ডুবিয়াও সুখের কল্পনা করিতে থাকে। কোন্‌টা হাসি, কোন্‌টা কান্না, কোন্‌টা সুখ, কোন্‌টা দুঃখ, তাহা বুঝিতে তো পারি না। রৌদ্র হইলে লোকে বৃষ্টির প্রার্থনা করে, আবার বৃষ্টি

হইলে রৌদ্রের জন্য লালায়িত হয়। তবে হাসি কান্না কাহাকে বলে? স্ত্রী স্বামীর প্রবাসবাসে সখীর নিকট দুঃখের কান্না কাঁদিতেছিল, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, স্বামী তাহার জন্য বিদেশ হইতে হাজার টাকার গহনা পাঠাইয়াছে; আর সে চোখের জল পড়িতে পড়িতে পড়িল না; নয়নকোণে হাসির বিদ্যুৎ চমকিল। মাতা বড় দুঃখে আনমনে বসিয়া মৃত স্বামীর উদ্দেশে রোদন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শিশু দৌড়িয়া আসিয়া কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল. মা কান্না ভুলিয়া গেলেন, আনন্দে পুত্রকে বক্ষে ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন। তাই বলিতেছিলাম, হাসি কান্না কি তাহা ত বুঝি না। এ সংসারে কান্না লইয়া কে কবে থাকিয়াছে? কে কবে থাকিতে পারিয়াছে? তা, তোমরা কেহ আমার দোষ লইও না।

একবার প্রকৃতির পানে চাহিয়া দেখ দেখি। আকাশ নীরব. নিস্তব্ধ; জগৎ স্পন্দহীন, চেতনারহিত; পশ্চিমে এত বড় একটা কাণ্ড হইয়া গেল দেখিয়া দিগঙ্গনাগণ যে যাহার স্থানে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া;—মরণের ছায়া স্তূপে স্তূপে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; আতঙ্ক নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চারিদিকে ফিরিতেছে;—কিন্তু ও কি! পূর্ব্বে ও কাহার হাসি?—মৃদু, মধুর, মোহমাখা, আবেশময়—ও কাহার হাসি? এ-হেন সময়েও ঐ পূর্ব্বের দুয়ারখানি খুলিয়া ঘুম-চোখে একাকিনী ঈষদ্‌মুক্ত দ্বারপথে দাঁড়াইয়া উষা ধীরে ধীরে হাসিরাশি ছড়াইতেছে। মুহূর্ত্তমধ্যে ঐ আবার উষার হাতখানি ধরিয়া পশ্চাৎ হইতে হাসিতে হাসিতে তরুণ, অরুণ ধীরে ধীরে দেখা দিল! কান্না পলাইল। শঙ্কা ও ত্রাস ছুটাছুটি করিয়া লুকাইল। যে পৃথিবী এতক্ষণ অচেতন-প্রায় ছিল, সে এখন জাগে অঙ্গমোড়া দিয়া উঠিল। যে পাখী শাখায় বসিয়া চক্ষু মুদিয়া নীরবে আপনার ভূতভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেছিল, সে আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিল। যে সমীরণ স্তব্ধ হইয়া এতক্ষণ এক কোণে দাঁড়াইয়াছিল, সে এখন নূতনের কথা দেশে দেশে প্রচার করিতে লাগিল। দেখ, দেখ, সেই দিক্‌বধূরা কান্না ভুলিয়া হাসিয়া হাসিয়া আমাকে পূজা করিতে আসিতেছে। ধরণী তাহার সকল ভোগ, সকল সম্পদ একে একে বাহির করিয়া হাসিয়া হাসিয়া আমাকে দেখাইতেছে। সে কান্না আর ত নাই। এ যে হাসির রাজ্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির পানে একবার চাহিয়া দেখ দেখি।

প্রকৃতি যে এই নিয়মেই বাঁধা! পুরাতনের বিসর্জ্জন, নূতনের প্রতিষ্ঠা, ইহাই তাহার জীবনের মূল মন্ত্র। দিবসের পর রাত্রি, সূর্য্যের পর চন্দ্র, শীতের পর বসন্ত। শূন্য লইয়া প্রকৃতি কখন থাকিতে পারে না। জড়প্রকৃতি যাহা পারে না, তোমরা তাহা পারিবে কেমন করিয়া? পুরাতনের বিসর্জ্জন হইয়াছে, তবে নূতনের প্রতিষ্ঠা করিতে কেন ভুলিতেছ? এখনও কি অচেতনে নিদ্রা যাইবে? এখনও কি ঘুম ভাঙ্গিবে না? আমি যে তোমাদের কাছে নূতনের সমাচার দিতে আসিয়াছি, আশার কথা বলিতে আসিয়াছি, একবার উঠ। পুরাতন-তুমি গিয়াছ, এখন নূতন-তুমি একবার উঠিয়া বসিয়া হাস দেখি!

কতকগুলা লোক আছে, তাহারা নববর্ষের নাম শুনিবামাত্র ডরাইয়া উঠে। এমন

আনন্দের দিনে নিরানন্দের কথা পাড়ে। বলে, নব বর্ষ আসিল বটে, কিন্তু পরমায়ুর এক বর্ষ কমিয়া গেল। বয়শের দেহ-ভবনে প্রবেশ করিয়া তাহার আর একটী রন্ধ্র হরিয়া লইল। ইহারা আপনাদিগকে ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু, হয় ইহারা ধর্ম্মের কিছুই বোঝে না, নয় ইহারা মিথ্যা বলে। যে তুচ্ছ জীবনের হিসাবটা লইয়া এত ব্যতিব্যস্ত, সে আবার ধর্ম্মের কথা বলিবে কি? তোমরা বিবর্ত্তবাদ মান, তোমাদিগকে আর বুঝাইতে হইবে না, বর্ষে বর্ষে জগতের উন্নতি কি অবনতি। যে দেবতা আপন অংশ দিয়া এই জগৎ গড়িয়াছেন, তিনিই ইহার চরমোন্নতি সেই দেবত্বপ্রাপ্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তাই জড়ত্ব হইতে পশুত্ব, পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্ব, আর মনুষ্যত্ব হইতে দেবত্ব। যতই বর্ষ যাইতেছে, মানুষের সেই চরমোন্নতি প্রাপ্তির সময় ততই নিকট হইতেছে। নব বর্ষ দেখিয়া মানুষ ভয় পাইবে কেন?

তবে এ কথা বলিতে পার, গত এক বৎসরে কি করিলে না করিলে একবার তাহার হিসাবটা খতাইয়া দেখ। আজ নব বর্ষ। আজ তাহাই দেখিবার দিন। আজ নূতন খাতা। ঐ দোকানী আজ তাহার ক্ষুদ্র দোকান খানি ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিয়াছে, গঙ্গাজল ছড়া দিয়াছে, ধূপ ধুনা গুগ্‌গুলে ঘর খানি পবিত্র করিয়া তুলিয়াছে, দ্বারে, আম্র-পল্লব টাঙ্গাইয়াছে। আজ তাহার নূতন খাতার দিন। শুধু তাহার একা নহে, আজ সবারই নূতন খাতা। এই ভবের হাটে আসিয়া দোকানপাট সাজাইয়া এক বৎসর ধরিয়া যে ব্যবসা চালাইলে আজ তাহার খাতা বদলাইতে হইবে। ঐ হৃদয়ের স্থানে স্থানে রাশি রাশি ধূলা মলা জমিয়া রহিয়াছে, তাহা ঝাড়িয়া পরিষ্কার কর; অনেক অপবিত্রতা প্রবেশ করিয়াছে তাহা জল ঢালিয়া ধুইয়া মুছিয়া ফেল। খরিদ বিক্রী, দেনা পাওনার হেওয়া মিলাইয়া লাভ লোকসান বুঝিয়া দেখ। জমা খরচে কৈফিয়ৎ কাটিয়া নূতন খাতায় জের লইয়া আইস। নূতন খাতায় জের আনিতে পার, ভালই; কিন্তু যদি শূন্য ভিন্ন আর কিছুই না দেখিতে পাও, হতাশ হইও না। কোন্ খাতে লোকসান দিয়াছ, তাহা ধর; সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চল; নূতন দিনে নূতন করিয়া ব্যবসার পত্তন দাও, শোধরাইয়া উঠিবে। হয় ত, এই বৎসরেই বাজারে তোমার নামের সাড়া পড়িয়া যাইতে পারে। নব বর্ষ মানুষকে ভয় দেখাইতে আসে না, তাহাকে নূতন উৎসাহ, নূতন স্ফূর্ত্তি, নূতন জীবন দিবার জন্যই আসিয়া থাকে। এ সময়ে কি আলসো বসিয়া থাকা সাজে?

তবে, বাজা, কল্পনা, তোর ঐ ভাঙা বীণা লইয়া আর একবার বাজা। আজ নূতনের রাজ্য, আনন্দের মহামেলা, কেন তুই একা পুরাতনের মধ্যে পড়িয়া নিরানন্দে থাকিবি! জড় প্রকৃতি পর্য্যন্ত আজ নূতন জীবন পাইয়াছে, সবই যেখানকার যা, সেখানেই ছিল; কিন্তু এমন তো ছিল না! এত হাসি এত আনন্দ তাহাদের দেখি নাই ত! আজ সকলেই সকলের কাছে নূতনের সমাচার দিতেছে। প্রকৃতি অন্য প্রকৃতিকে বলিতেছে—'হতাশ হইওনা, ভরসা বাঁধ, নূতন আসিয়াছে।' জগৎ জগন্তরকে বলিতেছে,—'হতাশ হইওনা, ভরসা বাঁধ, নূতন আসিয়াছে।' এক সৌরজগৎ অপর সৌর-

জগৎকে বলিতেছে—'হতাশ হইওনা, ভরসা বাঁধ, নূতন আসিয়াছে।' বায়ু সকল কাজ পরিত্যাগ করিয়া সেই বার্ত্তা সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেছে। পাখীরা একতানে সেই গানই গাহিতেছে। নিরাশা পলাইয়া গিয়াছে। মরণ ভয়ে লুকাইয়াছে। আজ আশার দিন, আজ জীবনের দিন। চারিদিকে নূতন স্ফূর্ত্তি, নূতন উৎসাহ, নূতন জীবন। আয় কল্পনা, তোরও ঐ তারগুলি আজ নূতন করিয়া বাঁধিয়া দিই।—আগে কি গাহিতে কি গাহিয়াছিস্, বীণা কত বেসুরা বলিয়াছে, কেহ শুনিতে চাহে নাই, যে একবার শুনিতে বসিয়াছিল সে হয়ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গিয়াছে—আজ সে সব ভুলিয়া যা! আজ তো পুরাতনের কথা কেহই বলে না, আজ যে নূতনের ঘোষণা।—আয় কল্পনা, তবে আয়, তোর ঐ তার গুলি নূতন করিয়া আজ বাঁধিয়া দিই। একবার তারে তারে ঝঙ্কার দিয়া, নূতন সুরে সুর মিলাইয়া, নূতন তানে নূতন প্রাণে গা দেখি!

ঊষা।

১

নয়নেতে মোহ আঁকা,
অধরেতে হাসি মাখা,
ঘুম-ভাঙা ঊষা-রাণী আসে পায় পায়!
সুনীল মেঘের কোলে
কিরীট-কিরণ দোলে,
সোণার আঁচল লোটে সুমেরু-মাথায়।

২

শুভ্র মেঘ-স্তরে স্তরে
আলো-রেখা খেলা করে;
নিরমল নীলাকাশ বিস্ময়ে চাহিয়া;
হাসিমাখা শুভ্র মুখ,
আধ ঢাকা শুভ্র বুক,
দিক্-নারী সারি সারি ঘেরে দাঁড়াইয়া।

৩

ম্লানমুখী শুক-তারা,
আলোকে লাজেতে সারা;
লুকায় মলিন ছায়া গিরিতলে, বনে;
নিদ্রা ত্রাসে ছুটে যায়;
স্বপ্ন আলুথালু প্রায়;
কল্পনা চমকি চায় পূর্ব্ব-দিক পানে!

৪

ফুটিছে হাসিয়া ফুল;
দুলিছে লতিকা-কুল;
মহীরুহ নত শির, ঝরিছে শিশির;
পূর্ব্ব-মুখে চেয়ে চেয়ে
পাখী ওঠে গেয়ে গেয়ে;
বহে ধীরি ধীরি অতি শিহরি সমীর।

৫

ভৃঙ্গ গুণ্ গুণ্ স্বরে
ফুলে ফুলে খেলা করে;
প্রজাপতি দুলে দুলে ভ্রমে মনোসুখে;
চকা-চকী চোখোচোখি;
ঘুঘু-দুটি মুখোমুখি;
ময়ূর বেড়ায় নেচে ময়ূরী-সম্মুখে।

৬

ওঠে কাংস্য-ঘণ্টা-রোল,
বম্বম্ বম্বম্ বোল,
প্রাচীন অশ্বত্থ-তলে ভগ্ন মন্দিরে;
ভাঙা সোপানের মূল,
শুষ্ক বিল্বপত্র ফুল,
বহে নদী কুল্ কুল্ মৃদুল অধীরে।

৭

আবক্ষ, নদীর পরে,
দাঁড়ায়ে, অঞ্জলি ক'রে,
তর্পণ করিছে দ্বিজ, মধু সাম গানে ;
চলে গ্রাম্যবধূ-গুলি
কুম্ভ কক্ষে হেলি দুলি,
বেড়া ঘেঁসে, মৃদু হেসে চেয়ে ভূমি পানে।

৮

রাখাল গো-পাল পাছে,
শিস্ দিয়া চলিয়াছে ;
হল-স্কন্ধ চলে চাষী উচ্চ কণ্ঠে গেয়ে ;
বাধ গিরি-পথে ওঠে,
বাঁশীতে ললিত ফোটে,
উচ্চ কর্ণে মৃগযূথ আসে নেচে ধেয়ে।

৯

নির্ঝরিণী এঁকে বেঁকে,
শত ইন্দ্র-ধনু এঁকে,
ঝাঁপায়ে পড়িছে দূরে গিরি-শির হতে ;
ঝক্ ঝক্ গিরি পরে,
তুষারে, মেঘের স্তরে
ঢাকিয়া রেখেছে যেন কি এক-জগতে।

১০

ফুটো না ফুটো না, রবি !
থাক ঘোর ঘোর ছবি,
ধরা যেন ঋষি-স্বপ্ন, মধুর—মদির !
নাহি শোক, নাহি তাপ,
নাহি মোহ, নাহি পাপ,
কেটো না এ আবছা-জাল, প্রত্যক্ষ অধীর

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

বামনপুরাণ।*

এই পুরাণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে ;—

১। ভগবান্ বিষ্ণুর বামন রূপ ধারণ।

২। প্রহ্লাদের সহিত নরনারায়ণের যুদ্ধ।

৩। সতীর দেহত্যাগ।

৪। তীর্থমাহাত্ম্য, ব্রতবিধি, দানবিধি।

ইহা ভিন্ন এই পুরাণে শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ, মহিষাসুর বধ, কার্ত্তিক, গণেশের জন্মবৃত্তান্ত, শিববিবাহ প্রভৃতি অন্য অন্য অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত আছে। রঘুনন্দন, নিজ সংগ্রহের মধ্যে অনেক স্থলে বামনপুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং বামনপুরাণোক্ত বিধি সমুদয় হিন্দুর পক্ষে অবশ্য প্রতিপাল্য।

অন্য অন্য পুরাণের ন্যায়, বামনপুরাণকেও আমরা তিন অংশে বিভক্ত করিতে পারি। যথা, (১) কাল্পনিক, (২) ঐতিহাসিক, (৩) নৈতিক। ঐতিহাসিক ও নৈতিক অংশ সম্বন্ধে পুরাণে পুরাণে মত-ভেদ নাই। কিন্তু কাল্পনিক অংশ সম্বন্ধে পুরাণকারগণ নিজ নিজ কবিত্ব ও উদ্ভাবনী শক্তির সম্যক্ ব্যবহার করিয়াছেন। শিবের অসম্মাননায় সতী প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, এই ঐতিহাসিক অংশ সকল পুরাণেই ও সকল কাব্যেই একরূপ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু সতী কি ভাবে কোথায় প্রাণত্যাগ

* শ্রীঠাকুরদাস চূড়ামণি কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও প্রকাশিত। ৪১ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।

করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে পৌরাণিকেরা সকলেই এক প্রকার পথ অবলম্বন করেন নাই। ভাগবতে সতীর প্রাণত্যাগ সম্বন্ধে লিখিত আছে যে,

"ততো বিনিশ্বস্য সতী বিহায় তং,
শোকেন রোষেণ চ দূষিতা হৃদা।
পিত্রোরঘাং স্বৈরমিবৃদ্ধীর্হিণ্,
প্রেয়স্তনো যোহর্হণমাং সতাং প্রিয়ঃ॥"

৪র্থ স্কন্ধ, ৩য় শ্লোক।

অর্থাৎ "সতী শোক-রোষ-পীড়িত হৃদয়ে, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে মহাদেবকে পরিত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে গমন করিলেন।" পরে, সতী দক্ষভবনে যোগমার্গে প্রাণত্যাগ করেন।

ততঃ স্বভর্তুশ্চরণাম্বুপাসবং,
জগদ্গুরোশ্চিন্তয়তী নচাপরং।
দদর্শ দেহোদ্ভবকর্মবঃ সতী,
সদ্যঃ প্রজজ্বাল সমাধিজাগ্নিনা॥"

৪র্থ স্কন্ধ, ২৭ শ্লোক।

অর্থাৎ "সতী অনন্যমনে জগদ্গুরু মহাদেবের চরণ ধ্যান করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।"

বামনপুরাণে সতীর দেহত্যাগ সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, কৈলাসে জয়া সতীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"চতুর্দ্দশেষু লোকেষু
অন্তরো যে চরাচরাঃ।
নিমন্ত্রিত ক্রতৌ সর্ব্বে
কিং নাসি ত্বং নিমন্ত্রিতা।"

অর্থাৎ "দক্ষযজ্ঞে সকল প্রাণীর নিমন্ত্রণ হইল। তোমার নিমন্ত্রণ হইল না কেন?" এই কথা শুনিয়াই সতী—

"জয়ায়া স্তদ্বচঃ শ্রুত্বা বজ্রপাতসমং সতী।
মুমোচাভিপ্লুতা ব্রহ্মন্ পঞ্চত্বমগমত্তদা॥"

অর্থাৎ "জয়ার এই বজ্রসম নিদারুণ বার্ত্তা শ্রবণে সতী শোকাভিভূত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।"

পুরাণে পুরাণে এই যে বিসম্বাদিতা আপাততঃ লক্ষিত হইয়া থাকে, বাস্তবিক এই বিসম্বাদিতা কোনস্থলেই গুরুতর বিসম্বাদিতা নহে। "সতী অভিমানে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন" এই ঐতিহাসিক সত্য ভিন্ন ভিন্ন কবি ও পৌরাণিক ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন২ কাব্যালঙ্কারে বিভূষিত করিয়াছেন। এমন কি ব্যাসদেবও নিজ রচিত দুই পুরাণে দুই প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে ধ্রুবচরিত্র ও প্রহ্লাদচরিত্র যেরূপে বর্ণিত আছে, ভাগবতে তাহা নাই। ইহা দেখিয়া এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, ধ্রুবচরিত্র বা প্রহ্লাদচরিত্র আদ্যন্তঃ কাল্পনিক। ইহার প্রকৃত মীমাংসা এই যে ভিন্ন ভিন্ন অথবা একই পৌরাণিক ও কবি সাধারণ কয়েকটী ঐতিহাসিক ভিত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অনেকস্থলে নিজ নিজ কবিত্ব ও কল্পনার ব্যবহার করিয়াছেন। যাঁহারা বলেন যে পুরাণের আদ্যোপান্ত ঐতিহাসিক তাঁহারা ভ্রান্ত। এবং যাঁহারা মনে করেন যে পুরাণের আদ্যোপান্ত কাল্পনিক তাঁহারাও ভ্রান্ত। পুরাণের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহা অংশতঃ ঐতিহাসিক, ও অংশতঃ কাল্পনিক অর্থাৎ কবিত্ব ও উদ্ভাবনী পরিপূর্ণ। মিল্‌টন বাইবলের কয়েকটী মূল ঘটনা ঠিক রাখিয়া অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে ঐ ঘটনার সহিত বিচিত্র কল্পনা ও বিচিত্র কবিত্বের সংযোজনা করিয়া Paradise Lost ও Paradise Regained প্রণয়ন করিয়াছেন। আমাদের পুরাণাদিও ঐ ভাবে রচিত হইয়াছে। পুরাণ

আরব্য উপন্যাসের ন্যায় কাল্পনিক নহে, এবং ইহা Grote বা Gibbon-এর ন্যায় কেবল ঐতিহাসিকও নহে। ইহা কাব্য ও ইতিহাসের সম্মিলন-স্থল।

বামনপুরাণের কাব্যাংশ বা ঐতিহাসিক অংশ তত সমৃদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। ৬৮৫ পৃষ্ঠায় যে বিরাট-মূর্ত্তির বিবরণ প্রদত্ত আছে তাহা গীতোক্ত বিশ্বরূপের সহিত তুলনায় তাদৃশ মনোহর নহে।

"কুক্ষিভ্যাং অর্ণবাঃ সপ্ত জঠরে ভুবনাস্তথা।
স্থিতা বলিষু নদ্যশ্চ জঙ্ঘাস্থ জঠরেস্তথা॥
* * *
চন্দ্রাদিত্যৌ লোচনে চ পক্ষস্থাঃ কৃত্তিকাদয়ঃ।
তারকা রোমকূপেভ্যঃ রোমাণি চ মহর্ষয়ঃ॥"

অর্থাৎ—"ঐ বিরাট্ পুরুষের কুক্ষিতে সপ্ত সমুদ্র, জঠরে চতুর্দ্দশ ভুবন, বলিতে নদী, জঠরে জঙ্ঘা, লোচনে চন্দ্র সূর্য্য, পক্ষে কৃত্তিকাদি নক্ষত্রমালা, রোমকূপে তারা, ও রোমে মহর্ষিচয় বিরাজিত আছেন।"

এই বর্ণনার সহিত শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতোক্ত বিশ্বরূপের বর্ণনার তুলনা করুন, দেখিবেন উভয়ে কত প্রভেদ।

"এবমুক্ত্বা ততোরাজন্
মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায়
পরমং রূপমৈশ্বরং॥
অনেকবক্ত্রনয়নং
অনেকাদ্ভুতদর্শনং।
অনেক দিব্যাভরণং
দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং
দিব্যগন্ধানুলেপনং।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবং
অনন্তং বিশ্বতোমুখং॥"

এই বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, মনশ্চক্ষু প্রসারিত হয়, এবং বহিশ্চক্ষু যেন নিমীলিত হইয়া আইসে। প্রীতি, ভয়, বিস্ময়, আনন্দ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রসের যুগপৎ আবির্ভাবে হৃদয়মধ্যে এক অপূর্ব্ব পবিত্রতা ও অপূর্ব্ব শান্তি উদ্রিক্ত হয়। পাঠকের কর্ণে যেন এক স্বর্গীয় বীণা-তন্ত্রী নিনাদিত হইতে থাকে, এবং হৃদয়-মধ্যে শান্তি, মাধুর্য্য, পবিত্রতা প্রভৃতির এক সুকোমল উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হয়। কিন্তু বামনপুরাণ যেন এ ভাবে লিখিতই হয় নাই। ইহাতে বিস্ময় আনন্দ প্রভৃতি সমস্ত রসের উপাদান একত্রীকৃত পুঞ্জীকৃত হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু ইহাতে যেন স্বর্গীয় অনুপম শিল্পনৈপুণ্যের অভাব দেখিতে পাই। ইহার কারণ কি? যে ব্যাসদেব গীতার রচয়িতা, সেই ব্যাসদেবই ত বামনপুরাণেরও প্রণেতা। তবে, কবি কোথাওবা মনঃপ্রসূতা কোন কন্যাকে মণি মুক্তা প্রবাল হীরকাদি নানা আভরণে ভূষিত করিয়াছেন কেন, এবং কোন কন্যাকেই বা নিরলঙ্কৃতা রাখিয়াছেন কেন? ইহার উত্তর আমার বোধ হয় এইরূপ;—

আমাদের পুরাণাদি সকল শাস্ত্রই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিকারীর উদ্দেশে রচিত হইয়াছে। যাহার হৃদয় কল্পনাময়, যে সৌন্দর্য্য ও সৌন্দর্য্যপ্রসূ কবিতার পক্ষপাতী তাহার জন্য এক প্রকার পুরাণ এবং যে দুর্ভাগ্যবশতঃ নীরস ও শুষ্ক হৃদয়ের অধিপতি, তাহার জন্য অন্য এক প্রকার পুরাণ। হিন্দুশাস্ত্ররূপ সদাব্রতে কোন অতিথিরই প্রত্যাখ্যান নাই। যে যাহা চাও, যে যাহা ভালবাস, তাহার জন্য স্তরে স্তরে সেই প্রকার দ্রব্যই সুসজ্জিত

রহিয়াছে। আমার বোধ হয়, বামনপুরাণ নীরস শুষ্কহৃদয় কঠোর জ্ঞানান্বেষীর জন্য লিখিত হইয়াছে। যে দক্ষিণে বাতাস বুঝে, কিন্তু মলয়ানিল বুঝে না, যে নদী বুঝে, কিন্তু তরঙ্গিণী বুঝে না, যে নক্ষত্র বুঝে, কিন্তু তারকারাজি বুঝে না, যে কৃষ্ণ বুঝে, কিন্তু বনমালাবিভূষিত ত্রিভঙ্গিম মুরলীধর বুঝে না,—সেই ঘটনা-সর্ব্বস্ব, কল্পনাবিহীন, কবিত্ব-বিহীন মনুষ্যের জন্য বামনপুরাণ রচিত হইয়াছে। সুতরাং কবি এই পুরাণে কবিত্ব বা কল্পনা গোপন করিয়াছেন।

বামনপুরাণের নৈতিক অংশ অতি সুন্দর। আমরা দুই একটী স্থান হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"ধর্ম্মোস্য মূলং ধনমেব শাখা।
পুষ্পঞ্চ কামঃ ফলমস্য মোক্ষঃ॥
অসৌ সদাচারতরুঃ সুকেশে।
সংসেবিতো যেন স পুণ্যভোক্তা॥"

অর্থাৎ "হে সুকেশে! এই যে সদাচাররূপ-বৃক্ষ, ধর্ম্ম ইহার মূল, ধন ইহার শাখা, কাম ইহার পুষ্প এবং মোক্ষ ইহার ফল। যে ব্যক্তি এই বৃক্ষের সেবা করেন, তিনিই পুণ্যবান্।" ইহার ভাবার্থ এই যে, মূলে ধর্ম্ম থাকিলে কাম, অর্থ, মোক্ষ আপনা হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"স্বাধ্যায়ঃ ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ দানং যজনমেব চ।
অকার্পণ্যং অনায়াসং দয়াহিংসা ক্ষমাদয়ঃ॥
জিতেন্দ্রিয়ত্বং শৌচঞ্চ মাঙ্গল্যে ভক্তিরুচ্যতে।
শঙ্করে ভাস্করে দেব্যাং ধর্ম্মোঽয়ং মানবঃ স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ "বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য, দান, যজন, অকার্পণ্য, শ্রমশীলতা, দয়া, অহিংসা, ক্ষমা, জিতেন্দ্রিয়ত্ব, শৌচ, মঙ্গলকর কার্য্যে অভিরতি, শঙ্কর, ভাস্কর ও ভগবতীতে ভক্তি মানবের ধর্ম্ম।"

অনুবাদক অনায়াস অর্থে সারল্য লিখিয়াছেন। আমার বোধ হয় ইহা ভ্রম। অনুবাদক বা মুদ্রাযন্ত্র আর একটী বিশেষ ভ্রম করিয়াছেন। হিংসাকে মনুষ্যের ধর্ম্ম বলিয়া পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যেও সংস্কৃতে দুই চারিটী ভ্রম প্রমাদ দেখিয়াছি। এতৎ সম্বন্ধে প্রকাশকগণের আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

'পরদারেষমর্ষিত্বং পারক্যার্থে চ লোলুপঃ।
স্বাধ্যায়ং ত্র্যম্বকে ভক্তি ধর্ম্মোয়ং রাক্ষসঃ স্মৃতঃ॥'

অর্থাৎ "রাক্ষসদিগের ধর্ম্ম পরদারে অভিলাষ, পরের অর্থে লোভ, বেদাধ্যয়ন ও শঙ্করে ভক্তি।" ইত্যাদি অনেক নৈতিক উন্নতির উপযোগী অনেক কথা বামনপুরাণ হইতে শিক্ষা করা যাইতে পারে।

নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে বামনপুরাণের সহিত অন্য কোন হিন্দুশাস্ত্রের কিঞ্চিন্মাত্রও বিরোধ নাই। ফলতঃ হিন্দুশাস্ত্রের অনেক শাখা হইলেও মূল কথায় কাহারও সহিত কাহারও বিরোধ দেখা যায় না। অবান্তর কথায় মতভেদ লক্ষিত হয় এই মাত্র। এক জন ইংরাজও বলিয়াছেন "In all essential matters unity; in non-essential matters liberty; in all charity." হিন্দুশাস্ত্রকারগণ সর্ব্বদা এই উদার নিয়মের প্রতিপালন করিয়াছেন।

এই পুরাণোক্ত ধ্যানগুলিও অতীব মনোহর। দুইটী ধ্যান উদ্ধৃত করিলাম।

"নমস্তে দেবতানাথ নমস্তে গরুড়ধ্বজ।
শঙ্খ চক্র গদাপাণে বাসুদেব নমস্তুতে॥
নমস্তে নির্গুণাতীত অপ্রতর্ক্যায় বেধসে।
জ্ঞানাজ্ঞান নিরালম্ব সর্ব্বালম্ব নমস্তুতে॥

রজোযুক্ত নমস্তেস্তু ব্রহ্মমূর্ত্তে সনাতন।
ত্বয়া সর্ব্বমিদং নাথ জগৎ সৃষ্টং চরাচরং॥
সত্ত্বাধিষ্ঠিত লোকেশ বিষ্ণুমূর্ত্তে অধোক্ষজ।
প্রজাপাল মহাদেব জনার্দ্দন নমোস্তুতে॥
তমোভিভূতোরূপেণ সর্ব্বব্যাপিন্ নমোস্তুতে।
ভূরিয়ং ত্বং অপরাধ জগান্বরহুতাশনাঃ॥

অপর,

নমস্তামি হরেশ্চক্রং দৈত্যচক্রবিদারণং।
সহস্রাংশুং সহস্রাভং সহস্রারং সুনির্ম্মলং॥
নমস্তামি হরেশ্চক্রং যস্য নাভ্যাং পিতামহঃ।
তুণ্ডে ত্রিশূলধৃক্ শর্ব্ব মায়ামূলে মহদ্ভিদুং॥
আরাসু সংস্থিতা দেবাঃ সেন্দ্রাঃ সার্কাঃ সপাবকাঃ।
অন্তে যুক্ত বিতোবায়ু রাপোগ্নিঃ পবনোনভঃ॥
আরাপ্রান্তেষু ভীমূতা সৌরাশীন্নক্ষতারকাঃ।
বাহতো মুনয়ো যস্ত বালিখিল্যাদয়স্তথা॥
তমায়ুধবরং বন্দে বাসুদেবস্য ভক্তিতঃ।
যন্মে পাপং শরীরোত্থং [illegible] মানস
নেন চ॥
তন্মে দহতু দীপ্তাংশো বিষ্ণুচক্র সুদর্শন।
যন্মেকুলোদ্ভবং পাপং পৈতৃকং মাতৃকং তথা॥
তন্মে হরতু তরসা নমস্তে অজিতায়ুধঃ।
আধয়ো মম নশ্যন্তু ব্যাধয়ো যান্তু সংক্ষয়ং॥

এরূপ মহামূল্য গ্রন্থের আদর নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। এরূপ গ্রন্থ ক্রয় করা ও পাঠ করা হিন্দুমাত্রেরই কর্ত্তব্য কার্য্য।

শ্রীনীলকণ্ঠ মজুমদার।

বেদ বিচার।

অনেকের ধারণা আর বিশ্বাস যে, বেদ নিত্য অপৌরুষেয় শাস্ত্র। ইহার রচয়িতা নাই, উহা স্বয়ম্ভু। আত্মা যেমন নিত্য অপরিবর্ত্তনশীল, বেদও তেমনি। সেই স্বয়ম্ভু বেদ ব্যাসদেব কর্ত্তৃক চারি অংশে বিভক্ত হওয়ায় তাহার এক ভাগের নাম ঋক, এক ভাগের নাম যজুঃ এক ভাগের নাম সাম, এক ভাগের নাম অথর্ব্ব হইয়াছে। ইহা ভিন্ন কতকটি উপনিষদও বেদ-মধ্যে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় তাহাও বেদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার শুক্ল কৃষ্ণ ভেদে যজুর্ব্বেদ দুই প্রকার। এই বেদ সকল ব্রাহ্মণ আর মন্ত্র দ্বারা বিশেষ বিশেষ কার্য্যকর হওয়ায় বেদ সকলের একভাগ মন্ত্র এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ভাগে ক্রিয়াকাণ্ড. মন্ত্র ভাগে জ্ঞানকাণ্ড আছে। এতাদৃশ বেদ চিরদিন সমভাবে চলিতেছে। এই বেদ অভ্রান্ত আপ্ত বাক্যে পরিপূর্ণ। এই ত বেদের বিষয়। এক্ষণে বিচারে কি দাঁড়ায় দেখা যাউক। সচরাচর সকলে যাহাকে বেদ বলেন, সেটি বিচারে বেদ বলিয়া সিদ্ধান্ত হয় না। উহা বেদ নামধারী শাস্ত্রবিশেষ। বিশুদ্ধ জ্ঞান পদার্থই বেদ। সেই জ্ঞান সর্ব্বত্র সমান, নিত্য পদার্থ। যাহাকে তন্ত্র শাস্ত্র কুণ্ডলিনী বলেন, পুরাণ শাস্ত্র যাহাকে বেদ-প্রসবিনী বাগ্‌দেবী বলেন, তাহাই প্রকৃত বেদ। সেই বেদ পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী। যাহাকে মূলপ্রকৃতি বা আদ্যা মহাবিদ্যা নিজ কণ্ঠদেশে মালা স্বরূপ ধারণ করিয়া আছেন। এই বর্ণ-

মালাই সকল শাস্ত্রের জননী। বেদ বল, শ্রুতি বল, স্মৃতি বল, পুরাণ বল, আগম বল, সকলি ঐ বর্ণমালা হইতে উৎপন্ন। এ নিমিত্ত ঐ বর্ণমালাকে মাতৃকা সরস্বতী বলে। মাতৃকা সরস্বতীও যাহা, মাহাবেদও তাহা। নচেৎ শাস্ত্র বিশেষ বেদ নামধারী ঋক যজুঃ সাম অথর্ব্বাদি শাস্ত্রকে প্রকৃত বেদ বলিয়া বোধ হয় না। প্রকৃত পক্ষে তাহাই যদি হইত, তবে পদ্ম পুরাণে এমন কথা প্রকাশ থাকিত না যে—

'নিগমাদাগমো জাত আগমাদ্যামলোদ্ভবঃ।
যামলাৎ বেদ উৎপন্নঃ বেদাৎ শ্রুত্যাদয়োপিচ।
শ্রুত্যাদেশ্চ পুরাণানি পুরাণাদিতিহাসকাঃ।"

অর্থাৎ নিগম হইতে আগম, আগম হইতে যামল; যামল হইতে বেদ, বেদ হইতে শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি। সেই শ্রুত্যাদি হইতে পুরাণাদি জন্মিয়াছে। আবার এই পুরাণ হইতে ইতিহাস সকল ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়। এইত শাস্ত্রীয় প্রমাণ। লোকে কিন্তুবর্তী অপেক্ষা শাস্ত্রীয় প্রমাণকে আদর করেন। বেদ হইতে অর্থাৎ ঋক যজুঃ সামাদি হইতে তন্ত্র শাস্ত্র যে আধুনিক ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ এ সামান্য চক্ষে ত দৃষ্ট হয় নাই। অধিক বিজ্ঞতা, ধার্ম্মিকতা ও পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য ইদানীং অনেকে তন্ত্রে দোষারোপ করিয়া বেড়ান, এ কথা সত্য; কিন্তু নিজে ও পরিবারবর্গের সহিত যে তন্ত্রানুমত ক্রিয়া করিতে ত্রুটি করেন না, ইহাও দেখা যাইতেছে।

কোন কোন ব্যক্তি বেদের আর শ্রুত্যাদি শাস্ত্রের রচনার কাঠিন্য আর কোমলতা দেখিয়া জ্ঞাত হইয়াছেন যে বেদ মূল আর প্রাচীন শাস্ত্র। এ নিমিত্ত সকল শাস্ত্র হইতে প্রাচীন আর কঠিন। বেদের ব্যাকরণ আর অভিধান এ সকল ব্যাকরণ আর অভিধান হইতে স্বতন্ত্র। বেদ-সমালোচক বলেন, যাহাকে সকলে ঋক বেদ বলেন উহা আদি যুগের ভাষানুযায়ী হওয়ায় অন্যান্য শাস্ত্র হইতে কঠিন ও ভাবগম্ভীর আর সংক্ষেপোক্তিবিশিষ্ট। আদি যুগের মানব সকলের ভাষা ও আচার ব্যবহার যেরূপ ছিল তাৎকালিক শাস্ত্রও তদনুরূপ হওয়ায় ঋক বেদই তদুপযুক্ত শাস্ত্র হইল। শ্রুতি স্মৃতির রচনা প্রণালী যজুর্ব্বেদানুযায়ী। যজুর্ব্বেদ ঋগ্বেদ হইতে কিছু সহজ হইল। শ্রুতি স্মৃতিকে যজুর্ব্বেদ বলিলে বেদের অনিষ্ট হইতে পারে না। এই যজুর্ব্বেদ কেবল ত্রেতা যুগেরই শাস্ত্র। একালের স্বর ব্যঞ্জন পৃথক পৃথক উচ্চারণের ক্ষমতা ও থাকিল না। সত্য যুগের লোকের ন্যায় আকৃতি প্রকৃতি ও পরমায়ু প্রভৃতি ত্রেতার লোকেরা পাইলেন না। এই জন্য আদি বেদ রূপান্তর হইয়া শ্রুতি স্মৃতি রূপী যজুর্ব্বেদ হইলেন। অতঃপর সামবেদ। এই সামবেদ যজুর্ব্বেদের রচনার ন্যায় কঠিন ও দুরুচ্চার্য্য শব্দে রচিত হয় নাই। সাম বেদের ভাবও কোমল হইবায় উহা দ্বাপর যুগের জন্য পুরাণ রূপে প্রকাশ পায়। এই সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ মিলিত করিয়া যে শাস্ত্র প্রস্তুত হইল তাহারি নাম আগম বা পঞ্চম বেদ হইল। এই আগম শাস্ত্র কলি ও প্রবল কলির শাস্ত্র। কলি আর প্রবল কলির লোক সকলের জন্যই এই শাস্ত্র সকল প্রকাশ পাইল। এ শাস্ত্রের রচনাপ্রণালী ও ভাব কোমলতায় ও গাম্ভীর্য্যে বিমিশ্রিত। এ নিমিত্ত আগম শাস্ত্রকে শুভমুখী শাস্ত্র বলে। শিব এই শাস্ত্রকে শাম্ভবী বিদ্যা বলিয়াছেন। এ শাস্ত্রে

ভ্রম প্রমাদাদি দোষ স্পর্শ করিতে পারে নাই। কলি যুগ ভিন্ন অন্য অন্য কোন যুগের জন্য যে সকল শাস্ত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহার ফল লাভ করা দীর্ঘকালসাধ্য। আশুমোক্ত ক্রিয়ার ফল অচিরকালে ফলে।

রচনার ইতর বিশেষে যদি শাস্ত্রের নবীনতা ও প্রাচীনতা প্রকাশ পাইত, আর প্রাচীন নূতনের আদর ও অনাদর হইত তবে ঋকবেদ সর্ব্ব শাস্ত্র হইতে অর্থাৎ যজুঃ ও সাম বেদাদি শাস্ত্র হইতে সর্ব্বোচ্চাসনও প্রাপ্ত হইতে পারিত। হিন্দু সমাজে সকল বেদই সমান। ইতর বিশেষ কিছুই দেখা যায় না। বরঞ্চ সামবেদ হিন্দু সংসদি অধিক মান্য। ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"বেদানাং সাম বেদোস্মি।"

অর্থাৎ বেদের মধ্যে আমি সামবেদ। সামবেদের মধ্যে কতকগুলি গান আর যে স্তব আছে তাহা অতিশয় সুমিষ্ট ও মনোহর। ঋক, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব শাস্ত্রের নাম যে জন্য বেদ হইয়াছে, তাহার নিদান ও তাৎপর্য্য অনেকে জানেন না বোধ হয়। ঋক যজুঃ সামের প্রকৃত নাম ত্রয়ী। অর্থাৎ সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই যুগত্রয়ে যে শাস্ত্র মতে লোক সকল ক্রিয়া করিতেন তাহারই নাম ত্রয়ী। বেদ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবার এই মাত্র কারণ যে, যাহাতে মাতৃকা সরস্বতী মন্ত্র ও যন্ত্ররূপে নিয়ত অবস্থিতি করেন তিনি জ্ঞানপ্রদ হেতু বেদ পদবাচ্য। ঋক যজুঃ সাম অথর্ব্বে যত মন্ত্র ও যন্ত্র আছে এত আর কোন শাস্ত্রে নাই। এই ত বেদের সংক্ষেপ সমালোচনা করা গেল।

ইহাতে এই মাত্র প্রকাশ পাইতেছে যে, গৌণ মুখ্য ভেদে বেদ সামান্যতঃ দুই প্রকার। তন্মধ্যে যাহা পৌরুষেয় পরিবর্ত্তনীয় তাহা গৌণ বেদ, আর যাহা অপরিবর্ত্তনীয় অপৌরুষেয় অথচ স্বয়ম্ভূ তাহাই মুখ্য বেদ। এই মুখ্য বেদ নিরাকার সর্ব্বপ্রাণিস্থ। ইহা কেবল বর্ণময় অক্ষর মাত্র। এই বেদ কণ্ঠতালুাদির অভিঘাতে প্রকাশ পায়। মানবদিগের শরীরের অষ্ট স্থান হইতে এই বেদ উৎপন্ন হন। অথবা প্রকাশ হন। এ সম্বন্ধে পাণিনি বলেন, "অষ্টস্থানানি বর্ণানামুরঃ কণ্ঠ শিরস্তথা। জিহ্বামূলঞ্চদন্তাশ্চ নাসিকোষ্ঠৌ তালুচ॥"

মনুষ্যের মধ্যে এমন মনুষ্যও আছে যে তাঁহাদিগের দ্বারা পঞ্চাশৎ বর্ণের মধ্যে কতক গুলি বর্ণ উচ্চারণ হইতে পারে না বলিয়া বর্ণমালার মধ্য হইতে সে সকল বর্ণ পরিত্যাগ করিয়া বর্ণমালা সংকোচ করিয়া তদ্দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। কোন কোন দেশে শব্দ বা কথা রাশিকে বর্ণস্থানীয় করিয়া কর্ম্ম চালাইতেছেন। মনের ভাব যাহা দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে তাহারি নাম বেদ। অথবা যাহাতে পদ পদার্থ বোধ হয় তাহাই বেদ। এ বেদ সর্ব্বত্র সর্ব্বজনসমাজে সমাদৃত। এতাদৃশ বেদকে মুখ্য বেদ বলা যায়। যেমন ঋক যজু সাম অথর্ব্ব শাস্ত্র বেদ বলিয়া পরিচিত তেমনি আবার কোরাণাদি ধর্ম্ম শাস্ত্রও ম্লেচ্ছ আর যবনদিগের নিকটে বেদ। প্রাচীন বাইবেল ও পুরাতন কোরাণ যেমন রূপান্তরিত হইয়া নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। সেইরূপ ঋক যজুঃ সামের আকৃতি পরিবর্ত্তন হইয়া শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ রূপ ধারণ করিয়াছে। এই পাপ-প্রধান কলি যুগে প্রকৃত যজু ও সাম সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন কুত্রাপি মেলে না। যাহা মেলে

তাহা আদল নকলে মিশ্রিত বিরূপ মাত্র। কি হিন্দু কি যবন কি ম্লেচ্ছ সকল জাতির অতি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রেরই এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। ইহাতে সন্দেহ নাই।

আগম ভিন্ন আর আর হিন্দুশাস্ত্র সকলের মধ্যে কতকগুলি শাস্ত্র দৈব, কতকগুলি আর্ষ, কতকগুলিকে ক্ষত্রিয়ঋ শাস্ত্র বলে। গৌণ-বেদ, দৈব আর্ষ উভয় ভাষায় প্রস্তুত হয়। লোকপিতামহ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যে সকল বেদ প্রকাশ পায় তাহা কেবল দৈবভাষায় প্রস্তুত। সে ভাষা সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বজাতীয় মানব ভাষার মূল। এই ভাষাকে প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা বলা যায়। আর্ষ ভাষাও কোমল সংস্কৃত ভাষা। এ ভাষার ব্যাকরণ অভিধান পাওয়া যায়।

ক্ষত্রিয় ভাষায় বেদ ভিন্ন কতকগুলি স্মৃতি সংহিতা প্রকাশ পায়। সেই স্মৃতির নাম মনু স্মৃতি বা মনু সংহিতা। ইহার ভাষা দৈব ও আর্ষ ভাষা হইতে কোমল। মনু আবার এক খানি নহে। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত মনু ছিলেন সকলেরি এক এক খানি করিয়া ধর্ম্মসংহিতা থাকায় অগণ্য মনুসংহিতা প্রকাশ হইয়াছিল। কোন প্রতিকে সে সকল মনুস্মৃতির নাম গন্ধও নাই। এখন যে মনুস্মৃতি পৃথিবীতে দেখা যায়, উহা শ্বেত বরাহ কল্পের বৈবস্বত মনুর কৃত। কিন্তু লোকে কি নিমিত্ত উহাকে সায়ম্ভব মনুর কৃত বিবেচনা করেন তাহা স্থির করা দুরূহ ব্যাপার।

সে যাহা হউক, আর এক কথা এই, শিব-প্রণীত তন্ত্রশাস্ত্র সকল দৈবভাষায় প্রকাশ না হইয়া কেবল মানবীয় ভাষায় প্রকাশ হইল কেন? এই সমস্যার সিদ্ধান্ত করিতে হইলে অগ্রে তন্ত্রের সমালোচনা করা আবশ্যক।

যত প্রকার তন্ত্র প্রকাশ পাইয়াছে তৎসমুদায় একই প্রকার ভাষায় প্রস্তুত হয় নাই। নানা লোকের হিতার্থ দয়ালু শিব দেবলোকের জন্য যে তন্ত্র প্রচার করেন তাহা কেবল দেবভাষায়; আর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্বাদির হিতার্থ যাহা, তাহা তাহাদিগের ভাষায়; এইরূপ মানবজাতির জন্য যে তন্ত্র তাহা মানবীয় ভাষায় সংরচিত হইয়াছে। অতি সহজ কথায় সরল ভাষায় এই শাস্ত্র লিখিত হইয়াছে। কিন্তু, সে সব অনেক কথা। তাহার সমালোচনার স্থান এখানে নাই। তন্ত্রশাস্ত্র বেদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। যদি চারি বেদ মান, তবে আর এক বেদ না মানিবে কেন?

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম।

লক্ষ্মী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তা, কথাটা এই। মন্মথনাথ কলিকাতা হইতে বিবাহ করিয়া বাড়ী আসিতেছে; বড় মানুষ ভাগর বৌ—তার গায় আবার জামা আঁটা! কথাটা যেই শুনিল, সেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এ বিবাহের বিন্দুবিসর্গও পূর্ব্বে কেহই শুনে নাই। মন্মথের গ্রামে প্রবেশের পূর্ব্বেই কথাটা গ্রামে আগে আসিয়াছিল। সুতরাং তাহা লইয়া গাঁয়ে একটা হলস্থুল পড়িয়া গেল। ছেলে বুড়ো, মাগী ছাগী সবাই

বৌ দেখিতে ছুটিল। গৃহিণী হাঁড়ি নামাইয়া, মেয়ে কুটনা ফেলিয়া, বৌ পানসাজা রাখিয়া, ছেলেরা স্কুল বন্ধ করিয়া বৌ দেখিতে দৌড়িল। যে চুল খুলিয়াছিল সে অমনি চুল গুলা পুনরায় জড়াইতে জড়াইতে, যে তেল মাখিয়াছিল সে মাথায় কতকটা জল থাবড়াইয়া, যে স্নান করিতেছিল সে ভিজা কাপড়েই—যে যে অবস্থায় শুনিল সে সেই অবস্থায়ই ছুটিল। যাহাদের কথা ফুটে নাই, তাহারাও মার কোলে উঠিয়া বৌ দেখিতে চলিল। মন্মথদের বাড়ীতে আজ লোক ধরে না।

মন্মথদের দুই খানি ছোট খ'ড়ো ঘর, আর একখানি রান্না-চালা—চারি দিকে মাটীর পাঁচিল। তাদের অবস্থা তেমন নয়। এক মা ভিন্ন তার সংসারে আর কেহই নাই। তাহার শৈশব অবস্থায় তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। বাপকে বড় তার মনে পড়ে না। বৃদ্ধা পৈতা তুলিয়া, পাট কাটিয়া ছেলেটিকে মানুষ করিয়াছে। ক্রমে মন্মথ মানুষ হইয়া দুটাকা আনিতে শিখিল, বৃদ্ধার আনন্দের সীমা রহিল না। আজ তাহার সেই মন্মথ বিবাহ করিয়া আসিয়াছে, মার মনে কত আনন্দ তা কে বলিবে? মন্মথ আসিতেছে শুনিয়া দৌড়াইয়া গিয়া বৃদ্ধা পাড়ার পাঁচজন এয়েস্ত্রীকে ডাকিয়া আনিল। তাহারা সাজিয়া গুজিয়া আসিয়া শুভকর্ম্মের সব আয়োজন করিয়া দিল। তখন আলপনার ঘটা পড়িয়া গেল। শাঁখের শব্দে ও উলুধ্বনিতে সে ক্ষুদ্র বাড়ী খানি কাঁপিতে লাগিল। বরক'নে বাড়ী আসিলে একজন গিয়া তাহাদের বরণ করিতে লাগিল।

যাহারা বউ দেখিতে আসিয়াছিল, মাতা তাহাদিগকে কাহাকেও "এস মা এস," কাহাকে "এস দিদি এস" কাহাকে "এস বাবা এস" বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার বড় আপশোষ হইল, যে তিনি কাহারও হাতে কিছুই দিতে পারিলেন না। কলিকাতায় বিবাহের কথা হইতেছিল, ইহাই তিনি পুত্রের মুখে শুনিয়াছিলেন: কিন্তু হঠাৎ যে মন্মথ বৌ লইয়া আসিয়া দাঁড়াইবে ইহা জানিতেন না। কোন উদ্যোগ নাই। গ্রামেও হঠাৎ কিছু কিনিতে মেলে না। মাতা বড়ই লজ্জায় পড়িলেন। সে লজ্জা ও কষ্ট জানাইয়া সকলের কাছে ত্রুটি স্বীকার করিতে লাগিলেন। অনেকেই তাঁহাকে বলিল "তা, লজ্জা কি, এ তো অন্য পর কেহ নয়। ভাল, বৌভাতে খুব ঘটা করিও।"

মা বলিলেন "আহা, মা তোমরা ভিন্নই বা আমার মন্মথের আর আছে কে? আশীর্ব্বাদ কর, ভগবান্ যেমন দুটিকে মিলিয়েছেন, যেন সুখে রাখেন।"

তখন, বরণ হইয়া গেলে, চারিদিক্ হইতে "বৌর মুখ দেখি—বৌর মুখ দেখি" বলিয়া রব উঠিল। যিনি বরণ করিতেছিলেন তিনি বধূর ঘোমটা খুলিয়া মুখ দেখাইলেন। চাঁদ পানা মুখ। যেমন নাক, তেমনি চোক। তেমনি কপাল। কপালের উপর তেমনি কাল কাল কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। কি গড়ন! নিখুঁত, নিটোল, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। একাধারে এত রূপ কেহ আর কখন দেখে নাই। দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য সকলে অবাক্ হইয়া গেল। মার বুকখানা আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

অনেকে বৌর নাম শুনিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল। মাতা কানে

কানে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি, মা?"

বালিকা মুখখানি নত করিয়া বাম হাতের দুই আঙুল দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"লক্ষ্মী।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার পর রামহরি মুখুয্যের আট-চালায় তাস পাশা পড়িয়াছে। গ্রামের যাঁহারা চাঁই তাঁহারা একে একে সকলে আসিয়া জমিয়াছেন। এক দিকে, "ইস্তক পঞ্জা—হাতের পাঁচ" আর এক দিকে "কাঁচেবার—পঞ্জুড়ি" প্রভৃতি শব্দে ক্ষুদ্র আট চালা প্রতিধ্বনিত হইতেছে। রামা চাকরের তামাক সাজিতে সাজিতে প্রাণ অন্ত হইবার যো হইয়াছে। তবে এ আজ নূতন ব্যাপার নয়, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া, প্রত্যহই এইরূপ হইয়া থাকে—সেও অভ্যস্ত হইয়াছে। অনেকে যে কেবল বাড়ীর তামাক খরচটা বাঁচাইবার জন্য এখানে আসেন ইহা তাহার বেশ ধারণা ছিল; কিন্তু সেও প্রভুভক্ত, মনিবের যাহাতে বেশী খরচ না হয় সে দিকে খুব নজর। দশবার ডাক ভাঁড়াইয়া একবারে "এজ্ঞে" বলিয়া উত্তর দিত।

বেলা বড়ই জমিয়া আসিয়াছে, পার্শ্ববর্ত্তী নিষ্কর্ম্মার দল হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া একদৃষ্টে খেলার দিকে দেখিতেছে; এমন সময়ে গ্রামের নায়সিদ্ধান্ত মহাশয় সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র রামহরি বাবু সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। নীলমণি ঘোষ হাত তুলিয়া বলিল—"প্রাতঃ প্রণাম।" তখন রামা তামাক দিতে আসিয়াছিল, শুনিয়া বলিল "তা সাঁজের ব্যালাও পেরাতঃ পেন্নাম বল্‌তি হবে কেন গা, সিদ্ধুর মশাই!" রামহরি তাহাকে বকিয়া উঠিলেন। রামা বাহিরে গেল। ন্যায় সিদ্ধান্ত মহাশয় আসন গ্রহণ করিলেন।

তখন খেলা ফেলিয়া সকলে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। রামহরি বাবু বলিলেন "কি, মনে করে?"

সিদ্ধান্ত মহাশয় টিপের উপর টিপ নস্য লইয়া বলিলেন "শুনেছ, কাল মন্মথের বৌভাত।"

রা। আজ্ঞে, তা শুনেছি।

সি। তার পর, কি স্থির কর্‌লে?

রা। তার আর স্থির অস্থির কি?

সিদ্ধান্ত মহাশয় একটু উগ্রস্বরে বলিলেন—"বলি, খেতে যাওয়া হবে?"

রামহরি ও অন্যান্য সকলে তাঁহার রকম সকম দেখিয়া কিছু চমৎকৃত হইল। বাস্তবিক, তাহারা ইতিপূর্ব্বে এ বিষয়ে বিশেষ কিছু চিন্তা করে নাই। রামহরি থতমত খাইয়া বলিল—"তা, আপনি কি আজ্ঞা করেন?"

সিদ্ধান্ত আরও রাগিয়া বলিলেন—"আজ্ঞা আবার কি? সে কোথাকার কার মেয়ে বিয়ে করে আনিল তাহার ঠিক্ নাই। বিয়ে করেছে কি নিকে করেছে তাই বা—"

চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী কিছু স্পষ্টবক্তা লোক, বলিল "ছিঃ ভদ্র লোকের নামে অমন কথা বল্‌বেন না।"

সি। ভদ্র লোক! কে ভদ্রলোক। অতবড় ধেড়ে মেয়ে আইবুড় কি ভদ্র লোকের ঘরে কখন থাকে।

চ। কেন, কোন্ কুলীনের ঘরে নেই! ২৫ বছরের মেয়েরও যে বে হয় না।

সি। চাঁদে আর বাঁদে! কিসের

কথার কি কথা আন ঠাঁা। কুলীনসন্তান আর মদ্যপ! ছিঃ তুমি অতি অর্ব্বাচীন।

শ্যামাচরণ কিছু রসিক লোক, বলিল—"মেয়েটা নাকি আবার কালা গায় দেয়—কি বাহার!"

সিদ্ধান্ত উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন "বল, চন্দ্রনাথ তায়াকে বল। বেবিশো—বেবিশ্যে—নিশ্চয় ও—

চন্দ্রনাথ বড়ই রাগিয়াছিল, বলিয়া উঠিল—'সিদ্ধান্ত মশাই, আর সিদ্ধান্তে কাজ নেই। উপাধির ছটা আর টিকির ঘটা থাকলেই পণ্ডিত হয় না—বেবিশ্যে নয়—বেশ্যা বলতে হয়। তা, ধর্ম্ম জানেন, সে কি, কিন্তু খুঁজলে প্রকৃত বেশ্যা অমন অনেক ঘরে—"

সিদ্ধান্ত তেলে বেগুনে জ্বলিয়া গেলেন। চন্দ্রনাথের প্রতি সহস্র "বেল্লিক, পাষণ্ড, অনড়ন্ প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া পড়িলেন। কোমরের কাপড় খানা খুলিয়া যাইবার উপক্রম হইল। রামহরি বাবু দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন—"চন্দ্র, তুমি বড় ছেলে মানুষ—থাম না!"

চন্দ্রনাথ চুপ করিয়া রহিলেন। সকলে মিলিয়া সিদ্ধান্ত মহাশয়কে ঠাণ্ডা করিয়া বসাইলেন। তখন ভাল হইয়া বসিয়া আর দু টিপ নস্য লইয়া বলিলেন "দেখ, এ ছেলেমানুষি নয়—এ সমাজের কথা! শাস্ত্রের কথা। আমার মতে ও বৌভাতে কারও যাওয়া উচিত নয়।"

শুনিয়া অনেকে শিহরিয়া উঠিল। রামহরি বলিল "তবে কি মন্মথকে এক ঘ'রে করিতে বলেন?"

সি। আগুন খেলেই আঙার যমন করিতে হয়।

রা। কিন্তু তার এমন কি দোষ!

সি। রামহরি বাবু, তুমিও ছেলে মানুষ হলে। দোষ নয়—মহৎ দোষ! বৌভাতে গেলে ঐ মেয়ের অন্ন খেতে হবে। কিন্তু ও কার মেয়ে, কি জাতের মেয়ে তা জান? আর এটাও বুঝতে পার না, যদি ভালই হবে, তবে লুকিয়ে বে হবে কেন? বের আগে কেউ একটা কথাই বা জানতে পর্ব্বে না কেন? এর ভিতর নিশ্চয়ই গলদ্ আছে—গলদ্ আছে—গলদ্ আছে!"

'অমন প্রকাণ্ড বগল নৈলে কে গলদ্ ধার কর্ত্তে পারে বল! দূর হোক!" ঈষৎ অনুচ্চ স্বরে এই কথা বলিয়া চন্দ্রনাথ সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন।

রামহরি বলিলেন, "কিন্তু—'

সি। আবার কিন্তু কি! আপনার আপনার জাত বাঁচাবার ইচ্ছা থাকে তো কেহই নিমন্ত্রণে যেও না। ইহাই আমার শেষ কথা।

সিদ্ধান্ত মহাশয় আর বসিলেন না। একেবারে উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে দুয়ারের কাছে একটা কুকুর শুইয়া ছিল, সে তাঁহার মূর্ত্তি ও ভঙ্গি দেখিয়া 'ঘেউ ঘেউ' করিয়া ডাকিয়া উঠিল।

সিদ্ধান্ত মহাশয় চলিয়া গেলে মুহূর্ত্তের জন্য সকলে অবাক্ হইয়া রহিল। তাস পাশা বন্ধ হইয়া গেল। তখন সেই কথারই আন্দোলন চলিল। কু ও সু সকল রকমই লোক আছে। কু ও সু সকল রকমই যুক্তি উঠিতে লাগিল। শেষ স্থির হইল, নিমন্ত্রণে না যাওয়াই শ্রেয়।

পরদিন মন্মথের মাতা যথাসম্ভব আয়োজন করিয়া সব প্রস্তুত করিল। আজ

তাহার মন্মথের বৌভাত। তাহার আনন্দের সীমা নাই। সেই বৃদ্ধ বয়সেও যেন তাহার যৌবনের বল ফিরিয়া আসিয়াছে। একাই সে কত লোকের রান্না রাঁধিল। সব প্রস্তুত। কেহই আসে না। ডাকিবার জন্য লোক গেল। কেহই আসিল না। লোকের মুখে মন্মথ সব শুনিল। ডাকিয়া মাতাকে তাহা শুনাইল। বৃদ্ধার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কতক্ষণের জন্য তাহার মুখে কথা আসিল না। শেষ নিমে মন্মথকে সঙ্গে লইয়া সবাইকে ডাকিতে গেল। কেহই ঘরে নাই। কর্ত্তারা নাই, সুতরাং ছেলেরাই বা যায় কি প্রকারে? কাঁদিতে কাঁদিতে মাতাপুত্রে গৃহে ফিরিল। তখন, সেই রাশীকৃত অন্ন ব্যঞ্জন কাঙ্গালী ডাকিয়া বিলাইয়া দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ আকাশে অনেক রাত্রে চাঁদ উঠিল। চাঁদের আলোয় উঠানে বসিয়া মন্মথ ও তাহার মাতা। মা বলিলেন "আমার মাথা খা, সত্য করে বল্ বাবা, তুই কার মেয়ে ঘরে আন্‌লি।"

ম। আমি তো বলেছি, মা, আমি না জেনে শুনে এ কাজ করি নি।

মা। কিন্তু সবাই যখন চর্চ্চাতে চায়, তখন যে আর আমি মুখ পাইনে।

ম। তাও তো আমি তোমাকে বলেছি; তাই কেন ভেঙে সকলকে বল না।

মা। তা কি বলিনি? কিন্তু কেউ তো বিশ্বাস করে না যে বরং আগে আমার দিকে টানিত সে এখন বলে—'তোমারই ছেলের দোষ—বাপ মা না থাক্ মেয়ের তিনকুলে কি কেউ নেই, যে আপনার জন বলে পরিচয় দেয়।'

ম। বিশ্বাস করে না! একজনও না।

মা। তবে আর মাথা খাচ্ছি কি! সত্য ক'রে বল্ বাবা, তুই কোথায় ও মেয়ে পেলি।

ম। তবে, তোমারও বিশ্বাস হয় না, মা!

মা। আমি তো, বাবা, অবিশ্বাস করি নি! আ মরি মরি! অমন বৌ কি হয়! মা আমার লক্ষ্মী তো যথার্থই লক্ষ্মী! যেমন রূপ তেমনি গুণ! কি কথা, কি কাজ কর্ম্ম, বের ক'নে—এখনই কত যত্ন আয়িত্যি! এমন বৌ নিয়েও আমি দুদিন সুখে ঘর কর্ত্তে পার্লেম না! বিধাতা কি এ কপালে কেবল ছাই গুলে লিখেছিলেন!

একেবারে সহস্র দুঃখের কথা তাঁহার মনে পড়িল। আর কিছু বলিতে পারিলেন না। দুই চক্ষে জলধারা বহিল। চাঁদের আলোয় মন্মথ তাহা দেখিল। গদ্গদ কণ্ঠে বলিল—'কেঁদো না মা, কেঁদো না। এ সব আমারই অদৃষ্টের ফের, নহিলে কেন এমন ঘটনা ঘটিবে? তুমি জানিবে না, অন্য কেউ জানিবে না, কেনই বা আমি বিয়ে ক'রে আসিব? বিয়ে ক'রে আসিলাম তো এ অভাবনীয় ব্যাপারই বা কেন ঘটিল? পরিচয় দিবার একজনই বা রহিল না কেন? হে ভগবন্! সকলই তোমার খেলা।'—

মন্মথের কান্না আসিয়াছিল। কণ্ঠ বাষ্প-পীড়িত হইয়াছিল। মা বলিলেন—"চুপ কর বাবা। ছিঃ, বেটা ছেলে, তোমার কান্না কেন? ধর্ম্মপথে থাকিলে কখনই মন্দ হবে না।"

ম। মা, ধর্ম্মাধর্ম্ম কিসে হয় কেমন করিয়া বুঝিব? শুনিয়াছ তো, এ গল্প

কত দিন করিয়াছি - বাসার কাছে একজন ব্রাহ্মণ থাকিতেন। তাঁহার স্ত্রী ও একটী কন্যা। ব্রাহ্মণ অতি শান্ত, সচ্চরিত্র ও নিষ্ঠাবান্। পূজাহ্নিকেই দিনের প্রায় সকল সময় কাটিয়া যাইত। যে টুকু অবকাশ তাহা সদালাপে ও শাস্ত্রালোচনায় কাটিত। আমি প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে যাইতাম। তাঁহার উপদেশপূর্ণ কথাগুলি শুনিতে বড়ই ভাল বাসিতাম। তিনিও আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। তাঁহার বাটীর ভিতরেও আমার যাইতে নিষেধ ছিল না। কন্যাটী বাপের কাছে পাঠ অভ্যাস করিত। কখন বা আমি গিয়া পড়িলে আমরা দুজনেই শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শুনিতাম। একদিন ব্রাহ্মণ ও তাঁহার স্ত্রী দুজনেই তাঁহাদের কন্যাটীকে আমার সহিত বিবাহ দিবার কথা পাড়িলেন। তখন আমি কিছুই বলিতে পারি নাই, বলিয়াছিলাম 'মাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিতে পারি না।' তার পর তোমায় বলিলাম। শুনিয়া তুমিও রাজি হইলে। আমিও গিয়া তাহাই বলিলাম। তাঁহারা বড় সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু সেই দিন হইতে আমি তাঁহাদের বাড়ী সর্ব্বদা যাতায়াত বন্ধ করিলাম। একদিন আপিস হইতে আসিয়া বসিয়া আছি, এমন সময়ে একজন লোক আমায় ডাকিতে আসিল। ব্রাহ্মণ ঠাকুর আমায় শীঘ্র যাইতে বলিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু উপস্থিত। তাড়াতাড়ি গেলাম। ব্রাহ্মণীর ওলাউঠা হইয়াছিল, একদিনেই শেষ অবস্থা হইয়া আসিয়াছে। তখন শ্বাস টানিতেছে। তখন ধরাধরি করিয়া বাহির করিলাম। সে সময়েও ব্রাহ্মণী আমার দিকে একবার সজলনেত্রে চাহিলেন, আমি মুখের কাছে কান লইয়া গেলেম। বলিলেন, "হাত"। আমি হাত বাড়াইয়া দিলাম। শিওরের কাছে তাঁহার কন্যা বসিয়া কাঁদিতেছিল, ধীরে ধীরে তাহার হাত খানি লইয়া আমার হাতের উপর রাখিলেন। একবার আকাশের দিকে চাহিলেন। চোখের তারা স্থির হইল। ব্রাহ্মণী স্বর্গে চলিয়া গেলেন। সে দৃশ্য এখনও যেন চোখের উপর দেখিতেছি। মনে করিলে এখনও সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। ব্রাহ্মণীর সৎকার হইয়া গেল। আট দিন পরে একদিন ব্রাহ্মণ আমায় বলিলেন, "মন্মথ, আজ দিন ভাল, আজই গোধূলি লগ্নে তোমার সহিত লক্ষ্মীর বিবাহ দিতে ইচ্ছা করি। তোমার কি মত?" আমি বলিলাম, "মা জানিলেন না, কাহাকেও বলা হইল না।" তিনি বলিলেন, "তোমার মা তো রাজি আছেনই।" তখন আমি বলিলাম "তবে আট দিন আপনার স্ত্রী গত হইয়াছেন, কালাশৌচ, এখন বিবাহ কেমন করিয়া হইবে?" তাহাতে তিনি বলিলেন, "তবে শোন মন্মথ, এটী আমাদের আপনার কন্যা নহে, পালিতা কন্যা। দুই বৎসরের সময় কাশীতে আমি ইহাকে পাই। রাঢ়ীয় শ্রেণী এক ব্রাহ্মণ এই কন্যাটী লইয়া সস্ত্রীক কাশী গমন করেন। আমি তখন সেইখানেই থাকি। তাঁহারা এক রাত্রি আমার নিকটে অবস্থিতি করেন। পরদিন প্রভাতে নৌকারোহণে দেশ যাত্রা করেন। সে দিন আকাশে বড় মেঘ উঠিয়াছিল। আমি অনেক মানা করিলাম, না শুনিয়া নৌকায় উঠিলেন। তারপর ঝড় উঠিল। সে নৌকার কি হইল জানি না; কিন্তু স্নানের সময় দশাশ্বমেধ ঘাটে দাঁড়াইয়া যখন সন্ধ্যা করিতেছিলাম, তখন

দেখিলাম একখানি কাঠ ভাসিয়া আসিতেছে, কাঠের উপর একটী শিশুকন্যা। দেখিবামাত্র চিনিলাম—এ সেই ব্রাহ্মণ কন্যা। সাঁতারিয়া তাহা ধরিয়া তীরে উঠাইলাম। অনেক সুশ্রূষায় কন্যাটীর চেতনা হইল। বাড়ী লইয়া গিয়া ব্রাহ্মণীকে দিলাম। কন্যাটীকে আপনার অধিক করিয়া পালন করিতে লাগিলাম। তার পর ব্রাহ্মণ ও তাঁহার স্ত্রীর অনেক সন্ধান করিয়াছিলাম, কোন উদ্দেশই পাই নাই। ক্রমে কন্যাটী বড় হইল। কার্য্যগতিকে কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। এখন ব্রাহ্মণী চলিয়া গেল; আর সংসারে থাকিতে বাসনা নাই। কন্যাটীকে তোমার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কাশীধামে ফিরিয়া গিয়া বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্মে এ জীবনের শেষ বোঝা নামাইব ইচ্ছা করিয়াছি।" শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। কিছুই বলিতে পারিলাম না। যথা লগ্নে আমাদের বিবাহ হইয়া গেল। দুই দিন পরে ব্রাহ্মণ কাশী চলিয়া গেলেন। আমি তোমার দাসী লইয়া তোমার নিকট আসিলাম। তোমার কাছে, মা, আমি অনেক অপরাধ করিয়াছি; কিন্তু ধর্ম্ম করিয়াছি কি অধর্ম্ম করিয়াছি তাহা বলিয়া দাও।"

মা নীরবে সব শুনিলেন। আজ আট দিন মন্মথ বাড়ী আসিয়াছে; আজ আট দিন মা অনেকবার এ কথা শুনিয়াছেন। কিন্তু তবু যখন শুনেন, তখনি যেন নূতন বলিয়া মনে হয়। মন্মথও যখন বলে তখনি যেন তাহার নূতন বলিয়া বোধ হয়। বলিতে বলিতে মন্মথ আত্মহারা হইয়া পড়ে; শুনিতে শুনিতে মাও আত্মহারা হইয়া পড়েন। কিন্তু লোকে তো তা বুঝে না। মার আবার চোখে জল দেখা দিল।

দেখিয়া মন্মথ বলিল "কাঁদিতেছ, মা?"

মা। সাধে কাঁদি, বাবা! কি করি তাই ভাবিতেছি। ইচ্ছা করে যে পোড়া দেশ থেকে এখনই সবাই মিলে উঠে আর কোথাও যাই।

ম। কোথায় যাব, মা? যদি কলঙ্কই না গেল, তবে দেশ ছাড়িয়া গিয়া কি করিব?

মা চুপ করিয়া রহিলেন।

মন্মথ বলিল "সকলে কি বলে?"

মা। পোড়া লোকে পোড়া কথা কয়; তাহা আর বলিব কি? বলে, মন্মথ ও বৌ ত্যাগ করুক; তার পর একটা প্রায়শ্চিত্ত করিলে সব চুকিয়া যাবে। মন্মথের বিবাহের ভাবনা কি।

মন্মথ আর কিছু বলিল না। বলিবার শক্তি তাহার ছিল না। একবার উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। নৈশ সমীর ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছিল। সেই বায়ুর সঙ্গে একটী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস মিশাইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ক্ষুদ্র গৃহের এক পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র বিছানা। সেই বিছানায় শুইয়া—লক্ষ্মী। মাথার কাছে জানালাটী খোলা। চাঁদের আলো আসিয়া বিছানার উপর পড়িয়াছিল। চন্দ্রের রশ্মি বালিকার মুখে, চুলে ও সর্ব্বাঙ্গে পড়িয়া খেলা করিতেছিল। কখন বা রশ্মিগুলা একত্রে একস্থানে জড় হইয়া ভাবিতেছিল, তাহাদের স্পর্শমাত্রেই তো পদ্ম মুদিয়া যায়, কিন্তু আজ এ পদ্মটা তাহারা যতই নাড়িতেছে চাড়িতেছে,

শুতই ঘুমিত না হইয়া ক্রমশঃ আরও বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছে কেন?

বালিকা অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে। অঙ্গের বসন শিথিল হইয়া এদিক ওদিক ছড়াইয়া পড়িয়াছে; চুলগুলি পোছায় পোছায় থাকিয়া থাকিয়া মুখের উপর কাঁপাইয়া পড়িতেছে; মৃদুবায়ুস্পর্শে ধীরে ধীরে ওষ্ঠাধর কাঁপিতেছে; ঈষদ্‌ভিন্ন অধরৌষ্ঠ যুগল মধ্যে মুক্তাশ্রেণীর ন্যায় দন্ত-রেখা দেখা যাইতেছে; অলসে একখানি হাত নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে;—মরি মরি কি রূপ! চন্দ্রকরে রঙ্ যেন আরও ফাটিয়া পড়িতেছে। সে ক্ষুদ্র গৃহ আলো হইয়া রহিয়াছে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অতৃপ্ত-লোচনে মন্মথ সে রূপরাশি দেখিতে লাগিল। পা নড়ে না, চক্ষু ফেরে না। সব ইন্দ্রিয় অবশ। দেখিতে দেখিতে দেখিতে মন্মথের চক্ষে ফোটা ফোটা করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। চক্ষু মুছিয়া আবার মন্মথ দেখিতে লাগিল। আবার জল গড়াইয়া পড়িল।

এই বালিকা—সরল, নির্দোষ, পবিত্র—কিছুই জানে না, সংসারের কোন রৌদ্র এখনও পোহায় নাই—আপনার যে হৃদয়ের দুঃখ তাহা আপনিই নীরবে হৃদয়ে বহন করে, কাহাকেও বলে না, কাহাকেও জানায় না—আপনার আশা ভরসা, সুখ শান্তি, সকলই একজন অপরিচিতের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত—মুখে চিন্তার ছায়া মাত্র নাই, অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে—এই দেববালার স্বামী হইবার যোগ্য কি অধম সংসারের কীট মন্মথ! বিধাতা, কেন এমন মিলন করাইলে? যে চির-দরিদ্র তাহাকে কেন এ দেবদুর্লভ রত্নের লোভ দেখাইলে? ছি ছি! মন্মথ মনে মনে আপনাকে শতবার ধিক্কার দিল, শত-বার আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। মনে মনে বলিল—"হে সমাজ, এ বালিকা তোমার কে? তোমার জন্য কত লোক আছে, এ ক্ষুদ্র বালিকাকে তোমার দলাদলির কুটিল চক্রে পিষিয়া কি ফল? নিরপরাধে ইহাকে বধিয়া তোমার কি ইষ্টসিদ্ধি হইবে?" চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

বালিকা ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতে-ছিল। দেখিতেছিল যেন, তাহার মা আসিয়া তাহকে বলিতেছেন 'আয় বাছা, এখানে আর থাকিস্‌নে, আমার সঙ্গে চলিয়া আয়।' স্বপ্নে বালিকা 'মা মা' করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ঘুম ভাঙিয়া গেল। চাহিয়া দেখিল, শিওরের কাছে দাঁড়াইয়া মন্মথ। মন্মথ নীরবে নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বালিকা স্বামীর হাত ধরিল। বলিল —"ও কি! অমন করিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদি-তেছ কেন?"

মন্মথ কথা কহে না।

"বল না—মাথা খাও, বল না।"

তবু মন্মথ কথা কহে না। কথা কহে না, কাঁদে।

তখন বালিকা স্বামীর হাত ধরিয়া বিছা-নায় আনিয়া বসাইল। বালিকাসুলভ আগ্রহের সহিত আবার জিজ্ঞাসিল "বল না, তোমার পায়ে পড়ি, কি হইয়াছে, বল না।"

মন্মথ বলিতে গেল; কিন্তু পারিল না। শুইয়া পড়িয়া বালিশের উপর মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বালিকা বিষম দায়ে পড়িল। কিছু

বুঝিতে না পারিয়া ক্ষণেক পরে সে নিজে কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

কতক্ষণ পরে মন্মথ বলিল "ছি! কাঁদিতেছ কেন?"

"তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

"আমি অভাগা তাই কাঁদিতেছি, কিন্তু তুমি কাঁদিবে কেন?

"তুমি কাঁদাইতেছ তাই কাঁদিতেছি, নহিলে তোমার কাছে থাকিয়া কেন কাঁদিব?"

মন্মথ বালিকার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল। বলিল—"তবে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কাঁদিয়া উঠিলে কেন?"

"সে একটা স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম।"

কি স্বপ্ন মন্মথ তাহা শুনিবার জন্য ভেদ করিল। বালিকা তাহা বলিল। শুনিয়া মন্মথ শিহরিয়া উঠিল। বালিকা বলিল "তা, ও কিছু নয়। স্বপ্ন কি কখন সত্যি হয়? বাবার মুখে শোন নি!"

মন্মথ আবার তাহার মুখের প্রতি চাহিল। বালিকার সরল প্রতিমূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হইল না। আবার আপনার উপর ধিক্কার জন্মিল। আবার মন্মথ কাঁদিল।

তখন বালিকা কথাটা শুনিবার জন্য বড়ই পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। মন্মথ কিছুতেই এড়াইতে পারিল না। মার সঙ্গে তার যে কথা হইয়াছিল তাহা সমস্তই বলিল। স্থির হইয়া বালিকা সমস্তই শুনিল। শেষ কথাটী আরও স্থির হইয়া শুনিল। স্থির হইয়া বলিল "তার পর, তুমি কি ঠাওরাইলে?"

মন্মথ উত্তর করিল—"কি ঠাওরাইব? আমার মাথা আর মুণ্ডু।"

বালিকা গম্ভীরে বলিল—"তোমার মাথামুণ্ডু তোমাতে নাই, তাহা হইলে এরূপ ঠাওরাইতে না। অন্য মত করিও না, যাতে সব দিক বজায় থাকে তাই কর। আমি কোন্ বাঁদীর বাঁদী, আমার জন্য কেন আপনি মরিবে ও মাকে মরাইবে?"

শুনিয়া মন্মথ অবাক্ হইয়া গেল। ভাবিল, এ কি বালিকা! বলিল—"তুমি বেশ ক'নে, ছেলে মানুষ; ছেলে মুখে তোমার এ সব বুড়ো কথায় কাজ কি?"

বালিকা ঈষৎ হাসিল। বলিল—"বাবা কি বলিতেন মনে পড়ে!"

"কি?"

"কর্ত্তব্যের কাছে, ধর্ম্মের কাছে ছেলে বুড়ো নাই। পাঁচ বৎসরের শিশু ধ্রুব বনে বসিয়া 'হরিনাম' সাধনা করিয়াছিল। বালক প্রহ্লাদ হাসিতে খেলিতে 'ক'রে কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিয়াছিল; শিশু বৃষকেতু খেলা ছাড়িয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে পিতার করাতের নীচে মাথা পাতিয়া দিয়াছিল; বেহুলা বিবাহরাত্রে মৃতস্বামীর গলিত শব বুকে বাঁধিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিল; সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী—সে সব কথা মনে পড়ে না? পুরাণের সে সব বিষয় ভুলিয়া গিয়াছ কি? আমি বালিকা হই আর শিশুই হই, তোমার ধর্ম্মপত্নী, তোমাকে ধর্ম্মের কথা কেন না বলিব?"

মন্মথ নির্ব্বাক, হতবুদ্ধি। এই বয়সে এত জ্ঞান! হা ভগবন্! এমন রত্ন দিয়াও তাহা কাড়িয়া লইতেছ! ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর মন্মথকে ছলিবার জন্যই কি ইহাকে ইহার মধ্যে এত রূপে গুণে সাজাইয়াছিলে? জগদীশ! তোমার খেলা তুমিই বুঝ। মন্মথ বালিকার যতই গুণের পরিচয় পাইতে লাগিল, ততই তাহার হৃদয় ফাটিয়া যাইবার

উপক্রম হইতে লাগিল। অনেক কষ্টে হৃদয় বাঁধিয়া বলিল—"এস, লক্ষ্মি, রাত হইয়াছে, এস আমরা শুই।"

দুই জনে দুই জনের পাশে শুইয়া পড়িল।

* * *

প্রভাতে মন্মথ উঠিয়া দেখিল, লক্ষ্মী নাই। উঠিয়া এদিক্ ওদিক্ খুঁজিল। দেখিতে পাইল না। ঘাটে, পথে, রান্নাঘরে কোথাও লক্ষ্মী নাই। মুখ শুকাইয়া গেল, বুকের ভিতর ধড় ধড় করিতে লাগিল। মাকে জিজ্ঞাসা করিল। বৃদ্ধা আকাশ হইতে পড়িল। 'সে কি—বৌমা কোথায়?' বৃদ্ধা আতিপাতি করিয়া খুঁজিল, লক্ষ্মী নাই। তখন পুত্রকে জিজ্ঞাসিলেন, তাহাদের দুই জনে কোন কথা হইয়াছিল কি না। যে কথা হইয়াছিল, তাহা সব মন্মথ মাকে বলিল। শুনিয়া বৃদ্ধা কপালে কর হানিল। বলিল—"হা ভগবান্! আমার এমন বাড়া ভাতেও ছাই দিলে! সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মী আমার ঘরে আসিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, আমি অভাগী কিছুই বুঝিতে পারিলাম না!" ক্রমে কথাটা গ্রামময় হইয়া গেল। যে শুনিল, সেই বিস্মিত হইল। মুখে মুখে কথাটা অনেকটা উপন্যাসের আকার ধারণ করিল। ক্রমে সবারই দৃঢ় প্রত্যয় হইল, যথার্থই লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বৈকুণ্ঠপুরী হইতে চলিতে আসিয়াছিলেন। অনেকে হায় হায় করিতে লাগিল, কেন তাহারা ধনপুত্রে তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য বর মাগিয়া লইল না!

ভৌতিক প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিক শক্তি।

পুরুষের বিশেষত্ব তাহার স্বাধীনতায়—জ্ঞানগত এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বে। সে নিজে আপনাকে একজন ব্যক্তি বলিয়া জানে এবং আপনাকে অন্যান্য প্রাকৃতিক পদার্থ সমূহ হইতে বিভিন্ন জানিয়া স্বকীয় স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বুঝিতে পারে। অপরন্তু, সে জানে যে, সে তাহার কর্ম্মের কর্ত্তা এবং সে তাহার সৎ অসৎ কর্ম্মের জন্য তাহার ভগবানের নিকট দায়ী। এই উভয় প্রকার স্বাধীনতা লইয়াই পুরুষের জীবন। পুরুষের এই যে ব্যক্তিত্বভাব, এই যে অহংজ্ঞান এইটুকু বাদ দিলে, তাহার সহিত জড় প্রকৃতির সঙ্গে কোন বিভিন্নতা থাকে না। এই স্বাধীন ব্যক্তিত্বই মানুষের শ্রেষ্ঠতর জীবন। ইহাই তাহার ধর্ম্ম।

বর্ত্তমান শতাব্দির বিজ্ঞানের ভাব ভঙ্গি দেখিয়া অনেকে ভীত হইতেছেন যে, মানুষের এ স্বাধীনতা বুঝি আর থাকে না। অনেকে মনে করিতেছেন যে মানুষের এই ভাবটি কেবল তাহার আত্মগরিমা-প্রসূত কল্পনা মাত্র। চারিদিকে প্রাকৃতিক শক্তি সমূহে পরিবেষ্টিত অচ্ছেদ্য নিয়ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, বস্তুতঃ প্রকৃতির অনিবার্য্য শক্তি প্রসূত যে মানুষ, সে মানুষ যে আবার স্বাধীনতার কথা বলে, ইহা যদি উন্মাদের প্রলাপ না হয়, তবে বুঝি উন্মত্ততা বলিয়া

একটা কিছু আর নাই। বস্তুতঃ বিজ্ঞান যেন চিরকাল মানুষের স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা করিতেছে, এবং দিন দিন যেন সে কৃতকার্য্যও হইতেছে। নিয়মের রাজত্ব যতই বিস্তৃত হইতেছে, ততই যেন স্বাধীনতার শেষ হইতেছে; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর জগৎ হইতে দূরে পলাইতেছেন। বিজ্ঞানের চক্ষে মানুষ প্রকৃতির অসংখ্য ভৌতিক শক্তির মধ্যে একটি মাত্র। এবং বস্তুতঃ মানুষের সমস্ত জীবন, তাহার আত্মা, এবং দেহ উভয়ই ভৌতিক শক্তির পরিবর্ত্তনের এবং বিবর্ত্তনের ফল। মানুষের শরীরের প্রত্যেক রক্তবিন্দু, তাহার প্রতি অঙ্গের শক্তি সমস্তই সে বাহিরের পদার্থ সমূহে নিহিত শক্তি হইতে সংগ্রহ করিয়াছে। তাহার জ্ঞানশক্তি ও ভৌতিক শক্তির ফল বলিতে হইবে, কেন না ইহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে, যে মানুষের মানসিক ক্রিয়াগুলির সমস্তই তাহার মস্তিষ্ক এবং স্নায়ু-প্রণালীর সহিত বিশেষ ঘনিষ্ট ভাবে সংযুক্ত। মস্তিষ্কের ভৌতিক শক্তির পরিবর্ত্তন এবং ব্যাবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মানসিক অবস্থারও পরিবর্ত্তন ও ব্যাবৃত্তি হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আমরা যাহাকে জ্ঞানময়ী শক্তি মনে করি, সে ত ভৌতিক নিয়ম এবং ভৌতিক শক্তির ফল মাত্র। এমন এক সময় ছিল, যখন ধর্ম্ম বিজ্ঞানের যবনিকার বাহিরে অনিয়মের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দৈবশক্তি এবং স্বাধীনতার অস্তিত্ব কল্পনা করিত। কিন্তু সে কাল আর নাই। ভৌতিক বিজ্ঞান এখন মানুষের জ্ঞেয় জগৎ জুড়িয়া বসিয়াছে। গগনচারী নক্ষত্রপুঞ্জের গতিবিধি হইতে ঐ, অন্যমনস্ক বালকের অপ্রস্ফুটিত ভাব পর্য্যন্ত সমস্তই অচ্ছেদ্য ভৌতিক নিয়মে আবদ্ধ করিয়াছে। ঘটনার পাশে ঘটনা, ভৌতিক শক্তির পর ভৌতিক শক্তি অচ্ছেদ্য নিয়মসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া রহিয়াছে। কোথায় দেবতা? কোথায় স্বাধীনতা?

তবে কি বাস্তবিকই সজ্ঞান আত্মা অজ্ঞান জড়শক্তির বিকাশ মাত্র? বাস্তবিকই তবে জগতে ভৌতিক শক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন প্রকার স্বাধীন তত্ত্ব কি নাই? এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় আছে। আপাততঃ আমাদের একটি কথা ভাল করিয়া বুঝা দরকার। সে কথাটি এই। পূর্ব্বে যে ভাবে স্বাধীনতা এবং ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, সে ভাবে কোন চেষ্টা এখন আর সফল হইবে না। বিজ্ঞানের যবনিকার বাহিরে অনিয়মের উদাহরণ দেখাইয়া স্বাধীনতার অস্তিত্ব কল্পনা করা এখন বিড়ম্বনা মাত্র। পদার্থ বিশেষকে অজ্ঞেয়, অদৃশ্য ও আশ্চর্য্য গুণের আধার বলিয়া তাহাতে দেবত্ব আরোপ করার চেষ্টাও বিফল। ভৌতিক নিয়মের ব্যতিক্রম আমরা জানি না, মানি না, বুঝি না। প্রকৃতির শক্তি-বিশেষকে কবি-কল্পনা-প্রসূত অস্ফুট আলোকে জড়াইয়া তাহার উপাসনা করিয়াও আমরা তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না। এখন আর আমরা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে পারি না, যিনি এখানে আছেন সেখানে নাই, অথবা সেখানে আছেন এখানে নাই। সুতরাং মানুষের বাল্য-জীবনের সেই কবিতাময় স্বপ্ন, সেই ভাবুকতা-প্রসূত দেবতা চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। বিজ্ঞান জগতের প্রত্যেক পদার্থেরই বিশ্লেষণ করিতেছে। যাহাকে বিশ্লেষণ করিতেছি—যাহার অস্তিত্ব ও

উদ্দেশ্য বুঝিতে হইলে অন্যান্য শক্তি ও নিয়মের সাহায্যে বুঝিতে হয়, তাহাকে কেমন করিয়া পূজা করিব! দৃশ্যমান প্রকৃতির ঘটনা-শৃঙ্খলের মধ্যে দেবত্ব আরোপ করা যেমন অসম্ভব, এই শৃঙ্খলের একটা আরম্ভ কল্পনা করিয়া সেই অদৃশ্য আরম্ভের উপাসনা করা তদ্রূপ অসম্ভব। ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা ভাবিয়া, জগতের একটা আরম্ভ কল্পনা করিয়া যে ঈশ্বর খাড়া করা হয়, তাঁহার নিকট আমরা মস্তক অবনত করিতে পারি না। কেন না সে ঈশ্বর এই দৃশ্যমান ঘটনা-শৃঙ্খলের অদৃশ্য বিস্তৃতি ব্যতীত আর কিছুই নয়। দেখিতে পাই না বলিয়া, দৃশ্যমান অংশের উপর, তাঁহার কোনরূপ প্রাধান্য স্বীকার করিতে পারি না। পরিমিত ঘটনারাজির অনন্ত শৃঙ্খলকে যে দিক্ দিয়া দেখি না কেন, অনন্তের ভাবই দেখি, অথবা তাহার আংশিক পরিমিত ভাবের প্রতিই দেখি, কোন খানে উপাসনা আসিতে পারে না। উপাস্য দেবতার অন্বেষণ করিতে হইলে এমন একটি তত্ত্বকে ধরিতে হইবে, যাহা হইতে এই বৈচিত্র-পরিপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, এবং যে তত্ত্ব এই চিত্রের মধ্যেও নিজের অখণ্ড স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। যে ঈশ্বর কেবল জগতের কালান্তর্গত সৃষ্টিকর্ত্তা মাত্র, যাঁহার সম্বন্ধে কেবল এই মাত্রই জানা যায়, যে তিনি কোন কালে এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ঈশ্বরের উপাসনায় আমরা তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না। ঘটনাশৃঙ্খলের অনন্ত বিবৃতির মধ্যে কবিত্বও নাই, ধর্ম্মও নাই। এ দুইয়ের কাহাকেও পাইতে হইলে সেই পরমতত্ত্বে উপনীত হইতে হইবে— যে তত্ত্ব (জগতের কালান্তর্গত কারণ নয়) জগতের ব্যাখ্যা; যে তত্ত্ব ব্রহ্মাণ্ডের বৈচিত্রের ব্যাখ্যা ও আধার হইলেও তাহার নিজের অখণ্ড স্বভাব কখন বিকৃত হয় না; যে তত্ত্ব সকল ক্রিয়ার—সকল নিয়মবন্ধনের আধার এবং মূল কারণ হইয়াও স্বয়ং স্বাধীন, দেশকালাতীত, ক্রিয়াবিবর্জ্জিত। প্রত্যুত যে তত্ত্ব সকল প্রকার সম্বন্ধ ও বৈচিত্রে পরিপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের মূল হইলেও, সম্বন্ধরহিত অখণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডের অতীত। গীতা এই তত্ত্বে এইরূপ বর্ণনা আছে—

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিবচ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃচ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণুচ॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥

গীতা, ত্রয়োদশ অধ্যায় ১৩-১৭।

যখন আমরা এই পরম তত্ত্বটি বুঝিতে পারিব, তখন দেখিতে পাইব যে ব্রহ্মাণ্ডের মুখশ্রী পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। অসংখ্য ভৌতিক শক্তির ঘাত প্রতিঘাত প্রসূত অনন্ত বৈচিত্রময় ঘটনা-শ্রেণীর মধ্যে তখন সেই মহাপুরুষের মুখচ্ছবি এবং এই ব্রহ্মাণ্ডকে সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পুরুষের জীবননীলা ভাবিয়া আমরা মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইব। জীবশক্তি জড়শক্তি সমূহের পরস্পরের সম্বন্ধনিচয়ের মধ্যে তখন পরস্পরের বন্ধন না দেখিয়া, দেখিব যে সকলেরই মধ্যে সেই এক স্বাধীন পুরুষের বিকাশ হই-

তেছে। সকলেই সেই স্বতঃ ক্রিয়াশীল পুরুষের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই যে পরমতত্ত্ব যিনি সকল জীবের মধ্যে, ব্রহ্মাণ্ডের সকল শক্তির মধ্যে, নিজের স্বাতন্ত্র স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া, অথচ সকল ক্রিয়ার কর্ত্তা হইয়া, জীবন মৃত্যুর মধ্যে সকলের আধার স্বরূপ হইয়া বিরাজ করিতেছেন—এই গীতা-প্রতিপাদ্য পরমতত্ত্বই কেবল প্রাকৃতিক জগতের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করিতে পারে. এবং জ্ঞানময় আত্মার স্বাতন্ত্র এবং স্বাধীনতা বজায় রাখিতে পারে।

এই যে তত্ত্বটির কথা উল্লেখ করা হইল, এইটি কোন রূপে আমাদের জ্ঞানগম্য হইতে পারে কি না, ইহার কোনরূপ প্রমাণ আছে কি না এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করাই দর্শন শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রের আলোচ্য। বর্ত্তমান সময়ে এই প্রশ্নটির মীমাংসা বিশেষ রূপে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। কেন না, আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের প্রাকৃতিক ঘটনা-শ্রেণীর জ্ঞান বিশেষ রূপে পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে। প্রকৃতির প্রত্যেক ঘটনার বিশ্লেষণ হইতেছে এবং প্রত্যেক ভৌতিক নিয়মের গ্রন্থন ক্রিয়া সকল আলোচিত হইতেছে। সুতরাং এখন আর এখানে যে কোন একটু ভৌতিক শক্তি মধ্যে দৈবশক্তি মিশ্রিত করিয়া দিবেন তাহার যো নাই। এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বব্যাপী ভৌতিক শক্তির ক্রিয়াভূমিতে যে কোন বিশেষ স্থানে দৈবশক্তির আবির্ভাব কল্পনা করা হইবে, তাহারও আর যো নাই। এ ভাবে ঈশ্বর খুঁজিতে গেলে তাহার উত্তর বিজ্ঞান দিয়াছে—"I have swept space with telescope but found no God." অথচ জগৎরাজ্যের মধ্যে কোথাও স্থান নাই। এরূপ অবস্থায় যদি কোথায় দৈবশক্তি দেখিতে হয়, যদি কোথায় কোন আত্মার ক্রিয়া দেখিতে হয় তাহা হইলে জগতের সর্ব্বত্রই শক্তির ক্রিয়া দেখিতে হইবে। জগতের মধ্যে অনন্ত ঘটনা-শ্রেণী ব্যতীত যদি আর কিছু দেখিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের জগৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানকে আগা গোড়া সমগ্রভাবে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, আমাদের বিজ্ঞানকে দর্শনের আলোকে আমূল সংশোধিত করিয়া লইতে হইবে। এবং তখন এক নূতন চক্ষে বিজ্ঞানের মীমাংসা গুলিকে পাঠ করিতে হইবে। বাহির হইতে কেবল Exceptions দেখাইয়া বিজ্ঞানকে জব্দ করিবার আশা আর নাই। বহু কালের শিক্ষায় বিজ্ঞান বুঝিয়াছে যে এ সকল Exceptions কেবল তাহার নিয়ম সকলের পরিশুদ্ধি, বিস্তৃতির উপায় মাত্র। এরূপ অবস্থায় বিজ্ঞানকে আক্রমণ করিতে হইলে, তবে তাহার মূল তত্ত্ব লইয়া, তাহার ভৌতিক পদার্থ এবং ভৌতিক নিয়মের জ্ঞান লইয়া করিতে হইবে।

Kant জার্ম্মাণিতে যে দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়া যান, এবং তাহার পরে যে কয়েকটি প্রধান প্রধান দর্শনের আবির্ভাব সেখানে হইয়াছে, সকল গুলিরই উদ্দেশ্য কতকটা এই রকম। ভৌতিক নিয়ম এবং আত্মার স্বাতন্ত্র এবং স্বাধীনতা এই দুইয়ের সামঞ্জস্যের জন্যই সে দর্শনের সৃষ্টি। বিজ্ঞানের ভৌতিক নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে এবং সর্ব্বব্যাপী ভৌতিক শক্তির ক্রীড়াভূমিতে, আত্মার স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র বজায় রাখিবার জন্য Kant যে উপায় অবলম্বন করেন তাহা অতীব আশ্চর্য্য।

যে উপায় কেবল Kant-এর ন্যায় মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত হওয়াই সম্ভব। নিয়মের বন্ধন শিথিল করিবার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, Kant নিজে বৈজ্ঞানিক নিয়মের ভিত্তি আরও কঠিন করিয়া দিলেন। এবং ভৌতিক জগতের আধার কাল এবং দেশকে আমাদের জ্ঞানের রাজ্য জুড়িয়া বসাইলেন। তাঁহার দর্শন যদি কিছু করিয়া থাকে, তবে তাহা এই প্রমাণ করিয়াছে যে, অনিয়মিত কিছু আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। এমন কিছু ভাবিতে পারি না যাহার একটী বিশেষ এবং নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ এবং স্বভাব (deffinite and particular quality and quantity) নাই। Kant আমাদের জ্ঞেয় বিষয়কে দুই প্রকার শক্তির ক্রিয়া বলেন। তিনি বলেন যে, বাহির হইতে যে শক্তি আমাদের উপর আঘাত করে, তাহার উপর আমাদের জ্ঞানের একটী প্রতিঘাত ক্রিয়া না হইলে, প্রকৃতভাবে তাহা 'বিষয়' (phenomena) নাম পাইতে পারে না। "বিষয়" তাহাই যাহা জ্ঞানগম্য। কিন্তু যাহা শক্তি সকলের মূল প্রকৃতি (things in themselves) আমাদের নিকট চিরকাল প্রচ্ছন্ন থাকিবে। কেন না, আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে হইলেই, তাহারা আমাদের জ্ঞানের প্রতিঘাত ক্রিয়ার দ্বারা বিকৃত হইয়া আসিবে। এই জগত পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু প্রকৃতিশক্তি সকলের মধ্যে যে পরস্পরের সম্বন্ধ, যাহাকে বৈজ্ঞানিক নিয়ম বলা হয়, এইগুলিই কেবল নিত্য এবং স্থির। আমাদের জ্ঞানের প্রত্যেক বিষয়েরই মধ্যে এইরূপ দুটী দিক দেখা যায়। একটা শক্তি চিরপরিবর্ত্তনশীল, আর একটা নিত্য। এ পদার্থটির আজ এই পরিমাণ আছে, কাল আর এক পরিমাণের হইল; আজ একরূপ স্বভাব রহিয়াছে, কাল আর এক স্বভাব ধারণ করিল, আজ এখানে আছে, কাল সেখানে আছে। কিন্তু ইহাকে সকল সময়ে একটা স্বভাব, একটা পরিমাণ, একটা দেশ অধিকার করিয়া থাকিতেই হইবে। এই যে দেশ, কাল, পরিমাণ প্রভৃতি কতকগুলি তত্ত্ব, এইগুলির উপর বিজ্ঞানের সমস্ত নিয়ম প্রতিষ্ঠিত, এবং এই গুলি জ্ঞানের মধ্যে নিত্যাংশ। আমরা যে বিষয়েরই জ্ঞান লাভ করি না কেন, আমরা যে বিষয়েরই চিন্তা করি না কেন, এই সকল তত্ত্ব আমাদের জ্ঞানের আধার স্বরূপ হইয়া নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই তত্ত্বগুলি, ব্যতীত আমাদের কোন জ্ঞান সম্ভবে না। সুতরাং বুঝিতে হইবে এই গুলি আমাদের জ্ঞানের প্রতিক্রিয়া। যাহা কিছু পরিবর্ত্তনশীল তাহা বাহির হইতে আসিতেছে, কিন্তু আমাদের সজ্ঞান আত্মা, আমাদের চিরসঙ্গী। সুতরাং তাহারই ক্রিয়া এই সকল নিত্যতত্ত্ব। কেননা, এইগুলি জ্ঞানের জীবন, জ্ঞানের ভিত্তি। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, যত দিন না আমাদের জ্ঞানের মূল পরিবর্ত্তন হইতেছে, যত দিন না আমাদের মূল প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ততদিন আমরা Chaos বলিয়া একটা কিছু কল্পনা করিতে পারি না। নিয়ম সর্ব্বত্র অচ্ছেদ্য। কেন না নিয়মই জ্ঞানের ভিত্তি, নিয়মই জ্ঞানের জীবন। কোন একটা কিছু যাহা আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত, তাহার অর্থ যে, সে নিয়মিত।

Kant যদিও এইরূপে বিষয় বিষয়ীর

(phenomena and conscious Ego) নিত্য সম্বন্ধ দেখাইয়া জ্ঞের বিষয় মাত্রেরই মধ্যে নিয়মের সূত্র প্রবেশ করাইয়া দিলেন; প্রত্যুত যদিও তিনি নিয়মকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসমষ্টি (Generalization) হইতে দার্শনিক তত্ত্বের অবশ্যম্ভাবিতার পদে তুলিলেন; তথাপি তিনি এই খানেই স্বাধীনতা ও আত্মার স্বাতন্ত্র রক্ষার উপায় করিলেন। যখন চারিদিকে নিয়মের বন্ধন তাঁহাকে নাগপাশে ঘিরিয়াছে, ঠিক সেই সময় তিনি আপনার অপূর্ব্ব প্রতিভা বলে সেই পাশ ছেদ করিয়া স্বাধীনতার জয়ধ্বজা তুলিলেন। আত্মার স্বাতন্ত্র রক্ষা করিলেন। তিনি দেখাইয়া দিলেন যে আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত ভৌতিক জগৎ, যাহা নাগপাশের ন্যায় আমাদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাহা আমাদেরই সৃষ্টি। আমরা আপনারাই আপনাদের শৃঙ্খল প্রস্তুত করিতেছি। আমাদেরই জ্ঞান আমাদের জন্য এই দেশকালান্তর্গত ভৌতিক জগৎকে সুদৃঢ় শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধরিতেছে। যাহাকে দেখিয়া আমরা ভীত হইতেছিলাম, সে বস্তুতঃ আমাদেরই ছায়া—কেননা বিষয়ের নিয়ম বন্ধন সমস্তই বিষয়ী পুরুষের ক্রিয়া। যাহাকে আমরা আমাদের জ্ঞানের বহির্ভূত, জ্ঞানের সীমাবন্ধনকারী বিপরীত শক্তি মনে করিতেছিলাম, বস্তুত সে আমাদেরই জ্ঞানের বিষয়; তাহার অস্তিত্ব আমাদেরই জন্য এবং আমাদেরই জ্ঞান হইতে উৎপন্ন। অবশ্য আমরা আপনারাই আবার আপনাদের জ্ঞানের বিষয়—কিন্তু সেই টুকুই আমাদের সমগ্র জীবন নয়। আমরা যে কেবল জ্ঞানের বিষয় তাহা নয়, আমরা বিষয়ী। আমরা যে প্রকৃতির অনেকের মধ্যে একটি, অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয়, তাহা নয়; আমরা দ্রষ্টা এবং সকল বিষয়ের আধার। আমি না থাকিলে জগতের কোন জ্ঞের বিষয়েরই অস্তিত্ব সম্ভবে না। আমি যেমন এক দিকে জগতের অন্যান্য সকল পদার্থের মধ্যে একটি হইয়া দেশ কালের অন্তর্গত হইয়া অহরহঃ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়াছি, সেইরূপ অপর দিকে আবার আমি সজ্ঞান বিষয়ী হইয়া পরিবর্ত্তনের মধ্যে অপরিবর্ত্তিত, কালের মধ্যে কালাতীত হইয়া এবং নিয়মের মধ্যে নিয়মাতীত নিয়মকর্ত্তা হইয়া রহিয়াছি। আমি নিয়মাতীত, কেন না আমি নিয়মের কর্ত্তা, নিয়মের আধার। নিয়ন্তা স্বীয় নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ নয়। আমার ভিতর এই যে সকল তত্ত্ব রহিয়াছে, ইহাদের সম্বন্ধে আর কিছু জানি আর না জানি, এই নিশ্চয় জানি যে তাহারা বিষয়ের নিয়মে আবদ্ধ নয়। কেন না বিষয়ের নিয়ম বিষয়ীতে বর্ত্তাইতে পারে না। মোট কথা এই যে, দেশ এবং কালগত প্রকৃতির বিকাশের জন্য দেশকালাতীত এক তত্ত্বের প্রয়োজন। জ্ঞানজীবন আত্মাই সেই তত্ত্ব। এই আত্মা ইন্দ্রিয়গোচর প্রকৃতির নিয়ম সকলের আধার হইয়া, ক্রিয়াশীল প্রকৃতির জীবনস্বরূপ হইয়াও স্বয়ং আপনার স্বাতন্ত্র রক্ষা করিয়া ইহাদের অস্তিত্ব সম্ভোগ করিতেছে।

অভাবপক্ষে আমাদের আত্মা সম্বন্ধে এ কথা বলা গেল যে সে প্রাকৃতিক নিয়মের আধার, সুতরাং নিয়মভঙ্গের ভয়ে তাহার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে

পার না। সেই রূপ ভাব পক্ষে এই স্বাধীনতার কিছু বিশেষ প্রমাণ আছে কি? Kant বলিলেন, হাঁ, আছে। কিন্তু সে দার্শনিক জ্ঞানের প্রমাণ হইতে পারে না। দার্শনিক জ্ঞান এই অভাব পক্ষীয় প্রমাণ টুকুর বেশি যাইতে পারে না। তবে আমাদের ধর্ম্মবৃত্তি হইতে আমরা এ সম্বন্ধে একটি অতি সুদৃঢ় প্রমাণ পাই। আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধি যে মুহূর্ত্তে আমাদের ন্যায়ানায় জানাইয়া দেয়, সেই মুহূর্ত্তেই ন্যায়ের অনুসরণ করিতে আমরা বাধ্য, এই কথা বলিয়া দেয়। প্রত্যেক ধর্ম্ম নিয়মের সঙ্গে একটা অবশ্য-কর্ত্তব্যতা ভাব (categorical imperative) জড়িত। এই অবশ্য-কর্ত্তব্যতার ভাব আমাদের সকল কর্ম্মের দায়িত্ব, কোনরূপ ওজর আপত্তি না শুনিয়া, আমাদেরই স্কন্ধে চাপাইয়া দেয়। এইভাবে ধর্ম্মবুদ্ধি যে কেবল এটি ন্যায় ওটি অন্যায় একথা বলিয়া দেয় তাহা নয়, সে আরও বলে যে এটি কর্ত্তব্য ওটি অকর্ত্তব্য। বস্তুত ন্যায় এবং কর্ত্তব্য একই কথা। কিন্তু এই ন্যায় এবং কর্ত্তব্যের একত্বের ভিত্তি স্বাধীনতা। আমার যদি ন্যায় পথে চলিবার স্বাধীনতা না থাকে, তবে এটি আমার কর্ত্তব্য—এটির জন্য আমি দায়ী এরূপ কথার কোন অর্থ থাকে না। যেখানে স্বাধীনতা নাই, সেখানে দায়িত্ব নাই, কর্ত্তব্যও নাই। সুতরাং ধর্ম্মবুদ্ধির ভিত্তির স্বরূপ স্বাধীনতা প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক নিয়মের ব্যতিক্রম অপরাধে যে স্বাধীনতা বিরুদ্ধে কোন যুক্তি উঠিতে পারে না, Kant পূর্ব্বেই তাহা দেখাইয়াছেন। সুতরাং ধর্ম্মবুদ্ধিজাত এই প্রমাণটি আকাট্য মানিতে হইবে। স্বাধীনতার সঙ্গে ঈশ্বর ও মানবাত্মার অমরত্বেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। ধর্ম্মজীবনের যে বিবাদ (moral struggle), বাসনা ও ধর্ম্মের যে নিত্য সংগ্রাম সে বিবাদের অর্থ কিছুই থাকে না, যদি এমন এক পুরুষ না থাকেন, যাঁহার জীবনে এই বিবাদের সামঞ্জস্য হইয়াছে, এবং যাঁহার দিকে অগ্রসর হইবার জন্যই আমাদের জীবন। এই পুরুষই ঈশ্বর। জীবাত্মার স্বাধীনতার ন্যায় পরমাত্মার স্বাধীনতা সম্বন্ধেও কোন আপত্তি খাটে না। আমাদের জীবনে এই বিবাদের সামঞ্জস্য একেবারে কখনই সম্ভব নয়। কেন না, আমাদের ধর্ম্মজীবন এই বিবাদেরই উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা জ্ঞানের জন্য যেমন একটী বাহ্য শক্তির উপর নির্ভর করি, সেইরূপ ধর্ম্মের জন্য নীচ বাসনা সকলের উপর নির্ভর করি। সুতরাং আমরা চিরকাল সেই মহান্ আদর্শের দিকে অগ্রসর হইব, কিন্তু কখন সে আদর্শ সম্পূর্ণরূপ জীবনে পরিণত করিতে পারিব না। আর অধিক দূর Kant-এর সঙ্গে না গিয়া এইখানে আমরা তাঁহার দর্শনের মূলতত্ত্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। আমরা যে উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছিলাম সে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে Kant-এর দর্শন কি আলোক দিতে পারে তাহা দেখা যাউক। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, এমন একটি তত্ত্বের আবিষ্কার করা যাহার জীবনে ভৌতিক প্রকৃতির এবং ভৌতিক নিয়মের সহিত জ্ঞানের স্বাতন্ত্র এবং স্বাধীনতার সামঞ্জস্য হইতে পারে। আমরা ইহাও জানি যে Kant-এর দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য এই। এখন দেখা যাউক তিনি তাহাতে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে

যে Kant যখন বলিয়াছেন যে "বিষয়" মাত্রই "বিষয়ীর" সহিত সংযুক্ত—জ্ঞান-সূত্রে গ্রথিত, আর, বিষয়ী-বিযুক্ত জ্ঞান-বহির্ভূত অনিয়মিত প্রকৃতি যে আমাদের কল্পনা করিবারও সাধ্য নাই—এ কথা তিনি ঠিক বলিয়াছেন। এই টুকুই তাঁহার দর্শনের মূল কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি এই তত্ত্বটি যতদূর গ্রহণ করা উচিত ছিল তাহা তিনি করেন নাই। বিষয় বিষয়ীর নিত্য সম্বন্ধ তিনি ভালরূপে বুঝিয়া তাহার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন নাই। তাই তিনি একটা বস্তুরাজ্য রাখিয়া দিয়াছেন, যাহার প্রকৃত স্বভাব, তিনি মনে করেন, আমাদের নিকট চিরকাল প্রচ্ছন্ন থাকিবে। এই বহির্স্থিত বস্তুজগৎ (Noumenal world) আমাদের জ্ঞানের উপর আঘাত করিলে তাহার যে প্রতিঘাত উৎপন্ন হয়, সেই ঘাত প্রতিঘাতের সংযোগেই আমাদের দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্ট হইতেছে। পরিদৃশ্যমান জগৎ যেন দুই বিপরীত শক্তির সংযোগে উৎপন্ন। কিন্তু হায়, দুই জগৎকে একবার পৃথক করিয়া তাহাদের সংযোগ করণের চেষ্টা বৃথা। এইখানেই Kantএর দুর্ব্বলতা। বস্তুতঃ এই দুই জগতের অস্তিত্বই যখন পরস্পরের উপর নির্ভর করিতেছে, তখন আবার উভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোথায়? সতত পরিবর্ত্তনশীল দেশ-কালান্তর্গত জগৎ না থাকিলে জ্ঞানের জীবন নাই। আবার অতীন্দ্রিয় নিত্য জ্ঞানময় পুরুষ না থাকিলে প্রকৃতির প্রকাশ নাই। বাসনার রাজ্য ব্যতীত ধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ প্রকাশ পাইবার ক্ষেত্র কোথায়? ধর্ম্মের সঙ্গে বিবাদ না থাকিলে বাসনার দুর্জ্জয় বল কেমন করিয়া অনুভব করি? সুতরাং বৈজ্ঞানিক জগৎ ছাড়িয়া বাসনার রাজ্য ছাড়িয়া যে Kant ধর্ম্ম এবং স্বাধীনতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বিফল হইয়াছে। এই হেতু Kantএর দর্শনে প্রকৃতি ও পুরুষ, নিয়ম ও স্বাধীনতা, বাসনা ও ধর্ম্ম প্রভৃতি পরস্পরবিবাদী তত্ত্বশ্রেণীর কোনরূপ মীমাংসা হয় নাই। তিনি ইহাদের সামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই এই জন্য যে, তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন এই ভুল বিশ্বাস লইয়া যে বস্তু জগৎ বলিয়া এমন একটা কিছু আছে, যাহাকে জ্ঞান অতিক্রম করিতে পারে না। হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গ গমন বা মহাদেবের বিষপানের ন্যায়, তাঁহার দুই দিক রক্ষা। তিনি তাহাদিগকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিতেও পারেন না, কেন না তাঁহার দর্শনের মূল তত্ত্বটি তাহা হইলে ছাড়িয়া দিতে হয়, অথচ তিনি তাহাদের সামঞ্জস্যও করিতে পারিলেন না। এই ভাবে দেখিতে গেলে Kantএর দর্শন বস্তুতঃ যে প্রশ্নটির মীমাংসা জন্য জন্মিয়াছে সেই প্রশ্নটিই আরও বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইল। আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে পরস্পরের নিত্য সম্বন্ধ দেখান তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—তিনি দেখাইলেন যে, সে সম্বন্ধ কেবল চিরবিবাদের। [ক্রমশঃ

শ্রীবশম্বদ মিত্র।

বুঝেছি আমার।

(গান)

ভূপালী—একতালা।

বুঝেছি আমার নিশার স্বপন
হয়েছে ভোর।
মালা ছিল, তার ফুল তুলি নাই
রয়েছে ডোর!
নেই আর সেই চুপি চুপি চাওয়া,
ধীরে কাছে এসে ফিরে ফিরে যাওয়া,
জেগে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে
ঘুমের ঘোর,
বাহুলতা শুধু বাঁধনের মত
বাহুতে মোর!

হাসিটুকু আর পড়ে না ত ধরা
অধর-কোণে।
আপনারে আর চাহে না লুকাতে
আপন মনে!
আধামাঝি হয়ে মিলনে বিরহে
মলয় পবন প্রাণে নাহি বহে,
গান শুনে আর ভাসে না নয়নে
নয়ন-লোর!
আঁখিজল আর চুরি ত করে না
সরম চোর!

বসন্ত নাহি রে এ ধরায় আর
আগের মত,
চাঁদিনী রজনী মলিন বরন,
—— নয়ন নত!
আর বুঝি কেউ বাজায় না বীণা,
কে জানে কাননে ফুল ফোটে কি না,
কে জানে সে ফুল তোলে কি না কেউ
ভরি আঁচোর!
কে জানে সে ফুলে মালা গাঁথে কি না
সারা প্রহর!

বাঁশী বেজেছিল, ধরা দিনু যেই,
থামিল বাঁশী;
এখন কেবল চরণে শিকল
কঠিন ফাঁসি!
আর কেন হাসি, আর কেন কথা,
নয়নে নয়নে কিসের বারতা,
যদি দিবে ব্যথা, দাও তবে ব্যথা
অতি কঠোর!
ভালবাসা নেই, কেন থাকে তবে
মিছে আদর!

কতই না জানি জেগেছ রজনী
কতই দুখে!
করুণ নয়নে চেয়েছ আমার
মলিন মুখে!
বুঝি এত ভার, সহেনাক আর,
লতায়ে পড়িছে দেহ সুকুমার,
কেন আমি আর আসি বার বার
দুয়ারে তোর!
ঘুমাও ঘুমাও আঁখি চুলে আসে
ঘুমে কাতর!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক-রহস্য নাটক।

TRAGI-COMEDY.

হরিহর ও অঘোর কুমার আসীন।
দূরে ক্ষুদ্র ডেস্কের পাশে বালক অপ্রকাশ-
চন্দ্র খাতায় মক্স-করণে নিযুক্ত।

——

হরি। আজ্ কোন মতেই পাচ্চিনে।

অঘোর। না মশাই, আজ্ না দিলে চল্‌ছে না। ছমাস হ'য়ে গেল।

ভীমকান্তের প্রবেশ।

হ। আসুন্ মশাই।

ভীম। এক খানা "হ-ষ-ব-র-ল" পত্রিকা পাঠিয়েছি, পেয়েছেন?

হ। আজ্ঞে পেয়েছি। আপনি?—

ভী। আমিই তার সম্পাদক।

হ। ও!

ভী। (সগর্ব্বে) আপ্‌নার কাগজে এবার সমালোচনা ক'রেছেন কি?

হ। না, হ'য়ে ওঠে নি।

ভী। দেখুন্, সব কাগজেই হ'য়েছে, শুধু আপনি—(পকেট হইতে ৩।৪ খণ্ড সংবাদ-পত্র বাহির করণ) দেখুন্, সবাই কি ব'ল্‌ছে—(পাঠ) "বিষয় নির্ব্বাচন সম্বন্ধে, ওজস্বিতা সম্বন্ধে, মূল্য সম্বন্ধে, ছাপা সম্বন্ধে ত্রিভুবন মধ্যে এ পত্রিকা-খানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে কু কিছুই নাই, মাঝামাঝি কিছুই নাই। প্রেম, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, গান, দর্শন, চুটকি সবই আছে। সকলগুলিই সুন্দর, সুরস, সুললিত, সুনির্ব্বাচিত, সুপরিষ্কৃত, সুলিখিত। মলাট-খানি পর্য্যন্ত, বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত সু—"

হ। আর থাক্ মশাই।

ভী। না না, আর একখানা দেখুন।

হ। দেখ্‌বো কি, আমি তো কাগজ-খানা সবই প'ড়েছি।

ভী। আচ্ছা—আচ্ছা, বেশ বেশ। আপনি প'ড়বেন নাতো প'ড়বে কে? তা, আপনি কি সমালোচনা ক'রবেন? এটা জিজ্ঞেসা করা অসভ্যতা মনে ক'রবেন না, আমরা সমধর্ম্মী। আমাদের মধ্যে courtesy কি?

হ। আমার কবিতাটা ভাল লাগে নি।

ভী। বলেন কি মশাই! কবিতাটী নবীন সেন, হেম বাঁড়ুয্যে দুজনেই recommend ক'রে পাঠিয়েছিলেন।

হ। হেম বাবু, নবীন বাবু!—আপ-নাকে চিঠিতে কি লিখেছিলেন?

ভী। না, কিছু লেখেন নি। লেখক কবিতাটীর সঙ্গে একখানা মস্ত চিঠি লিখেছিলেন। লেখক মস্ত পণ্ডিত, সবাই-কার সঙ্গে বড় আলাপ—খাতির করে।

হ। আমার তো আদৌ ভাল লাগে নি।

ভী। (সগর্ব্বে) হুঁ। বড় দাদা গোড়ার লাইনটা প'ড়েই ব'লেছিলেন, "বড় চমৎকার হ'য়েছে।" রবি ঠাকুরকে লেখাবার জন্য যাই, সঙ্গে প্রুফটা ছিল। তাঁকে শোনাতে ব'ল্লেন—"আমাকে কেন অপদস্থ ক'রবেন? এত বড় কবি

আপনাদের থাকতে—। দেখুন না, ঢের ঢের বিরহের কষ্ট দেখেছেন, কিন্তু এমন কষ্ট—

(মুখস্থ)

দাঁড়াতে বিরহ ভরে
এক পায়ে ভরু পরে
পারি না পারি না—ওগো আর !
মাথা ঘুরে পড়ি বুঝি,
(উচ্চৈস্বরে) পড়ি বুঝি মাথা ঘুরে
ভরু তলে হ'য়ে চুরমার ! !

উ ! আহা হা। আচ্ছা মশাই, গানটা ?

হ। কোন্ গানটা ?

ভী। দেওঘরি—

"তুরন্ত বসন্ত অনন্ত সনন্ত
হসন্ত সুবন্ত প্রায়।
রবি ছবি কবি অটবি ভারবি
সবি মৌলবী গায় !"

হ। আমি কিছুই বুঝতে পারি নে।

ভী। হা হা হা ! ও পাড়ার ভূদেব বাবু, শম্ভু বাবু, বঙ্কিম বাবু, দ্বিজেন্দ্র বাবু সবটা মুখস্থ ক'রেছেন। স্বরলিপি শুদ্ধ। আর দিন রাত্রি গাইছেন।

হ। নাওয়া খাওয়া ছেড়ে !

ভী। হ্যাঁ মশাই। আচ্ছা, গদ্যটা ?

হ। (ভয়ে ভয়ে) মন্দ হয় নি।

ভী। মন্দ হয় নি কি মশাই ? অনুগ্রহ ?

হ। (কম্পিত স্বরে) না, তবে—তবে—

ভী। আপনি কিছু বোঝেন না। একে বলে Tale—tale—incidental tale ! এক ফর্ম্মার মধ্যেই নায়ক নায়িকার চাওয়া চাওয়ি, হাসাহাসি, ভালবাসাবাসি, পাগান, দেব-মন্দির, গভীর অরণ্য, সাঁতার, এজেহার, জোবানবন্দি, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, বিদায়, কারাগার, গলায় দড়ি, দাহ সব লিখতে হবে। আবার আসচে সংখ্যার এক ফর্ম্মার মধ্যেই দেখাতে হবে—স্বর্গ, নরক, দেবতা, দৈত্য, পরমেশ্বর, খেমটা নাচ, বাই নাচ, দিল্লীওয়ালীর গান, খেয়াল, ধ্রুপদ, মিলন, পুষ্পবৃষ্টি—

হ। (ক্রন্দন স্বরে) আমি আস্তেম না, ভাই—

রক্ষাকালী বাবুর প্রবেশ।

আসুন।

রক্ষা। সমালোচনা ?

হ। কিসের মশাই ?

র। "ইষ্টুভিঃ ইষ্যদাস্বটোঃ" পত্রিকার।

হ। না, এবার হয় নাই।

র। না হোক্ তার জন্য ভাবি নে, আস্চেবার ক'রবেন। এবার আমার বইখানার—

হ। কি বই ?

র। "মজার বাসর।"

হ। এবার হবে না।

র। আচ্ছা, না হোক। তবে একটা লেখা দিন।

হ। লেখা ! !

র। হাঁ দিতেই হবে।

হ। ও কাগজে !—কাগজটা একটু ভাল করুন।

র। কাগজ ভাল ক'রবো কি ? মা জগদম্বার কৃপায় সাড়ে উনিশ জন গ্রাহক জুটেছে। লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটি হিন্দু চাঁদা—donation দেবে—পত্র লিখেছে। আর এক সংখ্যা পেলেই তারা দুই—আঠারো—ছিয়াত্তর—দেড়শ—এক এক লক্ষ ক'রে টাকা পাঠাবে।

হ। বলেন কি? আমি ত কোনোটা বুঝ্‌তে পারি নে।

র। কোনোটাও না? আচ্ছা, "হিন্দু-ধর্ম্মের সরল ব্যাখ্যা?" (মুখস্থ)—

"বিরাটতনয়দিগ্দেশে বিরাটরূপ নিতান্ত-লাক্ষারসরাগলোহিতাম্বর-চরণযুগল-পরিস্ফুত-তিরস্কৃত-পরভৃত-নিনাদ-নূপুর-নিক্কণ-মোদিত ত্রিযাম্পতি-কলানিধ্যাপনস্-শনৈশ্চর-ধূমকেতু-গ্রহোপগ্রহগ্রাম্বকিরণনিকরোচ্ছুরিতোদরজলধর পটলপাটলখণ্ডলিহ মেনকামনোমোহন গৌরী-গুরু গিরি হিমালয়, যামেতরে অবিরতপবন-বিধূননোত্থিতোত্তালতরঙ্গরঙ্গভঙ্গসংক্ষুব্ধ নক্র-তিমিমৎস্যাকুলকুম্ভীরশম্বুক-ভেক-সমাকুল ভয়াল বিশাল বারিনিধি, প্রাচীপ্রতীচীপ্রদেশ-পরস্পরে প্রতিহারীপ্রতিম প্রচুর প্রাচীন প্রকৃতি-প্রাচীর, মধ্যভাগে মধ্যস্থিবিষ্ণুহারীত-যাজ্ঞবল্ক-যোগীজনযোগভূমি সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের পুণ্যক্ষেত্র ত্রিকোণমিত জম্বুদ্বীপ—"

হ। এ কি Geometry, ভূগোল, না কাদম্বরী?

র। হা হা! দেখুন লেখাটা প'ড়ে সমালোচক কি ব'লেছেন—(বগল হইতে সংবাদপত্র বাহির করণ, পাঠ) "হিন্দুধর্ম্মের সরল ব্যাখ্যা মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। আনন্দে প্রায় নৃত্য করিয়াছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সম্পাদক অধুনাতন পতিতোন্মুখ হিন্দুধর্ম্মের—হিন্দুসমাজের কল্কি অবতার। এ পত্রিকা যদি উঠিয়া যায়, আমরা শপথ পূর্ব্বক বলিতেছি, আমরা আত্মঘাতী হইব। আমাদের পাঠকগণকে, বিজ্ঞাপনদাতাগণকে, সংবাদদাতাগণকে, আমাদের কাগজে যাঁহারা মসলা বাঁধেন, জুতা বাঁধেন; আমা-দের প্রেসের দপ্তরী, কম্পোজিটার, কালী-ওয়ালা ছোকরা—সকলকেই ইহার গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হইতে অনুরোধ—"

হ। আর থাক, মশাই।

র। দেখুন না, ইনি আবার আমাকে (অন্য কাগজ উল্টান) শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ দশা-বতার ব'লেছেন—

হ। দশ অবতারই—মীন, কূর্ম্ম, বরাহ।

র। দেখুন না, চোক্ থাকতে কাণে কেন? তা লেখা দেবেন কি না, বলুন। আপনার শ্বশুরালয় আমার মাতুলানীর পিতৃষসার জামাতৃ আলয়ের নিকটে। আপ-নার উপর আমার জোর খাটে। (হস্ত ধরিয়া) দেবেন কি না?

(হস্ত মুচড়াইবার উপক্রম।)

[হরির হস্ত ছিনাইয়া অন্দরে
বেগে প্রস্থান।

(রক্ষাকালী অঘোরকুমারের নিকট
সরিয়া আসিয়া)

লেখা?

অ। (ঢোক গিলিয়া) মশাই—আমি, মশাই—

র। আমি কি?

অ। আমি—আমি—কাপড় বেচি, বড়-বাজারে আমার দোকান, আ—

র। ঠাট্টা! তোমার বগলে কি?

অ। আজ্ঞে, খাতা।

র। যাও। (কাড়িবার উপক্রম।)

অ। হিসাবের খাতা—হিসাবের খাতা। মশাই, পায়ে পড়ি,—

র। টাকা নিয়ে লেখ, আমি দেবো। যাও, ছাপ্‌তে দিইগে।

[অঘোরকুমারের ঊর্দ্ধশ্বাসে
খাতা ফেলিয়া প্রস্থান।

(খাতা বগলে লইয়া, অপ্রকাশচন্দ্রের নিকট আসিয়া) লেখা ?

অপ্র। আজ্ঞে, লিখ্‌ছি।

ভী। (সরিয়া) সমালোচনা ?

(অপ্রকাশচন্দ্রের ক্যাল ক্যাল দৃষ্টে চাওন।)

আমার বেলাই—(অপ্রকাশের কাণ সরিয়া) স—মা—লো চ—না—আ—

অপ্র। কাকা—ও কাকা—ওঁ—ওঁ—

[সারাদিন হরিহরের বৈঠকখানায় "লেখা,—লেখা. সমালোচনা—সমালোচনা, কাকা ও কাকা।' অন্দর হইতে করুণ কণ্ঠে—'বাবারে পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়। কাকা ও কাকা।'

প্রেমদাস।

অজীর্ণের টোট্‌কা।

সচরাচর দেখা যায়, আমাদের অধিকাংশ রোগ আমাদের আহার হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। তার মধ্যে অজীর্ণই সর্ব্ব-প্রধান। অজীর্ণ হইতে অম্লপিত্ত প্রভৃতি নানা ব্যাধি জন্মে। আজকাল প্রায় ঘরে ঘরে এ রোগ দেখিতে পাই। হজমিগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া Eno's Fruit Salt পর্য্যন্ত ইহার ঔষধও অনেক হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে ততটা কাজ দেখিতেছি না। আমরা সেই জন্য সহজলভ্য গোটা-কত 'ঘর কোটালে' টোট্‌কার কথা লিখিতেছি। ইহা কেবল ঔষধ নহে. আহার ঔষধ দুই। যে সামগ্রী খাইয়া অজীর্ণ হইলে যে সামগ্রী খাইলে তাহা সারিবে নিম্নে তাহার তালিকা প্রদান করিলাম।

আদা—ইক্ষুগুড়।

আম, আঁব—দুধ, মৎস্য, সৈন্ধবলবণ, পলাশের মূল।

আমলকী—কাঁঠাল, ধুনা।

আলু—চালুনি জল।

ইক্ষুগুড়—আদার রস, জল।

ওল—গুড়, তেঁতুল।

কংবেল—নির্ম্মল।

কর্পূর—মৃগনাভি।

করেলা—শ্বেত সর্ষপ।

কলমী নেবু—তপ্ত জল আম্রবীজ।

কলা—ঘৃত, কাঁঠাল।

কাঁকুড়—গম, রুটি।

কাঁঠাল—কলা।

কাঁজি—মাংস, তিল তৈল।

কেসুর—শিঙ্গাড়া, পানীফল।

কিস্‌মিস—পদ্মের মৃণাল।

কুঙ্কুম—জাম্বফল।

খেজুর—চিনি, নিম ফল।

খেজুর গুড়—শুটের গুঁড়া।

খিচুড়ী—সৈন্ধব লবণ।

গণ্ডার মাংস—ভেরাণ্ডার তৈল।

গম—কাঁকুড়, অল্প ধুতুরা পাতা।

গাব—বকুল।

গুড় (খেজুর)—ওল, শুটের গুঁড়া।

গুড় (ইক্ষু)—আদার রস।

গোড়া নেবু—জল, চুনের জল।

ঘৃত—নেবুর রস, কলা, ঘোল।

ঘৃতপাক দ্রব্য—আমের রস, শিরকা।

ঘোল—দুধ, ঘৃত।

চাউল—নারিকেল, তালশাঁস।

চাপানটে শাক খেত সর্ষপ।
চুন—বাবাম, নারিকেল, নেবুর রস।
ছোলা—কাঁকুড়, অম্ল ধুতুরা পাতা।
জীরা—বড়া।
জল—পিঠে, জলে রূপা বা সোণা ৭ বার পোড়াইয়া ৭ বার ডুবাইয়া সেই জল খাইবে।
তৈত্তি—সমুদ্র ফেনা।
তাম—লবণ।
তাম্রকল—কুঙ্কুম।
তাল—পদ্ম।
তপ্ত জল—কলম্বা নেবু।
তালশাঁস—চাউল।
তিল তৈল—কাঁজি, তেঁতুল।
তেঁতুল—লবণ, তৈল।
তাল—নোয়াড়ির ফল।
দুধ—ঘোল, আম, সল্‌কর।
দালিম—নেবু।
দুধ ও দধি (মহিষীর)—শঙ্খচূর্ণ, সৈন্ধবলবণ।
বনে—বড়া।
নারিকেল—চাউল।
নেবু—শাকের ডাঁটা, চুন।
পিঠে—জল।
পলাশের মূল—আম্র।
পান ও সুপারি—নারিকেল জল।
পক্ষী মাংস—কেশের মূল জল দিয়া পিষিয়া পরম করিয়া খাইবে।
পানে অধিক চুন—নারিকেল, বাদাম, তেলে হাই।
পায়েস—মুগের যুষ।
পটল, পালম ও পুঁই—শ্বেত সর্ষপ।
পাঁপর—সজিনা বীজ।
পক্কের দুগাল—কিস্‌মিস্।
কেনী—লবঙ্গ।
বকুল—বকুলের মূল বা গাব।
বেগুন—শ্বেত সর্ষপ।
বক্কটী—দধি।
বুকে গ্রাস লাগা—আবার সেইরূপ স্নান করিবে বা জল খাইবে।
ভাত—সজল দুধ।
মটর, মুগ—অম্ল ধুতুরা পাতা।
মাংস—লবণ, শুক্‌না চিনি, কাঁজি, আম্রবীজ।
মৎস্য—আঁব, মাংসের কাবাব।
মদ—গেরি মাটি গুলিয়া।
মরিচ—বড়া।
মাষকলাই—নিম্ব ফল।
মৌয়া—কলসা, মুথা।
হরুন—মুথা।
লবণ—অম্ল, চালুনি জল।
শ্রীফল—ক্ষীরী ফল।
শূকরের বা কচ্ছপের মাংস—কাঁজি, লবণ।
সকল প্রকার শাক—তিল গাছের ক্ষার।
হিং, হরিদ্রা—বড়া, মুথা।

কোন্ দ্রব্যের সহিত কোন্ দ্রব্য খাইলে শীঘ্র পরিপাক হয়, তাহা এই কর্দ্দ মনে রাখিলে জানিতে পারিবে যথা;—আঁবের সহিত দুধ; ঘৃতের সহিত লবণ, নেবু বা কলা; ভাতের সহিত সজল দুধ ইত্যাদি।

শ্রীক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

অন্তমান জীবনের পত্র।

ভাই, দেখিতে দেখিতে—অতি ধীর পদ-ক্ষেপে—আমার এই সৌরভহীন শত-অভাব-ময় সংসারের শত-ধূলি-মাখান চির-শূন্য জীবনের অনেক বৎসর কাটিয়া গেল। দুঃখ-কীট-দষ্ট জীর্ণ, গলিত-প্রায় জীবন-পুস্তকের আর এক খানা পাতা অবশিষ্ট। জীবন-প্রদীপ নিবিতে আর অধিক দেরি নাই! তৈল ফুরাইয়া আসিয়াছে! সে দক্ষিণে বাতাস চিরদিনের মতন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রভাত-তপনের অনন্ত পথে অগ্র-সরের জন্য সে মধুর আহ্বান আর শুনিতে পাই না। বুঝি সময় আসিয়াছে। জীবন

অবকাশের জন্য ব্যাকুল। জীবনের চারিদিক ঘোর অন্ধকার করিয়া, এ পৃথিবী হইতে চির-অদৃশ্য করিবার জন্য বিস্মৃতি-রূপিনী কাল বিভাবরী আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। কাণের কাছে, প্রতিদিনের শত শত দীর্ঘনিশ্বাস ও শত শত অশ্রুকণাবাহিনী বৈতরণীর কি এক অস্ফুট-তরঙ্গ-গর্জ্জন অবিরাম ধ্বনিত হইতেছে! হৃদয়ের কোন্ দেশ হইতে কে যেন প্রেম-হীন কঠোর কণ্ঠে ডাকিতেছে। হায়! এত দিন—এ সুদীর্ঘ কাল—কি করিলাম? এ অমূল্য শত পুণ্যফলের মানব জীবন বৃথাই গেল! জীবনের একটাও কাজ করিলাম না! এই অনন্ত বিশ্বের কিছুই জানিলাম না! কেবল ক্ষুদ্র পাখীর মতন এ বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের চারি ধারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলাম। সংসারের স্রোতে হৃদয়-তরি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। চিরদিন বিকল উচ্ছ্বাসে গা ঢালিয়া, এমন সাধের মানব-জীবন, অসার শোকের আলয়, বাসনার কারাগার ও মিছে কথা ছলনার উৎস করিয়া ফেলিলাম। উন্মাদ, নব নব খেয়ালের মত ধনী সন্তানের মতন জীবন লইয়া ভাঁটা খেলিলাম। একবার ভাবিলাম না যে, ইহার পরিণাম আছে। কার্য্য-ফল অবশ্যম্ভাবী। কার্য্য-ফল সম্বন্ধবদ্ধ। জীবনের উদ্দেশ্য কি? কেন আসিলাম? এ পৃথিবীর সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ? জীবনটা কি ছায়া? "আসে, থাকে, আর মিলায়ে যায়?" হায় হায়! এত দিন কি করিয়াছি!

আজ কাঁদিতেছি। ভাবিতেছি। আজ এই অনন্ত নীলাকাশের তলে দাঁড়াইয়া সমস্ত বিশ্বজগৎ তন্ন তন্ন করিয়া কারণ অনুসন্ধানে রত হইয়াছি। খুঁজিয়া খুঁজিয়া ভাল করিয়া দেখিতেছি জীবনের কোন্ বরগা খানায় ঘুন ধরিয়াছে—কোন্ তারটা বেসুরো বাজিতেছে। হায়! কেন কাঁদি, যাহা স্বহস্তে স্বইচ্ছায় নষ্ট করিয়াছি, তাহার জন্য আবার কাঁদি কেন? দুঃখের মালা যখন সাধ করিয়া গলায় পরিয়াছি, তখন আবার তাহা খুলিয়া ফেলিতে এত ব্যস্ত, কেন? ঐ ত দুঃখ! জগতের ঐ ত রহস্য! আজীবন যাহা খুঁজিলাম, যাহার জন্য দেহ মাটি করিলাম, তাহাকে ত পাইলাম না। যাহাকে হীরক মনে করিয়া ছুটিলাম, তুলিয়া দেখি তাহা কাচ। কেন এ ভ্রমে পড়িলাম? কে প্রলোভন দেখাইল? বাহ্য সৌন্দর্য্যে ভুলাইয়া কে এ নির্ব্বোধের চির-দিনের মত সর্ব্বনাশ করিল? মানুষ এত ইচ্ছাধীন কেন? কেন সে ইচ্ছা সদা চঞ্চল-ময়ী? বৃত্তিগুলা সর্ব্বদা এত ভেল্কী লাগায় কেন? মনের উপর ভৌতিক পদার্থের এত প্রভুত্ব কেন? জীবনের সুখ এত পরের উপর নির্ভর করে কেন? এ কি কম দুঃখের কথা যে, মানুষ, মানুষের কোন কাজের কর্ত্তা নয়। কেবল কার্য্য-বাহক দাস মাত্র। আমি কি করি? আমার কোন্ কাজের আমি কর্ত্তা? আমার কি জানি আমি? কি বুঝি? সকল কাজের আড়াইত আমার হৃদয়ের ভিতর হইতে আসিতেছে। শরীরী-আমি তাহা সম্পাদন করিতেছি মাত্র। যন্ত্র যেমন মানুষের দ্বারা পরিচালিত হয়, আমরাও সেইরূপ পরের দ্বারা পরিচালিত হইতেছি। তাহার অধিক ক্ষমতা আমাদের আর কোথায়? প্রতিদিন চারিদিক হইতে কত নিন্দা, কত গালিগালাজ শুনিতেছি। কত লোকে কত প্রকারের কঠোর মর্ম্মভেদী বচনে হৃদয় আমূল-বিদ্ধ করিতেছে। সব

দেখিতেছি, সহিতেছি। কি করিব বল! কাহাকে কি বলি! জানিয়াছি, বুঝিয়াছি যে, মানুষের স্বভাবই এইরূপ। ইহা মনুষ্য-প্রকৃতি। তাই ত কাঁদি। মানুষের এই ভ্রান্তিপূর্ণ পরসুখ-প্রেক্ষী অবস্থা স্মরণ করিয়া তাই ভাবি যে, প্রকৃতির সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ কেন এমন হইল? কে তাহাকে এরূপ অসম্পূর্ণ করিয়া গড়িল? পদে পদে দুর্ব্বল করিল? চিরদিনের এ দুর্ব্বলতা হইতে মানুষকে কে রক্ষা করিবে? এ পৃথিবীতে যে মানুষ বড়—বড় দুর্ব্বল। আমিও তাই, বড়—বড় দুর্ব্বল! কিন্তু দোষ কার? আমার? আমি কি স্বইচ্ছায়, সাধনা করিয়া, দুর্ব্বল হইয়াছি? দেখিতেছ না, কে আমাকে প্রতিদিন একটু একটু করিয়া বিশ্বের মোহময় বিচিত্র মায়াজালে শতপাকে জড়াইয়া বিকল করিয়া ফেলিতেছে। জ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোক চোখের সম্মুখে রাখিয়াও, মায়ার অন্ধকার ত দূর করিতে পারিতেছি না। তাই বলি, মানুষের কি দোষ? দোষ মূলে,—সৃষ্টির অভ্যন্তরে। একবার গোড়ার কথাটা—সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্যটা—বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখ দেখি। মনশ্চক্ষে চাহিয়া দেখ দেখি, আমাদের সকল কর্ম্মের, জগৎ-রহস্যের, পিছনে দাঁড়াইয়া কে। কে ভিতর হইতে অদৃশ্য সূত্র ধরিয়া সকল কল চালাইতেছে। বিশ্বে যাহা কিছু ঘটিতেছে দেখিতেছ, মানুষ যাহা কিছু করিতেছে, সে সকলই ত সেই অনন্ত অদ্বিতীয় সর্ব্বমূলাধারের অচিন্ত্য লীলায়—হুকুমে।

কে তিনি? কোথায়? অনেক দিন ধরিয়া যে তাঁহাকে খুঁজিতেছি। ডাকিতেছি। আর যে পারি না! দেহ যে অবসন্ন—মৃতপ্রায়! এ মনের দুঃখ আর কাকে জানাইব? তিনি ভিন্ন এ জগতে আমার দুঃখ আর কে বুঝিবে? আমার কত দুঃখ! আমার দুঃখ, কেন তিনি মানুষকে অন্ধ করিয়া, পাপপ্রবণ করিয়া, শত অভাবের সমষ্টি করিয়া সৃজন করিলেন? মানুষ, কেন মরণাধীন? জগতের যে দিকে চাই, দেখিতে পাই, সকলই পরিবর্ত্তনশীল। তবে কোন্‌টা ঠিক? সত্য কাহাকে বলি? জীবন সত্য, না, মৃত্যু সত্য? জীবনের পুরস্কার কি কিছুই নাই? জীবনের পুরস্কার হ'ল অন্ধকার—মৃত্যু? আলোর পরিণাম শেষ অন্ধকার? ইহাই কি উন্নতি?• ইহাকেই কি পূর্ণতার পিছনে দৌড়ান বলে? তাঁহার কার্য্য আমরা কিছুই জানি নাই, বুঝি না বটে। তাঁহার সকলই ধুঁয়ায় আচ্ছন্ন। তবু প্রাণ কাঁদে। তবু প্রাণ কাঁদিয়া বলে যে, তিনি,—সৃষ্টিকর্ত্তা, মনে করিলে কি তাঁহার সৃষ্টি পূর্ণ করিয়া, সকল অভাব শূন্য করিয়া গড়িতে পারিতেন না? মানবের এ চির-কান্না কি ঘুচাইতে পারিতেন না? পৃথিবীতে কি সকল জীব আজীবন ধরিয়া কাঁদিয়া—অন্ধকার হইতে অন্ধকারান্তরে ঘুরিয়া যাইবে? তবে ইহাকে কি করিয়া সৌন্দর্য্যের আধার সর্ব্বকারুণিকের রাজ্য বলিব? কি করিয়া বলিব যে, তিনি সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপ প্রেমময়?—তাঁহার সৌন্দর্য্য, তাঁহার প্রেম যে তিনি অহরহঃ ভাঙ্গিতেছেন! তাঁহার সূত্র, তাঁহার মালা, তাঁহার ঐকতানিকতা যে তিনি নিজেই নষ্ট করিতেছেন!—তিনি প্রাণ, আমি দেহ। তিনি গান, আমি বাঁশী। তিনি ইচ্ছা, আমি বিকাশ। কেন তিনি

এ দেহ মাটি করিলেন? এ সুখের বাসা কেন চিরদিনের মতন ভাঙ্গিলেন? বাঁশী কেন আর রাধা-গান করে না? ইচ্ছা কেন বিকৃতি প্রাপ্ত হইল? আমার সুও তিনি, কুও তিনি। কেন তিনি সবটা সুকরিলেন না? যদি তুমি বল যে, তিনি মানুষে সু ও কু দুই সমান পরিমাণে দিয়া, পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত জগতে পাঠাইয়াছেন। কু'র পরাজয়ই মানুষের মহত্ত্ব—মনুষ্যত্ব। তাহা হইলে আমি বলিব, যিনি সকল প্রকার সুখ-দুঃখ এবং জগত বন্ধনের অতীত, যিনি অবিকৃত ও অব্যয়, তাঁহার আবার পরীক্ষা কি? কিসের জন্য তিনি পরীক্ষা করিবেন, বল? তাহাতে তাঁহার কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য, কোন্ অসীম কার্য্য সিদ্ধ হইবে? কোন্ অসম্পূর্ণ অদৃশ্য রহস্যের মূল বাহির হইবে? অথবা কেবল তাহাই বা বলি কেন? যে এক অসম্পূর্ণ চির-অজ্ঞাতমূল জীবময়ী অশরীরী বিরাট কার্য্য-শক্তি, এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, তাহার প্রাণে-প্রাণে মিশিয়া; পূর্ণতার গীতিময় অসীম বিজন পথে অবিরাম চলিয়াছে, তাহার সঙ্গে মানবীয় সুখ-দুঃখ-রহস্যের কি সম্বন্ধ বল? এ সৃষ্টি-রহস্য মনুষ-জ্ঞানের অতীত। ইহার সঙ্গে মনুষ্য-সুখ দুঃখ, উন্নতি অবনতির কিছু সম্বন্ধ নাই। থাকিলেও, তাহার জন্য সে দায়ী নহে। তাহাকে কখন দায়ী করিও না। মনুষ্য ইহা হইতে অনেক দূরে। ব্যক্তিগত ঈশ্বরের অস্তিত্ব জগতে কোথায়? সুখ-দুখ-সৃজন কারী এবং পাপ-পুণ্যের দণ্ড-পুরস্কার-দাতা-স্বরূপ কোন দেবতা মানব-অদৃষ্ট-ধারা হাতে করিয়া কোথাও বসিয়া নাই।

দেখ, সকল মানুষই এইরূপে কাঁদে। এইরূপে তাহারা আপনাদের অদৃষ্টের জন্য ঈশ্বরে দোষারোপ করে। ইহা ভ্রান্তি, অজ্ঞানতার ফল। বিশ্ব-তত্ত্ব, বিশ্ব নিয়ম তাহারা কিছুই বুঝে না। কে বলে বিশ্ব পূর্ণ? বিশ্ব পূর্ণ নহে। কোথায় দেখিয়াছ, গাছ জন্মাতে না জন্মাতেই আগে ফল জন্মিয়াছে? বিশ্বের জন্ম কাজ হইতে, অপূর্ণতা হইতে, আরম্ভ হইতে। শেষ হইতে নহে। পূর্ণতার গতি নাই। পূর্ণতা অপরিবর্ত্তনশীল। জগৎ অপূর্ণ। তাই জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। বিশ্বের গতি, অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতার দিকে। তার পর সুখ-দুঃখের কথা। সুখ দুঃখ ঈশ্বর-দত্ত নহে। যে পদার্থে মানব রচিত, সুখ-দুঃখ সে পদার্থের নহে। তাহাকে আমি মানবীয় বৃত্তি বলিতেও পারি না। মানবীয় সুখদুঃখের উপর ঈশ্বরের কোনও হাত নাই। সুখ-দুঃখ, মানবের অবস্থান্তর মাত্র। মনের গতির সঙ্গে তাহাদের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। সমাজের সহিত তাহার সম্বন্ধ। সমাজ তাহার জন্য দায়ী। আর এক কথা। সুখ-দুঃখের যাহাকার রব কখন ঘুচিবে কি না জানি না। ঘুচা উচিত কি না তাহাও বলিতে পারি না। দুঃখ না থাকিলে কে সুখ চাইত? কে তাহার সাধনা করিত? বিশ্বের উন্নতি এত কোথা হইতে হইত? "Suffering spiritualizes।" দুঃখই সুখের মূল। স্বর্গের দ্বার। অনন্তের একমাত্র পথ। তাই বলি ভাই, দুঃখের জন্য কেঁদো কাঁদিও না। দুঃখ সহ্য কর। দুঃখে ধৈর্য্য, অনাসক্ততা, অধ্যবসায়িতা শিক্ষা কর। দুঃখ-আগুণে পুড়িয়া আপনাকে পবিত্র, উন্নত কর। ঈশ্বরগত সমস্তভাবে আপনাকে প্রতিষ্ঠা কর, বিভোর

কর। এই সুখ দুঃখের জোয়ার ভাটা খেলিতে খেলিতে অগ্রসর হও, অনন্ত-সৌখর্য্যময় চিরদিবসের অপরিবর্ত্তনশীল পূর্ণতা-মহাসিন্ধু মিলিবে। দুঃখ যাইবে। ঈশ্বর-প্রাপ্তি হইবে। জলবিন্দু সাগরে মিশিবে। শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু।

তুলার চাস।

তুলার চাস আমাদের দেশ হইতে এক রকম উঠিয়া গিয়াছে। সে তাঁতিবংশ লোপ পাইয়াছে; সুতাহাটা উঠিয়া গিয়াছে; ঘরে ঘরে চরকা-কাটার সে ধুম আর নাই। তুলার চাসও এ দেশে আর বড় হয় না।

এখন হয় না, কিন্তু তখন খুব হইত। তখন ঘর ঘর চরকা কাটিত, ঘর ঘর তুলার চাস না করুক, যাহার ভদ্রাসন ভিন্ন অন্য জমি আর নাই সেও উঠানে দুই চারিটা কাপাসের গাছ দিত। বাঙ্গালায় তুলার চাসের নিতান্ত দুরবস্থা হইলেও আমেদাবাদ প্রভৃতি দক্ষিণ অঞ্চলে এবং গুজরাটি প্রদেশে অনেক দিন এ চাস রীতিমত চলিয়াছিল। এখনও হয়, কিন্তু তাহা অতি যৎসামান্য মাত্র। দিন দিন ইহার অবস্থা যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে ভয় হয়, তুলার চাস বোধ হয় আর এ দেশে হইবে না।

অথচ তুলার চাস আমাদের দেশে হওয়া উচিত। হওয়া দরকার। ম্যাঞ্চেষ্টারের সহিত আমরা কোন কালে প্রতিযোগিতা করিতে পারিব না। তবে ম্যাঞ্চেষ্টারকে যতদূর আমরা হাতে রাখিতে পারি এখন তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য। তাহার এক মাত্র উপায়, তাহাকে তুলা ও পাট যোগান দেওয়া। ইহাতে বেশ দু পয়সা লাভও আছে। তুলার দর ভাল। কাপড় বেচিয়া ম্যাঞ্চেষ্টার তো দেশ হইতে সব টাকা লইয়া গেল, তবু তুলার চাসে আমরা যদি তাহার কাছ হইতে কতক টাকাও ফিরাইয়া আনিতে পারি, মঙ্গলের কথা। ভারতের ভূমি স্বর্ণপ্রসূ, আর কিছুর জোরে আমরা লড়িতে পারি না পারি, আমাদের জমির জোর আছে। দুঃখের বিষয়, ইহা সকলে বুঝে না। আজ আমেরিকা ম্যাঞ্চেষ্টারকে তুলা যোগাইয়া বড় মানুষ হইয়া গেল, আর আমরা মূর্খ কেবল ম্যাঞ্চেষ্টারের বিরুদ্ধে আর্টিকেল লিখিতেছি, বক্তৃতা দিতেছি, আর বোকার মত তাহার কাপড় কিনিতেছি।

আমরা না কি নিতান্ত মূর্খ ও অকৃতজ্ঞ, তাই বুঝি মাতা ভারত-ভূমিও আমাদের প্রতি বিরূপা হইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সর্ব্বলোকবিদিত উর্ব্বরশক্তি কমাইয়া লইতেছেন। আইন আকবরী নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে দেখিতে পাই, তখন প্রতি একার ভূমিতে ২২৩ পৌণ্ড তুলা জন্মিত, আর এখন প্রতি একারে ৫২ পৌণ্ড মাত্র জন্মে! তাও সকল সময়ে নহে। কেন এমন হইল? মাতা কম দুঃখে সন্তানের প্রতি বিমুখ হন না। হতভাগ্য আমরা আমাদের নিজের ভদ্রাভদ্র বুঝি না, লাভ লোকসান ভাবিয়া দেখি না, জিনিস থাকিতেও তাহার সদ্ব্যবহার করিতে জানি না, তাই তো আমাদের এ দুর্দ্দশা। তুলার চাস আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, কেমন করিয়া তাহার আবাদ করিতে হয় তাহা আর মনে নাই। যাহা

কিছুও এখন করি, তাহা হেলায় শ্রদ্ধায়। কাজেই ফসলও আর তেমন হয় না। কোথায় আমরা এখন লেখাপড়া শিখিতেছি, আপনাদের অবস্থা বুঝিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা ইহার চাসের উন্নতি চেষ্টা করিব, না একেবারে ইহা ভুলিয়া যাইতেছি, কাজেই ভারতভূমিও আর সে ফসল দিতে রাজি নহেন। নহিলে, আমেরিকায় প্রতি একারে আজ ২০০ পৌণ্ড জন্মে, আর স্বর্ণপ্রসবিনী সেই ভারতে জন্মে কি না ৫২ পৌণ্ড!

তবু এখনও যে জমি সেই জমিই আছে; ভারতসাগরের জলে এখনও তাহা ভাসিয়া যায় নাই; বুঝিয়া সুঝিয়া আমাদের এ চাসের প্রণালী শিক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। রীতিমত চাস করিতে পারিলে ভারতে অন্য দেশ অপেক্ষা যে বেশি ফলিবে ইহা নিশ্চয় কথা। Mr. Rivett-Carnac লিখিয়াছেন, বেরার প্রদেশে একবার একটু ভাল করিয়া চাস দেওয়ায় প্রতি একারে ২৫৫ পৌণ্ড পর্য্যন্ত তুলা হইয়াছিল। তবে দোষ কাহার? ইহার চাসে আপনার ভাল, দেশের ভাল, তবে কেন ইহাতে হেলা করিবে? আমরা সংক্ষেপে সেই চাসের প্রণালীই আজ লিখিতেছি।

১। চাসের সময়। তুলার চাসের সময় সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। অনেক স্থলে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসেই বীজ বুনে; আবার জাহানাবাদ ও বাখরগঞ্জ অঞ্চলে কার্ত্তিক মাসে বীজ বুনিবার প্রথা আছে। ফলতঃ গরমেই তুলা ভাল হয়। সেই জন্য বাঙ্গালা অপেক্ষা—উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশেই তুলা বেশি জন্মে। গ্রীষ্মকালই চাসের প্রশস্ত সময়।

২। জমি। যে জমি বর্ষার জলে ডুবিয়া যায়, কি যাহা এত নীচু যে বৃষ্টির জল সহজে নির্গত না হয়, সে জমিতে তুলা করিবে না। আল্‌গা মাটিতে কার্পাস ভাল জন্মে না। পলি মাটিতে কি দোয়াশ জায়গায় গাছ খুব সতেজ হয়, কিন্তু ফলে কম। আঠাল মাটিই ইহার বিশেষ উপযোগী। চৈত্র মাসের বৃষ্টিতে মাটী কিছু নরম হইলে চাস আরম্ভ করিবে। কার্পাসের মূল প্রায় এক হাত পর্য্যন্ত মাটীর নীচে যায়, অন্ততঃ এক ফুট পরিমাণ খনন করিবে। কার্পাস-ক্ষেত্রে অস্থিচূর্ণ সার বড় উপকারী। যেখানে তাহা মেলে না, সেখানে বিঘা প্রতি চারি মণ কার্পাসের খইল দিবে। তাহাও না মিলিলে সরিষার খইল ব্যবহার করিবে। চারি মণ খইল চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত চারি মণ ঝুরা মাটী মিশাইয়া এক সপ্তাহ ঢাকা দিয়া রাখিবে, যেন জল বাতাস না লাগে। তার পর তাহা হইতে একটা গরম ভাব বাহির হইবে; তখন তাহা চসা ক্ষেত্রের উপর ছড়াইয়া দিবে। জমি এইরূপে তৈয়ার হইলে এক সপ্তাহের মধ্যে বীজ বপন করিবে।

৩। বীজ। কার্পাস নানা জাতীয়—আমেরিকান, ভোটাঙ্গি এবং দেশী। বীজ লইতে গেলে এই তিনের মধ্যে যাহা ভাল, তাহাই লওয়া উচিত। দেশী কাপাসের গাছে এক বৎসরের অধিক কাপাস পাওয়া যায় না, গাছ মরিয়া যায়। ভোটাঙ্গি বীজের গাছ অনেক দিন থাকে, কিন্তু তুলা পরিষ্কার হয় না, আঁশ বড় মোটা। আমেরিকান বীজের গাছ তিন বৎসর থাকে, এবং কার্পাস বড় ভাল হয়। সুতরাং আমেরিকান বীজই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। এইরূপ শ্রেষ্ঠতা দেখিয়াই ভারত-গবর্ণমেণ্ট একদিন এখানে আমেরিকান

কার্পাসের চাস প্রবর্ত্তিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। Schrottky সাহেবও এই জন্যই বলিয়াছেন—"On account of the greater length of fibre and the general superiority of the American cotton, it was but natural that the Indian Government should have concentrated its attention in the attempt to introduce and acclimatize in India the American variety of the cotton plant." বস্তুতঃ বীজের মধ্যে আমেরিকান বীজই প্রশস্ত।

৪। বুনন। বীজ প্রথম জলে ভিজাইবে। দুই প্রহর কাল ভিজিলে, তুলিয়া জল ঝাড়িয়া থলিয়ার উপর রাখিবে। তাহাতে খোসা পাতলা ও নরম হইয়া যাওয়ায় শীঘ্রই অঙ্কুর উদ্গমের সহায়তা করে। খসা হইয়া গেলে, কতকটা দোরা জলে ফেলিয়া বীজ গুলা তাহাতে ভিজাইতে হইবে। অনধিক একদিন এইভাবে ভিজিলে, বীজ ক্ষেতে বুনিবে। প্রতি বিঘায় আড়াই সেরের অধিক বীজ লাগে না। বিচ্ছিন্নভাবে ছড়াইয়া না দিয়া, আল বাঁধিয়া বুনাই ভাল। এত হাত সওয়া হাত অন্তর দুই ইঞ্চি পরিমাণ গর্ত্ত করিয়া প্রতি গর্ত্তে চারি পাঁচটী করিয়া বীজ বুনিয়া যাইবে। ইহাতে জল সেচিবার বড় একটা আবশ্যক হয় না।

৫। পালন। কাপাসের চাসে, প্রথমেই যাহা কষ্ট, তার পর পালন করিতে ততটা কষ্ট আর নাই। অবৃষ্টি হইলে, যতদিন গাছ এক ফুট পরিমাণ উচ্চ না হয়; ততদিন মধ্যে মধ্যে জল সেচিয়া দিতে হয়। চারা বা[illegible] হইলে, দুই তিনটী রাখিয়া দুর্ব্বলগুলিকে উপড়াইয়া ফেলিয়া দিতে হয় কিম্বা যেখানে হয় নাই, সেখানে রোপণ করিতে হয়। ঘাস জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া গাছের গোড়ায় মাটী দিতে হয়। ফল না হইয়া যখন দেখিবে কেবল কাঠ ও পাত গজাইতেছে, তখন তাহার আগা ছাটিয়া দিবে। আবার যদি অতিবৃষ্টি হয়, তাহার জন্য ক্ষেতের মাঝে ছোট ছোট নালা কাটিয়া রাখিতে হয়। অত্যন্ত শীতলতা এবং অত্যন্ত উষ্ণতা উভয়ই ইহার পক্ষে অনিষ্টজনক।

৬। তুলা সংগ্রহ। আশ্বিন মাসে কার্পাস ফুটিতে আরম্ভ হইয়া সমুদয় কার্ত্তিক মাসই ফুটিতে থাকে। দু দিন পরে একদিন ক্ষেত্র হইতে কার্পাস তুলিতে হয়। একত্রে অধিক ফুটিলে একদিনে তুলিব বলিয়া যাহারা বসিয়া থাকে তাহাদের অনিষ্ট হয়। কাপাস ফুটিয়া নীচে পড়িয়া ধুলা কাদায় নষ্ট হয়, বাতাসে উড়িয়া যায়, বিশেষতঃ বৃষ্টি হইলে একেবারে অকাজের হইয়া পড়ে।

তুলার চাস যে বিশেষ একটা শক্ত ব্যাপার, নট্‌খট কাজ, তাহা নহে। তবে ইহা কেন আমরা করিতে পারি না? ইজিপ্টের লোকেরা যাহা পারে, আমরা তাহা পারি না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! Mr. Login বলেন, ইজিপ্টে প্রতি একারে প্রায় ২৬৭ পৌণ্ড তুলা হইয়া থাকে। অথচ সেখানে খরচা বেশী। তিনি দেখাইয়াছেন, সেখানে যে চাস ১৭।৶০ আনায় হয় এখানে তাহা ১৩ টাকারও কমে হইতে পারে। ইংরাজেরা ইহা দেখাইয়া দিতেছে; মিশরবাসীরা আমাদিগের অপেক্ষা সহস্রগুণ অনুর্ব্বর ভূমিতে থাকিয়া আমাদের অপেক্ষা চতুর্গুণ ফসল উৎপন্ন করিতেছে; আর আমরা সভা করিতেছি, চীৎকার ছাড়িতেছি, লম্ফ মারিতেছি, আপনারা আপনাদের পিণ্ডি চট্‌কাইতেছি!

আপনি-বড়।

যাহারা বড়াই করে তাহারা সুখে থাকে, তাহাদের অল্প অহঙ্কার অল্পেই উদ্বেলিত হইয়া প্রশমিত হইয়া যায়। কিন্তু মনে মনে যাহারা বড় হইয়া বসিয়া আছে, অথচ বুদ্ধির আভিজাত্য বশতঃ মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না, তাহাদের অবস্থা সুখের নহে। যেমন বাষ্পের ধর্ম্ম ব্যাপ্ত হওয়া, তেমনি অহঙ্কারের ধর্ম্মই প্রকাশ পাওয়া। যে তাহাকে অন্তরে আটক করিয়া রাখিতে চায় সে তাহার সেই রুদ্ধ অহঙ্কারের অবিশ্রাম আঘাতে সর্ব্বদাই পীড়িত হইতে থাকে। বরং নিজের দুঃখশোক নিজের মনের মধ্যে রোধ করিয়া রাখিলে মহৎ ধৈর্য্যজনিত এক প্রকার গভীর সুখ লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু চপল অহঙ্কারকে হৃদয়ের গোপন কক্ষের মধ্যে শোষণ করিয়া সেই মহত্ত্বের সুখটুকুও পাওয়া না।

যাহারা দুঃখ শোক নীরবে বহন করিয়া সহিষ্ণুতা সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাদের বিশীর্ণ পাণ্ডুমুখের উপরে এক প্রকার উত্তাপবিহীন জ্যোতির্ম্ময় ছায়া পড়ে, কিন্তু অপরিতৃপ্ত অহঙ্কার যাহাদের হৃদয়-বিবরে ক্ষণে ক্ষণে উষ্ণনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, তাহাদের নেত্রের অধঃপল্লবে এক প্রকার জ্যোতিহীন জ্বালা, তাহাদের চিরশীর্ণ তীক্ষ্ণ মুখে, দৃঢ়রুদ্ধ ওষ্ঠাধরপ্রান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গভীর রহস্যরেখা সকল প্রকাশ পায়। বয়স যৌবনকালে এই উগ্র প্রাখর্য্য তাহাদের সৌন্দর্য্যের তেমন ক্ষতিকর না হইতেও পারে, কিন্তু প্রৌঢ় বয়সের যে বিমল শান্তিময় মমতাপূর্ণ অচঞ্চল শারদ শোভা তাহা তাহারা কিছুতেই রক্ষা করিতে পারে না। বয়সকালে তাহাদের চক্ষুপল্লবে সেই উজ্জ্বল কোমল অশ্রুরেখার ন্যায় ভারাক্রান্ত স্নিগ্ধদৃষ্টি, তাহাদের ওষ্ঠাধরে সেই স্নেহভাষায় জড়িত বাসনাহীন সান্ত্বনাপূর্ণ সুধাধৌত মৃদুহাস্য কিছুতেই প্রকাশ পায় না। তাহারা সৌন্দর্য্য প্রাণপণে রক্ষা করিতে চায়, কিন্তু তাহাদের হৃদয়ের অন্ধকূপ হইতে কুৎসিত বাষ্প-অঙ্গে অঙ্গে উত্থিত হইয়া তাহাদের মুখের সহজ মানব-শোভা লোপ করিয়া দেয়। তাহারা বার্দ্ধক্য গোপন করিতে চায়, অকালে রুক্ষ হইয়া পড়ে, অথচ কোনকালে বার্দ্ধক্যের পরিণত গাম্ভীর্য্য লাভ করিতে পারে না।

যাহারা কিছু একটা কাজ করিয়া তুলিয়াছে, কোন একটা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং সাধ্যানুসারে ক্রমশঃ তাহা সম্পন্ন করিতেছে, তাহাদের হৃদয়ে অহঙ্কার সঞ্চিত হইতে পারে না, কার্য্যস্রোতের সঙ্গে বাহির হইয়া ভাসিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু যাহারা কিছু করে না, করিতে পারে না, মনে করে করিতে পারি অথচ করিতে গিয়া নিষ্ফল হয়, তাহারা অহঙ্কার বাহির করিয়া ফেলিবার পথ পায় না। তাহারা কিছুতেই আপনার কাছে এবং পরের কাছে প্রমাণ করিতে পারে না যে তাহারা বড়, এই জন্য মনের খেদে মনে মনে আপনার বড়ত্বের প্রতি ক্রমশঃ অধিকতর অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আপনাকে প্রাণপণে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু কণ্টক-শয্যায় যেমন বিরাম নাই, তেমনি সে

সান্ত্বনার সান্ত্বনা নাই। তাহারা যত আপনাকে বড় মনে করে, ততই আরো অধিকতর দগ্ধ হইতে থাকে।

আমি যাহাদের কথা বলিতেছি, তাহাদের বুদ্ধি আছে অথচ এমন ক্ষমতা নাই যে কোন মহৎ কাজ সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে। এই বুদ্ধির প্রভাবে তাহারা আপনাকে সম্পূর্ণ প্রতারণা করিতে পারে না। কেবল সচেতন বেদনা অনুভব করিতে থাকে। তাহারা দেখিতে পায়, যে, আমরা আপনাকে এত বড় মনে করিতেছি তবুও কিছুতেই বড় হইয়া উঠিতেছি না। এই অলস অহঙ্কার দাস্তের নরকযন্ত্রণা বর্ণনায় স্থান পাইবার যোগ্য। বিপুল অভিমানে বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছি অথচ এক তিল প্রসর বাড়িতেছে না, সে কোন্ মহাপাতকের ভোগ!

এইরূপ বুদ্ধিমান গুপ্ত অহঙ্কারী সর্ব্বদাই বৃহৎ সঙ্কল্প সৃষ্টি করিতে থাকে। সকল দিকেই হাত বাড়াইতে থাকে অথচ কিছুই নাগাল পায় না। পাশের লোক তাহাকে যে, কোন বিষয়ে অতিক্রম করিয়া যাইবে ইহা তাহার ইচ্ছা নহে। এই জন্য কাহাকে কোন লক্ষ্যমুখে যাত্রা করিতে দেখিলে সেও এক এক সময়ে তাড়াতাড়ি ছুটিতে আরম্ভ করে, পথের মধ্য হইতে ফিরিয়া আসে ও মনে মনে কহে যদি শেষ পর্য্যন্ত যাইতাম ত আমিই জিতিতাম। সে চুপি চুপি এইরূপ প্রচার করে আমি যে কোন কিছুতেই বাস্তবিক কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, সে কেবল মাত্র ঘটনাবশতঃ। কারণ যাহারা নিজ নিজ সঙ্কল্পে কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা সে আপনাকে মনে মনে এত বড় বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছে যে নিজের অক্ষমতা সে কল্পনা করিতে পারে না। ক্ষমতা আছে অথচ ক্রমিক প্রতিকূল ঘটনাবশতঃ বড় হইতে পারিতেছি না, এই দুঃখে সে সর্ব্বদাই এক প্রকার তীব্রস্বভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। এমন কি তাহার ঈশ্বরে ভক্তি চলিয়া যায়। তাহার সমস্ত ভক্তি সে নিজের পদতলে আনিয়া গোপনে আপনার পূজা করিতে থাকে—বলিতে থাকে 'আমি মহৎ—সমস্ত জগৎ আমার প্রতিকূল, ঈশ্বর আমার প্রতিবাদী! কিন্তু যে যাহা বলে বলুক, আমি আমাকেই আমার শিরোধার্য্য করিয়া সংসারের পথে সবলে পদক্ষেপ করিব!" 'এই বলিয়া সে কখন কখন সবলে বন্ধন ছিঁড়িয়া হঠাৎ এক বেগে ছুটিতে থাকে, সগর্ব্বে চারিদিকে চাহিতে থাকে—বলে "কি আমার দৃঢ়চিত্ততা! স্বকপোলকল্পিত কর্ত্তব্যের অনুরোধে সমস্ত জগৎসংসারের প্রতি কি প্রবল উপেক্ষা!" বুঝিতে পারে না যে তাহা সংসারপ্রতিহত সঙ্কীর্ণ আত্মাভিমানের সফেন উচ্ছ্বাস মাত্র!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাদের বুদ্ধি যথেষ্ট আছে, এত আছে যে, বন্ধুবান্ধবেরা সকলেই প্রত্যাশা করিয়া আছেন কবে ইহারা আপন বুদ্ধিকে স্থায়ী কার্য্যে নিযুক্ত করিবে! বন্ধুদিগের উত্তেজনায় এবং আত্মাভিমানের তাড়নায় তাহাদের বুদ্ধি অবিশ্রাম চঞ্চল হইয়া বেড়াইতে থাকে, মনে করে হাতের কাছে আমার অনুরূপ কার্য্য কিছুই নাই। কোন একটা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে ভয় হয় পাছে ক্ষমতায় কুলাইয়া না উঠে এবং আত্মীয়সাধারণের চিরবর্দ্ধিত প্রতাপিরি মূলে কুঠারাঘাত পড়ে। ফলাফলের ভার বিধাতার হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক মহৎ কার্য্যের

অযোধ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আত্মসমর্পণ করা এরূপ লোকের দ্বারা সম্ভবপর নহে।

সুতরাং অবজ্ঞা, উপেক্ষা, প্রবল তর্ক এবং সমালোচনার আঘের বেগে ইহারা আপনাকে সকলের উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিতে চায়। অভিমান-শাণিত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া ইহারা সমস্ত সৃষ্টিকার্য্যকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া তোলে। অন্য সকলকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিচারে বিপর্য্যস্ত করিয়া মনে করে, 'গঠন কার্য্যে নিশ্চয়ই আমার অসাধারণ নৈপুণ্য আছে নহিলে এমন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বুঝিতে পারি কি করিয়া!' কিন্তু এত ক্ষমতাসত্ত্বেও তাহারা কেন যে কোন সৃজনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না ইহাই ভাবিয়া ভাবিয়া তাহারা এবং তাহাদের প্রতিবেশীবর্গ উত্তরোত্তর নিরতিশয় আশ্চর্য্য হইতে থাকে।

ইহারা নিতান্ত পার্শ্ববর্ত্তী লোকের প্রশংসা সহ্য করিতে পারে না। কারণ পাশের লোক হইতে নিজের ব্যবধান অধিক নহে। পাশের লোক যদি বড় তবে আমিই বা বড় নহি কেন এই কথা মনে আসিয়া আঘাত দেয়! আমার বুদ্ধি ইহার অপেক্ষা অল্প নহে। বিচার করিতে তর্ক করিতে সূক্ষ্ম যুক্তি বাহির করিতে আমার মত কয়জন আছে? তবে আমিই বা ইহার অপেক্ষা খাট কিসে! এ ব্যক্তি কেবল আপন সামান্য শক্তি প্রকাশ করিয়াছে এবং পাঁচজন মূর্খ লোকে ইহাকে বলপূর্ব্বক বাড়াইয়া তুলিয়াছে - দৈবক্রমে আমার বিপুল শক্তি মহৎ মস্তিষ্কভারে চাপা পড়িয়া আছে বলিয়া আমাকে আমি এবং দুই একটী বন্ধু ছাড়া আর কেহ চিনিল না! আমি বর্ত্তমান থাকিতে আমার পার্শ্বে যে লোকের দৃষ্টি পড়ে ইহা অপেক্ষা মূঢ়-সাধারণের অবিবেচনার প্রমাণ আর কি আছে! এরূপ স্থলে নিকটস্থ লোককে খাট করিবার অভিপ্রায়ে ইহারা দূরস্থ লোকের অতিশয় প্রশংসা করিবে, হঠাৎ এত প্রশংসা করিতে আরম্ভ করে যে তাহার আর অন্ত পাওয়া যায় না!

অধিকাংশ স্থলে ইহাদের কতকগুলি করিয়া নিজের জীব থাকে। তাহাদিগকে ইহারা সমাধা করিয়া তুলিতে চাহে। এই সকল স্বহস্তগঠিত পুতুল মূর্ত্তিকে যখন তাহারা সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে পূজা করিতে থাকে, তখন তাহাতে করিয়া তাহাদের আত্মাভিমান ক্ষুণ্ণ হয় না, বরঞ্চ পরিতৃপ্ত হইতে থাকে। কারণ এই পুতুলপ্রতিষ্ঠার মধ্যে তাহারা আপনাদের আত্মকর্ত্তৃত্ব বিশেষরূপ অনুভব করিতে থাকে।

ইহাদের একপ্রকার শুষ্ক বিনয় আছে তাহার মধ্যে বিনয়ের মাধুর্য্য কিছুই নাই। সে বিনয় এত কঠিন যে অবিনয় তাহা অপেক্ষা অধিক কঠিন নহে। মনে হয় যেন অহঙ্কার তাহার সমস্ত মাংসপেশী কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত করিয়া সবলে স্থির হইয়া আছে। বিনয়বচনের মধ্যে যেন কেমন একটা পরিহাসের স্বর প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। অভিমান যেন গভীর বিদ্রূপভরে বিনয়ের অনুকরণ করিতেছে। অথবা সে যেন সকলকে ডাক দিয়া বলিতেছে, "আমি নিজের মহোচ্চ স্কন্ধের উপর চড়িয়া এতই উন্নত হইয়া উঠিয়াছি যে বিনয় প্রকাশ করিলেও আমার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমি আপনাকে বিস্তর বড় বলিয়া জানি এই জন্য বিস্তর অহঙ্কারভরে বিস্তর বিনয় করিয়া থাকি।"

ইহারা যতই আত্মসংযম অভ্যাস করুক না, থাকিয়া থাকিয়া আত্মীয়স্বজনদের প্রতি ইহাদের কঠোর কটাক্ষ, নিষ্ঠুর বাক্য, ক্রূর পরিহাস বাহির হইয়া পড়ে। সম্বরণ করিতে পারে না। তীব্র আত্মদ্রোহ মরু-হৃদয়ের ভূগর্ভে অন্তঃসলিলা বহিতে থাকে; সময়ে সময়ে সামান্য কারণে ক্ষীণ আবরণ ভেদ করিয়া রক্তনেত্র, বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, বিদীর্ণ ওষ্ঠাধরের মধ্য দিয়া বাহিরে উৎসারিত হইয়া উঠে। এক এক সময়ে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের ন্যায় এক একটী ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ সহাস্য বাক্যে তাহাদের গোপন মর্ম্মগহ্বরের বিস্তীর্ণ অগ্নিকুণ্ড চক্ষের সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে! এরূপ আকস্মিক নিষ্ঠুরতার কারণ তৎক্ষণাৎ খুঁজিয়া বাহির করা যায় না, কিন্তু সে কারণ অল্পে অল্পে বহু দিন ধরিয়া হৃদয়ে সঞ্চিত হইতেছিল। অবরুদ্ধ অহঙ্কার অজ্ঞানে অলক্ষিতভাবে যখন-তখন আঘাত সহিতেছিল, অবশেষে সহিষ্ণুতা উত্তরোত্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এক দিন সামান্য আঘাতে দ্বিধা হইয়া যায়, এবং অভিমানের বিষদগ্ধ সম্মুখে যাহাকে পায় তাহাকেই আসিয়া বিদ্ধ করে।

এই হৃদয়বিবরবাসী অহঙ্কারের ঔষ্ণ নিশ্বাস-বাষ্পে প্রশান্ত স্নেহ, নিরভিমান প্রেম ও উদার করুণা আচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং ক্রমশঃ কলুষিত হইয়া উঠে। আত্মবিস্মৃত সরল সহৃদয়তার সুখ আর ভোগ করিতে পারি না, সর্ব্বদাই রুদ্ধ দ্বার, রুদ্ধ হৃদয়, তামসী মুখশ্রী, সঙ্কীর্ণ জীবনের গতি। গৃহকোণ অবলম্বন করিয়া কাল্পনিক উদারতার অভাব নাই, অথচ যথার্থ হৃদয়ের সহিত কাহাকেও হৃদয়ের কাছাকাছি অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে পারি না। এই বিচিত্র জনপূর্ণ সহস্র সুখদুঃখময় পৃথিবীতে সকলকে দূরে রাখিয়া, স্বজনদিগকে আঘাত দিয়া, আত্মতৃপ্তির অন্ধকূপের মধ্যে আপনাকে লুপ্ত করিয়া আমাদের মর্ত্ত্যজীবন অন্ধকারে নিষ্ফল অতিবাহিত করিয়া দিই, অবশেষে মৃত্যু আসিয়া আমাদিগকে এই জীবন্মৃত্যু হইতে শুভক্ষণে মুক্ত করিয়া দেয়!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

লক্ষ্মী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বৈশাখ মাস। দারুণ গ্রীষ্ম। দ্বিপ্রহরের সূর্য্য মাথার উপর আগুন ঢালিতেছে। পৃথিবী যেন কামারশালা। এ সময়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল আরও ভয়ানক। কাহার সাধ্য মধ্যাহ্নে সেখানে বাহির হয়? বালুকার এক একটী কণা যেন এক একটী সূচশলা। তার উপর অবিরত লু চলিতেছে। সে বায়ু লাগিলে গা পুড়িয়া যায়, সর্ব্বাঙ্গে ফোস্কা পড়ে। পশ্চিমের সুখ অনুভব করিতে চাও তো শীতকালে যাইও, এ সময়ে সোণার বাঙ্গালা ছাড়িও না।

এ ছাড়া পশ্চিমে এ সময়ে আরও ভয়ের কারণ আছে। ওলাউঠার বড়ই প্রাদুর্ভাব হয়; বসন্তে বিস্তর লোক মারা পড়ে। দুই-ই উৎকট রোগ, দুই-ই এ সময়ে এ প্রদেশকে ছারখার করিয়া ফেলে। যেখানে একবার দেখা দেয়, হঠাৎ সে স্থান

ছাড়িতে চাহে না। ওলাউঠা অপেক্ষা বসন্তের প্রভাব আরও কিছু বেশী। ভগবান্ এ সুখের সৃষ্টি রচনা করিয়া কেন তাহা দুঃখর আলয় করিলেন তাহা একরূপ বুঝিতে পারি; মানুষকে স্বহস্তে গড়িয়া কেন তাহাকে মৃত্যুর অধীন করিলেন তাহাও কতকটা বুঝিতে পারি; কিন্তু দয়াময় হইয়া তিনি এমন যন্ত্রণাময় ব্যাধির কেন সৃষ্টি করিলেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

এ বৎসর অম্বালায় বসন্তের বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সকল লোকেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। গভর্ণমেণ্টও ইহা নিবারণের জন্য যতটা উপায় অবলম্বন করা সম্ভব তাহা করিতেছেন। তবে কারপরদাজদিগের দোষে বা গুণে সকল নিয়মগুলা ঠিক পালন হইয়া উঠিতেছিল না, বা অতিপালন হইতেছিল। অম্বালার যেখানে ছাউনি—ক্যাণ্টনমেণ্ট—তাহা সহর হইতে প্রায় দুই ক্রোশ। এইখানে কমিসরিয়াট আপিষ; সুতরাং কমিসরিয়াট-কেরাণীদিগের এইখানেই বাসা। বসন্ত আগেই ছাউনিতে আরম্ভ হইয়াছে। বসন্ত ছোঁয়াচে রোগ; তাই ছাউনির নিয়ম, বসন্ত হইলে রোগী সেখানে থাকিতে পারে না। দূরে মাঠের এক ধারে তাহাদিগের থাকিবার একটা নির্দ্দিষ্ট ঘর আছে। সে ঘর গভর্ণমেণ্টের, এই অভিপ্রায়েই তাহা নির্ম্মিত। ভিক্ষুক হইতে ধনকুবের পর্য্যন্ত সবারই সে অবস্থায় এই আশ্রয়। এইখানে গভর্ণমেণ্টের ডাক্তার ও লোক জন আছে, তাহারাই দেখে শুনে। তবে যাহাদের আত্মীয় কেহ সঙ্গে থাকিতে ইচ্ছা করে সে থাকিতে পারে; কিন্তু রোগীর ন্যায় সেও সে কয় দিন ছাউনিতে আসিতে পারে না।

বেলা দুই প্রহর। সেই রোগনিবাসে অনেক গুলি রোগী শুইয়া যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছে। কেহ নীরবে কাঁদিতেছে, কেহ মরণাধিক যাতনায় চীৎকার ছাড়িতেছে. কেহ বা অজ্ঞানে প্রলাপ বকিতেছে। মৃত্যু যেন সবারই পাশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার মধ্যে যে একটু সৌভাগ্যশালী তাহার কোন আত্মীয় মাথার কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে বীজন করিতেছে, আর রোগী অপেক্ষা সহস্র গুণ কষ্টে এক একবার মর্ম্মস্থল হইতে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে। যাহারা বিদেশী, কর্ম্মোপলক্ষে এখানে প্রবাসী মাত্র, তাহাদের ন্যায় হতভাগ্য আর নাই। এক একবার ঘর বাড়ি, স্ত্রী পুত্র পরিবারের কথা মনে পড়িতেছে, এক একবার পার্শ্বস্থ শূন্য শয্যার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেছে, কাল যে ঐ বিছানায় শুইয়া তাহারই সহিত একত্রে এমনি ছট্‌ফট্ করিয়াছে আজ সে নাই, সে খালি বিছানা দেখিয়া আপনার অবস্থা স্মরণ হইতেছে, আর অপাঙ্গদ্বয় প্লাবিত করিয়া অশ্রুর পর অশ্রু নিঃশব্দে গড়াইয়া পড়িতেছে। সে দৃশ্য বড় মর্ম্মস্পর্শী; তাহা লিখিয়া ঠিক বুঝান যায় না।

সেই গৃহের এক পার্শ্বে একটী শয্যায় পড়িয়া এক বাঙ্গালী যুবক। সে একজন কমিসারিয়াটের কেরাণী; ছয় মাস হইল, কলিকাতা হইতে এখানে বদলি হইয়া আসিয়াছে। আপনার জন এখানে তাহার কেহই নাই। কয়েকজন বাঙ্গালী মিলিয়া একত্রে এক বাসা করিয়া ছিল। তাহার স্বভাব চরিত্র বড় ভাল, অতি ধীর শান্ত

মিষ্টভাষী। কাহারও কোনও কথায় থাকিত না, আমোদ আহ্লাদে বড় একটা মিশিত না, সদাই আপন মনে কি চিন্তা করিত, এবং আপিসের কাজ সারিয়া নির্জ্জনে আপনার সেই চিন্তা লইয়াই থাকিতে ভাল বাসিত। সবাই তাহাকে স্নেহ করিত, এবং তাহার ভিতর ভিতর কি একটা দুঃখ আছে তাহা বুঝিতে পারিয়া অনেকে তাহার জন্য সহানুভূতি করিত। হঠাৎ একদিন আপিস হইতে আসিয়া গা ব্যথা করিতেছে বলিয়া সে শুইয়া পড়িল। রাত্রে আর উঠিল না। প্রভাতে সবাই উঠিয়া দেখিল, তাহার বসন্ত হইয়াছে। দেখিয়া সকলে শীহরিল। হুকুম ছিল, বসন্ত হইবামাত্রই থানায় সংবাদ দিবে। কিন্তু যদি অল্পে অল্পে সারিয়া যায় এই ভাবিয়া "চুপ চুপ" করিয়া সে দিন সবাই কথাটা চাপিয়া রাখিল। আপিস কামাই করিয়া কেহ কেহ তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। ঘরে অনেকের অনেক রোগ থাকে, কিন্তু বিদেশে নিরাশ্রয়ের প্রতি আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করাই মহৎ গুণ। বাঙ্গালীর আর কোন গুণ থাক না থাক, এ গুণটী তাহার আছে।

কিন্তু, বিধাতা যাহার উপর নারাজ, মানুষে তাহার কি করিবে? পরদিন সভয়ে সকলে দেখিল, রোগ একদিনেই বড় বাড়িয়া উঠিয়াছে। তবুও তাহারা থানায় খবর দিতে সম্মত হইল না। কিন্তু যে ডাক্তার প্রথম দিন অনেক অনুনয়ের পর গোপনে দেখিতে স্বীকৃত হইয়াছিল, সে আজ আর গোপনে দেখিতে চাহে না। ডাক্তার না দেখিলেই বা কি হইবে? কাজেই অনেক চিন্তার পর, থানায় জানাইল। তৎক্ষণাৎ লোক আসিয়া ধীরে ধীরে উঠাইয়া তাহাকে সেই প্রান্তরস্থিত রোগ-নিবাসে লইয়া চলিল। যাইবার পূর্ব্বে একবার সকলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, শুশ্রূষার জন্য বাড়ী হইতে কাহাকেও আসিতে তাহারা টেলিগ্রাফ করিবে কি না। কিন্তু সে তাহার উত্তরে কিছুই বলিল না, একবার ঈষৎ হাসিল, আবার তৎক্ষণাৎ দুই চক্ষের কোণ দিয়া দুই ফোটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। দেখিয়া সকলে তাহার মনের ভাব বুঝিল। সে বড়ই দুর্ভাগা, এমন সময়েও তাহাকে দেখিবার আপনার জন কেহই নাই, ভাবিয়া সবাই যার পর নাই ব্যথিত হইল।

এ অভাগা আর কেহই নহে, মন্মথ। আমরা দুই বৎসর পরের কথা বলিতেছি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দুই বৎসর পরের কথা! এক দিনে—এক ঘণ্টায়—এক মুহূর্ত্তে মানুষের কত পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, তা দুই বৎসর!—কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তা কে বলিবে? আজ যেন মন্মথের পীড়া, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে যে মন্মথ সেই মন্মথ কি ছিল? সেই হাসি-হাসি সদাপ্রফুল্ল সুন্দরকান্তি মন্মথ কি হইয়া গিয়াছে! আর তাহার সে হাসি নাই, সে প্রফুল্লতা নাই, সে কান্তি নাই। দুই বৎসরের মধ্যে মন্মথ বৃদ্ধের ভাব, বৃদ্ধের রূপ ধারণ করিয়াছে। মুখ বসিয়া গিয়াছে, কপাল কোঁকড়াইয়া আসিয়াছে, দেহে কালি মাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু এ তো সব বাহ্যিক পরিবর্ত্তন; তাহার মনের পরিবর্ত্তন আরও ভয়ানক। সেখানে সুখ নাই,

শান্তি নাই। সদাই হা হুতাশ, সদাই তীব্র বিষের জ্বালা। বুকের ভিতর কি যেন ফুটিয়া রহিয়াছে; তাহা উঠে না, নামে না—বড় ব্যথা, বড় যাতনা—নিশ্বাস ফেলিতেও বাজিয়া উঠে। এ অবস্থায় চাকুরি করিতে আর তাহার প্রবৃত্তি ছিল না। তবে, সে একা নহে, বুড়া মা বর্ত্তমান। আহা! সে মার কত কষ্ট তাহা কে বলিবে? বুড়ী "বৌ বৌ" করিয়া এক রকম পাগল হইয়া গিয়াছে। এখনও ঘাটে ঘাটে পথে পথে লক্ষ্মীর সন্ধান করিয়া বেড়ায়। পথ দিয়া কোন স্ত্রীলোক যাইতে দেখিলে হা করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকে। সে চলিয়া যায়, আর বুড়ী আপন মনে কাঁদিতে থাকে। গ্রামে কাহারও বাড়ী যায় না, কাহারও সঙ্গে বড় একটা কথা কহে না। মন্মথ মার জন্য বড়ই কাতর। সদাই মার কাছে আপনার দুঃখ গোপন করিত। দুই বৎসর ধরিয়া মন্মথও অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু লক্ষ্মীর কোনও সন্ধান মিলিল না। এ দিকে অম্বালায় বদলির হুকুম হইল। একে চাকুরিতে আর প্রবৃত্তি নাই, তায় বিদেশে—যাই কি না যাই, মন্মথ অনেক ভাবিল। এক পয়সা সঙ্গতি নাই, দুদিন বসিয়া খাইলে চলে না। কিন্তু, মন্মথ নিজের জন্য ভাবে না। বুড়া মা—কোথায় যাইবে? পেটের জন্য এ বয়সে কার দোরে ভিক্ষা করিবে—কে কি বলিবে? মা ভিন্ন মন্মথের এ সংসারে আর কেহ নাই—সে মার কষ্ট সন্তান হইয়া কেমন করিয়া দেখিবে? মন্মথ অম্বালায় যাইতে স্বীকৃত হইল। মাকে সব বলিল। মা সঙ্গে যাইতে চাহিল। মন্মথ গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতার অধিক দূর কখন যায় নাই। বিদেশ-বিভূঁইয়ের মুদ্দুক সে তাহার কিছুই জানে না, সে না কি বড় কষ্টের জায়গা, সেখানে মন্মথ মাকে লইয়া যাইবে কেমন করিয়া? মাকে অনেক বুঝাইল। বৃদ্ধা দেবতার নিকট পুত্রের মঙ্গলের তরে মাথা কুটিতে লাগিল। তার পর, মার আশীর্ব্বাদ লইয়া মন্মথ বিদেশ যাত্রা করিল।

আজ দুই দিন হইয়া গেল মন্মথ এই রোগনিবাসে আসিয়াছে। দুই দিনে পীড়া ভয়ানক আকার ধারণ করিয়াছে। মুখ চোখ কোথাও আর স্থান নাই, সর্ব্বাঙ্গ বসন্তে ভরিয়া গিয়াছে, অসীম যাতনায় বিছানায় পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া কত কথা মনে পড়িতেছে। 'সেই মা! না জানি তিনি কষ্টই পাইতেছেন। আর মন্মথ যদি সত্য সত্যই না বাঁচে, তাঁহাকে কে দেখিবে? এ শেষ বয়সে কে মুখ চাহিবে? দুটো সান্ত্বনার কথা বলিবার যে কেহই নাই! হয় ত এ সংবাদে আত্মঘাতিনী হইবে—উঃ সে কি ভয়ানক!' মন্মথ আর ভাবিতে পারিল না। বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিল। আবার কতক্ষণে সেই বালিকার কথা মনে আসিল। 'লক্ষ্মী—লক্ষ্মী—লক্ষ্মী কি এ পৃথিবীতে আর নাই? দুই বৎসর এত চেষ্টার পরও কেন সন্ধান মিলিল না! আ মরি মরি, কি রূপ! রূপের অপেক্ষা কি গুণ! প্রাণ থাকিতে তাহা কি ভোলা যায়?' সেই রাত্রির সব কথা গুলি একে একে মনে জাগিয়া উঠিল। দুই বৎসরে মন্মথ তাহার এক বর্ণও বিস্মৃত হয় নাই। তখন রোগের যাতনা বাড়িয়া উঠিল। হতভাগ্য বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

রোদন করিতে করিতে একটু তন্দ্রা আসিল। মন্মথ ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু সে ঘুম শীঘ্র ভাঙ্গিল না। তাহা ঘুম নহে, অচৈতন্য। প্রাতঃকালে মন্মথ কাঁদিতেছিল, দুই প্রহরের সময় সকলে দেখিল, সে অঘোর অচেতন হইয়া পড়িয়াছে। বিকারের পূর্ব্বলক্ষণ দেখা দিয়াছে। এ সময়ে নিকটে আপনার জন থাকা বড় দরকার। সদাই মুখের প্রতি চাহিয়া সুশ্রূষার বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু হতভাগ্যের কেহই নাই। তখন যে সময় কেহ যে আসিবে গিয়া তাহার সঙ্গীদিগকে সংবাদ দিবে তাহাও পারে না। ভয়ানক লু—কার সাধ্য ঘরের বাহির হয়? ব্যথিতহৃদয়ে সবাই তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল।

সূর্য্য যেন আজ তাহার সকল কিরণ ঢালিয়া দিবে সংকল্প করিয়াছে। বিষম রৌদ্র। লু অবিরাম চলিতেছে, সে বায়ুর সঙ্গে তপ্ত বালুকণা উড়িতেছে, বায়ু যেন আগুন খেলাইতেছে। গাছগুলা শুখাইয়া আপনা আপনি কাটিতেছে। ঘাট মাঠ সর্ব্বত্র জনহীন। এ সময়ে ঐ তপ্ত বালুর উপর দিয়া কে ঐ রমণী ছুটিয়া আসিতেছে? সন্ন্যাসিনী বেশ; পরিধানে গৈরিক বাস; হাতে ত্রিশূল; কেশপাশ আলুথালু, তাহা ভস্মমাখা। এখনও সব চুলে জটা পড়ে নাই, দুই এক গাছায় ধরিয়াছে মাত্র। দেখিলে বোধ হয় এ অতি অল্প দিন এ বেশ ধারণ করিয়াছে। সূচশলার ন্যায় বালুকণা সকল পায়ে বিদ্ধ হইতেছে, লু লাগিয়া অঙ্গ ঝলসিয়া যাইতেছে, ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই; সন্ন্যাসিনী দ্রুতপদে সেই রোগনিবাসের দিকে ছুটিয়াছে। ঘরে প্রহরী বসিয়াছিল, সন্ন্যাসিনী আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহাকে কি বলিল। প্রহরী দর্শনমাত্রেই অবাক্ হইয়া গিয়াছিল, সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না। ভাবিতেছিল, "ভগবতীজি কৈলাস ছোড়্‌কে আয়া হোগা।" প্রহরী সসম্ভ্রমে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসিনী তাহা দেখিয়া পুনরায় আপনার কথা বলিল। তখন সে "আইসে মায়ি" বলিয়া পথ দেখাইয়া ঘরের ভিতর লইয়া চলিল।

সন্ন্যাসিনী গৃহের মধ্যে আসিয়া যেখানে মন্মথ অচেতনে পড়িয়াছিল, তাহার শিওরের কাছে বসিল। ঘর যেন আলো হইয়া উঠিল। প্রহরী বৃথায় অনুমান করে নাই। ঘরের সবাই দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িল। সন্ন্যাসিনীর বয়স ষোলর উপর হইবে না। কাঁচা সোণার রঙ্, সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপ, তবু যেন সে রঙ্ কাটিয়া পড়িতেছে। রূপ দেহে ধরে না। ভগবতী নহিলে এ বয়সে এতরূপ লইয়া কে সন্ন্যাসিনী সাজিবে? তিনি দয়াময়ী, অনাথের গতি, তাই দয়া করিয়া এই অনাথের ভার আপনিই লইতে আসিয়াছেন। মানুষের সাধ্য কি, এই লু'র ভিতর দিয়া এই বালির উপর দিয়া চলিয়া আসে? সম্ভ্রমে সকলে সরিয়া দাঁড়াইল।

সন্ন্যাসিনী কাহারও সঙ্গে কোন কথা কহিল না। ধীরে ধীরে মন্মথের মাথাটী লইয়া আপনার কোলের উপর রাখিল। ধীরে ধীরে গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

তিন দিন মন্মথ এইরূপ অঘোর অচেতন হইয়া রহিল। তিন দিন সন্ন্যাসিনী সেই একই স্থানে এক ভাবে বসিয়া তাহার সুশ্রূষা করিল। এ তিন দিনে কেহ তাহাকে

একটীও কথা কহিতে শুনে নাই, কেহ তাহাকে একবার চক্ষু বুজাইতে কি নড়িয়া বসিতে দেখে নাই; তিন দিন বিন্দু মাত্র জল পর্য্যন্ত সে গ্রহণ করে নাই। অনেকের তাহাকে কিছু খাওয়াইবার ইচ্ছা হইত, কিন্তু ভয়ে কিছু বলিতে পারিত না।

তিন দিন কাটিয়া গেল। ঈশ্বরের কৃপায় হউক, শুশ্রূষার গুণে হউক, এই তিন দিনের অচেতন অবস্থাতেই মন্মথ ক্রমে ভাল হইয়া উঠিতে লাগিল। চারি দিনের দিন মন্মথের চেতনা হইল। প্রভাতে সবাই দেখিল, মন্মথ বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে, তাহার রোগ প্রায় সারিয়া আসিয়াছে, অধিকাংশ বসন্ত মিলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিস্ময়ে সকলে দেখিল, সে সন্ন্যাসিনী আর নাই। মন্মথকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে কিছুই বলিতে পারিল না, ক্যাল্ ক্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। তখন সকলে সেই কথার আন্দোলন করিতে লাগিল।

পর দিন মন্মথ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মন্মথ সুস্থ হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাহার মনের সুস্থতা হইল না। সে আরোগ্য লাভ করিয়া বাসায় আসিলে বন্ধুবান্ধবেরা সকলেই সেই অপূর্ব্ব সন্ন্যাসিনীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাহারা পূর্ব্বেই এ কথা শুনিয়াছিল। এ সব কথা বড় একটা গোপন থাকে না। সবাই কৌতূহলী হইয়া সে কথা মন্মথকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মন্মথ কাহারও কথার কিছুই উত্তর দিতে পারিল না। উত্তর দিতে পারিল না, কিন্তু মনে মনে কেবল তাহাই তোলাপাড়া করিতে লাগিল। নির্জ্জনে একদিন ভাবিল, 'সবাই তো সে একই কথা বলিতেছে, তবে কি সত্য? সত্যই কি সন্ন্যাসিনী আসিয়া আমাকে বাঁচাইয়াছে। তিন দিন অনাহার অনিদ্রা—নড়িয়া বসে নাই, জলবিন্দু গ্রহণ করে নাই—এ কি মানুষে পারে? মানুষের কথাই বা ভাবি কেন, আমি অভাগা, আমার প্রতি এত দয়া কে করিবে? তবে কি সত্য সত্যই এ কোনও দেবীর কাজ? দীনপালিনী ভগবতীর কৃপা?' তাহা ভাবিতে মন্মথ শিহরিয়া উঠিল। আবার ভাবিতে লাগিল, কিন্তু—কিন্তু যেন স্বপ্নের মত মনে পড়ে কার একখানি মুখ তাহার মুখের উপর সদাই সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিত, সেই স্বপ্নের মত সে চোখে সে যেন দুই এক বিন্দু জলও দেখিয়াছিল। সে কি? সে মুখ ঠিক্ মনে পড়ে না, যেন আব্ছা আব্ছা মত। লোকে যাঁহার কথা বলে, সে কি তাঁহারই মুখ! মন্মথ ভাবিতে লাগিল। অন্ধকার ঘরে কে যেন একটু আলোর রেখা পাতিত করিল। মন্মথের মাথাটা হঠাৎ ঘুরিয়া গেল। সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হইল। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে আরম্ভ হইল। সে মুখ—সে মুখ যেন লক্ষ্মীর!

লক্ষ্মীর!—মহিলে এত দয়া এত গুণ কার? তবে কি লক্ষ্মী আজও এ পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছে? লক্ষ্মী সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছে? তাহার সেই লক্ষ্মীর আজ এই বেশ হইয়াছে?—না না, এ নিতান্ত অসম্ভব। লক্ষ্মী জীবিত নাই; তাহা হইলে দুই বৎসর ধরিয়া এত চেষ্টায়ও কি তার কোনও সন্ধান মিলিত না! আর তাই যদি হয় এরূপ অভাবনীয় ঘটনাই বা হইবে কি প্রকারে?

মন্মথ অম্বালার মাঠের মধ্যে হাঁসপাতালে রোগে পড়িয়া, সে সংবাদই বা লক্ষ্মী পাইল কোথা হইতে, এবং এতদিনের পর এখানে আসিলই বা কি রকমে? না না, এ নিশ্চয় কোন্ দেবীর ছলনা! মন্মথ বিকারে লক্ষ্মীর কথা ভাবিতে ভাবিতে কি স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবে। 'কিন্তু—কিন্তু'—মন্মথ আবার ভাবিল, "কিন্তু, যে একবার সে মুখ দেখিয়াছে সে কি আর ভুলিতে পারে? সে তো লক্ষ্মী! যথার্থই লক্ষ্মী! আমারই লক্ষ্মী! হায় হায়! কেন তখন তাহাকে চিনিতে পারিলাম না! স্বপ্নে দেখিলাম তো কেন তাহাকে স্বপ্নেই জড়াইয়া ধরিয়া রাখিলাম না? কোথায়—কোথায় গেলে তুমি! লক্ষ্মি—লক্ষ্মি—লক্ষ্মি—" মন্মথ চীৎকার ছাড়িয়া উঠিল। নির্জ্জন গৃহে সে শব্দের প্রতিধ্বনি হইল মাত্র। কে তাহার ডাকে উত্তর দিবে? মন্মথ বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল।

সেই দিন মন্মথের মাতার একখানি পত্র আসিয়াছিল। বৃদ্ধা কয়েক দিন পুত্রের সংবাদ না পাইয়া ভাবিত হইয়া পত্র দিয়াছেন। মন্মথ উঠিয়া মাকে একখানি পত্র লিখিল। তাহাতে আপনার অসুখের কোন কথা লিখিল না। কাজের জন্য স্থানান্তরে যাইতে হইয়াছিল, এই জন্যই পত্র লিখিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া আসল কথা ভাঁড়াইল। আরও লিখিল "আবার আজই কাজের জন্য আবার স্থানান্তরে যাইতে হইবে, দুই এক মাস ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, হঠাৎ ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা নাই, অতএব তুমি ভয় করিও না। আমি যেখানে থাকি সর্ব্বদাই পত্র লিখিব। কিন্তু তুমি আর এখন চিঠি দিও না। কখন কোথায় থাকি তাহার ঠিক্ নাই, তোমার চিঠি না পাইবার কথা। আশীর্ব্বাদ করিও যেন যে কাজে যাইতেছি তাহা সিদ্ধ হয়।" পত্র ডাকে চলিয়া গেল। মন্মথ আজ মার কাছে এই প্রথম মিথ্যা কথা কহিল। সে পত্রে যাহা লিখিল তাহা ঠিক্ নহে।

পত্রের সবটা ঠিক্ না হইলেও কতকটা ঠিক হইল বটে। মন্মথ সে স্থানে আর রহিল না। সেই দিন শেষ রাত্রে যখন সবাই গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন, একাকী মন্মথ শয্যা হইতে উঠিয়া নিঃশব্দে বাটীর বাহির হইল। রেলপথে গেল না, হাঁটা পথে চলিল। তাও কোথায় যাইবে তাহার নিরূপণ নাই, দুই পা যে দিকে লইয়া চলিল সেই দিকেই যাইতে লাগিল। একটু গিয়াই বসিয়া পড়িল। আবার উঠিল, ধীরে ধীরে আবার চলিল। এইরূপ বসিতে বসিতে যাইতে লাগিল। তখনও তাহার শরীর বড় দুর্ব্বল!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

'ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ"—একি সেই কুরুক্ষেত্র? কৃষ্ণার্জ্জুনের লীলাভূমি, ভীমের ক্রীড়াস্থল, ভীষ্মদ্রোণ-কৃপকর্ণের রণপ্রাঙ্গণ, একি সেই কুরুক্ষেত্র? কুরুপাণ্ডবের চির-কলহের শান্তি হইয়াছিল সে কি এইখানে? এই কি অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার সমাবেশভূমি? মহাভারতের সে কুরুক্ষেত্র কি এই কুরুক্ষেত্র? কে বলিবে? কে চিনাইয়া দিবে? পাণ্ডার। দ্বৈপায়ন হ্রদ দেখায়, ভীষ্মের শরশিখাস্থল দেখায়, দ্রোণাচার্য্য যেখানে তাঁহার বিচিত্র ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন, অমানুষকীর্ত্তি ভীমসেন যেখানে দুঃশাসনের হৃৎপিণ্ড

বিদারিত করিয়া তাহার রক্তে আপনার অনন্ত প্রতিহিংসার সন্তর্পণ করিয়াছিলেন, বালক অভিমন্যুকে সপ্তরথী মিলিয়া যেখানে ঘিরিয়া বীরনামে চিরকলঙ্ক লেপন করিয়াছিল, অর্জ্জুনের সম্মুখে যে স্থলে কর্ণের রথচক্র প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল,—আরও কত বিষয়, একে একে বলিতে বলিতে পাণ্ডারা সেই সব স্থানের খিন্ন স্মৃতিচিহ্ন সকল দেখাইতে থাকে। কিন্তু তাহা শুনি ও দেখি মাত্র, স্পষ্ট চিনিতে তো পারি না। আমি কোন্ মূঢ়, আজ যদি ভীষ্মদ্রোণের প্রেতাত্মা গভীর সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া এই স্থানে একবার বিচরণ করেন, তাঁহারাও ইহাকে তাঁহাদের সেই কুরুক্ষেত্র বলিয়া চিনিতে পারিবেন কি না জানি না। কালের হস্তে যত হউক না হউক, বিজাতীয়ের হস্তে আমাদের সকল তীর্থস্থানেরই প্রায় এই দশা ঘটিয়াছে।

এখনও যাহা আছে তাহা দেখিলে বাস্তবিক রোমাঞ্চ হয়, হৃদয়ে সহসা ভক্তির উদয় হয়। কেবল মাঠ—ক্রোশের পর ক্রোশ কেবল মাঠ; আর সেই মাঠে ক্রোশের পর ক্রোশ কেবল পলাশ গাছ। ডালে ডালে পাতায় পাতায় সমাকীর্ণ হইয়া ছাইয়া রহিয়াছে। আর যখন সেই সব গাছে ফুল ফুটে, কি অপূর্ব্ব শোভা! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লোহিতবর্ণ পুষ্পে সে বিস্তীর্ণ প্রান্তর আলো হইয়া যায়। দূরস্থ পথিক সেই অনন্ত রক্তক্ষেত্র দেখিয়া শীহরিয়া উঠে, আজও কি সেই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর শোণিত-সঞ্চয়ের শুকায় নাই—তাহা ভাবিয়া ভয় পায়। কুরুক্ষেত্রে বিস্তর যাত্রী আসে। গয়াধামের ন্যায় হিন্দুরা এখানেও তাহাদিগের ঊর্দ্ধপুরুষের পিণ্ডদান করিয়া থাকে। শাস্ত্রে ইহা মহা পুণ্যতীর্থ বলিয়া কথিত।

এই কুরুক্ষেত্রে দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরস্থ এক পলাশ-মূলে বসিয়া এক সন্ন্যাসী ও এক সন্ন্যাসিনী। সন্ন্যাসীর বয়স ষাট পার হইয়া গিয়াছে, গাত্রলোম পর্য্যন্ত শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছে তার উপর ভস্মলেপ, কুঞ্চিত কপালে রক্তচন্দনের অর্দ্ধচন্দ্রস্তবক, গলায় রুদ্রাক্ষ, পরণে গেরুয়া বাস। সে বয়সেও এ বেশে কান্তি যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। দেখিলে ভক্তি হয়, আর একবার ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা যায়। তা, সন্ন্যাসীর বয়স এ আশ্রমের উপযোগী বটে, কিন্তু সন্ন্যাসিনী এ আশ্রমের নিতান্তই অনুপযোগিনী। তাহার বয়স আজও ষোলর সীমা অতিক্রম করে নাই। অপূর্ব্ব স্ত্রী। সে সন্ন্যাসিনী আর কেহই নহে, তাহারই সুশ্রূষায় মন্মথ সে প্রাণান্তকর ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, সূর্য্য পশ্চিমের পলাশ-শ্রেণীর অন্তরালে ঢাকিয়া পড়িয়াছিল। অনেকক্ষণ উভয়ে সেইখানে বসিয়া অনেক কথাবার্ত্তা হইতেছিল। আমরা তাহার মাঝখান হইতে দুই একটা কথা শুনাইতেছি।

সন্ন্যাসী বলিলেন "মা, তখনও বলিয়াছিলাম এখনও বলি, এ বড় কঠোর ব্রত, তুমি বালিকা, তোমার ইহা কাজ নয়।"

সন্ন্যাসিনী। আজও কি পিতা, আমার উপর সন্দেহ আপনার গেল না!

"সন্দেহ করি না, এ বয়সে তোমার অসাধারণ ধৃতি দেখিয়া অনেক সময়ে বিস্মিত হইয়াছি। কিন্তু—"

"তবে আবার কিন্তু কেন?"

"কিন্তু, মনে কর, আমি আর কত দিন? জীবন তো ফুরাইয়া আসিল। বড় পাপী বলিয়াই বিশ্বেশ্বর আজও চরণে স্থান দিতেছেন না, নহিলে আর বয়সের বাকি কি? কিন্তু বড় বেশি আর দেরি নাই। তারপর আমি ম'লে তোমার উপায় কি হবে? তোমার এই বয়স, আর এই কুটিল সংসার, একেলা এ ব্রত, কেমন করিয়া বজায় রাখিবে, মা?

সন্ন্যাসিনী শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। সত্যই ত! এ সকল কথা সে এতদিন ভাবে নাই। আজ হঠাৎ শুনিবামাত্র আকুল হইয়া পড়িল। সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। তাই ত! কি বলিবে স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। নির্ব্বাকে অধোমুখে বসিয়া রহিল।

সন্ন্যাসীর চক্ষে এক বিন্দু অশ্রুকণা দেখা দিল। বলিল "কথা শুন, এ আশ্রম পরিত্যাগ কর।"

"ইহা ত্যাগ করিয়া কি করিব?"

"আবার গৃহী হও।"

"সে আশ্রম যে আমার বন্ধ।"

"তা তো সব জানি, জগন্নাথের পথে যে দিন তোমার সহিত প্রথম দেখা সেই দিনই তো সব শুনিয়াছি; মনে করিয়াছিলাম, ভগবান্ তোমার একটা ব্যবস্থা করিলেন, নিশ্চিন্ত হইলাম; তুমি সুখে আছ ইহা ভাবিয়া ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে সচ্ছন্দে মরিতে পারিব। বিধাতা সবই করিয়াছিলেন, আমার মন্দভাগ্য দোষে শেষ বিপরীত হইয়া উঠিল।"

এইখানে বলা উচিত, এ সন্ন্যাসিনী ও সন্ন্যাসী অপর কেহই নহে সেই লক্ষ্মী ও তাহার পালক পিতা। লক্ষ্মী সেই রাত্রে যখন অঘোর ঘুমাইয়া পড়িল, তখন বিছানায় উঠিয়া বসিল। চাঁদের আলোয় একবার তাহাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিল, অতি সাবধানে পা দুটী ধরিয়া কতই কাঁদিল, তার পর নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া বাটীর বাহির হইয়া একাকিনী নির্জ্জন পথ বাহিয়া চলিল। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পড়িল। তখনও প্রভাত হয় নাই। দেখিল, অনেকগুলি স্ত্রীলোক একত্র দল বাঁধিয়া চলিয়াছে, তাহারা শ্রীক্ষেত্রে যাইতেছিল। বালিকার যাইবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না, একেলা কোথায় যাইবে তাহাই ভয়ে ভয়ে ভাবিতেছিল। সে তাহাদের সঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে চলিল। পথে যাইতে যাইতে তাহার বড় অসুখ হইল। সঙ্গীরা ফেলিয়া পলাইল। মাঠের মাঝখানে বালিকা একেলা পড়িয়া রহিল। কাছ দিয়া কত লোক যাতায়াত করিতেছিল, কেহ ফিরিয়া চাহিল না। অনেক কষ্টের পর একটু ঘুম আসিল। ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিল যে, এক মহাপুরুষ কোলে লইয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেছেন। সেই দিনেই অসুখ সারিয়া গেল। অসুখ সামান্যই হইয়াছিল। শ্রীক্ষেত্রে যত লোক অসুখে মরে তার অপেক্ষা ভয়ে চতুর্থাংশ লোক মরিয়া থাকে। লক্ষ্মী চিনিল, সে মহাপুরুষ তাহারই পিতা। তখন পিতায় কন্যায় সব কথা হইল। পিতা কলিকাতার কোলাহল হইতে বাহির হইয়াই সন্ন্যাসবেশ ধারণ করিয়াছিলেন। রথযাত্রার তখন অল্প দিন বাকি ছিল; আগে শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া তাহা দর্শন করিয়া পরে কাশী যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। কন্যার কথা শুনিয়া মনটায় বড়ই ক্ষোভ হইল। পরদিন লক্ষ্মী সন্ন্যাসিনীর বেশ ধারণ করিল। পিতার কন্যায় তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে

লাগিল। যে দিন তাহারা কুরুক্ষেত্র তীর্থে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার দুই দিন পরে এক দল বাঙ্গালী যাত্রী অম্বালা হইতে সেই খানে আসে। তাহাদের মুখে কথায় কথায় লক্ষ্মী শুনিল, মন্মথ নামে একজন বাঙ্গালী কলিকাতা হইতে অল্প দিন বদলি হইয়া অম্বালায় আসিয়াছে, তাহার বড় বসন্ত হইয়াছে, বোধ হয় রক্ষা পাইবে না. আহা! তাহার নাকি কেহই নাই। লক্ষ্মী শুনিয়া শিহরিল। এ কি তাহারি মন্মথ। পিতাকে আসিয়া বলিল। পিতাও চিন্তিত হইলেন। অম্বালা কুরুক্ষেত্রের খুব কাছে। যাত্রীরা রাত্রেই ফিরিল। সন্ন্যাসিনী পিতার অনুমতি লইয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গোপনে চলিল। আজ চারি দিন হইল অম্বালা হইতে সে ফিরিয়া আসিয়াছে।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধের পর সন্ন্যাসী আবার বলিলেন—"আর একবার সংসারের কাজে ব্রত হইতে হইল দেখিতেছি। চল, মা, তোমায় লইয়া অম্বালায় যাই। মন্মথকে আর একবার সব বুঝাইয়া বলিয়া আসি।"

"তিনি তো এ পর্য্যন্ত কিছুই ভুল বুঝেন নাই।"

"তা নহিলে, আজ তোমার এ দশা কেন, মা?

"এ দশা তিনি করেন নাই, আমিই নিজে করিয়াছি। বলিয়াছি তো, তিনি আমাকে ত্যাগ করেন নাই, আমিই তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি।"

"চল, আবার তাঁহার হাতে তোমাকে দিয়া আসি। মন্মথ তোমায় গ্রহণ করুন, দেখিয়া আমি নিশ্চিন্ত হই।"

"না পিতা, তিনি তো আমাকে আদরেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমার কপাল মন্দ, তা তাঁর দোষ কি? আমি তাঁহার অযোগ্য স্ত্রী!"

"তবে কি করিবি, মা? তোর চিন্তা মনে হলে ঈশ্বর-চিন্তাও যে আর আমার ভাল লাগে না।"

সন্ন্যাসী নিস্তব্ধ হইলেন, দুই বিন্দু অশ্রু কপোল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল। লক্ষ্মী তাহা দেখিল। আপনার উচ্ছ্বসিত অশ্রুবেগ সম্বরণ করিয়া বলিল—"চল, সেই বাঙ্গালী যাত্রীটীকে দেখিয়া আসি। আহা কি কষ্ট! রুগ্ন শরীর, তায় বিদেশ, তার উপর এই দুর্দ্দান্ত রোগ!"

তাহা শুনিবামাত্র সন্ন্যাসীর যেন চমক ভাঙ্গিল। কি মনে হইল। বলিলেন—"চল।"

উভয়ে ধীরে ধীরে সে গাছতলা হইতে উঠিল। তখনও সম্পূর্ণ সন্ধ্যা হয় নাই।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রাতঃকাল। এখনও রোদ উঠে নাই। প্রভাত বায়ু বহিয়া বহিয়া ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। ঘনপত্রবিন্যস্ত এক পলাশমূলে বসিয়া লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর ক্রোড়ের উপর মাথা রাখিয়া শয়ন করিয়া এক বৃদ্ধ। দূরে বসিয়া লক্ষ্মীর পিতা ইষ্টদেবতার নাম জপ করিতেছেন।

এই বৃদ্ধের কথাই পূর্ব্ব দিন লক্ষ্মী পিতাকে বলিয়াছিল। ইহার বিসূচিকা হইয়াছে। পাণ্ডারা আপনাদিগের ঘরে স্থান দিতে আর রাজি নহে। সঙ্গীরা বিস্তর জেদ করিয়াছিল, কিছুতেই স্বীকার পায় না। সঙ্গীরাও ছাড়িবে না; শেষ পাণ্ডারা ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনিয়া

রাখিল। সেখানে তাহাদেরই রাজত্ব, কে তাহাদের সঙ্গে হাঙ্গামা করিবে? বিশেষ সঙ্গীরা দেখিল, অবস্থা বড়ই খারাপ, তাহারা আর বড় উচ্চ বাচ্য করিল না। তাহাদের মধ্যে তাহার আপনার জন কেহই ছিল না। সন্ধ্যাবেলা লক্ষ্মী ও তাহার পিতা গিয়া দেখিল, বৃদ্ধ একাকী বাহিরে পড়িয়া, কাছে কেহই নাই। তখন উভয়ে ধরাধরি করিয়া এই নির্জ্জন স্থানে লইয়া আসিল। সঙ্গীদের মধ্যে কেহ কেহ দূর হইতে ইহা দেখিল। কিন্তু কেহ চুঁ শব্দটী করিল না। কেবল সন্ন্যাসিনীকে দেখিয়া পরস্পরে একবার মুখচাওয়া-চাওয়ি করিয়া তাহার রূপের কথা আন্দোলন করিতে লাগিল।

সমস্ত রাত্রি বেজায় ভেদ বমি হইল। বালিকা তাহা দুই হাতে কাটিতে লাগিল। মনে কিছুমাত্র বিকার নাই। সমস্ত রাত্রি সে নিদ্রা যায় নাই। সন্ন্যাসীও অনিদ্র থাকিয়া অনেক সুশ্রূষা করিতে লাগিল। রাত্রি এক রকমে কাটিয়া গেল। ভোর বেলা রোগীর একটু তন্দ্রা আসিল। প্রভাত-সমীর ঝির ঝির করিয়া বহিতেছিল, তাহার স্পর্শে শরীর যেন অনেক সুস্থ হইল, সে ঘুমাইয়া পড়িল। অনতিক্ষণ পরেই আবার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। আর একবার ভেদ হইল। বালিকা তাহা পরিষ্কার করিয়া আবার মাথাটী কোলে লইয়া বসিল। বৃদ্ধের তখন জ্ঞান হইয়াছিল, একবার মুখপানে চাহিয়া বলিল "তুমি কে, মা?"

"আপনার কন্যা।"

"আমার কন্যা!"—দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধ আবার চক্ষু বুজাইল। সে চক্ষে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। লক্ষ্মী আর কিছু বলিল না। ধীরে ধীরে পলাশ-পত্র লইয়া বীজন করিতে লাগিল।

দূর হইতে সন্ন্যাসী ইহা দেখিল। বৃদ্ধের চক্ষে অশ্রুবিন্দু পর্য্যন্ত সে লক্ষ্য করিল। আজ কয়দিন ধরিয়া সে লোকটাকে চেন চেন করিতেছে অথচ চিনিয়া উঠিতে পারিতেছে না। সন্ন্যাসী সব দেখিল। মনের ভিতরে অনেক কথা তোলাপাড়া হইতে লাগিল।

তিন দিন সেই গাছতলায় কাটিয়া গেল। তিন দিনের পর বৃদ্ধ আরোগ্য হইয়া উঠিল। লক্ষ্মী পথ্য রাঁধিয়া দিল। বৃদ্ধ আহার করিল। তখন বালিকা তাহার সঙ্গীদিগকে সংবাদ দিতে গেল।

বালিকা চলিয়া গেলে সন্ন্যাসী বৃদ্ধের কাছে আসিয়া বসিল। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসিল "আপনি কে বাবা? এ মেয়েটী আপনার কে?"

স। আমি সন্ন্যাসী, এটী আমার কন্যা।

বৃ। সার্থক পিতা আপনি, অনেক পুণ্যফলে সাক্ষাৎ ভগবতী আপনার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

স। কন্যাটী আমার ঔরসজাতা নহে, পালিতা।

বৃ। পালিতা!

বৃদ্ধ অন্যমনস্ক হইল। বলিল—"কতদিন ইহাকে পালন করিতেছেন?"

স। দুই বৎসরের সময় ইহাকে পাইয়া ছিলাম।

বৃ। দুই বৎসরের সময়!

আবার বৃদ্ধ মনে মনে কি ভাবিতে লাগিল। বলিল "কে ইহাকে আপনার হাতে দিয়াছিল?"

স। ভগবান্ দিয়াছিলেন। কাশীতে ইহাকে আমি পাইয়াছিলাম।

বৃ। কাশী! কি বলিলেন,—কাশীতে?

স। আজ্ঞে হাঁ। তা, আপনি অমন করিতেছেন কেন?

বৃদ্ধ কোন উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস মর্ম্মের কথা প্রকাশ করিয়া দিল। সন্ন্যাসীর সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইল। মনে মনে বলিল—"আহা, ভগবন্, তাই হউক।" প্রকাশ্যে বলিল—"আপনি কখন কি কাশী গিয়াছিলেন?"

বৃদ্ধ সে প্রশ্ন শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। ক্ষণেক কিছু উত্তর দিতে পারিল না। সন্ন্যাসীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিল। তার পর দুই গণ্ড বহিয়া চক্ষের জল গড়াইয়া পড়িল। দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিল—"কাঁদিতেছেন কেন?"

এইবার বৃদ্ধ উত্তর করিল। বলিল—"কাঁদিতেছি কেন! তাহা কি বলিব? আজ চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া কাঁদিতেছি, তবু তো এ কান্না ফুরাইল না। যখনি সে কথা মনে হয়, তখনি বুক যেন ফাটিয়া যায়। তুমি সন্ন্যাসী, তোমায় তাহা বলিয়া কি বুঝাইব? বিশ্বেশ্বর দয়াময়, যে বলে, সে তাহা বলুক, কিন্তু তাঁহার মত নির্দ্দয় আমি আর কোন দেবতাকে জানি না। কাশীর নাম আর—"

বাধা দিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—"অমন কথা মুখে আনিতে নাই। আমরা পাপী তাই তাঁহার দয়া সকল সময় বুঝিয়া উঠিতে পারি না।"

বৃদ্ধ রাগিয়া উঠিল। সে অচির-রোগমুক্ত ভগ্ন দেহ কোপে কাঁপিতে লাগিল। বলিল "মাঝ-গঙ্গায় স্ত্রীপুত্র লইয়া অসহায় অবস্থায় নৌকা ডুবিয়া মরাও কি তাঁহার দয়ার কাজ!"

সন্ন্যাসী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। মনে মনে হর্ষের উদয় হইল। তাহা চাপিয়া রাখিয়া বলিল—"তিনি দয়াময়, আমাদের পাপের দণ্ড করিয়াও তিনি তাঁহার দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। আজও যে এ পৃথিবীতে পুণ্যের কিছু মাত্র আদর আছে সে কেবল পাপের দণ্ডের ভয়ে।"

বৃদ্ধ আরও রাগিল। বলিল—"কিন্তু দুই বৎসরের শিশু কি পাপ করিয়াছিল, যে তাহারও সেই দণ্ড ব্যবস্থা হইল।"

স। শিশুর নিষ্পাপ শরীর, তিনি তাহাকে অমন দণ্ড দেন না।

বৃ। দেন না! তবে আর বলিতেছি কি?

স। আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা বুঝিয়াছি। ইহাতেও তাঁহার অসীম দয়ার প্রকাশ। শিশু পাছে পাপীর সংস্পর্শে থাকিয়া বিগ্‌ড়াইয়া যায়, এই জন্য কৌশলে তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন মাত্র। শিশু মরে নাই।"

বৃদ্ধ বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে একবার সন্ন্যাসীর দিকে চাহিল। যেন তাহার কথা বুঝিতে পারিল না। চাহিয়া চাহিয়া বলিল—"আপনি কিসে জানিলেন, শিশু মরে নাই!"

স। তাহার প্রমাণ, এই কন্যা।

"এই কন্যা!—এ কি আমার সেই হারাধন!" বৃদ্ধ আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িল। চক্ষে জলধারা ছুটিল। একবার আকাশের দিকে চাহিয়া স্বর্গীকৃতা ব্রাহ্মণীর জন্য বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে ডাকিল—"ব্রাহ্মণি

ব্রাহ্মণি! কোথায় তুমি, একবার আসিয়া দেখিয়া যাও, তোমার হারান রতন পাওয়া গিয়াছে!" ব্রাহ্মণের আর কথা ফুটিল না। বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।

সুখ দুঃখের মুগপৎ প্রথম উচ্ছ্বাস প্রশমিত হইলে সন্ন্যাসী তখন ধীরে ধীরে পূর্ব্বকাহিনী সমস্ত বলিতে লাগিলেন।

স্থির হইয়া বসিয়া ব্রাহ্মণ সমস্ত কথা শুনিল। সন্ন্যাসীর কথা সমাপ্ত হইলে, তিনি দেখিলেন, ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি তখন ভয়ানক। চক্ষু রক্তবর্ণ, তাহার অগ্রভাগে দুই বিন্দু অশ্রু ঝুলিতেছে, ঘন ঘন দীর্ঘ শ্বাসে নাসিকা অবিরত স্ফীত হইতেছে, অধরপ্রান্ত দন্তে দন্তে নিষ্পেষিত হইতেছে, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘাম গড়াইয়া পড়িতেছে; নীরব, নিঃস্পন্দ, নিশ্চল। জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায়, বিদারণোন্মুখ আগ্নেয় ভূধরের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। সে স্তব্ধতা অতি ভীষণ। দেখিয়া সন্ন্যাসী শিহরিল। কতক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ আপনার কপালে করাঘাত করিয়া বলিল—"আমি বড় পাপী—বড় পাপী! বিশ্বেশ্বর আজও আমার পাপের উচিত দণ্ড দেন নাই। হায় হায়, আমার জননীকে আমি নিজেই এত কষ্ট দিয়াছি! বিশ্বেশ্বর! ভালই করিয়াছিলে, ইহাকে এ পাপীর সংস্পর্শ হইতে পৃথক্ করিয়াছিলে; শেষ আবার তাহার পাপনিশ্বাসের নিকট ইহাকে কেন আনিলে ঠাকুর! মা আমার যথার্থই লক্ষ্মী। এমন মেয়েও কি হয়! ছি ছি! আমিই তাহার যত দুঃখের মূল! হুতাশনেও যে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না।"

সন্ন্যাসী অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিল। আর, ব্রাহ্মণ বিলাপ করিতে করিতে কখন কপাল কখন বক্ষঃস্থল দুই হাত দিয়া চাপড়াইতে লাগিল।

এ ব্রাহ্মণ আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত সেই ন্যায়সিদ্ধান্ত। ন্যায়সিদ্ধান্তই লক্ষ্মীর প্রকৃত পিতা।

দশম পরিচ্ছেদ।

নিবিড় পলাশশ্রেণীর মধ্যে একখানি জীর্ণ কুটীর। সেই কুটীরের ভিতর পত্র শয্যায় শুইয়া লক্ষ্মী। আর পাশে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নিস্তব্ধে বসিয়া সন্ন্যাসী ও ন্যায়সিদ্ধান্ত। লক্ষ্মীর বিসূচিকা হইয়াছে। একদিনেই সে স্বর্ণলতা শুকাইয়া গিয়াছে। সে কুন্দ কমল বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তবুও সে আনন্দময়ীর মুখে হাসিখানি যেন এখনও লাগিয়া রহিয়াছে। সন্ন্যাসী কাঁদিতেছেন, ন্যায়সিদ্ধান্ত কাঁদিতেছেন, বালিকা সে অবস্থায়ও সেই স্বভাবমধুর স্নিগ্ধ বাক্যে তাহাদিগকে বুঝাইতেছেন। সন্ন্যাসী নীরবে রোদন করিতেছেন; আর ন্যায়সিদ্ধান্ত স্ত্রীলোকের ন্যায় কখন হায় হায় করিতেছে, কখন দেবতার নিকট মাথা কুটিতেছে, কখন কপালে করাঘাত করিতেছে। ন্যায়সিদ্ধান্তের সঙ্গীরা সকলই শুনিয়াছে, তাহারাও দেখিতে আসিয়াছে। লক্ষ্মীর আগাগোড়া অপূর্ব্ব কাহিনী স্মরণ করিয়া তাহারাও কাঁদিতেছে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা যতই যাইতেছে, লক্ষ্মীর অবস্থা ততই খারাপ হইতেছে। চোখ বসিয়া গিয়াছে, মুখ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সোণার অঙ্গে নীল মাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু তবু সে ঠোঁটের হাসি মিলায় নাই। অপরাহ্ণে লক্ষ্মী সন্ন্যাসীকে ডাকিল

"পিতা!" সন্ন্যাসী কাছে আসিয়া বলিলেন "কেন, মা?"

ল। পায়ের ধুলা দাও, আর আমার বেশি দেরি নেই।

সন্ন্যাসী আর থাকিতে পারিলেন না। উচ্চৈঃস্বরে পাগলের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন।

লক্ষ্মী বলিল, "কাঁদিও না, কোথায়?

সি। এই যে মা, আমি তোমার কাছে।

সিদ্ধান্ত বালিকার মুখের কাছে মুখ আনিল। লক্ষ্মী কি বলিতে গেল, পারিল না। একবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। দেখিয়া সিদ্ধান্ত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "ভয় কি মা, এখনি সারিয়া উঠিবে।"

ল। বাবা, এত দিনের পর তোমার দেখা পাইলাম; কিন্তু বড় আক্ষেপ রহিল, ভাল করিয়া একদিনও তোমার সেবা করিতে পারিলাম না।

সি। আমারই সেবা করিয়াই তো মা তোমার আজ এই দশা হইল। হায়, হায়, পাণ্ডারা যখন আমায় ফেলিয়া দিয়াছিল তখনই কেন আমি মরিলাম না? কেন মা, কুড়াইয়া আনিয়া এ হতভাগাকে বাঁচাইলে! আমায় বাঁচাইতেই যে আজ তোমার আপনার প্রাণ গেল। নহিলে তোমার এ রোগ কেন হইবে? আমা হ'তে যতদূর কষ্ট হবার তা ত সব হইয়াছে, শেষ প্রাণেও মারিলাম!

সিদ্ধান্ত উন্মত্তের ন্যায় আপনার বুক চাপড়াইতে লাগিল। তাহার মনের ভাব তখন অতি ভয়ানক। মর্ম্মের পরতে পরতে শত-বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা জ্বলিতেছে, মাথার উপর কে যেন তীব্র অঙ্কুশ আঘাত করিতেছে,—বড় জ্বালা,—বড় জ্বালা! সেই মৃত্যুমুখপতিতা বালিকার প্রতি যতই দেখিতেছে, ততই যেন সে জ্বালা আরও বাড়িয়া উঠিতেছে। একে একে সব কথা মনে পড়িতেছে। সেই রামহরির আটচালার সেই ভীষণ দলাদলির কথা। সে চক্রান্তের সেই যে একমাত্র মূল! তাহারা তো কেহ কিছু বলে নাই, বরং তাহার কথায় আরো অনেক বাধা দিয়াছিল। চন্দ্রনাথ কটু বলিতেও বাকি রাখে নাই। হায় হায়! দলাদলির কি মোহ, কি নেশা, কি সর্ব্বনেশে উত্তেজনা, কাহারও কথা যে তখন মনে লাগে নাই। তাহারই জন্যইতো আর আর সকলে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সে তো বেশি দিনের কথা নয়। সিদ্ধান্ত সে দৃশ্য এখনও যেন চোখের উপর দেখিতেছে। সিদ্ধান্ত কপালে করাঘাত করিতে লাগিল। মনে মনে বলিল—'হায় হায় কি করিয়াছি, দলাদলির মোহে অন্ধ হইয়া আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিয়াছি। হিংস্র পশুরাও আপনার শাবকদিগকে যত্নে রক্ষা করে, আমি নরাধম, পিতা হইয়া কন্যাহত্যা করিলাম! ভগবন, এ তোমারই খেলা, তোমারই দণ্ড!" সিদ্ধান্ত হায় হায় করিতে করিতে আবার আপনার বুক চাপড়াইতে লাগিল।

লক্ষ্মী বলিল—"বাবা, কেন দুঃখ কর। সুখ দুঃখ সকলই অদৃষ্টের কাজ। আমার অদৃষ্টে সুখ নাই তুমি কি করিবে?"

"আ মরি মরি—এমন মেয়েও কি আর জন্মায়!" সিদ্ধান্ত উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। একজন আসিয়া তাহাকে ধরিয়া সরাইয়া বসাইল।

তখন সূর্য্য ডুবিয়া আসিতেছিল, কিরণ-

ওলা ছুটাছুটি করিয়া লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিল। দিগ্‌ভ্রান্ত একটা কিরণ লক্ষ্মীর মুখের উপর পড়িয়া ঝিক্‌ মিক্‌ করিতেছিল। যেন এ লক্ষ্মী তাহার সে লক্ষ্মী নয় মনে করিয়া কিরণ ত্রস্তে সে গৃহের বাহির হইবার পথ খুঁজিতেছিল। সহসা দরজায় কিসের শব্দ হইল। গৃহস্থিত সকলে সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, মন্মথ। দীর্ঘকায় শুষ্কমুখ হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ করিল, মন্মথ।

মন্মথকে দেখিবামাত্র সিদ্ধান্ত উচ্চে কাঁদিয়া উঠিল। বলিল—"আর কি দেখিতে আসিয়াছ, মন্মথ! মা আমার ছাড়িয়া যায়।"

মন্মথ! কথাটা লক্ষ্মীর কানে বাজিল। তখন শেষ হইয়া আসিয়াছিল, চোখের পাতা বুজিয়া আসিতেছিল; তবু সে সময়েও জোর করিয়া লক্ষ্মী একবার চোখ খুলিয়া চাহিল। সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিস্পন্দ নির্ব্বাক্‌ হতবুদ্ধি মন্মথ-মূর্ত্তি। স্থির হইয়া বালিকা সে মূর্ত্তি দেখিল। একবিন্দু অশ্রু চোখের কোণে গড়াইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ আবার অধর-প্রান্তে হাসির বিদ্যুৎলতা দেখা দিল। ধীরে ধীরে ধীরে সে হাসি মিলাইয়া গেল। ধীরে ধীরে ধীরে চোখের পাতা বুজিয়া আসিল।

উন্মাদের ন্যায় বিকৃত কণ্ঠে মন্মথ ডাকিল —"লক্ষ্মি—লক্ষ্মি—লক্ষ্মি!"

আর কোনও লক্ষ্মী সে ডাকের উত্তর দিল না।

সমাপ্ত।

ছোট ছোট কবিতা।

অনন্ত রোদন।

চির দিন—চির সেই হাহাকার ধ্বনি,
গভীর নিশীথে জাগে করুণ ক্রন্দন,
জীবনে জীবিত সদা জীবের রোদন,
শতঘাতে প্রতিদিন মূর্চ্ছিত ধরণী;
কেন রে কিসের তরে আকাশ, অবনী
বহে এই চিরন্তন দুখের কল্লোল?
মরমর শুষ্ক কণ্ঠে আধ উতরোল,
আশা-হীন, ভাষা-হীন অশ্রুর কাহিনী!

দেখিয়া এ জীবনের অনন্ত রোদন,
ব্যথিত কাতর ক্লিষ্ট পীড়িত সবারে
সাধ যায় কেড়ে আনি—বিপুল জীবন
দাঁড়াই হিমাদ্রি সম দুঃখের সংসারে!
কেড়ে নেই মানবের অসীম বেদন,
একা বুঝি, একা যুঝি দুরন্ত পাথারে।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

রূপের সাগরে।

বল অসার অনিত্য রূপের সাগরে,
প্রাণ, কেন তুমি ডুবিতে চাও?
কেন বাসনা করিয়ে সংসার-পাথারে
আপনা আপনি হারায়ে যাও!
অনন্ত দুর্লভ জীবন তোমার,
হৃদয় তোমার সাধের ভাণ্ডার,
তবে কি সুখের তরে—কোন্ প্রয়োজনে
সাধের সর্ব্বস্ব বিষাদে দাও।

কেন বাসনা করিয়ে সংসার-পাথারে
আপনা আপনি হারায়ে যাও !

হেথা ল'য়ে অশ্রুজল হৃদয়ের সাথী,
করুণার গান গেয়ে দিবারাতি,
পাবে না সুফল—হবে না যে কিছু,
কেন বিফলে জীবন কাটায়ে দাও !
বল অসার অনিত্য রূপের সাগরে
প্রাণ, কেন তুমি ডুবিতে চাও !

হেথা কে বুঝে কাহার প্রাণের মমতা,
কে করে কাহার দুখের শমতা,
কে যে কাঁদে ব'সে কার তরে হেথা
কে জানে, কে বুঝে, মিছে কেন তবে
ভেবে এ ঘোর ভাবনা যাতনা পাও !
কেন বাসনা করিয়ে সংসার-পাথারে
আপনা আপনি হারায়ে যাও।

স্বপনের খেলা, স্বপনের হাসি,
কানে বাজে শুধু স্বপনের বাঁশী,
উদাস পরাণ শুনিতে ও গান
আকুল হইয়ে কেবল ধাও !
অসার অনিত্য রূপের সাগরে
প্রাণ, কেন তুমি ডুবিতে চাও !

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

আধ-খানা।

কি এক স্বপন-ঘোর নরম-আঁধারে গো,
অজানা বিরহ-তাপে আকুল নিশ্বাস !
প্রফুল্ল যৌবন-বনে সুখদ বসন্ত-দিনে
কার স্মৃতি ব'হে আনে কুসুম-সুবাস !
তটিনী তটের কূলে ব'হে যায় দুলে দুলে
ঘুমন্ত পরাণ চাহে মেলিতে নয়ান !
কোন্ দেশে কোথাকার মনে পড়ে বার বার
চেন চেন, আধ মুহু, মোহাগের গান !
জোছনার রাশি রাশি উছলি এসেছে হাসি,
পিছায়ে র'য়েছে কোথা তার প্রেম-সুখ !
এই দেখি এই দেখি, আঁখিতে না মিলে আঁখি
আকুল উচ্ছাস ভরে কেঁপে ওঠে বুক !

সুনীল দিগন্ত হ'তে আরেক দিগন্তে পাখী
উড়ে যায়—গেয়ে যায় গান ;
বুঝিতে পারি না, হায়, কি সম্বাদ দিয়ে যায়,
উদাস হইয়া যায় প্রাণ !
মরমরি লতা পাতা, মৃদু মৃদু কার কথা
কহে যেন বাতাসেতে দুলে ;
কে যেন আমারে চায় তারে ভুলে গিয়ে হায়
ঢেউ গণি সমুদ্রের কূলে।
আকাশের পানে চাই, তারা-গুলি আছে চাই,
জেগে কারে দিতেছে পাহারা !
প্রকৃতি চলেছে গাই, পাছে পাছে যেতে চাই
আগে সিন্ধু—না পাই কিনারা।

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

সুশ্রুত-সংহিতা। *

এই পুস্তকখানি প্রচারিত হইয়াছে দেখিয়া, যারপর নাই আনন্দিত হইলাম এবং সুশ্রুত-সংহিতার পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইলাম। তদনুসারে আমরা এ বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। সেই অনুসন্ধানের ফল নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

* শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন ও শ্রীচন্দ্রকুমার কবিভূষণ কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

(ক) কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের সাংস্কৃত চিকিৎসা বিদ্যার অধ্যাপক প্রাতঃস্মরণীয় মধুসূদন গুপ্ত মহাশয় ১৭৫৭ শকে (১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে) দেবনাগর অক্ষরে অতি সুন্দররূপে সুশ্রুত-সংহিতার মূল মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। তাঁহা কর্ত্তৃক প্রচারিত পুস্তক খানি যেরূপ বিশুদ্ধ, তদনুরূপ উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত। ক্বচিৎ দুই একটী বর্ণাশুদ্ধি ভিন্ন তাহার অন্য কোনই দোষ পরিদৃষ্ট হয় না।

(খ) ইহার ঊনত্রিংশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৯৬ শকে (১২৮০ সালে) শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র বসাক বড় বড় অক্ষরে নিকৃষ্ট কাগজে অশুদ্ধি-পরিপূর্ণ এক খানি সুশ্রুত প্রকটিত করেন। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থ, মধুসূদন গুপ্তের প্রচারিত গ্রন্থ অপেক্ষা উত্তম হওয়া দূরে থাকুক, নিতান্ত অবন্যই হইয়াছে। ইহাতে যথাস্থানে ছেদ নাই, দাঁড়ি প্রভৃতি চিহ্নেরও শৃঙ্খলা নাই।

(গ) অতঃপর সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণাধ্যাপক পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতির পুত্র শ্রীযুক্ত জীবানন্দ ভট্টাচার্য্য (বিদ্যাসাগর) বি, এ. ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে (১২৮০ সালে) ভাল কাগজে ছোট ছোট অক্ষরে উহার তৃতীয় বার মুদ্রাঙ্কণ করেন। ইহা ভুবনচন্দ্র বসাকের পুস্তক অপেক্ষা অশুদ্ধি প্রভৃতি নানা-অংশে হেয় ও অশ্রদ্ধেয়। কেন না, ইহাতে মূলের অনেক স্থান পরিত্যক্ত হইয়াছে। শীর্ষক (হেডিং), ছেদ (প্যারাগ্রাফ), দাঁড়ি প্রভৃতি চিহ্নগুলি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। স্থল-বিশেষে যে বৈবাৎ চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাও আবার নিতান্ত অযথা স্থলেই বিরাজ করিতেছে।

(ঘ) ১৭৯৫ শকে (১২৮০ সালে) অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সুশ্রুত সংহিতার বাঙ্গালায় প্রথম বার অনুবাদ মাত্র প্রকটিত হয়। স্থলে স্থলে উহার অনুবাদ প্রকৃত হয় নাই। সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য পারিভাষিক, সাংকেতিক ও সংক্ষিপ্ত পদগুলির ব্যাখ্যা করা হয় নাই। ঐ সালের মুদ্রিত পুস্তকে বর্ণাশুদ্ধিও ছিল। সম্প্রতি উহার যে দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে, তাহাতে অধিক অশুদ্ধি নাই বটে, কিন্তু মধুসূদন গুপ্ত প্রভৃতির গ্রন্থাদি-রূপ উপকরণ-সামগ্রী প্রাপ্ত হইবার পরে যেরূপ গ্রন্থ লোকে প্রত্যাশা করিয়া থাকে, ইহা তদ্রূপ হয় নাই; কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে নিতান্ত নিন্দা করা যায় না।

(ঙ) ১২৮৭ সালে কুমিল্লা হইতে শ্রীযুক্ত হরিমোহন সেন গুপ্তের যত্নে বাঙ্গলা অক্ষরে মূল, ডল্লনাচার্য্য-প্রণীত সংস্কৃত টীকা ও অনুবাদ প্রকটিত হইতে থাকে। জীবানন্দের ন্যায় ইহার মূল ভাগে কোন কোন শব্দ পরিবর্জ্জিত হইয়াছে এবং কোন কোন স্থানে অশুদ্ধ পদও বিরাজিত রহিয়াছে। পদ-যোজনা-বিষয়ে বিলক্ষণ দোষ রহিয়া গিয়াছে। বর্ণাশুদ্ধির তো কথাই নাই। এই পুস্তকে ডল্লনাচার্য্যের টীকার বৃত্তান্ত আমরা সবিশেষ অবগত আছি। পণ্ডিত-প্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের আন্তরিক চেষ্টায় ও বহুশ্রমে সংগৃহীত পুস্তকের সাহায্যেই উহা মুদ্রাঙ্কিত হইতে থাকে। দীনবন্ধু বাবু কাশ্মীররাজের পুস্তকালয় হইতে পুস্তক আনাইয়া এক বৎসরাধিক-কাল-গত পরিশ্রম ও অশেষ যত্ন সহকারে নিজ হস্তে তাহার প্রতিলিপি সমাপ্ত করেন। আমরা দীনবন্ধু বাবুর সঙ্কলিত

সেই মূল প্রতিলিপি দেখিয়াছি। সেই টীকার যে যে অশুদ্ধি পরিলক্ষিত হয়, কবিমোহন সেন গুপ্তের মুদ্রিত টীকায় তদপেক্ষা অধিক অশুদ্ধি আছে। পদ-যোজনা, পরিচ্ছেদ-বিভাগ, দাঁড়ি প্রভৃতি চিহ্নের ব্যবহার নাই, বলিলেই হয়। মূল সংস্কৃত ও ভাষান্তর পরস্পর বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। গুণের মধ্যে বড় বড় অক্ষরে অনুবাদটী মুদ্রিত। এইরূপ দুরবস্থাপন্ন করিয়াও, প্রকাশক মহাশয়, পুস্তকখানি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

(চ) সার্জন উদয়চাঁদ দত্ত ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বিব্‌লোথিকা ইণ্ডিকার (Bibliotheca Indica) সাহায্যে ইংরেজী ভাষায় উহার দুই তিন খণ্ড প্রচার করেন। তিনি নিজে সংস্কৃতজ্ঞ নহেন, সুতরাং তাঁহাকে পরের সাহায্যাপেক্ষী হইতে হয়। দুঃখের বিষয় এই যে, যে লোকের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া ভাষান্তর-কার্য্য সম্পাদিত হইতেছিল, তিনিও আবার স্বয়ংসিদ্ধ নহেন,—তিনিও পরমুখাপেক্ষী লোক ছিলেন বলিয়া, ঐ গ্রন্থখণ্ড আশানুরূপ উৎকৃষ্ট হয় নাই।

প্রথমতঃ।—সুশ্রুত-সংহিতা-সম্বন্ধে এই সকল উপাদানাবলী বিদ্যমান আছে। ইহাদের পরবর্ত্তী শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার কবিভূষণ কর্ত্তৃক প্রচারিত সুশ্রুত সংহিতা গ্রন্থ এই উপাদান-সাহায্যে কেমন অপূর্ব্ব ও উপাদেয় দ্রব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাই এ স্থলে একবার আলোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এই পুস্তক-সম্বন্ধে অন্যান্য কয়েকটী পত্রিকায় ইহার সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে,* কিন্তু তাহাতে সমস্ত গুণাগুণ উল্লিখিত না হওয়ায় এই সমালোচনা লিখিত হইল।

১। "ঔপধেনব বৈতরণ, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত, করবীর্য্য, গোপুর রক্ষিত ও সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষিগণ ধন্বন্তরির সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, ভগবন্! মানবগণ শারীরিক, মানসিক, আগন্তুক ও স্বাভাবিক নানাবিধ রোগে অভিভূত হইয়া অনাথ দীন হীনের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতেছে।"

(১ পৃষ্ঠা।)

এই ৪ চারি প্রকার রোগ-বিভাগ-বিষয়ে ভল্লনাচার্য্যের টীকায় দেখা যায় যে, এস্থলে মূলের মধ্যে "স্বাভাবিক রোগের" উল্লেখ থাকিবার আবশ্যকতা নাই।† কারণ, তাহা অপর বিশেষণ দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে।

---

* সারস্বত পত্র, ১২৯১ সাল, ৯চৈত্র। সোমপ্রকাশ, ১২৯১, ২৫চৈত্র। আয়ুর্ব্বেদ সঞ্জীবনী ১খণ্ড, ৪সংখ্যা। প্রভাতী, ১২৯১, ২৯ ফাল্গুন, ৪ চৈত্র ও ১৫চৈত্র। সঞ্জীবনী, ১২৯২ ১৬চৈত্র।

† "স্বাভাবিকানামত্রাগ্রহণমস্মিন্ শাস্ত্রে তৎপ্রতিকারস্যাপ্রাধান্য-সূচনার্থং। অথবা-অনন্চ প্রাণযাত্রার্থমিত্যত্রৈবাবরোধাচ্চ। ঋষীণাঞ্চ শারীর-মানসাগন্তু-ব্যাধ্যসম্ভবাৎ কেবলং স্বভাব-ব্যাধি নিষেধেনৈব প্রাণযাত্রাভিপ্রেতা।"

[ভল্লনাচার্য্যের টীকা।]

এই শাস্ত্রে স্বাভাবিক রোগ প্রতীকারের অপ্রাধান্য সূচনার জন্য এ স্থলে স্বাভাবিক রোগ গৃহীত হয় নাই; অথবা "আমাদের (ঋষিদের) প্রাণযাত্রার নিমিত্ত" এই অংশেই স্বাভাবিক রোগ পরিগৃহীত হইয়াছে বলিয়া ইহার আর পৃথক্ উল্লেখ হয় নাই। ঋষিদের শারীরিক, মানসিক ও আগন্তুক ব্যাধি সম্ভবিবার সম্ভাবনা নাই। কেবল স্বাভাবিক রোগের প্রতীকার হইলেই তাঁহাদের প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ হয়।

এইরূপ লিপি থাকিতেও মূলের মধ্যে স্বাভাবিক রোগের উল্লেখ দেখিয়া, মুদ্রাঙ্কণকারী মহাশয়গণ যে এ সকল বিষয় চিন্তা করিয়াছেন, তাহা প্রতীত হয় না। "বম্বে ও বারাণসী প্রভৃতি নানা স্থানে পর্য্যটন" পূর্ব্বক "টীকার অনেকাংশ সংগৃহীত" করিয়া বুঝি এই দুর্দশা হইল!

২। "শল্যতন্ত্র শব্দের অর্থ অস্ত্র-চিকিৎসা শাস্ত্র। কারণ, শল্য শব্দের অর্থ—অস্ত্র, এবং তন্ত্রশব্দের অর্থ—শাস্ত্র। সুতরাং অস্ত্র-বিষয়ক শাস্ত্রের নাম শল্যতন্ত্র।" (২ পৃষ্ঠা)

সুশ্রুতের সূত্রস্থানের ২৬ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে যেরূপ লিখিত আছে, তদনুসারে শরীরের মধ্যে যে সকল শর প্রভৃতি বিদ্ধ হয়, তাহাই এই শাস্ত্রের মতে শল্য। এবং তাহাই উহার প্রকৃত অর্থ। চিকিৎসা করিবার অস্ত্রকে শল্য বলে না।*

৩। "তাঁহাদের প্রার্থনামতে অশ্বিনী-দ্বয়ও ছিন্ন-মস্তক দেহে যোজন করিয়া দিলেন।

"ইহার উপায় ও যোগ সমস্ত আশুফল-প্রদ বলিয়া, এবং যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নি প্রস্তুত করিবার উপায় আছে বলিয়া অষ্টাঙ্গ মধ্যে শল্যতন্ত্রই অধিকতর আদরণীয়।" (৬পৃঃ)

এ স্থলে মূলের মধ্যে প্রণিধান শব্দ দেখা যায়। উহার অর্থ—প্রয়োগ। "প্রস্তুত" কখনই হইতে পারে না। কারণ, অগ্নি প্রণিধান-স্থলে চকমকি ঝাড়িয়া বা দেসালাই ঘসিয়া অগ্নি প্রস্তুত করিবার বৃত্তান্ত আয়ুর্ব্বেদ বলিতেছেন, এ কথা কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই বলিবেন না।

৪। "পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও আত্মা এই সমবেত ছয়টী ধাতুকে পুরুষ কহে।"

পুরুষ শব্দের নানা অর্থ। সাহিত্যে যে অর্থ, ব্যাকরণে তাহার বিপরীত; সাঙ্খ্য-দর্শনে একরূপ অর্থ, চিকিৎসা-শাস্ত্রে অন্য রূপ। এরূপ স্থলে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রণালী অবলম্বন করিয়া সতর্কতা সহকারে বলিতে হইলে, এই প্রকার নির্দ্দেশ করাই বিধেয় ছিল যে, 'এই সমবেত ছয়টীকে চিকিৎসা-শাস্ত্রে পুরুষ কহে।' এই নিমিত্তই মূলে "অস্মিন্ শাস্ত্রে" (এই শাস্ত্রে) এইরূপ পদের প্রয়োগ আছে।

৫। তৎপরে অনুবাদকগণ বলিতেছেন,—

"উক্ত পুরুষ স্থাবর ও জঙ্গম-ভেদে দুই প্রকার।" (৭ পৃষ্ঠা)

এ স্থলে এই অনুবাদ নিতান্তই ভ্রমাত্মক। পুরুষ দুই প্রকার লিখিত নাই, সমস্ত জগৎ দুই অংশে বিভক্ত, তাহাই লিখিত আছে।*

৬। "সেই স্থাবর ও জঙ্গমে অগ্নি ও সোমগুণ অধিক আছে বলিয়া, স্থাবর আগ্নেয় এবং জঙ্গম সৌম্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।" (৮ পৃঃ)

এ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ-সঞ্জীবনী † বলিয়াছেন,—"জগতের যাবতীয় পদার্থ আগ্নেয়, এবং যাবতীয় জঙ্গম পদার্থ সৌম্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা, আয়ুর্ব্বেদ-পাঠীর কথা দূরে থাকুক, এক জন সাধারণ লোকের পক্ষেও সম্ভব নহে। বস্তুতঃ পদার্থ-সমূহকে সোম-

---

* "শল্য শল্য আগমনে ঘঞ্, তস্য শলাদিতি রূপং।" * * * "অধিকারো হি লোহ-বেণু-বৃক্ষ-তৃণ-পৃক্ষাস্থিমৎসেষু * *।"

* "কস্মাৎ লোকস্য দ্বৈবিধ্যাৎ। লোকো হি দ্বিবিধঃ, স্থাবরো জঙ্গমশ্চ"—[সুশ্রুত-সংহিতা।

† আয়ুর্ব্বেদ-সঞ্জীবনী, প্রথম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, ১৪৯ পৃষ্ঠা দেখ।

গুণের আধিক্য বশতঃ সৌম্য এবং অগ্নি গুণের আধিক্য বশতঃ আগ্নেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা এস্থলে আচার্য্যের অভিপ্রেত। স্থাবর আগ্নেয়, জঙ্গম সৌম্য বলিয়া অভিহিত করা সংহিতার তাৎপর্য্য নহে।"

৭ "উক্ত আহার দ্রব্যও ঔষধ মধ্যে পরিগণিত। ঐ আহার দ্রব্য স্থাবর ও জঙ্গম-ভেদে দুই প্রকার। স্থাবর আবার চতুর্ব্বিধ, যথা—বনস্পতি, বৃক্ষ, বীরুধ ও ওষধি।

"বনস্পতি—যাহাদের কেবল ফল হয়, পুষ্প হয় না, তাহাদিগকে বনস্পতি কহে। যেমন, বট, অশ্বত্থ, উদুম্বর (যজ্ঞডুমুর) প্রভৃতি।

"বৃক্ষ—যাহাদের পুষ্প হইতে ফল হয়, তাহাদিগকে বৃক্ষ কহে। যেমন আম্র, জম্বু (জাম,) তিন্তিড়ী (তেঁতুল) ইত্যাদি।

"বীরুধ,—যাহারা একত্রীকৃত তৃণগুচ্ছের ন্যায় শাখা পল্লব-বিশিষ্ট এবং খর্ব্বাকার, তাহাদিগকে বীরুধ বা গুল্ম বলে।

"ওষধি,—ফল পরিপক্ক হওয়া পর্য্যন্ত যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহাদিগকে ওষধি কহে। যথা—কদলী, ধান্য, ইত্যাদি।

"জঙ্গম প্রাণী ও উৎপত্তি-ভেদে চতুর্ব্বিধ। যথা—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। তন্মধ্যে মনুষ্য, পশু প্রভৃতি জরায়ুজ, পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি অণ্ডজ; এবং বস্তু পচিলে, তাহা হইতে যে কীট জন্মে, তাহাদিগকে স্বেদজ কহে। যথা—মশা, মাছি, কীট ইত্যাদি। আর যে সমস্ত প্রাণী মৃত্তিকা মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠে, তাহাদিগকে উদ্ভিজ্জ প্রাণী বলে। যেমন—মহীলতা (কেচুয়া), ইন্দ্রগোপকীট প্রভৃতি।" (১০ ও ১১ পৃঃ)

আয়ুর্ব্বেদ-সঞ্জীবনী * এ বিষয়ে যাহা বলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—"এতদ্দ্বারা কি বুঝা যাইতেছে? সুশ্রুতাচার্য্য বট, অশ্বত্থ হইতে মশা, মাছি, চর্ম্মকীট প্রভৃতি পর্য্যন্ত সমুদায়ই আহারীয় দ্রব্য-মধ্যে পরিগণিত করিয়া উহার বিভাগ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু ইহা একান্ত অসম্ভব এবং আচার্য্যের অভিপ্রায়ের একান্ত বিরুদ্ধ। এই স্থানের চক্রপাণির ব্যাখ্যা † দেখিলেই, সুস্পষ্ট অনুভূত হইবে।

চক্রপাণি বলেন,—

* * "পূর্ব্বে যে সংশোধন ও সংশমনের কথা বলা হইয়াছে, উক্ত সংশোধনাদি ঔষধ স্থাবরাদি-ভেদে নির্দ্দেশ করিয়া আহারের প্রাধান্য স্থাপনের অভিপ্রায় এই যে, প্রাণিনামিত্যাদি পাঠের অবতারণা হইয়াছে, সুতরাং চক্রপাণির ব্যাখ্যা ও আচার্য্যের অভিপ্রায় প্রভৃতি অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলেই স্পষ্ট বোধ হইবে যে, বট, অশ্বত্থ মশা, মাছি প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ আহারীয় দ্রব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা আচার্য্যের অভিপ্রায় নহে।"

৮। অনুবাদিত ভাগের ৭পৃষ্ঠার টীকায় বলা হইয়াছে,—"এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, জীবিত শরীরেই চিকিৎসা হইয়া থাকে; মৃত শরীরে চিকিৎসা চলিতে

* আয়ুর্ব্বেদ-সঞ্জীবনী, প্রথম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, ১৫৮ ও ১৫৯ পৃষ্ঠা।

† "ইদানীমুক্ত-সংশোধনাদৌ স্থাবরাদি-ভেদেন ঔষধ-দ্রব্যং নির্দ্দেষ্টুং আহারস্যৈব প্রাধান্যখ্যাপনার্থমাহ প্রাণিনামিত্যাদি।"—[চক্রপাণি দত্ত-কৃত ভানুমতী।]

পারে না কেন?" এই যে একটী অতি-তর্কের প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার অভূতপূর্ব্ব সমাধানটী পাঠক মহাশয়গণ একবার পড়িয়া দেখিলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা কেমন মনোরম পদার্থ। ছোট ছোট অক্ষরে দুই পৃষ্ঠায় তাহা লিখিত আছে। তদ্দ্বারা কল্পনার অধিকতর স্থান অধিকৃত হওয়া কোন মতেই প্রার্থনীয় নয়।

৯। "সংশোধন ও সংশমন রূপ আহার ও আচার সম্যক্‌রূপে প্রযুক্ত হইলে, রোগের শান্তি হইয়া থাকে।" (৯ পৃষ্ঠা)

"সংশোধন ও সংশমন" -রূপ আহার ও আচার" পদার্থটী কি, পাঠক মহাশয়দিগকে আমরা ভাষান্তরকারকগণের লেখা হইতেই অগ্রে প্রদর্শন করিতেছি, তৎপরে তৎসম্বন্ধে আমাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিব।

"যদ্দ্বারা শরীরস্থ বিকৃত পদার্থ বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া যায়, তাহাকে সংশোধন বলে। যেমন শস্ত্র, ক্ষার, বমন ও বিরেচন। যদ্দ্বারা দোষ (বিকৃত বায়ু পিত্ত ও কফ এবং আমাশয় প্রভৃতি) বিরেচিত না হইয়া প্রশমিত হয়, তাহাকে সংশমন বলে। যেমন মালিশ, প্রলেপ রসায়ন, বাজীকরণ, পাচন দ্রব্য প্রভৃতি।" (৯ পৃঃ টীকা)

অনুবাদকগণের মত এই হইতেছে,—বমন, বিরেচন, মালিশ প্রলেপ ইত্যাদি রূপ আহার ও আচার! প্রথম উদ্ধৃত অংশ যে রূপ হওয়া কর্ত্তব্য ছিল, তাহা এই—

সংশোধন ও সংশমন, আহার ও আচার দ্বারা রোগের শান্তি হয়।

১০। এই স্থলে টীকা করিয়া বলা হইতেছে, "ঔষধ শব্দের শক্তি কোন্ কোন্ পদার্থকে আশ্রয় করিতে পারে, তাহার নির্দ্ধারণ করা স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার।" (৯ পৃঃ টীকা)

উহার পরেই "ঔষধের একটী সহজ-বোধ্য লক্ষণ ও তাহার বিবৃতি" দেওয়া হইয়াছে। যথা,—"রোগ প্রতীকারের যে যে দ্রব্য প্রয়োগ এবং যে যে উপায় অবলম্বন করা যায়, তৎসমস্তকেই ঔষধ বলা যাইতে পারে।" (৯ পৃষ্ঠার টীকা)

অহো মনোহারিণী বিবৃতি! বঙ্গদেশীয়গণ! তোমরা তো চিরকালই স্থূলবুদ্ধি বলিয়া বিদেশীয়ের নিকট তিরস্কৃত হও, তোমরা এত দিন ঔষধ শব্দের ঐ অর্থ জানিতে না। সুতরাং স্বদেশীয়ের নিকটও স্থূলবুদ্ধি জন্য আরও লাঞ্ছিত হইলে। সূক্ষ্মবুদ্ধি অনুবাদকবর্গ সৌভাগ্য ক্রমে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাই দেশটা বাঁচিয়া রহিয়াছে, এবং এইরূপ টীকা টিপ্পনী, ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের তেজেই বঙ্গদেশের দুঃখ-নিশার অবসান হইবে।

১১। 'কায় শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জ্বর ও অতিসার রোগের চিকিৎসা।"

(৩ পৃষ্ঠার টীকা)

কায় চিকিৎসা শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ জ্বর ও অতিসার রোগের চিকিৎসা কোন্ অভিধানে লেখা আছে?

১২। "স্বভাবতই হউক বা অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ জন্যই হউক, অল্প শুক্র ও পরিদূষিত শুক্রের বর্দ্ধন, দূষিত শুক্রের সংশোধন ও স্ত্রী-সংসর্গে শক্তি বর্দ্ধনের উপায় যাহাতে উক্ত হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদের সেই অংশের নাম বাজীকরণ তন্ত্র।" (৩পৃঃ)

ইহার অর্থ ওরূপ নহে। প্রকৃত অর্থ এই,—আয়ুর্ব্বেদের যে ভাগে অল্প শুক্রের আপ্যায়ন, দুষ্ট শুক্রের প্রশমন, বিগত শুক্রের

জনন, ও ক্ষীণ শুক্রের উপচয় জন্য ঔষধ, শুক্রদোষ সংশোধন এবং রতি শক্তি বর্দ্ধনের বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার নাম বাজীকরণ তন্ত্র।*

দ্বিতীয়তঃ।—অনুবাদকর্ত্তারা শাস্ত্রভাব কিরূপ পরিচয় দিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহাও দেখা কর্ত্তব্য।

১৩। সুন্দর কাগজে বিস্তর বায় ও আয়াস স্বীকার করিয়া যে গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হইতে থাকে, তাহার অশুদ্ধি দেখিলে, কি যে এক বিজাতীয় যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তাহা সকলেই ধারণা করিতে পারেন। এক্ষণে উৎসর্গ পত্র হইতে আরম্ভ করিয়া আমরা ক্রমে ক্রমে আমাদের বক্তব্য বিষয় প্রকটিত করিতেছি। উৎসর্গ পত্রের প্রথমেই এই শ্লোকটী আছে,—

"একমপ্যক্ষরং যস্ত গুরুঃ শিষ্যে নিবেদিতং।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্ত্বা সোঽনৃণী ভবেৎ।"

ইহার অর্থ এই যে, "যে গুরু শিষ্যকে একটী অক্ষরও দেন, পৃথিবীতে এমন কোনই দ্রব্য নাই, যদ্দ্বারা তিনি (সেই গুরু) অঋণী হন।"

এ স্থলে ব্যাকরণের নিয়মানুসারে (তিনি) "সঃ" শব্দে গুরুকে বুঝাইতেছে। শিক্ষা দিয়াও গুরু যে শিষ্যের নিকটেই ঋণী থাকেন, এই নূতন তত্ত্বটী যাঁহারা আজ শিক্ষা না করিবেন, তাঁহারা নরকগামী হইবেন। অনুবাদকেরা এইরূপ গুরুবৎসল বিদ্যার্থীই বটেন। পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকে উক্তরূপ রসাস্বাদে সন্তুষ্ট না হইতে পারেন। অতএব তাঁহাদের জন্য ঐ উদ্ভট শ্লোকের অধিকাংশ পদ বজায় রাখিয়া উহাকে অর্থযুক্ত ও বিশুদ্ধ করিয়া দিলাম,—

"একপাক্ষরং যস্মৈ গুরুঃ শিষ্যায় যচ্ছতি।
পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্দত্ত্বা সোঽনৃণী ভবেৎ।"

এখন অর্থ করিলে, প্রকৃত অর্থই লব্ধ হইবে। অর্থাৎ শিষ্যই গুরুর সন্নিধানে ঋণী থাকেন, এইরূপ অর্থ হইল।†

তৃতীয়তঃ।—আজ কাল বাঙ্গালা দেশের সকল লেখকই নূতন ভাব-প্রচারক বলিয়া পরিচিত হইতে চান। তাঁহারা সংগ্রহকার বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। মৌলিকতার ভাণ করিয়া পাঁচ স্থান হইতে পাঁচটী বিষয় সংগ্রহপূর্ব্বক সকলকে নূতন তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু দূরদর্শী লোকের নিকটে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। তাঁহাদের মানসিক শক্তির বল অত্যন্ত অধিক, সন্দেহ নাই। অধিক আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই,—উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহার প্রমাণ দেখুন,—পণ্ডিতবর কাণীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় তাঁহার সঙ্কলিত সাংখ্যদর্শনে জ্ঞান-বিষয়ে অন্যান্য অনেক কথার সঙ্গে যাহা যাহা কহিয়াছেন, তাহার একাংশ এই,—

১৪। "সাগরের তরঙ্গমালার ন্যায় নিরন্তর উত্থিত নানাবিধ জ্ঞান-প্রবাহের মধ্য হইতে কোন্‌টী যথার্থ (ঠিক) জ্ঞান, তাহা চিনিয়া লইতে হইবে। এ কারণ যথার্থ জ্ঞানের লক্ষণ উপদেশ করা আবশ্যক।"—(সাংখ্য-

* "বাজীকরণতন্ত্রং নাম অল্প-দুষ্ট-বিশুষ্ক-ক্ষীণ-রেতসামাপ্যায়ন-প্রসাদোপচয়-জনন-নিমিত্তং প্রহর্ষজননার্থঞ্চ।"

† বড়ই দুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্নের "শিক্ষা" পুস্তকেও ঐ ভ্রম আছে।

দর্শন, প্রথম ভাগ, ১ম সংস্করণ, ১৭ পৃ) ইহার নকল পাঠক দেখুন,—

১৫। "জলতরঙ্গের ন্যায় অবিরত সমুত্থিত জ্ঞান-প্রবাহ হইতে কোন্‌টী 'প্রকৃত জ্ঞান' তাহা পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। সেই জন্য প্রকৃত জ্ঞানের একটী সংক্ষিপ্ত সূত্র বা লক্ষণ বলা যাইতেছে।"—[সুশ্রুত-সংহিতা, ৫ পৃ, ১২৯১ সাল।]

১৬। বেদান্তবাগীশ লিখিয়াছেন.—

"যদ্দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উক্ত প্রমা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম প্রমাণ। এই প্রমাণ দ্বারাই বস্তুর পরীক্ষা সিদ্ধি হয়। ৩ ৩ একণে এই জিজ্ঞাসা জন্মিতে পারে যে. প্রমাণ কত প্রকার? কপিল মহানুযায়ীরা উত্তর দিয়েন—

"প্রমাণের সংখ্যাঘটিত অনেক মতভেদ আছে। কেহ ১, কেহ ২, কেহ ৩, কেহ ৪, কেহ ৫, কেহ বা ৬ প্রমাণ স্বীকার করেন। কপিল ৩ প্রমাণবাদী। ঐন্দ্রিয়ক, যৌক্তিক, আর ঔপদেশিক। ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান ঐন্দ্রিয়ক, অনুমান বা যুক্তিমূলক জ্ঞান যৌক্তিক, আর উপদেশ জন্য জ্ঞান ঔপদেশিক নামে ব্যবহৃত হয়। ইহার নামান্তর যথাক্রমে প্রত্যক্ষ, অনুমিতি ও শব্দ।"

—[সাংখ্যদর্শন, ১ম ভাগ, ১ম সংস্করণ।]

১৭। আয়ুর্ব্বেদ-অনুবাদক কি বলিতেছেন,—

"যদ্দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রমা বা প্রকৃত জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে প্রমাণ কহে। এই প্রমাণ দ্বারা বস্তুর যাথার্থ্য নিরূপিত হয়।

"একণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, প্রমাণ কত প্রকার? তদুত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, প্রমাণ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। তন্মধ্যে সূক্ষ্মদর্শী কপিল বলেন,—প্রমাণ তিন প্রকার, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান বা অনুমিতি ও শব্দ।"—[সুশ্রুত সংহিতা, ৫ ও ৬ পৃষ্ঠা।]

বাঙ্গালা ভূমিকার এক স্থানে "বীর্য্যহীন ও ক্রিয়াহীন ও মৃতপ্রায় আয়ুর্ব্বেদে যত্নবান্" হইতে "দেশহিতৈষী বিদ্যানুরাগী" মহাত্মাগণকে অনুরোধ করা হইয়াছে। ভাল, অনুবাদকর্ত্তাদিগকে জিজ্ঞাসা করি,আয়ুর্ব্বেদ যদি "বীর্য্যহীনই" হয়, তবে তাহার পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন কি?

চতুর্থতঃ।—টীকা টিপ্পনী মূঢ়-বোধের জন্যই বিজ্ঞ লোকে রচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই গ্রন্থে কেহ তাহার প্রত্যাশা করিলে, তাঁহাকে ব্যর্থ-মনোরথ হইতে হইবে। প্রথম অধ্যায়ের টীকা শুনুন,—

১৮। "চন্দ্রবংশীয় সুনহোত্রের পুত্র গৃৎসমদ হইতে চাতুর্ব্বর্ণের প্রবর্ত্তয়িতা মহাত্মা শৌনক ও কাশ্যপ বংশে কাশিরাজ জন্ম গ্রহণ করেন।"

লেখকদের মতে গৃৎসমদের পুত্র শৌনক ও কাশ্যপ। এই শৌনক ও কাশ্যপবংশে কাশিরাজ জন্ম গ্রহণ করেন! সর্ব্বৈব গোলযোগে পরিপূর্ণ। এ স্থলে বংশ-বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া বিশদরূপে বলা উদ্দেশ্য হইলে, এইরূপ বলাই উচিত ছিল যে,—চন্দ্রবংশীয় শৌনহোত্রী কাশ্যপ হইতে কাশিরাজের জন্ম হয়। আমাদের বাক্যের যথার্থ্য সামান্য করিতে যাঁহারা প্রয়াসী হইবেন, তাঁহারা অনুবাদকের অবলম্বিত বিষ্ণুপুরাণ দেখিলেই আমাদের মধ্যে কাহার কথা প্রামাণিক, উপলব্ধি করিবেন।

এই পুস্তকে অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র অভাব দেখিলাম না। ভরতাচার্য্যের টীকা আছে,

পৃষ্ঠপোষক এক জন প্রসিদ্ধ জমিদারের সাহায্য আছে, উৎসর্গ পত্র আছে। দুই জন অনুবাদকের যত্ন, চেষ্টা ও উদ্যম আছে। বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজীতে ভূমিকা আছে। এই সমস্তই আছে, কেবল সার পদার্থই নাই।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

গ্রন্থকার-রহস্য নাটক।

A COMEDY IN FIVE ACTS.

প্রথম অঙ্ক।

মুরলীধর ও লোকনাথ আসীন।

লোক। তোমার 'উড়ে যাই,—প'ড়ে যাই,—ম'রে যাই'-এ সবে আর কিছু হচ্ছে না। এত কষ্ট! বাচ্ছা কাচ্ছা গুলো যে মারা পড়ে। পেট চালাবার যোগাড় দেখ। খুনের দালালীটে ছেড়ে দিয়ে কি ভাল কাজ ক'রেছ?

মুর। ভাই, কল্পনার বালিশ বখন বুকে দিয়ে প'ড়ে থাকি, তখন কি আর পার্থিব ক্ষুধা তৃষ্ণা মনে থাকে! সংসার, পুত্র, পরিবার কি মনে থাকে? আগে বুক, পরে পেট; পেটের উপর বুক, একি তুমি জান না? আর কষ্ট?—কষ্টইত বিদ্বানকে যশস্বী করে; দেখ নেপোলিয়ান, সেক্সপীয়ার, হরুঠাকুর—

গৃহিণীর প্রবেশ।

গৃহি। (লোকনাথের প্রতি) ভাই, তুমি একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে বল। আমি ত আর পারিনে। হাতের কলি সার হ'য়েচে। রাবণের পুরী। ছেলেগুলো দিন রাত্রি খাই খাই ক'চ্ছে, কি দিয়ে তাদের থামাই? মাথা মুণ্ড, উনি ত চাদ্দিকে বই সাজিয়ে একবার এটা ওল্টান আর একবার ওটা ওল্টান—

নন্দদুলালের প্রবেশ।

নন্দ। মা বড় ক্ষিদে পেয়েছে। ও মা—

গৃহি। এই নাও তোমার ছেলে পিলে, এই রৈল তোমার ঘরকন্না। আমি বাপের বাড়ী পালিয়ে হাড় জুড়ুই—

(গৃহিণীর দ্রুত প্রস্থান।

নন্দ। ও মা—(প্রস্থানোদ্যত)

মু। নন্দ, ক্ষিদে পেয়েছে?

ন। বাবা, বড্ড, থাকতে পাচ্ছিনে।

মু। আয়, খা। (এক খণ্ড পাণ্ডুলিপি প্রদান এবং লোকনাথের প্রতি গম্ভীর ভাবে) শ্যালক-কুল-তিলক, নব্য কাব্য-রস সজল গব্যরসাপেক্ষা বহুতর গুণে উপাদেয়, স্বাস্থ্যকর।

লো। দেখা যাক্। (হাস্য)

ন। (লেহন পূর্ব্বক) থু থু! অ্যাঁ অ্যাঁ, থু থু! মা—ওঁ!

মু। আর আমার এ সংসারে থেকে কাজ নেই,—কেহ বশ নয়। পুত্রও হ'লো সমালোচক। ও!—ভাই, তোমার হাতে আমার পুত্র-পরিবারকে সমর্পণ ক'রে আমি বিবাগী হয়ে চল্লেম। শেষ কথা, সুখে থেক, সুখে রেখ।

লো। দোহাই—দোহাই—

(ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

মুরলীধর আসীন।

মু। (স্বগত) এই যে নূতন—চিরনূতন এত গুলি উপন্যাস, নবন্যাস, রহোন্যাস লিখেছি, এই যে কোন আটক না মেনে এতগুলি সুন্দর অতিসুন্দর নাটক, চটক লিখেছি, এই যে নিরবদ্য অচ্ছেদ্য উচ্ছ্বাসে এতগুলি পদ্য, গদ্য লিখেছি, এই যে একমন হ'য়ে এতগুলি প্রাণধন গ্রহণন লিখেছি, এ কি জগতে বরিষণ কর্ত্তে পারবো না! Full many a gem—(পরিক্রমণান্তর) বেশ বেশ! সদুপায় ঠাউরেছি। গনিমিয়া কে, সি, এস, আই হ'য়েছে, তাঁর নামে একটা গান লিখে পাঠান যাক; কিছু টাকা পাওয়া যাবে। আর, Thacker, Newmanদের নামে গোটা কত গান বাঁধা যাক, তারা খুসি হ'য়ে আমার বই ছাপাবে—(গুণ গুণ স্বরে) আঁ। তানা নানা নানা ধারে ধারে নানা তানা উম্।

(বাহিরে "ওগো মশাই বাড়ীতে আছ?") কে ও? উট্‌নোদার না? উঃ! আর পারি নে। বাধা—বাধা—চারি দিকে বাধা। এ সংসারে থাকতে চাইনে।

[অর্গল প্রদান।

তৃতীয় অঙ্ক।

গৃহিণী ও মুরলীধর আসীন।

মু। গৃহিণি, আর একটু ব'সো। তোমার বদন-সুধা পান ক'রে সারা দিনের উদর-সুধা নির্ব্বাণ করি।

গৃ। আ! আলাতোন ক'রো না, কিছু ধার-কারের যোগাড় দেখ। হাতের নক্সী পা দিয়ে ঠেলেচো। মুখের কাছে লীটে—

মু। প্রিয়ে, রসনামৃত কেন নবণাকে কচ্চো, অমৃত দেব-ভোগ্য।

(বাহিরে—"মহাশয় মহাশয়।")

কেও? নতুন গলা! গিন্নি, তুমি পাকশালায় যাও, বড় ক্ষিদে—

[গৃহিণীর প্রস্থান।

আগন্তুকের প্রবেশ।

(পরস্পরের অপ্যায়িত করণান্তর—)

আগ। মশাই, আমি এক খানা কাগজ বার কচ্চি, আপনার লিখ্‌তে হবে।

মু। উত্তম, অতি উত্তম। আরো লেখক আছে?

আ। আছে।

মু। উত্তম। গ্রাহক?

আ। আছে।

মু। উত্তম, অতি উত্তম। টাকা?

আ। না।

মু। (বিমর্ষ)

আ। মশাই!

মু। (চিন্তা)

আ। মশাই, লিখ্‌বেন না?

মু। (চিন্তান্তে) কথা দিয়েছি, লিখ্‌বো। কিন্তু আপনাদের একটা কাজ কত্তে হবে। আমার লেখায় কতকগুলো এডিটোরিয়েল নোট দিতে হবে প্রশংসা ক'রে—

আ। দেবো। তার আর কি মশাই!

মু। একটা টাইটেল—

আ। এখনি—এখনি।

মু। আচ্ছা, নাটক নভেল খন্ড গদ্য যখন যা দরকার তাই দেবো।

আ। মশায়ের কাছে তাই আসা। আপনি সহায় না হ'লে—

মু। (উৎসাহে) আর এক কর্ম্ম করুন না, আমার বই গুলো ছাপান্ না, মলাটখানায় শুধু কাগজের নাম থাকবে—

আ। (অস্পষ্ট স্বরে) বেশ কথা। (প্রকাশ্যে) পরে আপনার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্থির ক'রবো। আজ লেখাটা—

মু। দিচ্চি। (কাপি প্রদান।)

আ। (স্বগত) আর এ মুখে সে হয় সে—

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

মুরলীধর আসীন।

মু। (কাগজ হস্তে) তাইত! সবটাই যে বেরিয়েছে। সেবার তারা কাপি নিয়ে গেল, তা খানিকটা ছাপিয়ে আর ছাপালে না। বলে, ভাল নয়, কেউ পছন্দ করে না। শেষ কি না কাপি গুলো ফেরত দিলে! তা দিক্। আওন কখন চাপা থাকে না। এখন লেখাত বেরুলো, নামও জাহির হ'লো। মনে ক'রেছিলুম বইগুলো হয়ত বটতলায় ছাপাতে হবে—আর দিচ্চিনে। এক লেখায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য, মহা-মহিমার্ণব. বিখ্যাত প্রবন্ধকার, ও নটচূড়ামণি, হ'য়েছি!

চারিদিকে সবাই ব'লচে এমন কেউ লেখেনি, লিখ্‌বে না, লিখ্‌তে পারবে না। আর একটা লেখা ছাপালে—!! আমিত জান্তেমই—(উন্মাদে) গৃহিণি গৃহিণি!

গৃহিণীর প্রবেশ।

দেখ্‌লি পাগ্‌লি! ভাব্‌না কি তোর! দেখ আমায় কি ব'লেছে! পণ্ডিতাগ্রগণ্য—

গৃ। সে কি?

মু। প-ণ্ডি-তা-গ্র-গণ্য.

গৃ। কি! পিণ্ডি অরণ্য?

মু। দূর বুঝলি নে! (হাস্য) মহামহি-মার্ণব।

গৃ। ওমা মর মর ব'লে গাল দিয়েছে! সে কোন্ লক্ষ্মীছাড়া, পাজাড়া, মুখপোড়া, পথেপড়া!

মু। দূর! আচ্ছা, বিখ্যাত প্রবন্ধকার—

গৃ। কি! বিকৃত অন্ধকার সে আবার কি?—তা, তোমার চেহারাটা শুদ্ধ কাপি-য়েছে! আ ম'লো আঁস্কা দেখো, একটু কাল ব'লে অন্ধকার বলা হ'য়েছে, কি ব'লবো—

মু। দূর মুখ্খু! নটচূড়ামণি—

গৃ। এইবার বুঝেছি, নোটো! তা এটা কিন্তু ঠিক্ বলেছে।

মু। তোমার মাথা! আমি বলি এক, ও বলে আর!

গৃ। আমি বল্লেই যত দোষ! আর তারা বলেছে মধু বর্ষেছে।

মু। (সক্রোধে) দূর হ, হতভাগা মাগি।

গৃ। তা, বল্‌বে না, বেশ করেছে, বলেছে। উঃ আবার ঝাল!

বলে—"ন'টোরে বলোনা ন'টো।
উল্টে ধর্‌বে চুলের মুটো!"

মু। (কাতর স্বরে) না, মুখ্খুর পাল্লায় পড়ে প্রাণটা গেল। তুই এ সব কিছুই বুঝিস্‌নে. তাই মুনের দালালী নুনের দালালী ক'রে ঝগড়া করিস্। (পিঠ চাপড়ান) আজও তোর অর্থবোধ হলো না। অর্থই ত অনর্থের মূল।

পঞ্চম অঙ্ক।

মুরলীধর ও ধনেশ্বর বাবু আসীন।

মু। তা, আপ্‌নাদের ষ্টেজ্ বাঁধা হ'য়েছে—বেশ বেশ—বসুন; লিখে দিচ্ছি, এখনি লিখে দিচ্ছি। যা বলুন, নবরসের ন খানাই লিখে দিচ্ছি। নিজ মুখে ব'লতে চাইনে, আমার প্রশংসা টাইটেল সব ক দেখেছেন। আত্মপ্রশংসা করা (ঈষদ্‌হাস্য)—

ধনে। শুনেই এসেছি। পাঁচশো দিতে পারবো না, দুশো টাকা নিন্। আর দুঃখের একখানা নাটক লিখে দিন।

মু। দুঃখের—করুণ রসাত্মক! করুণ রস কি দুশো টাকায় হয়, মশাই? আপনিই দেখুন, কত পড়তে হয়, কত কাঁদতে হয়, শরীরের রক্ত জল কর্ত্তে হয়।

ধ। আচ্ছা আড়াইশো নিন; আর একপয়সাও বেশী দিতে পারবো না। ফতের টাকা, আমার নিজের হ'লে কথা ছিল না।

মু। আপনি শপথ ক'রে বল্‌ছেন আমায় আড়াইশো টাকা দেবেন?

ধ। হ্যাঁ, শপথ ক'রে ব'ল্‌ছি।

মু। আচ্ছা, পৌরাণিক ঐতিহাসিক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক কি নাটক চান?

ধ। সবাই যা বুঝতে পারে, মহাভারত টারত থেকে।

মু। বেশ. আপ্‌নি লিখুন আমি বলি। নিজে ব'লতে লিখ্‌তে গেলে কিছুই হয় না, ভাব বন্ধ হ'য়ে যায়।

ধ। (লিখনের সারঞ্জম লইয়া) বলুন।

মু। লিখুন—দেবযানী কূপে পতিত হইয়া (চিন্তা) হইয়া—হইয়া—(সহসা ঘরের কোণে একটা ভাঙ্গা ঢোলকের মধ্যে তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিয়া, ক্রন্দন স্বরে) রক্ষা কর, রক্ষা কর—দেবদৈত্যনরত্রাণ! যে যেখানে আছ রক্ষা কর, প্রাণ যায়! আমি সোম মঙ্গল বুধ—দূর ছাই একটা—বাপের মেয়ে, যে আমাকে উদ্ধার ক'রবে, বাবা তার সঙ্গেই আমার বিবাহ দেবেন, না দেন ত মজা দেখিয়ে দেবো--

ধনে। মশাই এ কি? (প্রস্থানোদ্যোগ)

মু। চুপ করুন—আরো আছে। পড়ুন, মূর্চ্ছা, ঘন ঘন বজ্রাঘাত, দীর্ঘ দীর্ঘ শ্বসত, উঃ, আঃ, অহো, প্রাণনাথ, হৃদয়-বল্লভ, হা সখি প্রাণ যায়—অনেক আছে, ক্রমে বল্‌ছি, লিখে যান। সবুরে মেওয়া ফলে। উত্তলায়—

ধনে। আর কাজ নাই, থাক মশাই।

(প্রস্থানোদ্যত)

(মুরলীধরের ঢোল শুদ্ধ পড়াইতে পড়াইতে ধনেশ্বরের চাদর ধরিয়া) রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, মহাশয় ধনী মানী গুণী জ্ঞানী; আপনি ধন্য, গণ্য, বদান্য, আমাকে দৈন্য হইতে উদ্ধার করুন। ছাড়বো না। কত দিকে কত ব্যয়, শপথ মনে করুন, বলা বাহুল্য, অলমতিবিস্তরেণ, কিমধিকমিতি—

ধ। কি করি! আমার নিজের লোকসান!

[মুদ্রা প্রদান ও প্রস্থান।

মু। (হর্ষে উচ্চৈস্বরে) গৃহিণি, গৃহিণি, —মহিষি মহিষি! পুত্রকে—যুবরাজকে কোলে লইয়া আমার বামে বসিয়া সিংহাসনের শোভা বর্দ্ধন কর। আজ কি আনন্দ!—

উদিল সুখ-শশী:—

মানবের উদ্দেশ্য ও কার্য্য।

'মানবতত্ত্বে' এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু স্থানাভাববশতঃ উহার সম্যক্ আলোচনা হয় নাই। এই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়াও সহজ নহে। ইহার মূল উদ্দেশ্য নির্দ্ধারণ মানব বুদ্ধির বিষয়ই নহে। কি জন্য মানবের সৃষ্টি অর্থাৎ বিশ্বের বা ঈশ্বরের কোন্ কার্য্য মানব না হইলে চলে না, তাহা মানব কি প্রকারে বুঝিবে? কেন না সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের আবার অভাব কি যে তাঁহার প্রয়োজন হইবে? সুতরাং ঈশ্বরের প্রয়োজন জন্য মানবের সৃষ্টি ইহা কিছুতেই বিবেচনা করিতে পারা যায় না। যদি বিশ্বের প্রয়োজন জন্য মানবের সৃষ্টি বিবেচনা করিতে যাওয়া যায়, তাহাও অসম্ভব হইয়া উঠে। কেন না মানবের ন্যায় বিশ্বের প্রয়োজন কি তাহাও কিছুমাত্র বুঝিবার উপায় নাই। বিশ্ব যদি ঈশ্বরের সৃষ্ট হয় তবে উহা না হইলে কিছুরই অস্তিত্ব থাকিত না। অর্থাৎ বিশ্ব সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। সুতরাং বিশ্বের সৃষ্টি না হইলে স্বভাবে ঈশ্বর ভিন্ন কাহারও ক্ষতি হইবার সম্ভব ছিল না; উহার সৃষ্টিতেও ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও উপকারের সম্ভব নহে। আবার উহা ঈশ্বরের প্রয়োজনে পৌঁছিতেছে। কিন্তু ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে তাহা আমাদের কল্পনারও অতীত—থাকিলেও তিনি তাহা নির্ব্বাহ করিয়া লইতেছেন মনে করিতে হইবে; আমাদের কার্য্য দোষে তাঁহার প্রয়োজন সিদ্ধির ব্যাঘাত হয় বলিলে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি হয়। এই জন্য বলি মানব বা সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তি ও স্থিতির উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝা মানব বুদ্ধির বিষয় নহে।

এই স্থলে আর একটী বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক, মানবের সহিত বিশ্বের কোন পদার্থেরই নিত্য সৌহার্দ্য নাই—সজাতীয় মানবই মানবের প্রকৃত সুহৃদ্ নহে। জড়াজড় সকল পদার্থই পরস্পর পরস্পরের অহিত চেষ্টা করিতেছে।

আমরা দেখিতেছি মানবগণ আপন হিতোদ্দেশে সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, উকুন, মৎকুন প্রভৃতি কষ্টদায়ক প্রাণী এবং মেষ ছাগ প্রভৃতি নিরীহ প্রাণী সকলেরই বধ সাধন করিতেছে; গো, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতিকে কষ্ট দিয়া হলশকটচালন, পথ ভ্রমণ প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিয়া লইতেছে; এবং বৃক্ষ, লতা, মৃত্তিকা, বায়ু, জল, তাড়িত, আলোক প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থের ধ্বংস বা বিকৃতি সম্পাদন করিয়া আপন ইষ্ট সাধন করিতেছে। অধিক কি মানব বিশ্বের পদার্থ সকলকে এমন চক্ষে দর্শন করে যে, যদি তাহার উপকার করিতে বিশ্বের সমস্ত পদার্থের ধ্বংস আবশ্যক বোধ হয় তাহাও করিতে প্রস্তুত। এই জন্য মানব অরণ্যকে মরুভূমি, মরুভূমিকে অরণ্য, পর্ব্বতকে সাগর ও সাগরকে পর্ব্বত করিতেছে। গিরিরাজ হিমবান কি জলরাজ মহাসাগরের প্রাণের প্রতিও মানবের কিছুমাত্র মমতা নাই। সুতরাং কি প্রকারে বলিব মানব বিশ্বের হিতানুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন বা সৃষ্ট।

আবার মানবের প্রয়োজন জন্য বিশ্বের অন্যান্য পদার্থ সৃষ্ট তাহাও বলিতে পারা

যায় না। কেন না সকল পদার্থই নিয়ত মানবের শত্রুতা সাধন করিতে সচেষ্ট। সিংহ ব্যাঘ্র, সর্প, প্রভৃতির ত কথাই নাই, যে অন্ন, পানীয় ও বায়ু মানবের জীবন বলিয়া প্রথিত তাহারাও নিয়ত মানবের অনিষ্ট সাধনে নিযুক্ত। মানব একটু অসাবধান হইয়া উহাদের সহিত মিলিত হইলে অর্থাৎ অপরিমিত ভোজন, পান ও বায়ু সেবনাদি করিলে মানবের প্রাণ হানি হয়।

অতএব কে কাহার জন্য সৃষ্ট ও কাহার কি প্রয়োজন তাহা স্থির করা মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। এই জন্য আমরা আর এই গাঢ় তমসাবৃত স্থানে ভ্রমণ করিব না। যাহা বুদ্ধির বিষয় নহে তাহার বিষয় চিন্তা করিলে কি হইবে? অন্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া একাকী মানবের লক্ষ্য স্থির হয় কি না দেখা যাউক। অর্থাৎ মানব যে শক্তি ও প্রকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তদনুসারে তাহার লক্ষ্য কি হইতে পারে তাহাই দেখা যাউক। আমাদের তাহা জানা নিতান্ত প্রয়োজন। কেন না লক্ষ্য স্থির না হইলে আমাদের কর্ত্তব্য স্থির হয় না। কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির, ভিন্ন ভিন্ন জাতির, ভিন্ন ভিন্ন দেশের যে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়, এক ব্যক্তি বা জাতি যাহাকে কর্ত্তব্য বলেন অন্য ব্যক্তি বা জাতি তাহাকে যে অন্যায় কার্য্য বলেন, লক্ষ্য স্থির না থাকাই তাহার প্রকৃত কারণ। লক্ষ্য স্থির থাকিলে কখনই এত ভিন্ন ভিন্ন পরস্পরবিরোধী মত সত্য বা লক্ষ্যসাধক বলিয়া আদৃত হইত না। তাহা হইলে যে মত অবলম্বনে চলিলে নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না জানা যায়, তাহা কেহই অবলম্বন করিত না।

মানব যে আদৌ লক্ষ্য অনুসন্ধান করিতে যত্ন করে নাই এমত নহে। প্রত্যুত বহুতর লোক ঐ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য চিরজীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাহার ফল একরূপ হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য কল্পনা করিয়াছেন; সুতরাং কাহার কথা সত্য বলিয়া গ্রহণীয় তাহা স্থির করা সুকঠিন। যাহা একরূপ নহে, বরং পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন তাহার সকলগুলিই সত্য হইতে পারে না। সুতরাং যাহা স্থির হইয়াছে তাহার কোন্‌টী সত্য অথবা তাহার মধ্যে কোনগুলীতে সত্য আছে কি না স্থির করা আবশ্যক। তাহারও অনেক চর্চ্চা এ পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা অদ্য সেই গুলির পুনরালোচনা করিব।

মানবের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানাবিধ মত। প্রধানতঃ ঐ সকল পরকালগত ও ইহকালগত ভেদে দুই প্রকার। যাঁহারা মানবের ক্ষণজীবন ও সামান্য শক্তির সহিত বিশ্বের অনন্তত্ব ও অসীম শক্তির তুলনা করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন তাঁহারা পরকালেরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহাদের মতে মানব ক্ষণভঙ্গুর জীবনে যাহা কিছু করিবে তাহা চিরস্থায়ী পরকালের হিতের জন্য করিবে। যাঁহারা অনন্ত বিশ্বের সহিত ক্ষণভঙ্গুর জীবনের চির ও পরস্পর সম্বন্ধ দর্শন করেন না তাঁহারা ইহকালেরই মুখ্যত্ব স্বীকার করেন। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে মানব যাহা কিছু করিবে তাহা ইহকালের হিতের জন্যই করিবে। ঐ মতদ্বয় আবার বহুতর অবান্তরভাগে বিভক্ত। পরকালবাদীদিগের মধ্যে একদল বলেন, স্বর্গ ও নরক নামে দুইটী চিরসুখ ও চিরদুঃখময় স্থান আছে, মানব ইহকালের

সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে তথায় যাইয়া চিরসুখে বা চিরদুঃখে নিমগ্ন হয়। নরক দুঃখময় ও স্বর্গ সুখময় স্থান। এই সম্প্রদায়ের মতে যে কার্য্য করিলে মানব চিরকাল স্বর্গে বাস করিতে পারে তাহাই মানবের কার্য্য এবং স্বর্গবাসই লক্ষ্য। কেহ কেহ বলেন বিশ্ব অনাদি অনন্ত, ইহাতে জন্ম মৃত্যু নাই; যে জন্ম মৃত্যু দেখা যায় সে কেবল অবস্থান্তর মাত্র। মানব যেমন কার্য্য করিবে তাহার ফলানুসারে পরজন্মে উত্তম বা অধম জীবন লাভ করিবে। যে উত্তম কার্য্য করে সে পরজন্মে উত্তম জীবন প্রাপ্ত হইয়া সৌভাগ্যশালী ও সুখী হয় এবং যে মন্দ কার্য্য করে সে দুর্ভাগ্য জীবন প্রাপ্ত হইয়া দুঃখ পায়। এই সম্প্রদায়ের মতে যে কার্য্য করিলে পরকালে সৌভাগ্যশালী হইতে পারা যায় তাহাই মানবের কার্য্য এবং সৌভাগ্য-জীবন লাভই মানবের লক্ষ্য। কেহ কেহ বলেন, জগতে যত কেন সৌভাগ্যশালী মনুষ্য হউক না, সম্পূর্ণ দুঃখহীন মনুষ্য হইতে পারে না। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যশালী বলিয়া বিবেচিত হয়েন তাঁহারও দুঃখের সীমা নাই। দুঃখবিহীন জীবন পৃথিবীতে আদৌ নাই—যত দিন জন্মলাভ করিতে হইবে তত দিনই দুঃখ রহিবে। জন্ম লাভ না হওয়াই সুখ বা দুঃখ নিবৃত্তির হেতু। এই জন্য এই সম্প্রদায়ের মতে যে কার্য্য করিলে আর জন্মলাভ না হয় তাহাই মানবের কার্য্য এবং জন্ম না হওয়া অর্থাৎ মোক্ষই মানবের লক্ষ্য। মোক্ষ আবার চতুর্ব্বিধ—সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য ও নির্ব্বাণ। ঈশ্বরের সহিত এক লোকে অর্থাৎ এক স্থানে বাস করাকে সালোক্য, ঈশ্বরের ন্যায় রূপশরিগ্রহ করাকে সারূপ্য, ও ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত হইয়া এক হওয়ার নাম সাযুজ্য। অস্তিত্ব-শূন্যতার নাম নির্ব্বাণ। সুতরাং নির্ব্বাণবাদীদিগের মতে বিশ্বের ধ্বংসই প্রার্থনীয় এবং সাযুজ্য বাদীদিগের মতে ঈশ্বরকৃত সৃষ্টি হওয়া প্রার্থনীয়। এই উভয় মতেই পরতঃ বিশ্বের বিনাশই প্রার্থনীয় হইতেছে। সালোক্য ও সারূপ্যবাদীদিগের মতে বিশ্বের বর্ত্তমান অবস্থার ধ্বংস হইবে বটে কিন্তু সমস্ত পদার্থ ঈশ্বর-লোকে বা ঈশ্বর-স্বরূপে মিলিয়া থাকিবে কাহারও কাহারও মত এই যে, মৃত্যুর পর মানবের আত্মা সকল আকাশমার্গে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিত থাকে। কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিনে (কত কালে যে সে দিন আসিবে তাহার স্থিরতা নাই) ঈশ্বর ঐ সকল আত্মার বিচার করিবেন। যে ব্যক্তি ইহকালে অসৎ কার্য্য করিয়াছে সে দণ্ড পাইবে এবং যে ব্যক্তি সৎকার্য্য করিয়াছে সে পুরস্কার পাইবে। এই সম্প্রদায়ের মতে যে কার্য্য করিলে পরমেশ্বর দণ্ড দিতে না পারেন তাহাই মানবের কর্ত্তব্য। তাঁহাদের বিশ্বাস, খৃষ্টের শরণাপন্ন হইলে ঈশ্বর কাহাকেও দণ্ড দিতে পারেন না। সহস্র দুষ্কর্ম্মকারী ব্যক্তি যদি খৃষ্টের শরণ লয় তাহা হইলে ঈশ্বর তাহার কিছুই করিতে পারেন না। এইজন্য এই সম্প্রদায়ীগণ খৃষ্ট-উপাসনাকেই মুখ্য কর্ত্তব্য বলেন।

পরকালবাদ এইরূপ নানা অবান্তর ভাগে বিভক্ত হইলেও সকলের মূলগত ঐক্য আছে। অর্থাৎ সকলেই ইহকালের সুখ দুঃখের প্রতি আস্থাশূন্য হইয়া পরকালের সুখের প্রতি লক্ষ্য করিতে যত্নশীল। যে কার্য্য পরকালে মঙ্গলকর তাহা নিতান্ত

কষ্ট-সাধ্য হইলেও তৎসাধনে পরকাল-বাদীরা নিতান্ত যত্নবান হয়েন, এবং যে কার্য্য পরকালে দুঃখকর তাহা ইহকালের পরম সুখকর হইলেও তাহা করিতে তাঁহারা একান্ত বিরত থাকেন।

ইহকালবাদীরা পরকালের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে পান না, এই জন্য তাঁহারা পরকালের সত্তা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে পরকাল সম্পূর্ণ মিথ্যা, সমস্ত ভোগাভোগ ইহকালেই মিটিয়া যায়। সুতরাং ইহকালের সুখই তাঁহাদের মতে পরম লক্ষ্য—তৎসাধক কার্য্য করাই এক মাত্র কর্ত্তব্য। পরকালের মিথ্যা সুখের আশায় ইহকালে দুঃখ করা তাঁহাদের মতে নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। পরকালবাদীর ন্যায় ইহকালবাদীও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। কেহ কেবল আপাতত সুখ লাভ জন্য সচেষ্ট; কেহ ভবিষ্যৎ সুখের জন্য দুঃখ করিতে প্রস্তুত; কেহ কেবল আপন সুখের প্রতি দৃষ্টি করেন; কেহ অন্যের সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক বিবেচনা করেন; কেহ আপন সুখের জন্য লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির প্রাণ নাশ, চৌর্য্য, দস্যুতা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন; কেহ বলেন যখন দেখা যাইতেছে পরের অনিষ্ট করিলে পরের অত্যাচার জনিত দুঃখ সহ্য করিতে হয় তখন যেমন তেমন করিয়া পরের অনিষ্ট কর্ত্তব্য নহে, এমন ভাবে পরের অনিষ্ট করিতে হইবে যেন লোকে জানিতে না পারে, সেই জন্য তাঁহাদের মতে কৌশলপূর্ব্বক পরদ্রোহ (Policy) কর্ত্তব্য; কেহ কেহ বলেন যখন দেখা যাইতেছে স্বজাতি বা স্বদেশের অহিত সাধন করিলে পরস্পরে বিবাদ করিয়া সকলে দুর্ব্বল হয় ও তজ্জন্য সময় পাইয়া বহিঃশত্রু আসিয়া সকলের প্রতি অত্যাচার করে এবং তাহাতে আপনারও কষ্ট হয়, তখন স্বজাতির অনিষ্ট করা অনুচিত, যে কার্য্য করিলে আত্মকলহ না হয় বরং একযোগে মিলিত হইয়া সকলে ভিন্ন দেশে অত্যাচার করিয়া তাহাদের সুখ হরণ করিয়া তদ্বারা আপনারা সুখী হইতে পারা যায়, তাহাই কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য সভ্য সমাজে এই স্বার্থপরতার নাম—patriotism। ফলতঃ সকল ইহকালবাদীরই উদ্দেশ্য ইহকালের সুখ লাভ করা; কিন্তু ইঁহাদেরও একরূপ পরকাল ও স্বর্গ নরক আছে। কেন না, ইঁহারা মৃত্যুর পরবর্ত্তী পরকালের সুখের জন্য সমগ্র জীবনে দুঃখকর কার্য্য করিতে বত্নশীল না হইলেও ভবিষ্যৎকালের সুখের জন্য বর্ত্তমান সময়ে সমূহ দুঃখ করিতে প্রস্তুত; এবং পরকালবাদীর ন্যায় তাঁহাদের বহিঃস্বর্গ নরকে বিশ্বাস না থাকিলেও এই পৃথিবীকে তাঁহারা স্বর্গতুল্য করিতে পারেন এই বিশ্বাস তাঁহাদের অন্তর্জ্জাগত। এই সুখের আশয়ে তাঁহারা না করেন এমন কষ্টকর কার্য্য নাই বলিলেই হয়। নিয়ত পরিশ্রম করিয়া চেষ্টা করিলেই ভবিষ্যতে আপনারা সুখী হইব, অথবা ভবিষ্যৎ বংশীয়গণ সুখী হইতে পারিবেন এই আশায় তাঁহারা জলে, স্থলে, রৌদ্রে, বাতে, সাগরে, পর্ব্বতে সর্ব্বত্রে দিবানিশি পরিশ্রম করিয়া থাকেন। কোন প্রকার মানাপমান বা সুখ দুঃখের প্রতি লক্ষ্য করেন না। পরকালবাদীরা যেরূপ আশার বশবর্ত্তী হইয়া যেরূপ কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করেন তাঁহারাও ঠিক তদ্রূপ করিয়া থাকেন।

ক্ষান্তং ন ক্ষময়া গৃহোচিত সুখং
ত্যক্তং ন সন্তোষতঃ।
ষোড়া দুঃসহ শীত বাত
তপন ক্লেশান্ তপ্তং তপঃ॥
ধ্যাতং বিত্তমহর্নিশং -
ন চ পুনর্ব্বিকোঃপদং শাশ্বতং।
যদ্যৎ কর্ম্মকৃতং তদেব
মুনিচিষ্টৈস্তৈঃ ফলৈর্ব্বঞ্চিতং॥

শান্তিশতক। ৮

অর্থাৎ, ক্ষমাগুণে না হইলেও মুনিগণের ন্যায় আমরাও গৃহসুখ ত্যাগ করিয়া থাকি, সন্তোষের সহিত না হইলেও আমরাও তাঁহাদের ন্যায় ত্যাগস্বীকার করিয়া থাকি. তপস্যার জন্য না হইয়া বিষয়ার্জ্জন জন্য হইলেও আমরা তাঁহাদের ন্যায় শীত বাত তপন ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকি, এবং তাঁহাদের ন্যায় পরাৎপর বিষ্ণুর ধ্যান না করিলেও আমরা নিয়ত অর্থের ধ্যান করিয়া থাকি; সুতরাং মুনিগণ যে সকল কার্য্য করেন আমরাও তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকি কিন্তু তাঁহারা যে ফল প্রাপ্ত হন আমরা তাহা পাই না।

পরকালবাদীরা যেরূপ ঈশ্বর-সেবা করেন ইহকালবাদীরা সেইরূপ প্রকৃতির সেবা করিয়া থাকেন, কি করিলে প্রকৃতি তাঁহাদের প্রতি সদয় হইবে, অর্থাৎ কি করিলে প্রাকৃতিক বাধা বিপত্তি সকল দূরীভূত হইয়া ঈপ্সিত উন্নতি লাভ করিতে পারা যাইবে নিয়ত তাঁহারা তাহার চেষ্টা করিয়া থাকেন। পরকালবাদীরা যেরূপ সৎপ্রবৃত্তিগণের অধীন হইয়া দান ত্যাগ প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, ইহকালবাদীরা সেইরূপ প্রত্যুপকার পাইবার প্রত্যাশায় দানাদি কার্য্য করিয়া থাকেন; এবং পরকালবাদীরা যেরূপ পরকালীন সুখলাভের জন্য ইহজীবনে দুঃখ করিয়া থাকেন. ইহকালবাদীরা সেইরূপ ঈপ্সিত উন্নতিরূপ সুখলাভ বাসনায় চিরজীবন দুঃখ করিয়া থাকেন। কার্য্য উভয় সম্প্রদায়ই একরূপ করিয়া থাকেন, কিন্তু ফল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেন না পরকালবাদীরা নৈরাশ্যজনিত মহৎ দুঃখ ভোগ করেন না। কারণ, তাঁহাদের কার্য্যফল মৃত্যু অন্তে পাইতে হইবে, সুতরাং তাঁহাদের কৃত কার্য্যের ফল ফলিল কি না তাহা তাঁহাদের জানিবার উপায় নাই। কাজেই তাঁহাদের অকৃতকার্য্যতা জন্য নৈরাশ্য হয় না। প্রত্যুতঃ আশাসুখ যথেষ্ট আছে কেননা তাঁহাদের মনে বিশ্বাস, তাঁহাদের কার্য্যের ফল অবশ্যই ফলিবে। কিন্তু ইহকালবাদীগণের ফলাকাঙ্ক্ষা ইহজন্মেই হইবার কথা। সুতরাং কার্য্যের সুফল না হওয়ায় অথবা ঈপ্সিত বিষয় লাভ করিয়াও কাঙ্ক্ষিত সুখ না পাইয়া নিয়ত নৈরাশ্যজনিত দুঃখে অভিভূত হয়েন এবং যে উন্নতির আশয়ে তাঁহারা এবম্বিধ বহুতর কষ্ট করিতেছেন তাহার অপ্রাপ্তিতে নিয়ত তাঁহারা দুঃখিত হইয়া থাকেন। পরকালবাদীগণ মৃত্যুকেও ভয় করেন না. তাঁহারা আহ্লাদের সহিত ইহকালের কষ্টকর জীবন পরিত্যাগ করিয়া পরকালের চিরন্তন সুখলাভ লালসায় করাল কালের সহিত আলিঙ্গন করেন। কিন্তু ইহকালবাদীগণের মৃত্যু যন্ত্রণার অবধি নাই। তাঁহাদের অস্তিত্বের শেষ হইতে চলিল, যে উন্নতির জন্য আজীবন কষ্ট করিলেন তাহা তাঁহারা পাইলেন না, আর চেষ্টা করিবারও অবসর নাই, অথবা অসহ্য নিয়ত কষ্ট করিয়া যে সকল ভোগ্য বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা ভোগ

করিতে পাইলেন না. সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে চলিয়া যাইতে হইল. এই মহাদুঃখে তাঁহাদের হৃদয় জর্জ্জরিত হইতে থাকে।

আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় পরকালের স্বর্গ নরকাদির প্রতি নিতান্ত আস্থাশূন্য। কিন্তু তাঁহারা উন্নতিবাদের একান্ত পক্ষপাতী। কি আস্তিক, কি নাস্তিক, কি পরকালবাদী, কি ইহকালবাদী আধুনিক শিক্ষিত সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই বিশ্বাস যে, ঐহিক উন্নতিকর কার্য্য মানবের সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য, ব্যক্তি বা জাতি নির্ব্বিশেষে সকলেরই ঐ নির্দ্দিষ্ট রূপ উন্নতিকর কার্য্যে সচেষ্ট হওয়া উচিত। উন্নতিবাদের তাঁহারা এরূপ পক্ষপাতী যে, যে সকল সাধুপুরুষ ঐহিক ভোগ তুচ্ছ করিয়া ইন্দ্রিয়াদি সংযমনে দৃঢ় প্রযত্ন, তাঁহাদিগকে তাঁহারা নিতান্ত মূর্খ ও উন্নতিবিঘাতক মানবের পরম শত্রু বোধ করেন। অধিক কি তাঁহাদের মতে উন্নতি করিবার জন্যই মানবের সৃষ্টি ও আবশ্যক।

আশ্চর্য্য এই যে. এই উন্নতি ব্যবস্থা সকলের পক্ষেই এক রূপ। অর্থাৎ সকল ব্যক্তির চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে তিনি জ্ঞানী, ধনী, বুদ্ধিমান, যশস্বী, দাতা, পরোপকারী, বিলাসী ও অট্টালিকা-বাসী প্রভৃতি হইবেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, চেষ্টা করিলেই সকলেই ঐরূপ হইতে পারেন, অধিকারী অনধিকারী ভেদ নাই। চেষ্টা করিলে ভদ্র অভদ্র, নির্ব্বোধ বুদ্ধিমান, সবল দুর্ব্বল, সুস্বভাব কুস্বভাব, সকলেই নিউটন বা আর্য্যভট্ট, কালিদাস বা সেক্সপীয়ার, অগস্টস বা রথচাইল্ড এবং বুদ্ধ, খৃষ্ট বা চৈতন্য হইতে পারেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যদি সকলেই যশস্বী হইবে, তবে যশ করিবে কে? যদি সকলেই পরোপকার করিবে তবে উপকার লইবে কে? সকলেই যদি অট্টালিকাবাসী হইবে, তবে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবে কে? সকলেই যদি সুভোগ্য দ্রব্য ভোজন করিবে, তবে ঐ সকল প্রস্তুত করিবে কে? সকলেই যদি যানারোহণ করিবে, তবে বহন করিবে কে? সকলেই যদি পণ্ডিত হইবে তবে শিক্ষা করিবে কে? যদি বল, মানবের বিনা পরিশ্রমে পশু ও যন্ত্রবলে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবে ও সকলেই সমান সুখী হইবে, তাহা হইলে পরকালের স্বর্গে অবিশ্বাস করিবার কারণ কি? বাস্তবিক উহাও যেরূপ সুখ-কল্পনা-সম্ভূত, এই ইহস্বর্গেও সেইরূপ কল্পনা-সম্ভূত বলিতে হইবে। কিন্তু যুক্তি ও বিজ্ঞান ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী। পরকালের স্বর্গ অপেক্ষাও এই উন্নতিরূপ স্বর্গ অসম্ভব। কেন না পরকালের স্বর্গবাদীর মতে যাহার কার্য্যের ফল সেই ভোগ করিতে পায়; কিন্তু উক্ত প্রকার ইহকালের স্বর্গের ফল যদি কেহ পায় তবে কেবল চরম উন্নতি অবস্থা-প্রাপ্ত মানবেরা মাত্র প্রাপ্ত হইতে পারে, আর কেহ তাহা পাইতে পারে না। কেন না চরম উন্নতি না হইলে পৃথিবী প্রকৃত সুখের স্থান হইবে না। সুতরাং সেই চরম উন্নতির সমকালবর্ত্তী লোকেরা ঐ সুখ বিনা চেষ্টায় বা সামান্য চেষ্টায় প্রাপ্ত হইবেন। অথচ আদিমকাল হইতে সেই সুদীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত অনন্তকোটী মানব যে উন্নতি চেষ্টায় শরীর মন পাত করিল, তাহারা কিছুই ফল প্রাপ্ত হইল না। কি বৈজ্ঞানিক যুক্তির কথা! যদিও তর্কের অনুরোধে উহাকে সম্ভব বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়

তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য এই, যখন মানবের ঐরূপ চরম উন্নতির সময় আসিবে তখন তাহার কার্য্য থাকিবে কি? তখন ত আর উন্নতির প্রয়োজন থাকিবে না। কল্পনাতেও কি এরূপ উন্নতি অনুভব করিতে পারা যায়? কখনই নয়।

বাস্তবিক এইরূপ উন্নতি কার্য্য মানবের এক মাত্র বা আদৌ উদ্দেশ্য নহে, এবং ঐহিক উন্নতি সুখের এক মাত্র বা আদৌ কারণ নহে। উন্নতি ব্যতিরেকে কি সুখ হয় না? যদি মানব স্বভাবতঃ বা স্বতঃ সুখের অবস্থা প্রাপ্ত হয় তবে তাহার উন্নতির প্রয়োজন কি? সুখের বর্দ্ধন জন্য উন্নতির আবশ্যক, নয়, দুঃখ বা অভাব নাশের জন্যই উন্নতির আবশ্যক হইয়াছিল? যে আদিম অবস্থায় মানব কিছুমাত্র উন্নতি সাধন করে নাই সে সময়ে মানবের কিছুমাত্র উন্নতির আবশ্যকই হয় নাই। প্রাকৃতিক অবস্থা তাহার যথেষ্ট তৃপ্তিকর ছিল। যদি মানবের কোনরূপ অভাব না হইত তাহা হইলে আদৌ উন্নতির আবশ্যক হইত না। তাহা হইলে পর্ব্বত ওহার পরিবর্ত্তে অট্টালিকার সৃষ্টি হইত না, নির্ঝরিণীর পরিবর্ত্তে পুষ্করিণী খনিত হইত না, সুপক্ক ফলের পরিবর্ত্তে মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইত না, অধিক কি বয়ঃপ্রাপ্ত স্নেহোপরত রমণীবৃন্দের উপভোগের পরিবর্ত্তে একরমণী বিবাহ প্রথারও সৃষ্টি হইত না। কিন্তু কালে মানববংশ যত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল তত নৈসর্গিক পদার্থের অভাব ঘটিতে লাগিল; তাই মানব চেষ্টা করিয়া দুঃখ নিবারণের উপযোগী পদার্থের সদ্ভাব বৃদ্ধি করিতে লাগিল। নচেৎ বিলাসিতা বৃদ্ধি করিবার জন্য বা নির্দ্দিষ্ট অনভ্যাসে অপ্রাপ্য, নিতান্ত আবশ্যক, সুখকর কোনও অবস্থা বা পদার্থ আবিষ্কার করণাভিপ্রায়ে উন্নতির চেষ্টা হয় নাই। অতএব যাঁহারা পৃথিবীর উন্নতি-সাধন করা মানবের মুখ্য কার্য্য মনে করেন তাঁহারা ভ্রান্ত।

ফল কথা, কি পরকালবাদী কি ইহকালবাদী সকলেরই মূল উদ্দেশ্য সুখ লাভ বা দুঃখ নিবৃত্তি। বাস্তবিক ঐ উদ্দেশ্য সাধন ভিন্ন মানবের স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য করিবার কোন অভিপ্রায়ই দেখা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, কোন সম্প্রদায়ী ব্যক্তিই মুখ্য সুখের উদ্দেশে কার্য্য করেন না। সকলেই বিষয় লাভ উদ্দেশে কার্য্য করিয়া থাকেন। স্বর্গলিপ্সুরা স্বর্গরূপ বিষয়াভিলাষী, মোক্ষ-লিপ্সুরা মোক্ষরূপ প্রার্থনীয় বিষয়ের অভিলাষী। উন্নতি বা ঐহিক বিষয়-লিপ্সুরা কল্পিত সুখকর পদার্থ বা অবস্থা বিশেষ প্রাপ্তির অভিলাষী। কিন্তু এতৎ সমস্ত বিষয়ই কিছু মানবের অভিলষনীয় নহে, সুখই প্রকৃত অভিলষনীয়। ঐ সকল বিষয় পাইলেই সুখ পাইব বিবেচনা করিয়াই মানবগণ ঐ সকল বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু বাস্তবিক ঐ সকল বিষয় উদ্দেশ্যসুখ দানে সমর্থ কি না তাহা কেহ বিবেচনা করে না। সুতরাং তাঁহারা সুখের অভিলাষী হইলেও প্রকৃত সুখের অনুসরণ না করিয়া বিষয় বিশেষেরই অনুসরণ করেন। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট বিষয় বিশেষের সহিত কখনও সুখ সম্বন্ধ নহে। তাহা যদি হইত তাহা হইলে কখনই এত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শক্তিবিশিষ্ট ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাসম্পন্ন, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জীব ও মানবের সৃষ্টি হইত না এবং তাহা হইলে এত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ও পরস্পর

বিপরীত ভাবাপন্ন কার্য্যও ভাবাবলী দৃষ্টি-গোচর হইত না। যখন দেখা যাইতেছে এক-জনের যে শক্তি প্রবল অন্যের সে শক্তি দুর্ব্বল.তখন অবশ্যই বলিতে হইবে সকলেই নির্দ্দিষ্ট একরূপ বস্তুর প্রার্থী নহে। এবং যখন দেখা যাইতেছে রিপু চরিতার্থে যেমন সুখ হয়. রিপু দমন করিলেও সেইরূপ সুখ হয় তখন অবশ্যই বলিতে হইবে এক-রূপ কার্য্য সকল সময়ে সুখকর নহে। এই সকল দেখিয়াই ঋষিগণ বর্ণধর্ম্ম, যুগ-ধর্ম্ম কুলধর্ম্ম. আপদ্ধর্ম্ম. সকাম ধর্ম্ম ও নিষ্কাম ধর্ম্ম, প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। অবস্থা, কাল ও পাত্র ভেদে ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়া-ছেন। তদনুসারে যাঁহার যেরূপ সুখের প্রকৃত আবশ্যক তিনি সেইরূপ সুখের উপ-যোগী কার্য্য করিবেন। সুখই মানব-কার্য্যের উদ্দেশ্য সুতরাং বিষয় কামনা শূন্য হইয়া সুখ মাত্র লাভের চেষ্টা করাই মান-বের কর্ত্তব্য। আর্য্য ঋষির আবিষ্কৃত নিষ্কাম ও বর্ণ ধর্ম্ম চর্চ্চাই ইহার এক মাত্র উপায়। অর্থাৎ শক্তি, অবস্থা. প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া উপযোগী বিষয় অবলম্বনে কার্য্য করিতে হইবে, তাহার ফলাফল তুল্য সুখকর জ্ঞানে মনের শান্তি স্থাপন করিতে হইবে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ নিষ্কাম ধর্ম্ম ও বর্ণ ধর্ম্ম প্রকরণ পাঠে জানা যাইবে।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

প্রেমতীর্থ।

আঁধার ঘনায়ে আসে,
যে যাহার বাস বাসে,
খেলা ছাড়ি শিশু ছোটে ঘরে ;
নারি অন্য গৃহস্থালি,
সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালি
কুলবধূ দ্বার রুদ্ধ করে।
দুয়ার ভেজায়ে দিয়ে,
শিশুটিরে কোলে নিয়ে
বসে আসি প্রদীপের ধারে ;
স্তন দিয়ে পুত্র-মুখে
কতই কতই সুখে
ধীরে তার বদন নেহারে !
এক স্তন চোষে ঠোঁটে,
অন্যটিরে হাতে পোটে,
হেসে শিশু মার পানে চায় ;
কি আনন্দ জননীর,
নয়নে উথলে নীর,
বুকে চেপে মুখে চুমো খায়।

গেছে স্বামী, নাহি আসে,
একা নারী শূন্য বাসে —
অবলম্ব শিশুটি অধার ;
সেই সে সাধের সাথী,
সেই সে ব্যথার ব্যথী,
সেই সে সকল জুড়াবার।
মাতা যত খায় চুমো,
বলে 'চাঁদ ঘুমো ঘুমো,'
শিশু তত হেসে কুটোকুটি !
কি বলে না বোঝা যায়,
কত আধ কথা কয়,
কভু তোলে কচি হাত দুটি।
দীপালোক ছায়া পড়ে,
দেয়ালে সে হাত নড়ে,
বড় খুসী শিশু তাহা দেখে ;
হাসে আর ফিরে চায়,
ছায়া যে ধরিতে যায়,
কোল হ'তে ওঠে বেঁকে বেঁকে।

আনন্দে অধীরা মাতা,
লইয়া কাজল-নাতা
ধরে দীপ-শিখার আগায় ;
মৃদু নড়ে দীপ-শিখা,
ভাঁজে ভাঁজে পড়ে রেখা,
শিশু ভয়ে মার মাই খায়।
খাওয়া হলে দুধ-টুক,
অঞ্চলে মুছায়ে মুখ
ভালে টীপ কাটে ধীরে ধীরে ;
কাজল পরায়ে চোখে
মুখানি তুলিয়া দেখে,
সাধে চুমো খায় ফিরে ফিরে।
নীরব নির্জ্জন গেহ,
সে দৃশ্য না হেরে কেহ,
একা দীপ দেখে আর হাসে ;
দুয়ারের ফাঁক বেয়ে
দূর বায়ু আসে ধেয়ে
প্রেমতীর্থ দরশন আশে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

কর্ণধার। ১ম খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা। শ্রীহরিপদচন্দ্র রক্ষিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহা একখানি ক্ষুদ্রকায় ডিমাই তিন ফর্ম্মার মাসিক পত্র। দ্বিতীয় সংখ্যা প্রথম সংখ্যা অপেক্ষা ভাল হইয়াছে। লেখকগণের নামের তালিকায় অনেক গুলি সুলেখকের নাম দেখিলাম। আমরা ইহার উন্নতি কামনা করি।

দীপিকা। মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। ১ম ও ২য় সংখ্যা। 'সুলভ সাহিত্য প্রকাশ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।' আকার ডিমাই দুই ফর্ম্মা মাত্র। কোন আড়ম্বর নাই। "অবতরণিকাটী" বেশ হইয়াছে। কিন্তু ২য় সংখ্যায় কতকটা 'ছাম্‌বড়াই' দেখা গেল।

গান ও গল্প। পাক্ষিক পত্র। শ্রীমতিলাল বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যা। যে দেশে বঙ্গদর্শন, বান্ধব চলিল না, সে দেশের লোকের মতি গতি বুঝিয়া মতি বাবু এ মন্দ কন্দি বাহির করেন নাই। সম্ভবতঃ ইহার দেখা ও খোরাক দুই জুটিবে। ছাপা বেশ, মূল্য ও সুলভ।

আমরা সম্পাদককে অনুরোধ করি—প্রতি সংখ্যায় ৩।৪টী গল্প টুক্‌রা টুক্‌রা প্রকাশ না করিয়া, প্রতি সংখ্যায় একটী বড় গল্প ক্রমশঃপ্রকাশ, আর একটী গল্প সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিলে ভাল হয়। প্রতি সংখ্যাই আসর জমাইতে পারে। আর, গানগুলির প্রতি একটু নজর রাখা উচিত। গান সুরে জমে, অনেক ভাল গান পড়িতে তেমন ভাল লাগে না। গান সুরে মিলিল কি না, সে দিকে ধরাকাট না করিয়া, গানে কবিত্ব আছে কি না দেখা উচিত।

মহাপ্রস্থান। বা পাণ্ডবগণের স্বর্গারোহণ। শ্রীহারাণ চন্দ্র রক্ষিত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

স্বর্গারোহণ পর্ব্ব মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অংশ। মূলে বা কাশীদাসে ইহা অতি সুন্দর ও উপাদেয়, বিবিধ কবিত্ব ও প্রকৃতিবর্ণনায় পূর্ণ এ অংশটুকু নাটকে ফলান যায় কি না, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। বোধ হয় ইহা কাব্যের বা মহাকাব্যেরই বিষয়। স্থানে স্থানে মন্দ হয় নাই।

শতদল। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। শতদল কুটিরাতে রবীন্দ্রনাথের ছায়ার। উপহারও দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথকে। "গ্রামের শ্মশান ঘাটে" প্রভৃতি কয়েকটী কবিতা বেশ হইয়াছে। তাহা নাই। একটু রহিয়া সুইলে, ইহাতে কবিত্বের সৌরভ আরও যে অধিকতর পরিমাণে দেখিতে পাইতাম, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

মায়াবিনী। (পদ্য) শ্রীনৃত্যকৃষ্ণ বসু প্রণীত। দর্শন বিজ্ঞান চাই, কবিতায় দেশ ভরিয়া গেল, কবিতায় কি হইতেছে, ইত্যাদি কয়েকটা পদ্য বলিতে সমালোচকগণ নবীন কবিদিগকে হাড়ে মাটি করিবার চেষ্টা করেন। যেখানে সেখানে, যাহাকে তাহাকে এ কথাগুলা বলা ভাল নহে।

নৃত্যকৃষ্ণ বাবুর ভাষা বেশ, ভাবের বেশ স্ফূর্ত্তি আছে; উৎসাহ পাওয়া উচিত।

মনোমোহন-গীতাবলী। অর্থাৎ প্রসিদ্ধ নাটককার শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু প্রণীত সমস্ত গীতগুলির একত্র সঙ্কলন। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ইহার প্রকাশক।

মনোমোহন বাবুর "দিনের দিন" প্রভৃতি অনেকগুলি গান দেশ-বিখ্যাত। তাঁহার সাহিত্য-সংসারে আর পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র। সকলেই জানেন মনোমোহন বাবুর প্রকৃত ক্ষমতা আছে। সঙ্গীত-রসজ্ঞ পাঠকগণ ইহা পাঠে যথেষ্ট আমোদ পাইবেন। ছাপ্‌আখড়াই, কবি, হাঁড়া কবি, রঙ্গের গান ইত্যাদি হইতে তাঁহার প্রণীত নাটকগুলির সমস্ত গান ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে মনোমোহন বাবু ছাপ-আখড়াইয়ের একটী অনতি-বিস্তৃত সুন্দর ইতিবৃত্ত প্রদান করিয়াছেন। তাহা সকলেরই জানা উচিত।

বসন্ত নির্ণয়। শ্রীগোবিন্দচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। পুস্তকখানির নাম দেখিয়া আমরা প্রথমে স্থির করিয়াছিলাম কোন নবীন লেখকের লিখিত বসন্ত ঋতু বর্ণন—সেই শিকরাজের মর্ম্মস্থল-স্পর্শী পঞ্চম স্বরে কুহু ডাক, সেই মলয় মারুত-হিল্লোল, সেই বিরহী বিরহিণী দিগের আক্ষেপ প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু পাঠ করিয়া দেখিলাম তাহার বিপরীত। ইহা এক খানি আধ্যাত্মিক কাব্য। ইহার উদ্দেশ্য অনাবিল, লক্ষ্য—দেহ রাজ্য, সৃষ্টি—আধ্যাত্মিক জগতে। পুস্তক খানি ভাবুক পাঠকদিগের নিকট বড় সুন্দর জিনিষ। এই ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর জগতের ক্ষণস্থায়ী—"বসন্ত" বর্ণনা নহে। ইহা দেহ রাজ্যের বিষয় লইয়া আধ্যাত্মিক ভাবে বসন্তের বর্ণনা করা হইয়াছে। কবি পরিভাষায় লিখিয়াছেন, 'যাহাতে সংসারে লোকদিগের চিত্ত হইতে মনসিজ ও রতির অবিশুদ্ধ ভাব তিরোহিত হয় ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য। যাঁহারা কাম ও রতির যথার্থ অর্থ অবগত না হইয়া পুরাণকল্পিত সাকার রূপে দৃঢ় বিশ্বাস করত চিত্তে এক প্রকার বিকৃত ভাবের আবির্ভাব করিয়া রাখিয়াছেন যাহাতে তাঁহাদের সেই ভাব বিনষ্ট হয় এবং তদ্বিপরীতে কাম ও রতিকে প্রকৃতি মাতার চির সহচর ও ভবের মুক্তির প্রধান কারণ বলিয়া জানিতে পারেন তদ্বিষয়ে সাহায্য করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।' পাঠকগণ গ্রন্থের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন। কবি অতীব নিপুণতার সহিত আপনার আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার রচনায় বহুল গবেষণা শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। শব্দ বিন্যাসের পারিপাটা অত্যন্ত সুন্দর। আমরা এরূপ আধ্যাত্মিক ভাবময় কাব্য অতি অল্পই দেখিয়াছি। গ্রন্থখানি যদিও পৃষ্ঠা-সংখ্যায় অধিক, তথাপি পড়িতে ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না। যদি যথার্থই সদর্থ অবগত হওয়া যায় তাহা হইলে কাব্য খানি পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করা যায় তাঁহার রচনা ভারতচন্দ্র প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের ন্যায় নানার্থ-পূর্ণ। কল্পনার বেশি স্থান নাই বলিয়া আজ তাহার কোনও উপহারণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিলাম না। কাব্য-প্রেমের সম্বন্ধে পাঠকদিগের এক একবার এখানি পাঠ করা উচিত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

আমি মূর্খ, ভগবদ্গীতার মর্ম্ম কি বুঝিব? গীতা জগতের অদ্বিতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ। গীতার ভাষায় বলিতে গেলে—

"আকুল পূরিত, স্থির, অচঞ্চল
সমুদ্রে সলিল প্রবেশে যেমন;"

তেমনি জগতের যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থরাশি এই গীতা-সাগরে বিলীন হইয়া যায়। কাব্যাংশেও গীতা অতুলনীয়। ইহার অভিনেতা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং ভারতের অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন। স্থান—ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র। সময়—মহাভারত-যুদ্ধের প্রারম্ভ। দর্শক—ভারতের সশস্ত্র যুদ্ধার্থী নৃপতিমণ্ডল। বিষয়—কর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখ অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে রত করা। ইহা গীতার গৌণ উদ্দেশ্য। অনন্ত জ্ঞানসিন্ধু মন্থন করিয়া মানবজাতির জন্য পরমধর্ম্মামৃত বা চরম মনুষ্যত্ব উদ্ভাবন করাই গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য। কাব্যে এবং ধর্ম্মগ্রন্থে রূপগত পার্থক্য থাকিলেও প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষা দেওয়াই উভয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য। গীতোপদিষ্ট সেই চরম মনুষ্যত্বের নাম—

নিষ্কাম ধর্ম্ম।

এই নিষ্কামত্ব বা কামনার নির্ব্বাণই বৌদ্ধ ধর্ম্মের

নির্ব্বাণ।

কি প্রণালীতে এই মহৎ ধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে, কি সূত্রে গীতোক্ত তত্ত্বরত্নরাশি গ্রথিত হইয়াছে, এবং তাহার মধ্যে কোন কোনটী সর্ব্বপ্রধান, তাহা একবার সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

প্রথম অধ্যায়।

সৈন্যদর্শন।

ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে কৌরব পাণ্ডবেরা যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়াছেন। ভারতবর্ষের সমস্ত নৃপতিমণ্ডল দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতেছেন। এমত সময়ে অর্জ্জুনের ইচ্ছানুসারে শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যে রথ লইয়া গেলে অর্জ্জুন দেখিলেন যে তাঁহার সমুদায় আত্মীয় স্বজন যুদ্ধার্থে উপস্থিত। তিনি বলিলেন—

"হই বা নিহত যদি ইহাদের করে আমি
হে মধুসূদন!
তুচ্ছ মহী, ইহাদের না ইচ্ছি ত্রৈলোক্যতরে
বধিতে কখন।" ৩৪

তখন তিনি শোকে একান্ত কাতর হইয়া ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়া উদ্বিগ্ন মনে রথে বসিয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাঙ্খ্যযোগ।

ভগবান অর্জ্জুনকে বলিলেন যে এরূপ সঙ্কট সময়ে তাঁহার এরূপ মোহ ও ক্লীবত্ব আর্য্যের অযোগ্য। কিন্তু অর্জ্জুন বলিলেন, তিনি গুরুগণ বধ না করিয়া বরং ভিক্ষা করিয়া খাইবেন। তাঁহার এই ইন্দ্রিয়-শোষক শোক ধরার রাজ্য, কিম্বা সুররাজ্যও বিমোচন করিতে পারিবে না। অতএব—

"পরন্তপ ধনঞ্জয় কহিলেন পদ্মনাভে—
করিব না যুদ্ধ আমি, রহিলেন মৌনভাবে।" ৯

তখন ভগবান সহাস্য বদনে তাঁহাকে অদ্ভুত গীতোক্ত ধর্ম্ম বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। এইখানে গীতা আরম্ভ হইল। তিনি বলিলেন, অর্জ্জুন জ্ঞানী হইয়াও যে বিষয়ে শোক করা উচিত নহে তাহাতে শোক করিতেছেন এ কথাটী তিনি তিন প্রকারে বুঝাইলেন। তিনি প্রথমতঃ বুঝাইলেন যে আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, বিকার নাই, কেবল দেহ মাত্র অন্ত হয়। অতএব আত্মাকে কেহ বধ করিতে পারে না, আত্মাও কাহাকে বধ করেন না। মানুষের দেহে যেরূপ কৌমার, যৌবন, ও বার্দ্ধক্য সংঘটিত হইয়া থাকে, মৃত্যুও সেইরূপ অবস্থান্তর মাত্র।

"যথা জীর্ণ বাস করি পরিহার,
করে নর নব বসন গ্রহণ ;
তথা পরিহরি দেহী জীর্ণ দেহ,
করে অন্য নব শরীর ধারণ।" ২২

দ্বিতীয়তঃ যদি মনে কর, আত্মা নিত্য জন্মিতেছে, নিত্য মরিতেছে, তথাপিও শোক অনুচিত। কারণ—

"জন্মিলে নিশ্চিত মৃত্যু মরিলে জন্ম নিশ্চিত।
অপরিহার্য্যের তরে শোক তব অনুচিত।" ২৬

তদ্ভিন্ন—

"আদিতে অব্যক্ত থাকে, মধ্যভাগে হয় ব্যক্ত
ভূতগণ যত ;
নিধনে অব্যক্ত পুনঃ হয় ; তার তরে কিবা
বেদনা ভারত ?" ২৮

বুঝাইলেন, আত্মা নিত্য। তাহার জন্ম মৃত্যু নাই। আর দেহ-আদিতে অব্যক্ত থাকে বলিয়া ত কেহ শোক করে না। তবে নিধনে অব্যক্ত হয় বলিয়া শোক করিবে কেন ?

তৃতীয়তঃ অন্য কারণে না হইলেও নিতান্ত—

"স্বধর্ম্মেরও পানে চাহি ভীতি কর পরিহার,
ধর্ম্মযুদ্ধ হ'তে শ্রেয় ক্ষত্রিয়ের নাহি আর।" ৩১

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ। ইহার উদ্দেশ্য পরস্বহরণকারী দুরাচারের দমন। ভগবান বলিলেন—

"আর যদি তুমি নাহি কর এই ধর্ম্মরণ,
হারায়ে স্বধর্ম্ম,কীর্ত্তি,পাপে হবে নিমগন।" ৩৩

ইহার নাম সাঙ্খ্যযোগ বা জ্ঞান যোগ। তিনি বলিলেন ভোগ ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি ফল কামনা করিয়া যে কর্ম্মাদি করা যায় তাহাতে চিত্ত বিষ্ণুতে সমাহিত বা স্থিরীকৃত হয় না।

"সকাম সকল বেদ, অর্জ্জুন ! হও নিষ্কাম,—
যোগী,নিত্য ব্রহ্মেস্থিত,দ্বন্দ্বহীন,আত্মবান।" ৪৫

কারণ, কর্ম্ম হইতে জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ।—

"বহু কূপে হয় যাহা, পারে এক পারাবারে
সাধিতে সকল।
একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান পারে তথা প্রদানিতে
সর্ব্ব বেদফল।" ৪৬

তবে কি কর্ম্ম করিব না ? করিব।

"কর্ম্মে তব অধিকার, নহে ফলে কদাচিত।
তেয়াগিবে কর্ম্মফল, কর্ম্মত্যাগ অনুচিত।৪৭"

অতএব—

"সুখ দুঃখ সমজ্ঞানে, লাভালাভ, জয়াজয়,
কর যুদ্ধ তুমি, পাপ হইবে না ধনঞ্জয় !" ৩৮

এরূপ যোগ অবলম্বন করিলে তোমার জ্ঞান ব্রহ্মেতে স্থিত হইবে, অর্থাৎ তুমি স্থিতপ্রজ্ঞা লাভ করিবে।

তখন অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন "স্থিত প্রজ্ঞ" ব্যক্তির লক্ষণ কি ? ভগবান বুঝাইলেন—

(১)"মনের কামনা সর্ব্ব করি পার্থ ! পরিহার,—
আত্মাতেই তুষ্ট আত্মা, স্থিতপ্রজ্ঞ নাম তার।৫৫

(২) "কূর্ম্মের অঙ্গের মত, করিবারে সঙ্কুচিত
যে পারে ইন্দ্রিয়গণ, তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত।৫৭

(৩) "সংযত-ইন্দ্রিয় হও
মৎপর ও যোগস্থিত।" ৬১

অর্থাৎ (১) নিকাম, (২) জিতেন্দ্রিয় এবং (৩) ঈশ্বরপরায়ণ যোগীই স্থিতপ্রজ্ঞ।

"আকুল পূরিত, স্থির, অচঞ্চল,
সমুদ্রে সলিল প্রবেশে যেমন;
তেমতি কামনা প্রবেশে যাহাতে,
সেই পায় শান্তি, নহে কামীজন।"৭০

তৃতীয় অধ্যায়।

কর্ম্মযোগ।

অর্জ্জুন তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি কর্ম্মযোগ হইতে জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ, তবে আমাকে কেন এ ঘোর কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছেন?

ভগবান কহিলেন, কর্ম্ম না করিয়া লোক নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করিতে পারে না। বিশেষতঃ—

"অকর্ম্মা থাকিতে কেহ
নাহি পারে কদাচিত।
স্বভাব গুণেতে সবে
হয় কর্ম্মে নিয়োজিত।" ৫

অতএব প্রকৃতির দ্বারা বাধ্য হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে।

"কিন্তু আত্মাতেই রত, আত্মাতেই তৃপ্তি যার,
আত্মাতে সন্তুষ্ট সদা, তার কার্য্য নাহি আর।১৭

যত দিন সে অবস্থা না হইবে ততদিন নিকাম ভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন লোকশিক্ষার জন্যে নিতান্ত তোমার কর্ম্ম করা উচিত। কারণ—

"যাহা আচরিবে শ্রেষ্ঠ করে তাইতর জন।"২১

স্বয়ং ঈশ্বর কর্ম্ম করিতেছেন—

"আমার কর্ত্তব্য পার্থ! ত্রিলোকে নাহি কিঞ্চিৎ
অপ্রাপ্ত, প্রাপ্তব্য নাহি, তবু আমি কর্ম্মরত ২২
কেন?
"আমি কর্ম্ম না করিলে হবে সব উৎসাদিত।"

অতএব সকলেরই কর্ম্ম করা উচিত। তবে অজ্ঞানীরা যে কর্ম্ম সকাম ভাবে করে জ্ঞানীরা তাহা নিকাম ভাবে করিবে। ভগবান কহিলেন—

"আমাতে সকল কর্ম্ম আধ্যাত্মিক জ্ঞানবলে
করি সমর্পণ,
নিকাম, মমতা-হীন হয়ে, নির্ব্বিকার চিতে
কর তুমি রণ।" ৩০

তুমি যে দুষ্ট শত্রুকে ক্ষমা করিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিতেছ, অর্থাৎ যুদ্ধ করিতেছ না, তাহা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। ক্ষমা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। তাহা ভাল হইলেও—

"সম্যক্ সু-অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হ'তে শ্রেয়
স্বধর্ম্ম বিগুণ।
স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়, পরধর্ম্ম ভয়াবহ
তথাপি, অর্জ্জুন!" ৩৫

তখন অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, চিত্তবিকার জন্মাইয়া পুরুষকে কে অনিচ্ছায় বলপূর্ব্বক পাপে নিযুক্ত করে? উত্তর—কাম এবং ক্রোধ। অতএব ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া ইহাদিগকে ধ্বংস করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

জ্ঞানকর্ম্ম বিভাগযোগ।

পূর্ব্ব দুই অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগ বুঝাইয়া ভগবান এই অধ্যায়ে উভয়ের পার্থক্য বুঝাইতেছেন। বুঝিলাম, ফলকামনা ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ ঈশ্বরে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করাই কর্ম্মযোগ। কিন্তু কোন্‌টী সুকর্ম্ম, কোন্‌টী দুষ্কর্ম্ম, এবং কর্ম্ম-

হীনতাই বা কি, তাহা কি প্রকারে জানিব ? যখন লোকের এরূপ দুরবস্থা হয় যে সুকর্ম্মে দুষ্কর্ম্মে প্রভেদ বুঝিতে পারে না, অর্থাৎ সংসার হইতে ধর্ম্ম জ্ঞান তিরোহিত হয়—

"যখন যখন ঘটে, ভারত ! ধর্ম্মের গ্লানি,
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, আপনাকে সৃজি আমি।৭

"সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের
করিতে সাধন,
স্থাপন করিতে ধর্ম্ম, করি আমি যুগে যুগে
জনম গ্রহণ।" ৮

তখন ভগবান শরীর গ্রহণ করিয়া মানব-জাতিকে প্রকৃত ধর্ম্ম অর্থাৎ প্রকৃত কর্ত্তব্য-জ্ঞান শিক্ষা দেন। আর যদি বল যে, তাহা লাভ করা বহু জ্ঞান এবং তপস্যার ফল, তথাপি—

'যে যথা আমাকে চাহে তাকে তথা ভজি আমি' কারণ—

"পার্থ ! সর্ব্বরূপ নর মম পথ অনুগামী" ।১১

লোকে দ্রব্যাদি দ্বারা নানারূপ যাগ যজ্ঞ করে এবং যোগ সাধন করে। কিন্তু—

"দ্রব্যময় যজ্ঞ হ'তে জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেয়ান্বিত ;
সর্ব্বরূপ কর্ম্ম, পার্থ ! জ্ঞানে হয় সমাপিত।"৩৩

সে জ্ঞান কি রূপ ?—

"যে জ্ঞান লভিলে পুনঃ না হয় মোহ, পাণ্ডব !
আমার আত্মাতে যাহে দেখিবে সংসার সব৩৫

কি রূপ হইলে তাহা পাওয়া যায় ?—

"তৎপর, সংযতেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাবান, লভে জ্ঞান।
লভি জ্ঞান, পায় শীঘ্র পরম শান্তি নিদান।৩৯

পঞ্চম অধ্যায়।

কর্ম্মসন্ন্যাস যোগ।

ঈশ্বর-জ্ঞান লাভার্থ কর্ম্ম ত্যাগের নাম সন্ন্যাস। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করিয়া, অর্থাৎ ফল কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করার নাম কর্ম্মযোগ। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, এ দুটীর কোন্‌টী শ্রেয়। ভগবান কহিলেন, উভয়ই শ্রেয়স্কর, তথাপি সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সাঙ্খ্যযোগ ও কর্ম্ম-যোগ পৃথক নহে—

"সাঙ্খ্যে পায় যেই স্থান, যোগেও সেখানে যায় ;
অভিন্ন সাঙ্খ্য ও যোগ যে দেখে সে দেখে তায়" ৫

কর্ম্মযোগ-বিহীন সন্ন্যাস কেবল দুঃখের কারণ। কেননা কর্ম্মযোগী সর্ব্বভূতে পর-মাত্মাকে দেখে, এবং সে মনে করে ইন্দ্রি-য়াদির ভোগ্য বিষয়ের জন্যে ইন্দ্রিয়েরা কর্ম্ম করিতেছে। অতএব সে কর্ম্ম করিয়াও সন্ন্যাসীর মত কোন কর্ম্মে লিপ্ত হয় না।

"ব্রহ্মে সমর্পিয়া কর্ম্ম নিষ্কাম যে কর্ম্মরত ;
না হয় সে পাপে লিপ্ত পদ্ম পত্রে জল মত।" ১০

সে কেবল আত্ম-শুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্ম করে মাত্র। সে জানে—

"নরের কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম, কর্ম্মফল, কদাচিত
না সৃজেন বিভু ; জীব স্বভাবেতে প্রবর্ত্তিত।১৪
না লন সুকৃতি, পাপ, কারো বিভু কদাচন।"

তবে লোকে সে রূপ মনে করে কেন ?—

"অজ্ঞানে আচ্ছন্ন জ্ঞান, তাহে মুগ্ধ জীবগণ।১৫

সে প্রকৃত রূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া শান্তি লাভ করে।

"যজ্ঞ-তপ-ফল-ভোক্তা, অর্জ্জুন ! সর্ব্ব লোকের
আমি মহেশ্বর,
সুহৃদ সর্ব্বভূতের,— আমাকে জানিয়া শান্তি
লভে সেই নর।" ২৯

এত অল্প কথায় পরমেশ্বরের এমন একটী মহৎ ও পূর্ণ চিত্র অন্য কোনও ধর্ম্মগ্রন্থে আছে কি না জানি না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অভ্যাস যোগ।

এই অধ্যায়েও সন্ন্যাস এবং কর্ম্ম যোগ

বা যোগের কথা। ভগবান কহিলেন—

"করে যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর্ম্ম-ফলে হীনস্পৃহ,
সে সন্ন্যাসী, সেই যোগী; নহে নিরগ্নি নিক্রিয় ১

যে ব্যক্তি যোগাকাঙ্ক্ষী, কর্ম্ম তাহার অবলম্বন। আর যে ব্যক্তির যোগসিদ্ধি হইয়াছে তাহার অবলম্বন শান্তি। তাহার আর কর্ম্ম নাই। যোগারূঢ় বা যোগসিদ্ধের অবস্থা কিরূপ?—

"জ্ঞানে বিজ্ঞানেতে তৃপ্ত, অবিকার জিতেন্দ্রিয়,
সেই যোগী, যার লোষ্ট্র, শিলা, স্বর্ণ সমপ্রিয় ।৮

* * *

"নিবাত স্থানেতে স্থিত নিষ্কম্প প্রদীপ মত,
অর্জ্জুন! সংযতচিত্ত যোগী আত্ম-যোগরত।১৯

* * * *

"আত্মাকে সমস্ত ভূতে, আত্মাতে সমস্ত ভূত
সর্ব্বত্র সমান-দর্শী যোগী করে অনুভূত।"২৯

* * * *

"সর্ব্বত্র সমান দেখে আত্মবৎ যেই জন,
সুখে দুঃখে, মম মতে সে জন যোগী পরম ৩২

তখন অর্জ্জুন কহিলেন—

"হে কৃষ্ণ! চঞ্চল মন, দৃঢ়, মত্ত শক্তিধর;
"তাহার নিগ্রহ করা বায়ু মত সুদুষ্কর।" ৩৪

উত্তর—

"দুর্জ্জয় চঞ্চল মন, হে মহাবাহো! নিশ্চিত।
অভ্যাসে, বৈরাগ্য, কিন্তু হয় তাহা নিগৃহীত ৩৫

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহারা মনের চঞ্চলতা নিবন্ধন যোগে অকৃতকার্য্য হয়, তাহারা কি "ছিন্ন মেঘের মত" উভয় লোক ভ্রষ্ট হয়? ভগবান্ কহিলেন—

"ইহলোকে পরলোকে না হয় সে বিনাশিত।
দুর্গতি কল্যাণকারী নাহি পায় কদাচিত।"৪০

সে ব্যক্তি পরজন্মে

"লভি তথা বুদ্ধিযোগ, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ধন,
সিদ্ধি তরে বহু যত্ন করে সে, কুরুনন্দন!"৪৩

সে এরূপ যত্ন করিয়া,

"বহু জন্মে হ'য়ে সিদ্ধ, পায় সে পরমগতি।"৪৫

সপ্তম অধ্যায়।

বিজ্ঞান-যোগ।

সকল যোগের লক্ষ্য সেই পরমগতি বা পরম ব্রহ্মের প্রকৃতি কি রূপ? ভগবান কহিলেন, ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, বুদ্ধি, মন, ও অহঙ্কার—এই আমার অষ্ট প্রকার প্রকৃতি। ইহাদিগকে অপরা প্রকৃতি কহে। জীবভূত অন্য যে পরাপ্রকৃতি আছে, তাহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয় হয়।

আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ আর নাহি কিছু হে ভারত,
আমাতে গ্রথিত বিশ্ব সূত্রে মণিগণ মত।"৭

রাজসিক, তামসিক ও সাত্ত্বিক ভাবে জগৎ বিমুগ্ধ। কেবল চাতুর্ব্বিধ পুণ্যবান ভগবানের ভজনা করে—পীড়িত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, অর্থাকাঙ্ক্ষী, এবং জ্ঞানী। ইহাদের মধ্যে

"লভি বহু জন্ম অন্তে এই জ্ঞান—কৃষ্ণ সব,
যে জ্ঞানী আমাকে পায়, সে মহাত্মা সুদুর্লভ"১৯

আর যাহারা দেবতার পূজা করে?

"লভে ক্ষণ-স্থায়ী ফল সেই অল্পজ্ঞানীগণ;
দেবযাজী পায় দেব, আমাকে মদ্ভক্ত জন।"২৩

আর,

"অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞ সহ জানে
যাহারা আমায়,
আমাকে সে যোগীগণ, প্রয়াণকালেও পার্থ!
জানিবারে পায়।"

অষ্টম অধ্যায়।

ব্রহ্মযোগ।

অধিভূতাদি কাহাকে বলে তাহা বুঝাইয়া ভগবান বলিলেন—

"সহস্র যুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার দিন বিদিত,
রাত্রিসুদ্ধ সহস্রান্ত,—জানে দিবারাত্রিবিৎ।১৭
অব্যক্ত হইতে সব জনমে আসিলে দিন।
সেরূপ আসিলে রাত্রি অব্যক্তেতে হয় লীন।১৮
ভূতগণ এইরূপে জন্মি জন্মি হয় লয়।
রাত্রিতে অবশ থাকে, দিবসেতে হয় লয়।'১৯

সংক্ষেপে এমন বিজ্ঞানসঙ্গত সৃষ্টি-প্রকরণ কি আর কোনও ধর্ম্মগ্রন্থে আছে? সৃষ্টিপ্রকরণ বুঝিলাম। তবে ভূতগণের এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থা ভিন্ন কি আর কিছু নাই?

"ব্যক্তাব্যক্ত ভিন্ন আছে সনাতন ভাব আর,
"সর্ব্বভূত হ'লে নাশ না হয় বিনাশ যার।২০
"অব্যক্ত অক্ষর সেই—তাহাই গতি প্রধান।২১

তাহাকে কিরূপে পাওয়া যায়?

"সে শ্রেষ্ঠ পুরুষ হয় অনন্য ভক্তিতে লাভ।
সর্ব্বত্র অন্তস্থ যার, সবে যার আবির্ভাব।"২২

ভগবান কহিলেন—

"জানিলে এ পথ যোগী নহে মুগ্ধ কদাচিত।
অতএব সর্ব্বকালে হও তুমি যোগান্বিত।"২৭

তুমি যোগান্বিত হইয়া যুদ্ধ কর।

নবম অধ্যায়।

রাজগুহ্য যোগ।

ভগবান এ অধ্যায়ে ঐশ্বরিক রাজ-গুহ্য ভাব, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নিগূঢ় তত্ত্ব সকল ব্যাখ্যা করিতেছেন।

"অব্যক্ত মূর্ত্তিতে মম জগত সর্ব্বব্যাপিত।
আমাতে সমস্ত ভূত, আমি নহি তাহে স্থিত।৪

সে আবার কি রূপ?

"যথা আকাশেতে নিত্য সর্ব্বগামী মহা বায়ু
করে অবস্থান,
সেই রূপে সর্ব্বভূত, আমাতেই অবস্থিত,
জানিও প্রমাণ।"

কি সুন্দর ও বিশদ উপমা। সেই সর্ব্বভূতের স্রষ্টা কে?

"কল্পক্ষয়ে সর্ব্বভূতে আমার প্রকৃতি পায়।
কল্পারম্ভে তাহাদের সৃজি আমি পুনরায়।"৭

কি প্রকারে?

"প্রকৃতি অধ্যক্ষে মম সৃজে এই চরাচর।
এই হেতু জগতের বিপর্য্যয় বীরবর॥" ১০

কিন্তু ভগবানই জগতের সর্ব্বেসর্ব্বা, এবং লোকেরা একত্বে বা পৃথকত্বে তাঁহারই পূজা করিয়া থাকে। আর,

"যারা শ্রদ্ধান্বিত হয়ে পূজে অন্য দেবতায়,
তারাও অবিধিমতে, কৌন্তেয় পূজে আমায়"২৩

ভক্তের অতি সামান্য উপহারও তিনি গ্রহণ করেন।

'ভক্তিতে যে জন দেয় পত্র, পুষ্প, ফল, জল,
লই আমি পবিত্রাত্মা ভক্তদত্ত সে সকল।"২৬

আর পাপী দুরাচারও যদি তাঁহার ভজনা করে,

"ধর্ম্মাত্মা হইয়া শান্ত পায় সে শান্তি পরম।
কৌন্তেয়! জানিও নষ্ট নাহি হয় ভক্ত মম"৩১

অতএব—

"মদ্ভক্ত, মদ্গত-চিত্ত, হও মম উপাসক,
কর নমস্কার!
যুক্তাত্মা মৎ-পরায়ণ এরূপ হইলে, পাবে
একত্ব আমার।" ৩৪

দশম অধ্যায়।

বিভূতি-যোগ।

অর্জ্জুন তখন জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কহ সে অশেষ দিব্য আপন বিভূতি চয়,
করিতেছে অবস্থিতি ব্যাপি যাহে লোকত্রয়।১৬
হে যোগি, কি ভাবে চিন্তি পাব আমি তব জ্ঞান'
চিন্তিব তোমায় আমি কি কি ভাবে, ভগবান?১৭

ভগবান কহিলেন, তাঁহার বিভূতি বা ৩৭

অনন্ত। জগতের যে জাতীয় দ্রব্যে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাই তাঁহার বিভূতি। যথা—

আদিত্যেতে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্মানেতে প্রভাকর
মরুতে মরীচি আমি, তারাগণে শশধর।" ২১

• • •

"বেগগামী মধ্যে বায়ু, শস্ত্রীগণে দাশরথী,
মৎস্যেতে মকর আমি, নদীগণে ভাগীরথী ৩১

• • •

"বাগ্মীগণে বাসুদেব, পাণ্ডবে শ্বেতবাহন,
কবিগণে শুক্রাচার্য্য, মুনিগণে দ্বৈপায়ন।"

মোটামুটি,

"যে সত্ত্ব ঐশ্বর্য্যান্বিত, শ্রীমৎ বা প্রভাযুত,
জানিবে সে সব মম তেজ-অংশ-সমুদ্ভূত।" ৪১

সর্ব্ব শেষ বলিলেন—

"কিম্বা এত, পার্থ, তব কিবা প্রয়োজন জানি?
একাংশে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া রয়েছি আমি।"

একাদশ অধ্যায়।

বিশ্বরূপ দর্শন।

অর্জ্জুন সেই বিশ্বব্যাপী ঐশীরূপ দেখিতে ইচ্ছা করিলে, ভগবান তাঁহাকে "দিব্য চক্ষু" দিয়া বলিলেন—

"দেখ পার্থ! দেখ শত সহস্র রূপ আমার
নানাবিধ, নানাবর্ণ, আমার দিব্য আকার।৫
দেখ সূর্য্য, বসু, রুদ্র, মরুত, অশ্বিনীসুত,
অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব, ভারত! দেখ অদ্ভুত।৬
এক স্থানে সমুদায় দেখ বিশ্ব চরাচর—
দেখ যাহা ইচ্ছা আর, মম দেহে, বীরবর!"৭

শ্রীকৃষ্ণ পরমযোগী। যাঁহারা যোগশাস্ত্র বিশ্বাস করেন, যাঁহারা বিশ্বাস করেন, আত্মা "মহিমাসিদ্ধির" দ্বারা বিশ্ব ব্যাপিতে পারে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের এই বিশ্বরূপে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় দেখিবেন না। যাঁহারা যোগশাস্ত্র বিশ্বাস না করেন, তাঁহারা এরূপ বুঝিলেই হইবে, যে ভগবান অর্জ্জুনকে উপরোক্ত মতে পরমেশ্বরের বিশ্বরূপ দেখাইলেন অর্থাৎ বুঝাইয়া দিলেন, আমরা বিশ্বের দ্বারাই একমাত্র বিশ্বেশ্বরকে জানিতে পারি। ইহার দ্বিতীয় উপায় নাই। অতএব বিশ্বই তাঁহার রূপ,—তিনি বিশ্বরূপ।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রদত্ত "দিব্যচক্ষু" বা জ্ঞানের দ্বারা অর্জ্জুন সেই বিশ্বরূপ দেখিলেন। দেখিয়া ভীত স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার ধ্যান করিলেন। কি ঈশ্বর-মাহাত্ম্যে, কি কবিত্বে, এই ধ্যান অপূর্ব্ব। বিস্মিত, পুলকিত, রোমাঞ্চিত অর্জ্জুন প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন—

"বহু বাহুদর, বদন নয়ন,
দেখিতেছি তব অনন্ত স্বরূপ;
নাহি অন্ত মধ্য, নাহি তব আদি,
দেখিতেছি, বিশ্বেশ্বর! বিশ্বরূপ।"১৬

আবার—

"দ্যুলোক, ভূলোক, অন্তরীক্ষ, ভূমি
ব্যাপিয়াছ একা দিক সমুদয়;
দেখিয়া অদ্ভুত উগ্ররূপ তব
হ'তেছে মহাত্মা! ভীত লোকত্রয়।"২

বিশ্বের দ্বারা বিশ্বকর্ত্তাকে দেখিতে গেলে তাঁহার ধ্বংস কার্য্যই নশ্বর মানবের সর্ব্বাগ্রে নয়নগোচর হয়। তাই—

"করাল দশন বদনে তোমার
দেখি কালানল-সন্নিভ প্রকাশ।
নাহি জানি দিক, নাহি পাই শান্তি,
সুপ্রসন্ন হও, হে জগন্নিবাস!" ২৫

আবার,

"যথা নদীদের বহু অম্বুবেগ,
সিন্ধু-অভিমুখী, প্রবেশে সাগরে;

তথা এই নরলোক বীরগণ
পশিছে জ্বলন্ত বদননিকরে।" ২৮

এই সর্ব্ব-সংহারক মূর্ত্তি দেখিয়া অর্জ্জুনের বীর-হৃদয়ও সন্ত্রস্ত হইল। তিনি বারম্বার কাতর হইয়া বলিলেন—

"প্রসীদ দেববর! জগন্নিবাস।"

তিনি বার বার ভক্তি ভাবে প্রণাম করিলেন—

"তোমাকে সহস্র করি নমস্কার
পুনঃ নমস্কার করি বহুবার। ৩৯
সম্মুখে, পশ্চাতে করি নমস্কার,
সর্ব্ব দিকে, সর্ব্ব প্রণাম আবার।"৪০

ভগবান প্রথমেই বুঝাইয়াছেন যে এই কালগ্রাস বা মৃত্যু প্রাণীমাত্রেরই অপরিহার্য্য অদৃষ্ট-লিপি। তখন অর্জ্জুনকে ডাকিয়া বলিলেন—

"অতএব উঠ, লভ তুমি যশ।
কর রাজ্য ভোগ নিমি শত্রু দল।
পূর্ব্বেই করেছি হত আমি সব,
সব্যসাচি। তুমি নিমিত্ত কেবল।"৩৩

দ্বাদশ অধ্যায়।

ভক্তি-যোগ।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবানকে যাহারা এরূপ সাকার ভাবে উপাসনা করে আর যাহারা অব্যক্ত নিরাকার ভাবে উপাসনা করে, এই দুই প্রকার উপাসকের মধ্যে কাহারা উত্তম। ভগবান বলিলেন, নিরাকার উপাসকই শ্রেষ্ঠ। যাহারা এরূপ ভাবে অব্যক্তের উপাসনা করে—

"সংযমি ইন্দ্রিয়গণ, সমজ্ঞান সমুদায়,
সর্ব্বভূতহিতে রত, তারাই আমাকে পায়।" ৪

কিন্তু নিরাকার উপাসনা বড় কঠিন।

"অব্যক্ত আসক্তদের ক্লেশ সমধিক তর,
দুঃখেতে অব্যক্তগতি পায় দেহধারী নর।"৫

সেই জন্য—

"আমাতে স্থাপিত স্থির চিত্ত যদি নাহি হয়,
পাইতে অভ্যাস যোগে ইচ্ছা কর, ধনঞ্জয়। ৯
অভ্যাসে অশক্ত যদি, হও মৎকর্ম্মপর;
করি কর্ম্ম মম তরে পাবে সিদ্ধি বীরবর।১০
তাতেও অশক্ত যদি, কর মম যোগাশ্রয়,
যতাত্মা হইয়া ত্যাগ কর কর্ম্ম-ফলাশয়।"১১

তাহার পর ভগবান কহিলেন, যে সর্ব্বভূতে সমদর্শী, যাহার সুখ দুঃখাদিতে সমজ্ঞান, যে জিতেন্দ্রিয়, যে—

"শুচি, দক্ষ, উদাসীন, বিগত-ব্যথ, নিস্পৃহ,
সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী, মদ্ভক্ত, সে মম প্রিয়।"১৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় কি? ভগবান কহিলেন, শরীর ক্ষেত্র, আমি ক্ষেত্রজ্ঞ, এবং ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। তাহার পর তিনি বুঝাইলেন, ভূতগণের সাধারণ প্রবৃত্তি যাহা তাহা ক্ষেত্রের বিকৃতি, এবং পূর্ব্বোক্ত উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। আর—

"তত্ত্ব জ্ঞানার্থ দর্শন, অধ্যাত্মজ্ঞান নিত্যতা,—
ইহাকেই কহে জ্ঞান, অজ্ঞান যাহা অন্যথা।১২

জ্ঞেয় স্বয়ং ভগবান—

"অবিভক্ত, ভূতগণে বিভক্ত রূপেতে স্থিত;
সৃষ্টি স্থিতি-গ্রাস-কারী সেই জ্ঞেয় অভিহিত।১৭
এই জ্ঞেয় পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয় অনাদি,
এবং গুণ ও বিকার মাত্রই প্রকৃতি-সম্ভূত।
"কার্য্য আর কারণের প্রকৃতিকে হেতু কহে,
সুখ দুঃখ ভোগ হেতু প্রকৃতি পুরুষ নহে।২১

"হইয়া প্রকৃতিস্থিত, পুরুষ প্রকৃতি জাত
ভুঞ্জে গুণগণ ;
এই গুণ-সঙ্গ, পার্থ! অসৎ সৎ যোনিতে
জনম কারণ।২২

কিন্তু পুরুষ তাহাতে লিপ্ত হন না।

"নির্লিপ্ত সূক্ষ্মতা হেতু সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত,
আকাশ যেমন ;
সর্ব্ব দেহে অবস্থিত নির্ব্বিকার পরমাত্মা
নির্লিপ্ত তেমন।" ৩৩

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গুণত্রয়-বিভাগযোগ।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে গুণের কথা আসিয়া পড়িয়াছে। ভগবান এই অধ্যায়ে গুণের প্রকৃতি বিশেষ করিয়া বুঝাইতেছেন। গুণরাশি তিনভাগে বিভক্ত—সত্ত্ব, রজঃ এবং তম।

"নির্ম্মলত্ব হেতু সত্ত্ব,—প্রকাশক, অনাময়,—
সুখ সঙ্গে, জ্ঞানসঙ্গে, করে বদ্ধ, ধনঞ্জয়!৬
তৃষ্ণা-সঙ্গ-সমুদ্ভূত রাগাত্মক রজঃগুণ,
দেহীকে কর্ম্মের সঙ্গে করে বদ্ধ, হে অর্জ্জুন!৭
সর্ব্বদেহী—মোহকারী জ্ঞান অজ্ঞানজ তমঃ,
প্রমাদ ও নিদ্রালস্যে করে বদ্ধ, অরিন্দম!

তাহার পর এই তিন গুণে মানুষকে কি প্রকার কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, ইহারা বর্দ্ধিত হইলে কিরূপ হয়, সে অবস্থায় মৃত্যু হইলে কি গতি হয়, এবং তাহার ফলাফল কিরূপ, ভগবান তাহা বিস্তারিত রূপে বুঝাইলেন।

"সুকৃত কর্ম্মের, পার্থ! সাত্ত্বিক ফল নির্ম্মল ;
রজসের ফল দুঃখ, তমের অজ্ঞান ফল।"১৬

কিন্তু এই ত্রিগুণ অতিক্রম না করিলে মুক্তি নাই

"সেই সমুদ্ভূত এই গুণত্রয় অতিক্রমি
আত্মা দেহধারী,
জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখ-মুক্ত হ'য়ে, অমৃতের
হয় অধিকারী"।২০

এই তত্ত্ব নিরাকরণ করিবার জন্যেই ভগবান বুদ্ধদেব সংসারত্যাগী হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার অপূর্ব্ব জীবনের মূলমন্ত্র। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, ত্রিগুণাতীত বা ত্রিগুণ-অতিক্রমকারীর লক্ষণ কি?

ভগবান বুঝাইলেন, যে জিতেন্দ্রিয়, সমজ্ঞানী, এবং নিষ্কাম—

"উদাসীন মত থাকে, নহে গুণে বিচলিত,
গুণ কার্য্যে রত জানি, রহে যে অচলচিত,
সে ব্যক্তিই গুণাতীত। আর—
"অনন্য-ভক্তিযোগেতে যে জন সেবে আমায়,
হ'য়ে সর্ব্বগুণাতীত সে ব্রহ্মত্ব ভাব পায়।"২৬

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পুরুষোত্তম যোগ।

সেই ত্রিগুণাত্মক সংসার কিরূপ, তাহা একটী "ঊর্দ্ধমূল-অব্যয় অশ্বত্থ" বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করিয়া অতি সুন্দর রূপ বুঝান হইয়াছে

"অধে ঊর্দ্ধে তার শাখা প্রসারিত,
গুণেতে বর্দ্ধিত, বিষয়ে পল্লবিত,
অধ অনুগামী বাসনার মূল,—
নরলোকে কর্ম্ম-বন্ধন নিশ্চিত।"২

বৈরাগ্য দৃঢ়াস্ত্রে ইহাকে ছেদন করিয়া পরম ধাম অন্বেষণ করিতে হইবে। সে কিরূপ?—

"চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি যথা নাহি করে দীপ্তি দান,
যথা গেলে নাহি ফের, সে মম পরম ধাম।"৬

মৃত্যু ও জন্ম সময়ে এই গুণভোগী ইন্দ্রিয়গণ কোথায় যায়?

"দেহ প্রাপ্তিকালে, আর দেহ পরিত্যাগকালে
করেন ঈশ্বর

গ্রহণ ইন্দ্রিয়গণ, পুষ্প হ'তে যথা গন্ধ
লয় সমীরণ।"৯

ত্রিগুণান্বিত ও ইন্দ্রিয়-সমন্বিত ভূতগণ ক্ষর এবং ভূতস্থ পুরুষ অক্ষর। তবে পরমেশ্বর কি?

"ক্ষরের অতীত আমি, অক্ষর হ'তে উত্তম,
এইহেতু লোকে বেদে আখ্যাত পুরুষোত্তম১৮

ষোড়শ অধ্যায়।

দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগ যোগ।

ভগবান এই অধ্যায়ে বুঝাইতেছেন যে ত্রিগুণান্বিত এবং ইন্দ্রিয়-সমন্বিত লোক দুই প্রকার প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। যাহারা দৈব সম্পদেতে অভিজাত, অর্থাৎ দৈবগুণ বিশিষ্ট হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, তাহারা এই গীতোক্ত উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল লাভ করে, আর যাহারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিপরায়ণ তাহারা আসুরী সম্পদেতে অভিজাত।

"অসত্য, অপ্রতিষ্ঠিত, অনীশ্বর এ জগৎ,
আসুরীরা কহে,
কাম-হেতু-পরস্পর-সম্ভূত ভিন্ন ইহা
আর কিছু নহে।"৮

আমাদের শিবলিঙ্গ পূজা কি তবে ইহাদের দ্বারাই প্রচলিত? এই অসুর-জন্মাদের প্রবৃত্তি যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা আমাদের আধুনিক সমাজের একটী জীবন্ত চিত্র। বর্ণনাটী আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কিছু গায়ে লাগিবার কথা।

"আসুরগ চিন্তাগ্রস্থ হইয়া অপরিমাণ,
কাম-উপভোগ ধ্রুব করে পরমার্থ জ্ঞান।১১
শত আশা-পাশে বদ্ধ, কামক্রোধ-পরায়ণ,
কামার্থ সঞ্চিতে ব্যর্থ অন্যায় করে যতন।১২

এইরূপে বুঝাইয়া ভগবান কহিলেন—

"দ্বেষ্টা, ক্রূর, মন্দকারী, সংসারে সে নরাধম,
আসুরী যোনিতে আমি অজস্র করি ক্ষেপণ।১৯

পরলোক বা পুনর্জন্ম বিশ্বাস না করিলেও দেখিতে পাই, সচরাচর পুরুষানুক্রমে যোগীর সন্তান যোগী, পাপীর সন্তান পাপী এবং পুণ্যাত্মার সন্তান পুণ্যাত্মা হইয়া থাকে। আর্য্য শাস্ত্রানুসারে পতি, পত্নীর গর্ভে সন্তান রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। এজন্যে পত্নীর এক নাম জায়া।

মোক্ষার্থে দৈবী-সম্পদ, আসুরী বন্ধন তরে।
কেন কর শোক তুমি দৈবী জন্মলাভ করে!২

সপ্তদশ অধ্যায়।

শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ যোগ।

মানুষের দুই প্রকার প্রকৃতি বুঝাইয়া এখন ভগবান বুঝাইতেছেন, মানুষের শ্রদ্ধা তিন ভাগে বিভক্ত।—সাত্বিক, রাজসিক, এবং তামসিক। এ তিন শ্রদ্ধানুসারে লোকের পূজা, আহার, যজ্ঞ, এবং তপ সকলই তিন প্রকার। তন্মধ্যে—

"সুখ্যাতি-মান-পূজার্থ দম্ভে অনুষ্ঠিত তপ—
চঞ্চল, অধ্রুব—তাহা রাজসিক, পরন্তপ।৮"১

তেমনি দানও তিন প্রকার—

"দাতব্য মাত্র জানিয়া অনুপকারীকে দান।
যথা দেশে,কালে,পাত্রে, সাত্বিক তাহার নাম২০

আর—

"প্রতি-উপকার তরে, কিম্বা ফল-কামনায়,
ক্লিষ্ট ভাবে দেয় যাহা,—রাজস কহে তাহায়২১

সর্ব্ব শেষ—

"অদেশে, অকালে, যাহা অপাত্রেতে হয় দান
অশ্রদ্ধা অবজ্ঞা সহ—তামস তাহার নাম।২২

অষ্টাদশ অধ্যায়।

মোক্ষ যোগ।

ভগবান কহিলেন, উপরোক্ত যজ্ঞ, দা-

তপ, কর্ম্মাদির দ্বারা মনীষিরা পবিত্রিত হইয়া থাকেন, অতএব তাহা কদাচিৎ ত্যাগ করিবে না। তবে

"তোমিয়া আসক্তি, ফল, কর্ত্তব্য এ কর্ম্ম সব
নিশ্চিত উত্তম মত এই মম, হে পাণ্ডব !৬
কেন ?

"কর্ম্মের ত্রিবিধ ফল, অনিষ্ট, ইষ্ট, মিশ্রিত,
ঘটে অত্যাগীর পরে, ত্যাগীর নহে কচিৎ।১২

কর্ম্মের হেতু পাঁচটী—দেহ, কর্ত্তা, ইন্দ্রিয়-গণ, চেষ্টা এবং দৈব। কর্ম্মের প্রবর্ত্তক তিন—জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা। কর্ম্মের আশ্রয়ও তিন—করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা। জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, বুদ্ধি, ধৃতি, এবং সুখ গুণভেদে ত্রিবিধ—সাত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক।

"নাহি পৃথিবীতে, স্বর্গে, দেবগণে, কদাচন
প্রকৃতিজ এই তিন গুণ-মুক্ত যেই জন।১০
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রদের, বীরবর !
স্বভাব-সম্ভূত গুণে প্রবিভক্ত কর্ম্ম সব।"৪১

এই স্বাভাবিক কর্ম্ম করিলে কদাচ পাপ হয় না।

এমন কি—

"সদোষ হ'লেও নাহি কদাচ সহজ কর্ম্ম
করিবে বর্জ্জিত;
ধূমাবৃত অগ্নি মত, সর্ব্ব কর্ম্মারম্ভ থাকে
দোষে আবরিত।৪৮

ভগবান কহিলেন—

করিব না যুদ্ধ, ইহা ভাবিছ যে অহঙ্কার
করিয়া সহায়,
মিথ্যা সে সঙ্কল্প তব, প্রকৃতিই নিয়োজিত
করিবে তোমায়।৫৯

* * * *

"সর্ব্বভূত-হৃদয়েতে বিরাজিত, হে অর্জ্জুন !
আছেন ঈশ্বর ;
ভ্রমেণ সর্ব্ব ভূত মায়া-বলে ভ্রাম্যমাণ
করি নিরন্তর।"৬১

অতএব—

"ছাড়িয়া সকল ধর্ম্ম, লও তুমি একমাত্র
শরণ আমার।
করিও না শোক, পার্থ ! সর্ব্ব পাপ হ'তে আমি
করিব উদ্ধার।"৬৬

গীতা শেষ হইল। "লও তুমি একমাত্র শরণ আমার" এইটী গীতার মূল মন্ত্র, চরম শিক্ষা। বুঝিলাম, ভগবান ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাঁহার প্রকৃতির বা শক্তির ব্যক্ত ভাবই পরিদৃশ্যমান জগৎ। তাঁহার প্রকৃতি হইতে জগৎ সৃষ্ট, তাঁহার প্রকৃতির দ্বারা জগৎ বর্দ্ধিত ও পালিত, এবং তাঁহার প্রকৃতিতেই জগৎ বিলীন হইয়া যায়। তিনি সর্ব্বভূতস্থ আত্মা। অতএব আত্মা অমর; মৃত্যু দেহের অবস্থান্তর মাত্র। এই প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম্মের নাম স্বধর্ম্ম। অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া, এবং ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করিয়া, নিষ্কাম ভাবে স্বধর্ম্ম পালন করিলেই চরম মনুষ্যত্ব বা পরম সুখ লাভ হয়। ভগবান সর্ব্ব-ভূতস্থ; অতএব সর্ব্বভূতকে আত্মসম জ্ঞান করিয়া, সর্ব্বভূতহিতার্থ কর্ম্ম করিলেই, কর্ম্ম-ফল ভগবানে সমর্পিত হয়।

এই অপূর্ব্ব ধর্ম্মগীতা শেষ করিয়া ভগবান অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"একাগ্র চিত্তে কি পার্থ ! করিলে ইহা শ্রবণ ?
অজ্ঞানজ মোহ তব হইল কি বিমোচন ?"৭২

ভারত মাতার কি এমন দিন হইবে যে আর্য্যসন্তানেরা এই ভগবদ্গীতা পাঠে স্বধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া অর্জ্জুনের মত ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে বলিবে—

"নষ্ট মোহ, স্মৃতিলাভ, হয়েছে প্রসাদে তব,
গত ভ্রান্তি মম ; আজ্ঞা পালিব তব, কেশব।"

যিনি মনোনিবেশপূর্ব্বক এই গীতা পাঠ করিবেন, তাঁহাকে সঞ্জয়ের মত বলিতে হইবে—

"কৃষ্ণার্জ্জুন এ সম্বাদ, অদ্ভুত ও পুণ্যাধার,
স্মরিয়া স্মরিয়া হৃষ্ট হইতেছি বারম্বার।৭৬
হরির অদ্ভুত রূপ স্মরিয়া স্মরিয়া আর
হ'তেছে বিস্ময় মহা, হৃষ্ট চিত্ত বারম্বার।৭৭

সঞ্জয় যে ভবিষ্যদ্বাণী অন্ধরাজকে বলিয়া গীতা আবৃত্তি শেষ করিয়াছিলেন, অদ্য "ভারত হিতৈষীগণকে" তাহা উপহার দিয়া এই সমালোচনা শেষ করিলাম।

যথা যোগেশ্বর কৃষ্ণ, যথা পার্থ ধনুর্দ্ধর,
তথা শ্রী, বিজয়োন্নতি, নীতি ধ্রুব, নৃপবর!

ভারতের হৃদয়ে কৃষ্ণ, যাহাতে পার্থ, অধিষ্ঠিত না হইলে, ভারতের শ্রী, বিজয়োন্নতি, ও ধ্রুব নীতির আশা নাই। *

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

বাঙ্গালায় নাটকের অবস্থা।

Hamlet—"O, reform it altogether. And let those that play your clowns, speak no more than is set down for them. For there be of them, that will themselves laugh, to set on some quantity of barren spectators to laugh too; though in the meantime, some necessary question of the play be then to be considered: that's villanous; and shows a most pitiful ambition in the fool that uses it. So, make you ready."

Shakespeare.

কখন কখন এক একটা একটা স্রোত আসে। যখন যখন অনাহূতই আসিতে থাকে, কোন বাধা বিপত্তি মানে না, গতির প্রতিরোধ করিতে গেলে কোনও ফল দেখে না, আপন বলে দেশ ভাসাইয়া লইয়া যায়। সেই স্রোতের মুখে যাহারা পড়ে, তাহাদের মধ্যে যাহারা সন্তরণপটু, তাহারা গা ভাসাইয়া সাঁতার

---

* বাঙ্গালার লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন কবিতায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনুবাদ করিয়াছেন। পুস্তক প্রকাশিতপ্রায়। নবীন বাবুর কবিত্ব ও তাঁহার ভাষা সর্ব্বজনপ্রশংসিত। এই অনুবাদে তিনি তাঁহার ক্ষমতার আরও এক সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি অক্ষরে অক্ষরে, ছত্রে ছত্রে, শ্লোকের মাত্রায় মাত্রায় অনুবাদ করিয়াছেন, অথচ তাহাতে ভাবের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। শব্দের আড়ম্বর নাই, ব্যাখ্যার ঘোরঘটা নাই, অথচ যে সহজ কথায় ও সুকৌশলে ইহা অনুবাদিত হইয়াছে, তাহা পড়িলেই সেই মহাগ্রন্থের তাৎপর্য্য কাহারও বুঝিতে বাকি থাকে না। পুস্তক প্রকাশিত না হইলে সে সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা ভাল দেখায় না। তবে, নবীনবাবু তাঁহার এই প্রবন্ধে সেই অনুবাদ গ্রন্থ হইতে স্থানে স্থানে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাই ধরিয়া এতটা বলিলাম। গীতা-পাঠকগণ এই কয়েকটী শ্লোকের অনুবাদ দেখিয়াই আমাদের বাক্যের সপ্রমাণতা বুঝিতে পারিবেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধটী তাহার উপক্রমণিকা রূপে ব্যবহৃত হইলে বড় ভাল হইবে।

ক, স।

খেলাইয়া অনায়াসে তীরে উত্তীর্ণ হয়; আর যাহারা আনাড়ি, তাহারা হাবুডুবু খায়, জল গিলে, শেষ ধনুষ্টঙ্কারের রোগীর ন্যায় চরে লাগিয়া হাত পা ছড়াইয়া কাদা মাখিয়া পড়িয়া থাকে। কাণ্ডারও বা কোন সন্ধানই মেলে না, স্রোতে তাহাকে একেবারে ভাসাইয়া লইয়া যায়। পার্শ্বস্থ লোক ইহা দেখিয়া ভীত হয়, মনে মনে প্রমাদ গণে, যথাসাধ্য প্রতিকারের চেষ্টা পায়। কিন্তু যতক্ষণ এ স্রোত আপন তেজে বহিতে থাকে ততক্ষণ কোন চেষ্টাই ফলবতী হয় না। আবার ঈশ্বরের এমনই খেলা, যখন ইহা যায়, তখন একেবারেই যায়। দেখিতে শুনিতে দেয় না, রাতারাতি আপনা আপনি কোথায় মিলাইয়া যায়। শেষ উচ্চৈঃস্বরে তাহার জন্য চীৎকার ছাড়িলেও আর সে ফিরিয়া দেখে না।

ধর্ম্মে, সমাজে, সাহিত্যে, মনুষ্যচরিত্রে সকল বিষয়েই এক এক সময়ে এমনই এক একটা স্রোত আসে। বাঙ্গালার নাটকেও এমনি এক সময়ে একটা স্রোত আসিয়াছিল। বেশী দিন নয়, ১২।১৪ বৎসরের কথা। তখন ইহার বল দেখে কে? নাটক নাটক করিয়া একটা তুমুল রব উঠিল, দেশময় হুলস্থুল পড়িয়া গেল, দেখিতে দেখিতে নাটকে বাঙ্গালা ছাইয়া পড়িল। স্কুল-মাষ্টার, আপিসের কেরাণী, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, উমেদার, পিয়ন, হরকরা, স্কুলবয়, পাঠশালার প'ড়ো—শেষ—কোণের বউ সবাই নাটক-লেখক। ছাপাখানার অবসর নাই, দিনরাত্রি নাটক ছাপিতেছে; ব'য়ের দোকানে রাশি রাশি নাটক গাদা হইতেছে; রেজিষ্ট্রি আপিসে রোজ আর এত নাটক রেজিষ্ট্রি হইয়া উঠিতে পারে না। তুমুল ব্যাপার। লণ্ড ভণ্ড কাণ্ড উপস্থিত। ফলও বড় ভয়ানক হইতে লাগিল। অনেক উকীলের অন্ন উঠিল, তিনি মোকদ্দমার ব্রিফ্ লিখিতে গিয়া নাটক লিখিয়া বসেন, কাযেই মক্কেলেরা আর মোকদ্দমা দেয় না। অনেক কেরাণী মারা পড়িল, সে আপিসে গিয়া খাতা খুলিয়া কেবল নাটক লেখে, আপিসের কাজ করে না, সাহেব দিন কয়েক দেখিয়া তাড়াইয়া দিল। অনেক স্কুলের ছেলের এইখানেই পড়া বন্ধ হইল। অনেক কর্ত্তা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল, গৃহিণীর নাটক লেখার আলায় উঠি, আর দুটী রাঁধা ভাত [illegible] একলে প্রমাদ গণিতে [illegible] মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ছাড়িয়া ইহার [illegible] কলই নগণ্য মাত্র। [illegible] খেলা ধূলার [illegible] শেষ করিলেন; [illegible] বিদায় [illegible] কতই কড়া বলিলেন। কিন্তু [illegible] হইল না। কে কার কথা শুনে? [illegible] বলে তোড়ে বহিয়া চলিল। [illegible] হইল, 'বঙ্গদর্শন' বিদ্রূপ করিয়া [illegible] দিন বলিয়াছিলেন প্রকৃত কার্য্যে তাহাই পরিণত হইল। নাটকের নাম আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তখন "বলদ-মহিমা নাটক", "ছারপোকা নাটক" প্রভৃতি নাম গ্রহণ করিতে লাগিল। কিন্তু অনেকেই তো এ স্রোতে আত্ম-সমর্পণ করিল, তাহাদের পরিণাম হইল কি? যাঁহারা কয়েকজন পাকা লোক তাঁহারাই কেবল ধীরে ধীরে সাঁতারিয়া তীরে উঠিলেন। তা ছাড়া, আর আর সকলে হাবুডুবু খাইল; কেহ তলাইয়া পড়িল, কেহ চরে লাগিয়া হাত পা ছড়াইয়া কাদা মাখিয়া পড়িয়া রহিল; কেহ স্রোতের মুখে কোথায় যে ভাসিয়া

যেন আজও কোন ঠিকানা মিলিল না।

তার পর, হঠাৎ এক দিন এ স্রোত কোথায় মিলাইয়া গেল। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া সংস্র লোকের চীৎকারে যাহা হইল না, এক দিনে রাতারাতির মধ্যে তাহা আপনা আপনিই চলিয়া গেল। ভাল করিয়া দুটা কথা বলিবারও সময় দিল না। বাঙ্গালায় আজ কাল নাটকের বড়ই দুর্দ্দিন। যে সময়ের কথা বলিলাম, তখনও যে ইহার বিশেষ একটা সুদিন গিয়াছে তাহাও দেখি না। অগণ্য নাটক প্রসিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের [illegible] ছাড়া প্রকৃত [illegible] নাহিত্য-

Hamlet more th[illegible] to [illegible]

র যে সমস্ত লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন তাহা দুই এক খানিতে কদাচিৎ পাওয়া যায়, নহিলে আর সব কেবল কথার যোজনা মাত্র। তাহাতে 'প্রাণনাথ' আছে, 'হায় সখি, কি হলো' আছে, 'পতন' আছে, 'মূর্চ্ছা' আছে; বেদ, বিলাপ, রোদন, দীর্ঘশ্বাস, হাসি, তামাসা, স্বপ্ন, যুদ্ধ—আর আর সবই আছে, কিন্তু নাটকের যাহা নাটকত্ব তাহা নাই। তাহা প্রকৃত পক্ষেই 'না টক না মিষ্টি!'

বস্তুতঃ এত অসংখ্য নাটকের মধ্যে প্রকৃত নাটককার বলিয়া নাম করিবার অতি অল্পই লোক দেখিতে পাই। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন বাঙ্গালার প্রথম নাটক রচনা করেন। তাঁহার "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" বাঙ্গালার প্রথম নাটক। কিন্তু 'কুলীন কুলসর্ব্বস্বে' নাটক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবার কিছুই নাই। তাহা আদ্যা সংস্কৃত, আধা বাঙ্গালা। যাহা বাঙ্গালার প্রথম নাটক তাহা এরূপ সংস্কৃতবহুল হওয়া বিচিত্র নহে। তার পর, তর্করত্ন মহাশয় আরও অনেক নাটক লিখিয়াছেন। তাঁহার রত্নাবলী, বেণীসংহার প্রভৃতি সংস্কৃতের অনুবাদমাত্র; কিন্তু তাঁহার 'নবনাটক' খানি তাঁহার সম্পূর্ণ নিজের। নবনাটকে তাঁহার ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় পাইলেও আমরা তাহাকে নাটকাংশে তত শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতে পারি না।* পণ্ডিত রামনারায়ণ 'নাটুকে নারাণ" বলিয়া অনেকের কাছে প্রসিদ্ধ ছিলেন। যিনি বাঙ্গালার প্রথম নাটকের সৃষ্টি করেন, তাঁহার এ নাম পাওয়া উচিত 'কুলীনকুল-সর্ব্বস্বে'র পর 'বিধবা বিবাহ' নাটক প্রকাশিত হয়। ইহার রচয়িতা বাবু উমেশচন্দ্র গুপ্ত। "বিধবা বিবাহে" পক্ষমাত্র সমর্থনের চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই বিশেষ দেখিতে পাই না। ইহার পরে অনেকেই নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। তাহার মধ্যে দুই মহাপ্রতিভাশালী ব্যক্তি ভিন্ন নাম করিবার আর কেহ নাই। মাইকেল ও দীনবন্ধু যে দিন বাঙ্গালায় নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন সেই দিনই বাঙ্গালায় নাটকের সুবর্ণযুগ প্রবর্ত্তিত হয়। 'কৃষ্ণকুমারী', 'পদ্মাবতী', 'শর্ম্মিষ্ঠা' প্রভৃতি অনেক গুলি নাটক মাইকেল রচনা করেন, কিন্তু তাঁহার অন্য গুলি নাটকাংশে কিছুই না হইলেও, এক "কৃষ্ণকুমারী" তাঁহার সকল যশ বিস্তার করিয়াছে। নাটকের যে সমস্ত লক্ষণ "কৃষ্ণকুমারী"তে আমরা তাহা সব খুঁটিয়া দেখিতে পাই। বাঙ্গালার সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি একজন যে উচ্চদরের নাটককার তাহা আমরা বুঝিতে পারি। আর, দীনবন্ধু? সাহস করিয়া বলিতে পারি, বাঙ্গালা ভাষা যত দিন জীবিত থাকিবে, দীনবন্ধুর সে "নীলদর্পণ" কেহই বিস্মৃত হইতে পারিবে না। 'নীল-

দর্পণ' বাঙ্গালার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক। নাটক লিখিতে হইলে কিরূপ শক্তি, কিরূপ সুদক্ষ ও কিরূপ দর্শন লইয়া বসিতে হয়, তাহা আমরা 'নীলদর্পণ' পাঠে বুঝিতে পারি। এ ছাড়া, দীনবন্ধু আরও অনেক গুলি নাটক প্রণয়ন করেন। তাঁহার 'নবীনতপস্বিনী', 'লীলাবতী', 'জামাইবারিক' প্রভৃতি পাঠ করে নাই, বাঙ্গালায় এরূপ অল্পই লোক আছে। কিন্তু এ গুলিতে তাঁহার কবিত্ব ও ক্ষমতার পরিচয় থাকিলেও আমরা নাটকত্বের বিশেষ পরিচয় পাই না। অধিকাংশই নাটকাকারে প্রহসন। প্রহসনে দীনবন্ধু সর্ব্বেসর্ব্বা। তাঁহার "সধবার একাদশী" প্রহসনে অদ্বিতীয়। দীনবন্ধুর পর বিস্তর নাটককার দেখিতে পাই। সেই নাটককারদিগের হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি ও পেশাপিশির মধ্যে কয়েকজনকে মাত্র চিনিয়া লইতে পারি। প্রথম, বাবু মনোমোহন বসু। মনোমোহন বাবুর অধিকাংশ নাটকই পৌরাণিক। 'রামাভিষেক', 'সতী-নাটক', 'হরিশ্চন্দ্র', 'পার্থপরাজয়'—এ সকলই পুরাণ অবলম্বনে লিখিত। সুতরাং এ সকলে তাঁহার কবিত্ব ও রচনানৈপুণ্য ভিন্ন উদ্ভাবনী শক্তির বড় একটা পরিচয় পাই না। কিন্তু মনোমোহন বাবু যে সে শক্তিতে বঞ্চিত নহেন, তাহা আমরা তাঁহার 'প্রণয় পরীক্ষা' পাঠে জানিতে পারি। 'প্রণয় পরীক্ষা,' একখানি সুন্দর নাটক। তার পর, বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'পুরুবিক্রম', 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতী' প্রভৃতি কয়েকখানি নাটক ইহাঁর লেখা। 'সরোজিনী' সে সকলের মধ্যে উৎকৃষ্ট, ইহা বাঙ্গালার একখানি উপাদেয় নাটক। আগাগোড়া কান্নাহাটি হইলেও আমরা এ পুস্তক ভালবাসি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাবুর নামের পর আর একটী নাম মনে আসে। ৺ দুর্গাদাস দাস। ইহা গ্রন্থকারের প্রকৃত নাম নহে। তাঁহার আসল নাম, উপেন্দ্রনাথ দাস। 'শরৎসরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' এই দুই খানি পুস্তক ইহাঁর রচিত। সামাজিক নাটকের মধ্যে দুই খানিই অতি উৎকৃষ্ট। সুরেন্দ্রবিনোদিনীতে ইংরাজের অত্যাচারের কাহিনী যে স্থলে বর্ণিত হইয়াছে তাহা অতি চমৎকার। এক দিন এই পুস্তকখানি লইয়া খুব হলস্থূল হইয়াছিল। ইহার পর নাম করিবার মত আর নাটককার দেখি না। বাবু হরলাল রায়, বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি দুই একজন ছাড়া আর সকলই নগণ্য মাত্র।

তার পর, সেই যে দুদিনের খেলা ধুলার পর নাটক অকালে বাঙ্গালা হইতে বিদায় গ্রহণ করিল, আর তাহা ফিরিল না। ভাল হউক, মন্দ হউক, তবু তখন দুদিন অন্তর দুই একখানা করিয়া নূতন নাটকের মুখ দেখা যাইত; এখন আর নাটকের নামটী পর্য্যন্ত শোনা যায় না। সেই পুরাতন ভরসা। অথচ, আজকাল সহরের গলিতে গলিতে থিয়েটার হইতেছে; গ্রামে গ্রামে নাট্যসমাজ জন্ম গ্রহণ করিতেছে; যাত্রার দলে পর্য্যন্ত আজ কাল অভিনয়ের প্রথা আরম্ভ হইয়াছে; পাড়ার ছেলে গুলো খেলা ধুলা ভুলিয়া দিনরাত্রি বাখারি লইয়া 'পাহর, নীচাপর' ইত্যাকার শব্দে কান ঝালাপালা করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু কৈ, নাটক কৈ? এত হইতেছে, কিন্তু নাটক তো আর এক খানিও হইতেছে না। অনেকে সেই পুরাতনই বার বার অভিনয় করিতে লাগিল। কিন্তু চিরশ্রুত বিষয় শুনিতে আর ভাল লাগে না, সকলেই নূতন চায়। কিন্তু নূতন নাই—

হইল না। তখন কাব্য ভাঙ্গিয়া, উপন্যাস ভাঙ্গিয়া তাহাই থিয়েটারে থিয়েটারে অভিনীত হইতে লাগিল। কিন্তু কাব্য এক জিনিস, উপন্যাস এক জিনিস, আর নাটক স্বতন্ত্র জিনিস। যাহা ভাল কাব্য তাহা ভাল নাটক না হইতে পারে, যাহা ভাল উপন্যাস তাহা যে নাটকাংশেও ভাল হইবে এমন কিছু কথা নাই। সকল কাব্য ও সকল উপন্যাস নাটক হয় না। সুতরাং উৎকৃষ্ট কাব্য ও উপন্যাস অনেক থাকিলেও তাহা ভাঙ্গিয়া নাটক বেশি হইল না। যাহা হইল, তাহাতে দিন কয়েক চলিল। তার পর, যে নাই—সে নাই। যে সব সখের থিয়েটার, তাহাদের পুরাতন লইয়া চলিতে পারে বটে, কিন্তু যাহারা পেশাদার তাহাদের চলে না। কাজেই নূতনের জন্য তাহাকার উঠিল। পুরাতনে আর পয়সা হয় না, দর্শকদিগকে নূতন কিছু দেখাইতে হইবে, তাহা ভাবিয়া থিয়েটার কোম্পানিরা উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। তখন রমণীগণ তাহাদের দলে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। থিয়েটার কোম্পানিরা জানিত, দর্শকেরা সেই রমণীগণের কণ্ঠনিঃসৃত গীতসুধা পান করিতে বড়ই উৎসুক, সুতরাং সেই সকল রমণীর নৃত্য ও গীত যুগপৎ যে সহজেই তাহাদের মন হরণ করিবে ইহা একরূপ নিশ্চয় কথা। তখন ইংরাজেরা এক দিন ইটালিয়ানের অনুকরণে যাহা করিয়াছিল, ইংরাজের অনুকরণে আবার বাঙ্গালীরা তাহাই করিল। বাঙ্গালায় অপেরার সৃষ্টি হইল। দেখিতে দেখিতে বস্তা বস্তা অপেরা জন্মিতে লাগিল। আমরা সে রাশির মধ্যে "সতী কি কলঙ্কিনী", 'আদর্শসতী', 'হরিশ্চন্দ্র' প্রভৃতি দুই চারি খানি ছাড়া নাম করিবার আর কিছু পাই না। থিয়েটার কোম্পানি যাহা ভাবিয়াছিল তাহাই হইল। দিনকতক খুব একটা চি চি পড়িয়া গেল। অভিনয় রাত্রে রঙ্গভূমিতে আর লোক ধরে না। একে রমণীগণের সকটাক্ষ হাবভাবব্যঞ্জক মনোহর নৃত্য, তায় আবার বীণাঝঙ্কার-নিন্দিত অপূর্ব্বকণ্ঠগীতিবৎ গানের সুর পরদায় পরদায় উঠিতেছে, দর্শক দেখিবে কি শুনিবে কিছুই ভাবিয়া পায় না। ঘন ঘন করতালি, ঘন ঘন encore—encore শব্দ উঠিতে লাগিল। মুটে মজুরেরাও রাস্তা ঘাটে সেই গান গাহিতে আরম্ভ করিল। এই দিন হইতে নাটকের প্রকৃত অবনতি আরম্ভ হইল।

পরস্পরের কথাবার্ত্তা ছাড়া নাটক যে আরও কিছু একটা স্বতন্ত্র জিনিস ইহা মনে থাকা আবশ্যক। আহারান্তে উপাধানে মস্তক রক্ষা করিয়া অর্দ্ধ-নিদ্রিত অর্দ্ধ-জাগ্রত অবস্থায় সটকা টানিতে টানিতে মুদিতপ্রায় চক্ষে পড়িয়া কেবল ইহা উপভোগ করিবার সামগ্রী নহে। বাঙ্গালার নাটক দেখিয়া নাটকের বিচার করিও না। বলিয়াছি তো, বাঙ্গালায় কোন কালেই নাটকের সুদিন আসে নাই। টীকা ভিন্ন অনেক নাটক সবটা বুঝিয়া উঠা যায় না। কালিদাস ও ভবভূতির টীকাকারগণ না থাকিলে সেই সব অমূল্য সামগ্রীর প্রকৃত আস্বাদ গ্রহণ করিতে আজ আমরা পারিতাম কি না সন্দেহ। আর, ইংলণ্ড বিদ্যানের দেশ, সেখানে আজ সেক্‌পীয়রের টীকাকারের সংখ্যা হয় না। আবার, অনেক স্থলে টীকাকারদিগের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। এক বিষয়ের ভিন্ন জনে ভিন্ন অর্থ করিতেছেন। কিন্তু সহস্র টীকায়

যাহা না হয়, এক অভিনয়ে তাহা হইয়া যাকে। অভিনয় নাটকের প্রাণ, নির্জ্জীব নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণকে সজীব করিয়া দেখায়। আমরা নির্জ্জীব অবস্থায় যাহাকে না বুঝিতে পারি, জীবন্ত অবস্থায় অতি সহজেই তাহাকে চিনিয়া লইতে পারি। অভিনয় কার্য্য নিতান্ত সহজ নহে। মনে করিলেই অভিনেতা হওয়া যায় না। কেবল চীৎকারপটু, আবৃত্তিকুশল, লম্ফনশীল ও ভঙ্গীদোরস্ত হইলেই অভিনেতা হয় না। তা, সে কথা যাক। বলিতেছিলাম, অভিনয়ই নাটকের প্রাণ। অভিনয়ে নাটকের আরও আদর বাড়ে। সেক্ষপীয়র নিজের নাটক নিজে অভিনয় করিতেন। ভবভূতি আপনি থাকিয়া কালপ্রিয়নাথের মন্দিরে তাঁহার প্রণীত নাটক অভিনয় করাইতেন। কেবল আজ কালের কথা নহে, তখনও অভিনয় দেখিয়া নাটকের বিচার হইত। ভবভূতির "উত্তর চরিত" অপূর্ব্ব সামগ্রী হইলেও অভিনয়ে তত জমে নাই; তাই কবি "মালতীমাধব" প্রণয়নের পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন "জানন্তি কিমপি তে ছান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।" ইহা তো গেল সে কালের কথা। আজ কাল তখনকার অপেক্ষা সকল বিষয়েই কিছু না কিছু বাড়াবাড়ি দেখা যায়। সুতরাং অভিনয় ভিন্ন অনেক নাটকের আদর যে আজ কাল হইবে না, ইহা নিতান্ত বিচিত্র নহে। গ্রন্থকার দেখেন, অভিনয় ভিন্ন তাঁহার নাটকের কাটতি হয় না। ঘরের পয়সা খরচ করিয়া লোকসান দিতে হয়। পক্ষান্তরে, থিয়েটার কোম্পানি ব্যবসাদার লোক, কিসে দু-পয়সা উপার্জ্জন হইবে সেই দিকেই তাঁহাদের দৃষ্টি, নাটকের প্রকৃত গুণের (literary merits) প্রতি তাঁহাদের ততটা লক্ষ্য নাই, দর্শকগণের মতিগতি বুঝিয়া তাঁহারা সেইরূপ বিষয়ের অভিনয় করিতে থাকেন। সাধারণ ব্যক্তিগণও তাহাতেই উন্মত্ত। অন্য দিকে দেখিবার তাহাদের সময়ও নাই, প্রবৃত্তিও নাই। কাজেই গ্রন্থকারকে নাটক লেখার চেষ্টা ছাড়িয়া দিতে হইল। তাই বলিতেছিলাম, প্রহসনের সৃষ্টি হওয়া পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় নাটকের অবস্থা আরও যেন শোচনীয় হইয়া পড়িল।

প্রহসন পূর্ব্ব হইতে চলিতেছিল। মাইকেল ও দীনবন্ধু হইতেই ইহার রচনা বাঙ্গালায় আরম্ভ হইয়াছিল। প্রহসনে বড় রঙ্গ, বড় মজা। লোকে গভীর বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে না পারিলে এইরূপ ফষ্টিনাষ্টিতেই থাকে ভাল। দেখিতে দেখিতে প্রহসনের ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' ব্যতীত আধুনিক প্রহসনের মধ্যে "তিলতর্পণ" "বিবাহবিভ্রাট" ও "এমন কর্ম্ম আর কর্ব্বো না" প্রভৃতি কয়েক খানি ছাড়া নাম করিবার যোগ্য অধিক আর নাই। হাস্যরসটা নিতান্ত হেলাফেলার সামগ্রী নহে। প্রহসন হইতে পঞ্চরঙ্গের উৎপত্তি হইল। Opera, Melodrama, Farce, Pantomime, Bourlesque, Mask—এক এক ইংরাজি কেতার সবই হইল। কিন্তু ভাল নাটক আর একখানিও হইল না।

আর যে এখন হঠাৎ হইবে তাহারও আশা দেখি না। এখন আবার আর এক উপসর্গ জুটিয়াছে। নূতন-প্রিয় বাঙ্গালী আর এক নূতন পাইয়াছে। ইহা দৃশ্যকাব্য। বর্ত্তমান ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ ইহার প্রবর্ত্তয়িতা।

গিরিশ বাবু এক জন স্বদক্ষ অভিনেতা, এক জন পাকা ব্যবসায়ী। তিনি দেখিলেন, ক্রমে সবই তো পুরাতন হইয়া আসিল, এখন নূতন কিছুর আবশ্যক। সাধারণ দর্শকগণের মনের গতি তিনি নখদর্পণের ন্যায় বুঝিতে পারেন, সে ক্ষমতা তাঁহার বিলক্ষণ আছে; নহিলে আজ কখনই তিনি এত দূর কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। তিনি কবি, তাঁহার কল্পনার লীলা আছে দর্শকগণের মনের গতি বুঝিয়া সেই দিকে তাঁহার কল্পনা নিয়োজিত করিলেন। এ দিকে বাঙ্গালায় যাহা প্রধান ষ্টেজ তাহা তাঁহার কর্তৃত্বে তিনি কল্পনাবলে বাছিয়া বাছিয়া দৃশ্যপটের যোজনা করিয়া পৌরাণিক ইতিবৃত্ত অবলম্বনে নূতন ধরণে নূতন ছন্দে দৃশ্যকাব্য সকলের অবতারণা করিতে আরম্ভ করিলেন। বাঙ্গালায় একটা রব উঠিল। দর্শক ভুলিয়া গেল, সমালোচক ভুলিয়া গেল। দৃশ্যপট দেখিয়া, অভিনয় দেখিয়া সকলে তাক্ হইয়া বলিতে লাগিল—"এত দিন পরে বাঙ্গালার নাটক আপন পরিচ্ছদ চিনিয়া লইতে পারিয়াছে।" দেখাদেখি বেঙ্গল থিয়েটার কোম্পানি আসিয়া রাজকৃষ্ণ বাবুকে ধরিল। রাজকৃষ্ণ বাবু বাঙ্গালার একজন প্রতিভাশালী কবি। তিনিও সেই মত নানা পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য রচনা করিতে লাগিলেন। মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের একটা খুব ঢেউ উঠিল। প্রকৃতির নিয়ম, বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাক্রান্ত বিষয়েই ঘাত প্রতিঘাত অতি সত্বর ও সজোরে হইয়া থাকে। সেই ঢেউ আসিয়া থিয়েটার-চড়ায় বড়ই জোরে আঘাত করিল। যাহা বিলাসিতার রঙ্গভূমি বলিয়া ভদ্রলোকের অগম্য হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই ধর্ম্ম ও নীতির শিক্ষাস্থল হইয়া উঠিল। থিয়েটারে থিয়েটারে সঙ্কীর্ত্তন ও হরিধ্বনির ধুম পড়িয়া গেল। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, বুদ্ধদেব, চৈতন্য—একে একে সকলের লীলা অভিনীত হইতে লাগিল। দৃশ্যপটের জম্‌জমাট, অভিনয়ের কৌশল, সঙ্গীতের আকর্ষণীশক্তি, বিষয়ের গরিমা, সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিকের অদ্ভুত কারখানা, সব মিলিয়া দর্শকদিগকে ভেল্কি লাগাইয়া দিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সবাই মুগ্ধ হইয়া পড়িল। মুগ্ধ হইবার সামগ্রীই বটে। বস্তুতঃ যখনই আমরা সে সকলের অভিনয় দেখিয়াছি তখনই মুগ্ধ ও আত্মহারা না হইয়া থাকিতে পারি নাই। বাঙ্গালার থিয়েটার যে এরূপ উন্নতি লাভ করিবে তাহার কল্পনাও ইহার পূর্ব্বে আমরা করিতে পারি নাই। যাঁহাদের যত্নে ও ক্ষমতায় ইহার এতদূর উন্নতি হইয়াছে অবশ্যই তাঁহারা প্রশংসার পাত্র। কিন্তু একটা আক্ষেপ, এতেতেও নাটকের যে অভাব সেই অভাব রহিয়া গেল। প্রকৃত নাটক আর একখানিও বাঙ্গালায় হইল না। লেখকেরা এই সব গ্রন্থের নাম দেন বটে—নাটক; কিন্তু, নাটক হইতে ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দৃশ্যকাব্য ভিন্ন ইহাকে অন্য নাম দেওয়া যায় না। এ গুলি অভিনয়ে খুব জমে বটে, কিন্তু পড়িতে তেমন কিছুই নহে। দৃশ্যপটাদির সহিত এ গুলির এরূপ সম্বন্ধ যে, সে সব বাদ দিলে ইহাতে আর কিছুই থাকে না। যে গান গুলিয়া যার পর মোহিত হইয়াছিলাম, তাহা আর কতকগুলা শব্দের সৃষ্টি ভিন্ন বিশেষ কিছুই বোধ হয় না। অভিনয়কালে একদিন যাহা উল্লসিত অন্তরে একমনে বসিয়া আদ্যন্ত শুনিয়াছি, তাহা

দুই পাতা পড়িয়াই মুড়িয়া রাখিতে ইচ্ছা যায়। নাটকের সে কবিত্ব ইহাতে কোথায়? সে কল্পনা কোথায়? সে নাটকত্বের উপাদান কোথায়? বাঙ্গালায় প্রকৃত নাটক আর একখানিও হইল না!

অথচ, দেখিতে পাই নভেলের বাজার আজকাল খুব গরম। নিত্যই সংবাদপত্রের দীর্ঘ দীর্ঘ স্তম্ভ সকল অধিকার করিয়া সস্তা দরে বস্তা বস্তা নভেলের বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়। একদিন নাটকের সময়ে যাহা হইয়াছিল, আজ নভেলের আমলেও তাহাই দেখা যায়। বাজারে কোনও জিনিষের অতিরিক্ত আমদানি হইলে তাহার আর দর থাকে না। খরিদ্দার অপেক্ষা বিক্রেতা বেশি। সবাই হাঁকিতেছে, 'আয় খরিদ্দার, বড় জবর মাল, আধা কড়িতে ছাড়িব।' দেখিয়া শুনিয়া যে কিনিতে যায় সে থতমত খায়, অনেক সময়ে ভাল মন্দের বিচার করিতে পারে না, বিক্রেতার বাক্যের বাগুরায় জড়াইয়া পড়িয়া নগদ দাম দিয়া মন্দ জিনিষ কিনিয়া লইয়া ঘরে যায়। ঘরে গিয়া অবশ্যই জিনিষটা নাড়া চাড়া করিয়া পরে সে বুঝিতে পারে সে কি কিনিয়াছে। কিন্তু, পাছে নিজের বোকামি ও মূর্খতা প্রকাশ হইয়া পড়ে সেই ভয়ে কাহাকেও কিছু বলে না, বরং তাহার প্রশংসাই করিতে থাকে। আর এ দিকে অনেক ভাল জিনিষ অবিক্রি থাকিয়া দোকানে পড়িয়া গড়াগড়ি যায়। আসল পাকা ব্যবসাদার না হইলে তাহার জিনিষ কাটে না। বাঙ্গালায় নভেলের বাজার ত এইরূপ। কিন্তু তবু রাশি রাশি নভেলই হইতেছে; নাটক আর কেহই লেখে না।

এখন, কথা হইতেছে, কেন এমন হইল? কেন এমন হইল, এ কথাটার মীমাংসা অতি সহজেই হয়, যদি আমরা একবার বিলাতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। আজকালের বাঙ্গালা ভাষা নিতান্তই ইংরাজী ছাঁচে ঢালা, ইংরাজী ভাষার অস্থি মজ্জা ইহার অস্থিতে অস্থিতে মজ্জায় মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট; বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য ইংরাজী সাহিত্যের ছায়া মাত্র। সুতরাং ছায়ার বিচার করিতে গেলে, সে যাহার ছায়া, তাহার বিচার করিলেই বুঝা যায়। সে ইংরাজী সাহিত্যে আজ কি দেখিতে পাই? সেখানেও অবিকল এই ভাব। নভেলের বেজায় হুড়োহুড়ি—স্ত্রীপুরুষ সবাই মিলিয়া নভেল লিখিতেছে। কিন্তু নাটক আর একখানিও হয় না, কেহই নাটক লিখিতে চাহে না। লর্ড লিটনের পর হইতে বিলাতের সবাই নভেল-লেখক, আর নাটক-লেখক বড় দেখি না। নহিলে, সেক্‌পীয়ারের জন্মভূমিতে আজ ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র গিল্‌বার্ট (W. S. Gilbert) এক জন ভারি নাটকপ্রণেতা বলিয়া এতটা প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিত না। দেশ নিরন্তপাদপ না হইলে এরণ্ডও কখনই মহাবৃক্ষ বলিয়া গণ্য হয় না। "Patience", "Pinafore", "The Pirates of Penzance"—ইহার একখানিও রীতিমত নাটক নহে। Sir Arthur Sullivanও একজন বর্ত্তমান নাটক-লেখক। কিন্তু, তিনি আবার গিল্‌বার্টের নীচে। ধরিতে গেলে, বিলাতেও নাটক আর হয় না। অথচ, সেখানে থিয়াটারের আজকাল বড়ই ধুম, অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের সম্মানের সীমা নাই। কেণ্ডালদম্পতিকে (Mr. and Mrs. Kendal) অভিনয়ের পর মহারাজ্ঞী স্বয়ং এক দিন মহা সম্মা-

মের সহিত নিজগৃহে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। থিয়েটারের এত প্রতিপত্তি কিছু আজও বাঙ্গালায় হয় নাই, এত সংখ্যাতীত রঙ্গালয়ও জন্ম গ্রহণ করে নাই। তবে বাঙ্গালার কথা আর কি বলিব? এততেও বিলাতে নাটকের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। নাটক—নাটক করিয়া সেখানেও চীৎকার উঠিতেছে। তবে, বিলাতে অসংখ্য থিয়েটার যখন নাটক অভাবেও চলিতেছে, তখন বাঙ্গালার দুই চারিটা থিয়েটার যে চলিতে পারিবে তাহা কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। কিন্তু বিলাতের থিয়েটারগুলি কি ভাবে চলিতেছে, প্রধানতঃ কয়েকটী বড় বড় থিয়েটারের কথা বলিলেই আজকালের বাঙ্গালার রঙ্গালয় গুলির অবস্থা ও সে অবস্থার কারণ বুঝা যাইবে। আমরা কয়েকটী বড় বড় থিয়েটারের কথা বলিতেছি :—

১। St. James.—উল্লিখিত কেওলিথুন এবং Mr. Hare ইহার ম্যানেজার। কখন পুরাতন নাটক কখন বা নূতন ভাঙ্গিয়া তাহা নাটকাকারে আনিয়া অভিনয় হয়। আবার কখন বা কেহ নাটক অনুবাদ করিয়া তাহাই অভিনীত হইয়া থাকে।

২। The Lyceum.—Mr. Irving ইহার ম্যানেজার। এখানে সেক্সপীয়রের নাটক অভিনীত হয়; কখন বা Wills এবং Alary প্রণীত দুই একখানি নাটকের অভিনয় হয়। কিন্তু সে সব নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নহে।

৩। The Hay market.—এখানকার ম্যানেজার Mr. Bancroft সাহেব কোনও বিশেষ বাঁধাবাঁধি মানেন না। পয়সা উপার্জ্জন যাহাতে হয় তাহাই তিনি চেষ্টা করেন, তাঁহার রঙ্গালয়ে সেই রূপ বিষয়েরই অভিনয় হইয়া থাকে। তিনি নিজেই বলেন, "my first business is to make the house pay."

৪। Drury Lane.—Mr. Harris ইহার ম্যানেজার। তিনি ইহার বিস্তর উন্নতি সাধন করিয়াছেন। কিন্তু এখানে প্রকৃত নাটকের বড় একটা নামগন্ধ নাই। Melodrama'র এখানে বড়ই প্রাদুর্ভাব। কিন্তু তাহা কি নাটক?

৫। The Princess', । The Adelphi.—এ দুই জায়গায়ই Drury Lane-এর ন্যায় Melodrama অভিনীত হইয়া থাকে।

এ ছাড়া সকল গুলিতেই প্রহসনের (Farce) খুব ছড়াছড়ি আছে। Pantomime, Bourlesque প্রভৃতির বাজারও বেশ সরগরম্। তা ছাড়া, Byron ও Scottএর অনুকরণে এক প্রকার Romantic Drama হইয়াছে, তাহার আদর খুব দেখা যায়। চোর, ডাকাত, পলায়ন, নৌকাডুবি, কারাগার, বিচার, রাজা, সৈন্য, ঝড়, বৃষ্টি, ঘন ঘন বজ্রাঘাত, ভূত, প্রেত, দানা, দৈত্য, পরীর নাচ প্রভৃতি নানা রকম অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয় ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। দেখিয়া দর্শকগণ কখন ভয়ে আকুল হয়, কখন আনন্দে করতালি দেয়, কখন বা নির্ব্বাকে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া থাকে। এ ছাড়া, আদর, আসবাব, সাজসজ্জা ও দৃশ্যপটের পারিপাট্য—সে সকলের আর তো কথাই নাই। কাজেই নাটকের বিশেষ অভাব হইলেও কষ্ট পাইতে হয় না, তাহার জন্য বড় একটা কাজ আটকায় না। এমনি করিয়া দুই একটা ঘটনার পর ঘটনা জোড়া তাড়া দিয়া, মতলবমত দৃশ্যপট সাজাইয়া থিয়েটারের ম্যানেজারেরাই দিনে দুখানা করিয়া নাটক তৈয়ার করিয়া

দেখিতেছেন। অভিনয়ের কার্য্য যেমন চলিতেছে।

আর অধিক কথা বলিতে চাহি না। এখন মিলাইয়া দেখ বাঙ্গালারও ঠিক্ এই রকম হইয়াছে কি না। সেই পুরাতন ভিন্ন উপায় নাই; কাব্য নভেল ভাঙ্গিয়া লওয়া ভিন্ন গতি নাই; অপেরা, প্রহসন, পঞ্চরং—আর আর সব যথেষ্টই আছে; তবে Romantic Drama প্রকৃত পক্ষে নাই বটে, কিন্তু তাহা না থাকিলেও আধুনিক দৃশ্যকাব্য গুলি সে অভাব পূরণ করিয়াছে। সমুদ্রবক্ষে সাগরবালাগণের ক্রীড়া, মাটী ফুঁড়িয়া বসুমতীর উত্থান, অনন্তশয্যাকে শ্রীকৃষ্ণের শয়ন, কমলাসনে ভারতী, হিঃ হিঃ শব্দে প্রমথগণের আবির্ভাব, কি অন্ততপক্ষে তার দিয়া উপর হইতে দুটা পরী ঝুলান—এ আছেই আছে। নহিলে সে দৃশ্যকাব্যই হইল না। তা ছাড়া দৃশ্যপটের আড়ম্বর ও ঘটার তো কথাই নাই। হ্যাণ্ডবিলে নাটকের প্রকৃত গুণের কথার বড় একটা উল্লেখ দেখিতে পাই না; কিন্তু দেখিতে পাই, বড় বড় অক্ষরে প্রায়ই লেখা আছে "The—Scene will doubly repay the, price you pay at the door." এ মন্দ আকর্ষণী নহে! সকলেই জানেন, যে রমণীর স্বভাব-সৌন্দর্য্য নাই সেই নাক ফুঁড়িয়া, কান ফুঁড়িয়া অলঙ্কারের রাশি গায়ে ঝুলাইয়া সাধারণের নিকটে আপনাকে রূপবতী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পায়। দেখিয়া শুনিয়া আমাদের অনেক সময়ে সেই কথাটা মনে পড়ে। আমরা ইংরাজের অনুকরণটা করিয়াছি ভাল। থিয়েটারের ম্যানেজার বা তাঁহারই আত্মীয় কোন লোক ভিন্ন নাটক লেখা যেন আর কাহারিও সাধ্যায়ত্ত নহে, এমনই হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু ইহাতে হইতেছে কি? বাঙ্গালার কথা আর বলিব না, বিলাতে কি হইতেছে তাহাই দেখ। Harry Quilter যথার্থই বলিয়াছেন—"In briefest words, the change in dramatic literature is the change from an art to a trade, and the results are of a corresponding nature." হইতে পারে, থিয়েটারের ম্যানেজার একজন সুকবি, সুলেখক ও সুধিধান্, হইতে পারে, তাঁহার অভিনয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকায় সাধারণ লেখক অপেক্ষা নাটকে-অভিনয়ে মিলাইয়া মিশাইয়া এক রকম লিখিতে পারেন ভাল; কিন্তু ইহাও মনে রাখা উচিত তিনি ব্যবসাদার, তিনি যাহা করিবেন তাহাতে তাঁহার ব্যবসার যাহাতে উন্নতি হয় সেই দিকটাই আগে লক্ষ্য রাখিবেন। Quilter সাহেব তাহাই আবার বলিয়াছেন—"But it must be remembered that managers are men of business first, and patriots and literary artists afterwards, if at all." কথাটা উড়াইয়া দিবার নহে। কিন্তু এখন নাটকের উপায় কি? অভিনয়ই যখন নাটকের প্রাণ, তখন ভাল নাটক যাহাতে হয় অভিনেতাদিগের তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা কি কর্ত্তব্য নহে? যে দেশে বিজ্ঞান দর্শন লইয়া এত আলোচনা হইতেছে, এমন সব ভাল ভাল কাব্য ও নভেল জন্মিতেছে, সে দেশে যে নাটক লিখিবার একজনও নাই, তাহা আমরা মনে করিতে পারি না। আর বাঙ্গালা? বাঙ্গালার কথা বলি না, অথবা না বলিবই বা কেন; এখনও ছোটখাট প্রতিভা লইয়া অনেক বাঙ্গালী জন্মি-

ছেছে, ভাল ভাল কাব্য উপন্যাসেরও বাঙ্গালায় অভাব নাই, পূর্ব্বের কয়েকজন নাটককার এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তবে বাঙ্গালায় যে আর নাটক হইতে পারে না, ইহা স্বীকার করি না। তবে আসল কথা, লেখক উৎসাহ পান না, তাঁহার পুস্তকের আদর হয় না। অবশ্য লেখক আপনার কল্পনা লইয়া লিখিতে বসিবেন, সাধারণ দর্শকবর্গ কি চায় না চায় তাহার একটা গণ্ডি আঁকিয়া তাহার মধ্যে আপনার কল্পনাকে ঠাসিয়া পুরিয়া রাখিতে স্বীকৃত হইবেন না। কিন্তু তিনি পরিশ্রম করিয়া যাহা করিলেন, থিয়েটারের ম্যানেজার মহাশয় তাহা দেখিয়া নাক সিটকাইলেন, সাধারণ রুচি অনুযায়ী তাহা হয় নাই বলিয়া তাহাতে হাত দিতে রাজি হইলেন না। তখন, ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিয়া গ্রন্থকর্ত্তা আপনার পাণ্ডুলিপি বাক্সের মধ্যে পুরিয়া রাখিলেন। সে আর সূর্য্যালোক দেখিল না। এই ভাবে কত নাটক রচিত হইয়াও যে প্রকাশিত হয় নাই, তাহারই বা কে সংখ্যা করিবে? এখন প্রধান দোষ, দর্শকগণের রুচি। কদর্য্য রুচি লইয়া আমরা থিয়েটারে দেখিতে যাই। এ রুচির পরিবর্ত্তন হওয়া বিশেষ দরকার হইয়াছে, নহিলে নাটকের আর অবস্থান্তর দেখি না। কিন্তু রুচি পেট হইতে পড়িয়াই হয় না। চেষ্টা করিলেই ইহার পরিবর্ত্তন করা যায়। কিন্তু সে চেষ্টা করে কে? অন্যের দ্বারা, ততটা উপকারের আশাও দেখি না। অভিনেতারা মনোযোগ করিলে অনেক করিতে পারেন। সাধারণের রুচি ফিরাইবার কর্ত্তাও তো তাঁহারা। সাধারণের রুচি ফিরিলে ব্যবসার পক্ষে আর তাঁহাদের কোন আশঙ্কার সম্ভাবনা থাকিবে না। তার পর, তাঁহারা অভিনয়ের বাহ্যাড়ম্বরের প্রতি ততটা দৃষ্টি না রাখিয়া অভিনয় জিনিষটার প্রতি একটু বেশি লক্ষ্য করিলেই ক্রমে সুফল ফলিবে। বাঙ্গালায় আবার নাটকের মুখ দেখিতে পাইব, এমন আশা হইবে। Quiller সাহেবও বিলাতের জন্য তাহাই বলিয়াছেন, "The cure for this evil is to return to a simpler method of production, to rely upon the play rather than upon its scenery, its costumes and its furniture."

কড়ি ও কোমল।

সকল দেশেই প্রতিভার আদর কিছু কম। বাঙ্গালায় তাহা নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। প্রতিভা প্রতি দিন জন্মায় না। গৃহে গৃহে দেখা যায় না। একটা বড় প্রতিভা জন্মাতে অনেক দিন লাগে। অনেক বসন্তের আবশ্যক। অনেক কুঁড়ি ঝরিয়া তবে একটা ফুল ফোটে। অনেক মানুষ মরিয়া তবে একটা প্রতিভা জন্মায়। প্রতিভা, বিবর্ত্তন-ধর্ম্মী। বিবর্ত্তন, নিয়মের ফল।

প্রতিভাশালী ব্যক্তি আর সাধারণ মানুষ এক নহে। নানা কারণে তাঁহাদের স্থান সাধারণ মানুষের অনেক উপরে। সেই জন্য প্রতিভার গুণ, মর্য্যাদা বুঝিতেদময়

লাগে। ঘোরাবের জন্য বসিয়া থাকিতে হয়। সেই জন্যই প্রায় দেখা যায়, কোন প্রতিভাশালী ব্যক্তি জীবদ্দশায় যশঃ লাভ করিতে পারেন নাই। প্রতিভার গতি অতি বেগশালিনী। তাহা কেবল বর্ত্তমানে আবদ্ধ নহে। বর্ত্তমান অতিক্রম করিয়া তাহার বিস্তার, গতি। প্রতিভা, ভবিষ্যদ্দর্শী, ভবিষ্যৎ জননী। প্রতিভার পরিচয়, ভবিষ্যতে। ভবিষ্যৎ তাহার রঙ্গভূমি। বর্ত্তমান তাহার ঠিক সমালোচনার,—ঠিক পরিচয়ের স্থান নহে, সময় নহে। তখন তাহা কাঁচা। কুঁড়ি।

আমাদের এই নব প্রকাশিত 'কড়ি ও কোমলের' রচয়িতা, একজন অতি উচ্চদরের কবি। অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি।—এ বাঙ্গালা দেশে রবীন্দ্রনাথকে চিনে না কে? তাঁহার প্রতিভা নানামুখী। তিনি সুকবি, সুগায়ক, সুলেখক। একাধারে এত গুণের আধার হইয়া আর কোনও কবি জন্মিয়াছিল কি? তাঁহার গানে, তাঁহার কবিতায় আমরা মুগ্ধ। তাঁহার সমালোচনার প্রকৃত সময় আসিয়াছে কি না জানি না। জানিবার আবশ্যকতা নাই। আমি সঙ্কীর্ণ সমালোচক নহি। 'কড়ি ও কোমল' আজ আমি সমালোচনা করিতে বসি নাই। তাহার দোষ বাহির করিয়া নিন্দা গাহিবার অভিপ্রায়ে আমি সেই দুষ্টা সরস্বতীর সহিত পরামর্শ করিয়া কলম ধরি নাই। আজ আমি প্রতিভার পূজা করিতে আসিয়াছি। হৃদয়-মন্দিরে 'কড়ি ও কোমল' রূপী সৌন্দর্য্যময় দেবতার প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়াছি। 'কড়ি ও কোমল'-মহাপ্রাণে প্রাণ মিশাইয়া বাঁচিতে আসিয়াছি।

লিখিলেই যাহারা কবি, ছাপাইলেই যাহা কাব্য, কড়ি ও কোমলের লেখক সে-রূপ কবি নহে; কড়ি ও কোমল সেরূপ কাব্য নহে। সেরূপ কবি ও কাব্য বাঙ্গালায় যথেষ্ট আছে। তাহাদের নূতন পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। তাহারা কমলাকান্ত শর্ম্মার কুষ্মাণ্ড শ্রেণীর মধ্যে। 'যদি চালে তুলিয়া দিলে, তবেই ইহারা উচ্ছে ফলিলেন, নহিলে মাটিতে গড়াগড়ি যান।" সময়-স্রোতের এই বড় কুটাদিগের ঘোরতর ডাক হাঁকের উৎপাতে ক্ষুদ্র বাঙ্গালা-সাহিত্য-তরী ডুবু-ডুবু-প্রায়। রবীন্দ্রনাথ তাহাদের দলভুক্ত নহেন। রবীন্দ্রনাথের দল ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের দল, একা রবীন্দ্রনাথকে লইয়া। তাহা নূতন দল বাঙ্গালায় এ দলের আবির্ভাব এই প্রথম। তাঁহার কবিতার সুর সম্পূর্ণ নূতন। পুরাতন নহে, ভাঙ্গা গলা নহে। তাহা বড় মিঠে, বড় স্বাস্থ্যজনক, বড় অনুরাগ-পরিপূর্ণ, বড় ভাবপ্রধান। বাঙ্গালার কোন বর্ত্তমান কবি কবিতার মধ্যে এত প্রাণ, এত ভাবের তরঙ্গ, এবং এত সৌন্দর্য্যের রস ঢালিয়া এমন সুকৌশলে গাঁথিয়া লিখিতে পারেন নাই। বলিতে কি, বাঙ্গালায় কবিতার এক নূতন দেশ তিনি সৃজন করিয়াছেন। প্রকৃত কবিতা কাহাকে বলে, কবিতা জিনিষটা কি, তাহা তিনিই আমাদিগকে এই প্রথম দেখাইলেন, শিখাইলেন। তাঁহার কবিতা পড়িতে পড়িতে দেখিতে পাই, যেন তিনি আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া Rossetti র সেই বীর জীবন্ত অমানুষী ছবি-আঁকা তুলিকার মুখে দাঁড় করাইয়া, দেখাইয়া দিতেছেন যে, কেবল ছন্দ সাজাইয়া যাওয়া, শব্দ না বাছিয়া যেরূপ শব্দই হউক না কেন সেই শব্দ যোজনা করিয়া কবিতার ভাষা করা, হৃদয়ের ভাব, জীবনের সুখ-

দুঃখের রহস্য, হৃদয়-প্রদেশের বাহিরে দাঁড়াইয়া, অলঙ্কৃত করিয়া—আবখানা করিয়া—মৌরস করিয়া বলা, তাহার মূল না দেখাইয়া কবিতায় স্থান দেওয়া, কবিতার মধ্যে বাঁচিয়া থাকিবার জীবনী-শক্তি না দিয়া, কল্পনার স্ফূর্তিজনক স্বাধীনতার মলয় বাতাস বিনা অনন্ত আকাশ চারি দিকে সৃজন না করিয়া, কবিতাকে কল্পনা-শূন্য নীতি-গৃহে বদ্ধ করিয়া দীর্ঘ করা, কবিত্বের রস, অমৃত, শব্দের হাড়ে হাড়ে, মজ্জায় মজ্জায় না মিশাইয়া, কবিতাকে স্বভাবানুকৃতি-যন্ত্রের দ্বারা ধূমার্জ্জিত সুপ্রস্ফুটিত সর্ব্বাবয়ববিশিষ্ট করিয়া না তোলা, কবিতা নহে। তাহাকে কবিতা বলে না, কাব্য বলে না, গীতিকাব্যও বলা যায় না। তাহাকে আমি কি নামে যে সম্বোধন করিব, এমন কথা খুঁজিয়া পাই না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িয়া আমরা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের দোষাদোষ পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারি। বুঝিতে পারি, তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত কবি নামের যোগ্য কয় জন। কিন্তু আমাদের এই মস্তিষ্কশূন্য বিলাস-সমুদ্রে ভাসমান অকর্ম্মণ্য দেশের সকলই অদ্ভুত ব্যাপার—নিগূঢ় রহস্যাত্মক—হাস্যজনক। দেশ হইতে কবিতার পাঠ একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। কবিতা এখন আর কেহ পড়ে না, শোনে না, বোঝে না। সাধারণের বিশ্বাস, কবিতা মিথ্যা, ফাঁকি, ছায়া, কল্পনা, ধুঁয়া। কবিতার দ্বারা পেট ভরে না। অভাব দূর হয় না। সমাজের জটিল রহস্য মীমাংসা হয় না। বাহ্য সুখ-সম্পদাদি বৃদ্ধি পায় না। এখন কবিতা পড়ে, সমালোচনার। কবিতার সমালোচনাই এখনকার কবিতা, কাব্য। কবিতা-রসাস্বাদনের সুখ অনেক দিন হইল উঠিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালির বিশ্বাস, কবিতা যেখানে সেখানে জন্মায়। সকলের কাছেই পাওয়া যায়। কবিতা যেন বাড়ীর বাগানের কলমূল; ভৃত্যে যেন তাহার চাষ করে। ইচ্ছা করিলেই হাতে আসিবে। অথবা তাহা যেন বিক্রেয়। মিলিতে কেবল পয়সার অপেক্ষা। বাঙ্গালা দেশে আজকাল কবিতার আদর এইরূপ। এইরূপ তাহার পরিপুষ্টি, এইরূপ তাহার রসাস্বাদন। বাঙ্গালার উন্নতির দৌড়টা কতদূর, বুঝা গেল। এইরূপ তাহার সকল বিষয়েই উন্নতি। এইরূপ জ্ঞান লইয়া, কবিতার প্রতি এইরূপ গভীর বিরাগ লইয়া আবার বাঙ্গালী য়ুরোপীয় কবিদিগের সমকক্ষ হইতে চায়, তাহাদিগের ছিদ্র খুঁজিতে বসে। হায়, কি আত্ম-প্রবঞ্চনা! কি জ্ঞান-দুর্ভিক্ষ! কি অনুরাগের অভাব!—ধন্য বাঙ্গালির শিক্ষা প্রণালীকে!

কেন এরূপ হয়? শিক্ষার দোষে। অনুশীলনের অভাবে। বাঙ্গালার পাঠক কোথায়?—কি আছে? কোন্ জিনিসটা বাঙ্গালি সম্পূর্ণ জানে?—বাঙ্গালি পড়ে না, পড়িতে আজও শিখে নাই। কয়জন বাঙ্গালির জীবন কেবল পড়িয়া শেষ হইয়াছে? পড়িবার স্বভাব, বাঙ্গালির আজও জন্মায় নাই—ইহার অপেক্ষা অধিকতর নিন্দার কথা, দুঃখের বিষয়, কিছু আর আছে কি? —বাঙ্গালাদেশে পাঠকসমাজ নাই। কবিতা বুঝিবার যাত, সাহিত্যের জীবন, জনসাধারণের মধ্যে আজও আসে নাই। তবে বাঙ্গালার রোগ, পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, কিছু কঠিন, মারাত্মক। বোকামো, বাঙ্গালি বোঝে না। এ বিষম রোগের ঔষধ কি? *

* উপবাস?

সুন্দর বস্তু দেখিলেই চিনা যায়। সুন্দর কে, কাহাকেও চিনাইয়া দিতে হয় না। তাহার সত্যতার জন্য কোন প্রমাণও আবশ্যক করে না। সত্যের আবার প্রমাণ কি? মিথ্যারই প্রমাণ চাই মিথ্যা গুপ্ত। সত্য প্রকাশিত। মিথ্যা নানা কথা বলে। সত্য এক কথা কয়। সত্য কখন মিথ্যা হয় না। সত্য, চিরদিনই সত্য। সত্য আপনি প্রকাশিত হয়। দেখিবামাত্রই তাহা প্রাণে লাগে। সৌন্দর্য্যও সত্য। সৌন্দর্য্য, সত্যের মূর্ত্তি, সত্যের শরীর। সৌন্দর্য্যও নিরবগুণে প্রকাশিত, ব্যক্ত। আমাদের এই 'কড়ি ও কোমল'ও ঠিক তাই। ইহার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কাহারও আর সংশয় উপস্থিত হইবে না। 'কড়ি ও কোমল' কবিতাপুস্তক, গীতিকাব্য। কাব্যের প্রাণ সৌন্দর্য্য। 'কড়ি ও কোমল' সেই সৌন্দর্য্য-ভাবে বাঁধা। সেই সৌন্দর্য্য-জ্ঞানে লব্ধ-প্রাণ। আধুনিক গীতিকাব্য সকলের মধ্যে 'কড়ি ও কোমলে'র আসন প্রথম। বাঙ্গালার একখানিও এরূপ সুন্দর সাহিত্যরস-পূর্ণ গীতিকাব্য নাই। কোন গীতিকাব্য এত প্রস্ফুটিত নহে। যে দিক হইতেই দেখ, 'কড়ি ও কোমল' বিকাশের চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। 'কড়ি ও কোমল' সুমধুর পঞ্চমে ভরা। রবীন্দ্রনাথ, সৌন্দর্য্যের উপাসক, প্রেমিক। প্রকৃতির শিষ্য। সৌন্দর্য্যজননী প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-সুধাতে রবি পালিত সেই আত্মবিস্মৃত-কারী সৌন্দর্য্যে রবি ওতঃপ্রোত। 'কড়ি ও কোমল' প্রকৃতির সৌন্দর্য্যেরই গান, স্তোত্র। Humanity তাহার সুর, রাগিনী। এই সৌন্দর্য্য-সৃজনকারিণী শক্তিতে রবীন্দ্রনাথ জগতের প্রধান গীতিকাব্য-রচয়িতাদিগের সহিত তুলনীয় এত সৌন্দর্য্য আর কিসে আছে? যেমন সৌন্দর্য্য, তেমনি ভাব। এত ভাব-বৈচিত্র আর কে দেখাইয়াছে? কবি, কল্পনার অতুল্য দেব-সিংহাসনের উপর সৌন্দর্য্য ও ভাবের একীকরণ করিয়া, বিবাহ দিয়া, কড়ি ও কোমল, পুস্তকের জন্ম দিয়াছেন। ইহার কবিতাগুলি, সে বিবাহের মন্ত্র। এ বিবাহের দান-সামগ্রী কবির আত্ম-প্রাণ। তাই কবি প্রথমেই আপনার প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন। এই উৎসর্গে কবি, প্রাণ দিয়া অনন্ত প্রাণ লাভ করিয়াছেন। মৃত্যু তাঙ্গিয়া জগৎলাভ করিয়াছেন। আজ কবি অমর। মানবের সুখ-দুঃখের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত—গ্রন্থিত।

কিন্তু এই স্থানে আমার একটু কথা আছে। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। কবিমাত্রেই সৌন্দর্য্যের উপাসক। সৌন্দর্য্য ভিন্ন কাব্য জন্মাইতে পারে না। তবে সৌন্দর্য্য সকলের চক্ষে সমান নহে। সৌন্দর্য্যের তারতম্য শিক্ষা-ভেদে—প্রকৃতিভেদে। মনুষ্য-ভেদে প্রকৃতি-ভেদ। আবার প্রকৃতিদত্ত শিক্ষা সকলের অদৃষ্টে লিখে না। সেই জন্য সৌন্দর্য্যানুবোধ কাহার অল্প, কাহার অধিক। সেই জন্যই জগতের সৌন্দর্য্য-উপাসকদিগের মধ্যে দুইটি দল দেখা যায়। একদল স্থূল সৌন্দর্য্যের উপাসক। অপর দল সূক্ষ্ম অশরীরী সৌন্দর্য্যের উপাসক। প্রথম দলভুক্ত কবিরা কেবল প্রকৃতির আকৃতি সৌন্দর্য্যের বর্ণন করেন। তাঁহাদের সৌন্দর্য্য প্রাণহীন, জড়ময়, স্থূল। তাঁহাদের সৌন্দর্য্য মূর্ত্তি লইয়া। তাঁহারা পর্ব্বত, নদী, তারা, চাঁদ ও সরোবরাদির বাহ্য অবয়ব কথা ও ভাব, প্রকাশ করেন। তাঁহাদের সৌন্দর্য্য সীমাবদ্ধ। পর্ব্বত, নদী,

তারা প্রভৃতিতে বদ্ধ। সেই সৌন্দর্য্যই তাঁহাদের চরমোৎকর্ষ। সেই বাহ্য জড় সৌন্দর্য্য হইতে তাঁহারা এক চামচে পরিমিত নীতির তীব্র অপ্রীতিকর ঔষধ বাহির করিয়া তারার তারা, নদীর নদী, চাঁদের চাঁদ, মানুষের মানুষ দেখিতে পান। তাঁহাদের চক্ষে সৌন্দর্য্যজননী প্রকৃতি জড় নহে। তাহা "Great Spiritual Power and Presence।" সেই মহাপ্রাণ, মহা সৌন্দর্য্যনাড়ী জগতে আছে বলিয়াই জগৎ সুন্দর। সে সৌন্দর্য্য আবিল নহে, ইন্দ্রিয়সংশ্লিষ্ট নহে। তাহা পবিত্র, নির্ম্মল, ইন্দ্রিয়াতীত। সে সৌন্দর্য্য-উপভোগ-জনিত সুখ, মানসিক। শারীরিক নহে। এ দলের কবি য়ুরোপে Sophocles, Shelley, Keats, Tennyson * আর এ বঙ্গে—রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয় কুমার। 'কড়ি ও কোমল' এই অপরীরী সৌন্দর্য্য। ইহা আত্মার,—কবির আত্মার সুখ-দুঃখের ইতিহাস। জীবনের আলো-অন্ধকারের মিলন।

পৃথিবীতে এই দলের কবির সংখ্যা, হস্তরেখা অতিক্রম করে না। ইহা পৃথিবীর দুর্ভাগ্য। জগতে জগতের ভাগই অধিক। স্বর্গের ভাগ কতটুকু বল? জগতের চিরদিনের অমর কবিরা মাঝে মাঝে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের ছায়া, আভাস, দেখাইয়া যান সূক্ষ্ম কবি দৃষ্টি সকল কবির থাকে না। সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি, জগতের আত্মা, কয় জন দেখিতে পায়? আমাদের 'কড়ি ও কোমল' সেই উপাদানের। তাহা বড় উচ্চ। তাহা স্মৃতির চক্ষের জল। তাহা ধ্যান। তাহা অসীমের পিছনে দৌড়ান। তাহা "এস এস বঁধু এস।" এরূপ কবিতা বুঝা কিছু কঠিন। সকলে তাহা বুঝিতে অক্ষম। যাহাদের দৃষ্টি সূক্ষ্ম ও মর্ম্মভেদি, প্রকৃতি আধ্যাত্মিক ভাবে গঠিত, কল্পনা ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী, এবং মানসিক শক্তি পূর্ণবিকাশপ্রাপ্ত, তাহারাই 'কড়ি ও কোমল' বুঝিতে সক্ষম। কিন্তু সে দিন আজও আসে নাই। মানসিক শক্তির জীবন্ত মূর্ত্তি মনুষ্য-দুর্লভ সেই Shelley প্রভৃতি অদ্বিতীয় দেব-কবিদিগের প্রকৃত আদর আজও দেখি না।

আমি 'কড়ি ও কোমলের' মূল কথা, চাবি খুলিয়া দিয়াছি। তাহার কবিতা উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। আমার মতে উদ্ধৃত করা ভাল নয়, সৌন্দর্য্য নষ্ট করে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

দুই বন্ধু।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তবে আরম্ভ করি?—আমার সেই দুঃখময়ী আখ্যায়িকা—দুই বন্ধুর কথা আরম্ভ করি?—তোমরা সকলে মন দিয়া শুন।

প্রভাতের বায়ু ধীরে ধীরে বহিতেছে, কিন্তু এখনও সূর্য্যোদয়ের বিলম্ব আছে। প্রকৃতি যেন এখনও সুষুপ্ত, কিন্তু পক্ষীগণের মধুর কলরব ধীরে ধীরে সেই সুষুপ্ত প্রকৃতির ঘুম ভাঙ্গাইতেছে। দিবসের এই প্রথমাংশ বড়ই মধুর। প্রভাত-সমীরণের সুখস্পর্শে সকলেরই হৃদয় স্নিগ্ধ হয়—সক-

* Peter Bell-চরিত্রে Wordsworth'র নামে কি এ দলের মধ্যে করা যায় না?

সেরূপ মন নবোৎসাহে মাতিয়া উঠে। কিন্তু প্রভাতের সেই স্নিগ্ধতা ও উৎসাহ মধ্যাহ্নে থাকে না, সুতরাং স্বপ্ন ও মনের সুখের অবস্থা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। সংসারের গতিই এই!

দেখিতে দেখিতে বাবাণ্ডা গ্রামের রাস্তা দিয়া দুই একজন লোক চলিতে আরম্ভ করিল, এখন যেন গ্রামখানি সজীব হইতে লাগিল। তখন ধীরে ধীরে সেই পক্ষীগণের মধুর কলরবের সহিত কর্কশ মনুষ্যকণ্ঠরব মিলিতে লাগিল। মধুর ও কর্কশের মিলনে এক অপূর্ব্ব সুর জন্মিয়া গেল। তখনও প্রকৃতি অনেকটা নীরব, প্রকৃতির অল্প অল্প চেতনা হইতেছে মাত্র। কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ জীবন্ত ভাব দেখা যায় নাই। এমন সময় একটি সপ্তম বৎসরের বালক ঐ গ্রামের এক গৃহস্থের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ডাকিল—"সমর—সমর—এখনও ঘুম!"

তৎক্ষণাৎ এক অষ্টম বৎসরের বালক গৃহমধ্য হইতে বাহির হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"কে ও অমর. তুমি ভাই আজ এত সকাল সকাল উঠিয়াছ যে!"

দুই জনে তখন হাত ধরাধরি করিয়া গৃহের বাহিরে আসিল। সমর অমরকে পাইয়া আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে চলিল, এবং অনেক প্রাণের কথা বলিতে লাগিল। কিন্তু অমর আজ যেন কিছু বিষণ্ণ ও অন্যমনস্ক, পূর্ব্বের ন্যায় প্রাণ খুলিয়া মন খুলিয়া অমরের সহিত কথা কহিতেছে না। সমর তাহা বুঝিল। একবার অমরের মুখের দিকে চাহিল, তাহার আজিকার সেই বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া সমরের হৃদয় ব্যথিত হইল। সমর ব্যথিত হৃদয়ে বলিল—"অমর, তোমার মুখ আজ শুষ্ক কেন ভাই?"

কথা কয়েকটী বলিতে বলিতে সমরের চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রুজল দেখা গেল। ধীরে ধীরে অমর সে চক্ষের জল মুছাইয়া দিল। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব রহিল। তাহার পর, অমর বলিল—"তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে—চল আমরা বাগানে যাই?"

কথা কয়েকটী বলিয়া অমর সমরের হাত ধরিয়া টানিল। সমর আর কোন কথা বলিল না। তখন উভয়েই নীরবে সম্মুখস্থ উদ্যানে প্রবেশ করিল। উদ্যানের মধ্যে এক অতি দীর্ঘ পুষ্করিণী ছিল, তাহার সোপানে উভয়ে গিয়া বসিল। তখনও প্রভাতের বায়ু সেই পুষ্করের জল সঞ্চালিত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা তুলিতেছিল, আর পুষ্পে পুষ্পে সৌগন্ধ চুরি করিয়া চারিদিকে ছড়াইতেছিল।

সমর বলিল—"অনেক কথা—কি অমর?"

অমর। আমাকে লইয়া যাইতে মামার বাড়ি হইতে লোক আসিয়াছে।

সমর। এই তোমার অনেক কথা!

অমর। আমি যাইব না।

সমর। কেন?

অমর। আমার মন কেমন করিবে যে।

সমর। কাহার জন্য, অমর?

অমর। তোমার জন্য, সমর।

সমর তখন আর কোন প্রশ্ন করিল না, কিন্তু অনেকক্ষণ অমরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"না অমর, তোমার গিয়া কাজ নাই।"

অমর। আমি না যাইলে কিন্তু বাবা রাগ করিবেন।

সমর। তবে তুমি যাও।

অমর তুমি আমার সঙ্গে যাইবে বল।

সমর আবার নীরব হইল. কিছুক্ষণ পরে বলিল—"আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।"

অমর বলিল—"যাও

সমর তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গৃহে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে আসিয়া বিষণ্ণ মনে অমরের পার্শ্বে আসিয়া বসিল। অমর সমরের মুখের প্রতি চাহিয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"মার মত হইয়াছে?"

সমর অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—"না

অমর আর কথা কহিল না। কিন্তু সমর অমরের দিকে চাহিয়া দেখিল যে তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। এবার সমর ধীরে ধীরে অমরের চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল—"অমর, তুমি আমায় এত ভালবাস!"

অমর। না. আমি তোমায় ভালবাসিনে, ভালবাসিলে যে ভাল কাপড়, জুতা, খেলনা এই সব কিনে দিতে হয়। আমি তোমায় কি দিতে পারি, ভাই? তবে তোমায় না দেখিলে আমার বড়ই মন কেমন করে; ইচ্ছা হয়, তুমি যেখানে সেখানে এক দৌড়ে ছুটিয়া যাই।

সমর। আমারও তোমার জন্য বড়ই মন কেমন করে। আমি ভাই, মনে করি, আমরা কখনও ছাড়াছাড়ি হইব না। আচ্ছা, আমারও মামার বাড়ি আছে, আমি যাইব না, তুমি তোমার মামার বাড়ি কেন যাবে, ভাই?

অমর। আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যাব না।

সমর। তোমার বাপ যদি মারে?

অমর মার খাব।

এই সময় পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল—"অমর!"

উভয়ে চমকিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিল যে অমরের পিতা বিশ্বনাথ। পিতাকে দেখিয়া অমরের প্রাণে ভয় হইল, সে তাড়াতাড়ি সমরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। সমরও কাঁদিতে লাগিল। বিশ্বনাথ গোপনে দাঁড়াইয়া উহাদিগের অনেক কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিলেন, দুইটী বালকের এইরূপ অকৃত্রিম প্রণয়ের দৃশ্য দেখিয়া তিনিও মোহিত হইয়াছিলেন, এখন উভয়কে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—"না অমর, তোমার মামার বাড়ি আর যাইতে হইবে না।"

বিশ্বনাথ চলিয়া গেলেন। বালকদ্বয়ের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তখন উভয়ে মনের আনন্দে বাগানে গিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পর দুই জনে মিলিয়া নানাজাতীয় ফুল তুলিয়া দু-ছড়া মালা গাঁথিল। তখন সেই মালা উভয়ে উভয়ের গলায় পরাইয়া দিয়া উভয়েই বিপুল আনন্দ উপভোগ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব বর্ণিত ঘটনার পর প্রায় দশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। এই দশ বৎসরের মধ্যে জগতের যে কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কিন্তু আমাদের সেই সমরেন্দ্র আর অমরেন্দ্র এই দুই বন্ধুর প্রণয়ের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। বাগাতাগ্রামে আরও অনেক বালক ছিল, কিন্তু অমরেন্দ্র আর সমরেন্দ্র আর কাহার সহিত খেলা করিত

না, এবং আর কাহার সহিত কোন সংস্রব রাখিত না। গ্রামের বালকেরা সুর করিয়া সকলেই বলিত—'যেখানে সমর, সেইখানে অমর, আর যেখানে অমর, সেইখানেই সমর।' অমরের মাতা বর্ত্তমান নাই, কিন্তু সমরের মাতা জীবিতা ছিলেন, পিতা বর্ত্তমান ছিলেন না। অমর সমরের জননীর নিকট মাতৃস্নেহ পাইত, সমর অমরের পিতার নিকট পিতৃ আদর পাইত। উভয়ের কিছুরই অভাব ছিল না, অভাব কাহাকে বলে, উভয়ে কেহই জানিত না। একত্রে শয়ন, একত্রে অধ্যয়ন এইরূপে দশ বৎসর কাটিয়া গেল, এক দিনের জন্য কেহ কাহার মনে কোনরূপ কষ্ট দেয় নাই।

এক দিন বৈকালে দুই জনে সেই বাগানে বেড়াইতেছে, দুই চারিটি অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর সমর বলিল—"ভাই অমর, আজ তোমায় একটা শুভ সংবাদ দিব।"

অমর আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"কি সংবাদ ভাই?"

সমর। আমার বিবাহ।

অমর। মিথ্যা কথা!

সমর। না অমর, সত্য, এই তিথে আষাঢ় দিন ধার্য্য হইয়া গিয়াছে।

এইবার অমর প্রাণের ভিতর এক অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল, মুখও বিবর্ণ হইল। সমর চাহিয়া দেখিল যে, অমরের চক্ষে আর সে জ্যোতিঃ নাই।

ব্যথিত হৃদয়ে ধীরে ধীরে অমর বলিল—"তোমার এ বিবাহ কেন সমর?"

সমর। বিবাহ সকলেই করে, তোমাকেও করিতে হইবে।

অমর। না—আমি বিবাহ করিব না।

সমর। কেন?

অমর। বিবাহ করিলে আর প্রণয় একেবারে থাকিবে না।

সমর হাসিয়া বলিল—"ছি অমর, এ কথা তোমার ভুল।"

অমর এইবার করুণস্বরে বলিল—"কিসে ভুল সমর? আমি তোমায় ভালবাসিতেছি, এ পৃথিবীতে আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারিব না, তবে বিবাহ করিবে কেন?"

সমর। বিবাহ করিলে কি কখন বন্ধুত্ব যায়? সকলেই ত বিবাহ করে, তাহাদের কাহার কি বন্ধু নাই?

অমর। তাহাদের কিরূপ বন্ধু আছে, তাহা আমি জানি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস তাহাদের প্রকৃত বন্ধু নাই।

সমর পুনরায় হাসিয়া বলিল—"তোমার সকলই ভুল। হৃদয়ের যতটুকু অংশ স্ত্রীর প্রাপ্য সেই অংশ স্ত্রীকে দিব, বেশী দিব না। আর যে অংশ বন্ধুর প্রাপ্য সে অংশ বন্ধুকে দিব, তাহা আর কাহাকে দিব কেন?

অমর। হৃদয়ের মধ্যেও ভাগাভাগি! আমার বিশ্বাস হৃদয় এরূপে ভাগ করা যায় না।

সমর। এও তোমার ভুল।

অমর আর কথা কহিল না। অনেকক্ষণ সমরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পূর্ব্বে সে মুখ দেখিয়া যেরূপ আনন্দ উপভোগ করিত, এখনও সেইরূপ করিল। সুতরাং অমর হৃদয়ে প্রথম আজ যে ব্যথা পাইল, সমরের মুখ দেখিয়া তাহা ভুলিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বাস্তবিকই ৩০শে আষাঢ় সমরের বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়াছিল। সমরের বিধবা জননী পুত্রবধূমুখ দেখিবার জন্য অস্থির হইয়া তাঁহারেই পিত্রালয়ের সন্নিকটে নিজেই একটী পাত্রী স্থির করেন। জননীর অনুরোধেই হউক, কিম্বা নিজের বিবাহ করিবার ইচ্ছা থাকা প্রযুক্তই হউক সমর এ সম্বন্ধে কোন আপত্তি করে নাই।

আজ ২৮শে আষাঢ় সমরের গাত্রহরিদ্রা। সমরের জননী আত্মীয় স্বজন সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সমরের গৃহ আনন্দ ও উৎসবে পরিপূর্ণ। সকলেই আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন, আজও সমর ও অমর উভয়ে সর্ব্বদা একত্রে রহিয়াছে, এক মুহূর্ত্তের জন্য কেহ কাহার কাছছাড়া নহে। উভয়েরই মুখ প্রফুল্ল,—সমরের প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া অমরেরও মুখ প্রফুল্ল হইয়াছে।

আজ ৩০শে আষাঢ় সমরের বিবাহ। প্রাতঃকাল হইতেই আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশী সকলে সমরের গৃহে আসিয়া জমিতে লাগিল আহারান্তে বেলা দুইটার সময় মহা সমারোহের সহিত বর ও বরযাত্র সকলে চলিলেন। সমর ও অমর একত্রে এক সঙ্গে চলিল চারি ক্রোশ রাস্তা অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সকলে কন্যাকর্ত্তার বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল। যথা সময়ে শুভক্ষণে গোধূলি লগ্নে পরিণয় হইয়া গেল। সে রাত্রেও অমর যতক্ষণ না বালিশে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সমর তাহাকে ছাড়িয়া বাসর ঘরে আসিতে পারে নাই। পর দিন প্রভাতে সকলে মহা আনন্দে ও উৎসবে বরকন্যা লইয়া রাঘাতাগ্রামে ফিরিয়া আসিল।

আজ ২রা শ্রাবণ সমরের ফুলশয্যা। এতকাল সমর ও অমর একত্রে এক শয্যায় শয়ন করিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু আজ আর তাহা হইল না, সন্ধ্যার পর হইতে অমরের মুখের সে প্রফুল্লতা আজ কি জানি কেন আর দেখা গেল না। সমরেরও মন আজ সেরূপ আনন্দিত ও উৎসাহিত নহে। প্রতি প্রত্যূষে সমর অমরের শয়নগৃহে গিয়া ডাকিল—"অমর!"

অমর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল। অমরের মলিন মুখ ও রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিয়া সমর বিস্মিত হইল। সে রাত্রে অমর এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিদ্রা যায় নাই। সে দৃশ্য দেখিয়া সমরের প্রাণ আকুল হইল, সমর ধীরে ধীরে অমরের শয্যায় গিয়া উপবেশন করিল। হঠাৎ বালিশে হাত পড়িল। সমর শিহরিয়া উঠিল—দেখিল, অমরের বালিশ ভিজা!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"শৈল, তুমি কি আমায় ভালবাস না?"

এক বিংশতি বৎসরের যুবক অতৃপ্ত-লোচনে এক ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া উৎসুক অন্তরে জিজ্ঞাসা করিতেছে—"শৈল, তুমি কি আমায় ভাল বাস না?"

বালিকা লজ্জায় জড়সড় হইয়া আকুঞ্চিত-দেহে মস্তক নত করিয়া রহিল, যুবকের সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। যুবক অস্থির, যেন সেই প্রশ্নের উত্তরের উপর তাহার জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে।

পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"শৈল, আমার মাথার দিব্য, আমায় ভালবাস কি না বল।"

বালিকা এইবার অতি ক্ষীণ স্বরে উত্তর করিল—"বাসি।"

কিন্তু এই ক্ষুদ্র "বাসি" কথায় যুবকের তৃপ্তি লাভ হইল না। যুবক বলিল—"আমার সহিত এরূপ ব্যবহার কর কেন শৈল? মাথা তুলিয়া কথা কহ না। আমি তোমার মুখখানি দেখিতে পাই না যে। তোমার মুখ দেখিলে এ পৃথিবীর আর কোন সুন্দর বস্তু দেখিতে আমার ইচ্ছা করে না। তোমার কথা শুনিলে স্বর্গীয় অপ্সরাদিগের গীতও আমার শুনিবার ইচ্ছা থাকে না। একবার মাথা তোল।"

এই কথা বলিতে, বলিতে যুবক সহসা বালিকার নতশির সোজা করিয়া দিল। যুবক তখন কাণ ভরিয়া বালিকার সেই সুন্দর মুখ খানি দেখিতে লাগিল। কিন্তু সেই মুখখানি দেখিয়াও যুবক সম্পূর্ণ সুস্থির হইতে পারিল না, কারণ বালিকার চক্ষু মুদিত ছিল। যুবক আগ্রহের সহিত বলিল—"শৈল, একবার চাও, আমার দিকে চাও।"

বালিকা চক্ষু চাহিবার চেষ্টা করিল, চক্ষুর পাতা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু বালিকা চাই চাই করিয়া আর চাহিতে পারিল না। চাহিতে পারিল না বটে, কিন্তু এই সময় বালিকার সেই ক্ষুদ্র মুখ খানিতে যে সৌন্দর্য্যের ক্ষণপ্রভা খেলা করিয়া গেল তাহা বর্ণনাতীত। অঙ্কুরিত প্রণয়ের অস্পষ্ট সৌন্দর্য্যকণায় আমাদের মন যেরূপ মোহিত হইয়া যায়, বর্দ্ধিত প্রণয়ের সৌন্দর্য্য-রাশিও আমাদের মনকে সেরূপ মোহিত করিতে পারে না। এই প্রস্ফুটিতোন্মুখ প্রণয়ের মধ্যে যেরূপ নির্ম্মল পবিত্র স্বর্গীয় ভাব আমরা দেখিতে পাই, এরূপ আর কোথাও আছে কি? যুবক মুহূর্ত্তের জন্য সেই অস্পষ্ট সৌন্দর্য্যকণা দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। হৃদয়ের বেগ স্থির করিতে পারিল না। বারম্বার বালিকার মুখ চুম্বন করিল।

পরে অনেক সাধ্যসাধনার পর বালিকা ধীরে ধীরে চক্ষু চাহিল। কিন্তু ঐ যা—আবার চক্ষু মুদিল। আবার যুবকের অনুরোধে চাহিল, আবার মুদিল। এইরূপ অনেকক্ষণ অভ্যাসের পর বালিকা সলাজে আড়ে আড়ে যুবার প্রতি চাহিতে আরম্ভ করিল। আ মরি! মরি! কি সুন্দর চাহনিরে! স্বর্গীয় কোন পদার্থ যদি এ কলঙ্কিত পৃথিবীতে থাকে, তবে ঐ চাহনিতেই তাহা আছে। যুবক মোহিত হইয়া তখন মনে মনে এই কথাই ভাবিতেছিল। ক্রমে ক্রমে যুবকের সকল সাধ মিটিতেছিল। হঠাৎ কি মনে পড়িল, যুবক ধীরে ধীরে বালিকার চিবুক ধরিয়া বলিল—"শৈল এইবার একবার তুমি হাস, একবার মাত্র তোমার ঐ হাসি মুখ দেখিবার জন্য আমি হাসিতে হাসিতে জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারি।"

বালিকা তৎক্ষণাৎ ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। কিন্তু তখনি হঠাৎ কি আসি কেন পুনরায় সেই ক্ষুদ্র দেহ-খানি অধিকতর আকুঞ্চিত হইয়া গেল, ঠিক যেন লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ করার পরিবর্ত্তে আঘাত করা হইল। বালিকা পুনরায় মস্তক নত করিয়া জড়সড় হইল। যুবক এইবার সাহস করিয়া বলিল—"ছি শৈল! তুমি আমায় ভালবাস না।"

কথা কয়েকটী বলিতে বলিতে যুবক শৈলকে আপনার কোলের দিকে টানিল। বালিকা তাড়াতাড়ি যুবকের বক্ষে মুখ লুকাইল। কিন্তু একি! অকস্মাৎ যুবক বিস্মিত নেত্রে দেখিল, বালিকার চক্ষের জলে তাহার বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। যুবকের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। এ কি শৈলের চক্ষের জল? যুবকের সে দৃশ্য অসহ্য হইল। যুবক ব্যথিতহৃদয়ে বলিল—"শৈল, তুমি কি কাঁদিতেছ?"

বালিকার উত্তর নাই!

পুনরায় প্রশ্ন হইল—"শৈল, কেন কাঁদ বল না।"

এবারও বালিকা নিরুত্তর!

যুবক পুনরায় আগ্রহের সহিত বলিল—"আমার কথার উত্তর দিবে না? কেন কাঁদ? বল—বল—বল।"

বালিকা এবারেও নিরুত্তর, কিন্তু এখন তাহার কান্না আর ছিল না, বালিকা তখন দুই হস্তে চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিল। যুবক বুঝিল যে তাহার দুইটি কথা বালিকার হৃদয়ে আঘাত করিয়াছে! যুবক এইবার শৈলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"না শৈল, তুমি আমায় যথার্থই ভালবাস। কিন্তু আমার সহিত ভাল করিয়া কথা কহ না কেন?"

শৈল এইবার ধীরে ধীরে বলিল—"আমার লজ্জা করে যে।" যুবক সে কথা শুনিয়া মোহিত হইয়া বালিকার-মুখ চুম্বন করিল।

এই সময় কে বাহির হইতে ডাকিল "সমর!"

যুবক চমকিয়া উঠিল, হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইলে যেরূপ হয় যুবকের অবস্থা ঠিক সেইরূপ হইল। পুনরায় বাহির হইতে কে ডাকিল—"সমর, একবার বাহিরে এস ভাই—সমর।"

সমর এইবার আর স্থির থাকিতে পারিল না বলিল—"একবার বাহিরে যাই?"

শৈল। না।

সমর। এখনি আসিব,—একবার যাই?

শৈল না—এখন যাওয়া হইবে না।

পুনরায় বাহির হইতে আগ্রহসূচক স্বরে শোনা গেল—"সমর, একবার এসনা ভাই।"

সমর এইবার একটু চঞ্চল হইয়া বলিল—"অমর ডাকিতেছে, এক মুহূর্ত্তের জন্য ছাড়িয়া দাও।"

বালিকা সেই সলজ্জ অর্দ্ধবিস্ফারিত চক্ষু সমরের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বলিল—"ডাকুক অমর, এখন ছাড়িয়া দিব না।"

পুনরায় বাহির হইতে অমর ডাকিয়া বলিল—"ভাই সমর, একবার আসিলে না?" এই "একবার আসিলে না" কথা কয়েকটী অমরের হৃদয়ের মর্ম্মস্থল হইতে বাহির হইতেছিল, তাহার কথা অস্পষ্ট, স্বর করুণরসোদ্দীপক। পূর্ব্বে অমরের মুখে এরূপ স্বরে এরূপ কথা শুনিলে সমর পাগলের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়াইত। কিন্তু আজ সমর স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, এক বিন্দুও অশ্রু তাহার চক্ষে দেখা গেল না। অমর আর একবার সমরকে ডাকিয়া কি কথা কহিয়াছিল, কিন্তু রুদ্ধকণ্ঠের সে কথা কেহ শুনিতে পাইল না তাহা বাতাসে মিশাইয়া গেল।

[ক্রমশঃ

সখের বাউল।

বা

বাউল বিংশতি।

প্রস্তাবনা।

সখের বাউল কুড়ি জন,
দুই দল, প্রতি দলে দশ জন,
আসরে খুলিয়া প্রাণ
গাহিবে কুড়িটী গান
পর পর সুস্বতর
হৃদয় প্রফুল্লকর;
খোলা প্রাণে করুন শ্রবণ।

১ম দল।

বাউলের সুর—রাগিণী ভৈরবী—একতালা।

ভবে কেউ দুখী নয়, আমিই দুখী।
বিরোধ বিষম লেঠা ভালবাসি হাসিখুসি।
বিধাতা নহেন বাম,
সুখ-ভরা ধরাধাম,
হৃদয় আনন্দধামে নিরানন্দ কেন পুষি!

মা'র কোলে ছেলে হাসে,
চাঁদ হাসে নীলাকাশে,
উদয়-অচলে কিবা হাসে উষা অকলুষী!

সকলি তো নিজ দোষ,
কার প্রতি করি রোষ,
পরে মিছে দুখী কোরে কেন আপনারে তুষি!

হাস খেল মনসাধে,
কাজ নাই বিসম্বাদে,
দু দিনের তরে আহা কেন রে ভাই রোষারুষি!

॥১॥

২য় দল।

বাউলের সুর—রাগিণী পাহাড়ী—তেতালা।

ভবের খেলা চমৎকার।
এর কোথাও ফাঁসি, কোথাও হাসি,
কোথাও ওঠে হাহাকার।

লক্ষ্মী দেবী হিরণ্ময়ী কিরণে কিরণ,
পেঁচা বিচিত্র বাহন;
খেলে পদ্মবনে আপন মনে পরিয়ে পদ্মের হার
সরস্বতী, পরিয়ে পদ্মের হার।

দ্যাখে আপন কোটা, গোটা সপ্তসমুদ্র সমান
যত খেকী-তেজীয়ান্;
রাখে প্রাণ দিয়েও পরের মান, এমন সুজন—
হরি হে, এমন সুজন মেলা ভার।

বিশ্ব-শাস্ত্র-পাঠকের প্রাণ অনন্ত-উদার,
প্রেম স্নেহ পারাবার;
মিট্‌মিটে গ্রন্থ-কীড়ে মহিমা বোঝে না তার

॥২॥

১ম দল।

বাউলের সুর—রাগিণী খোগিয়া-

(জৎ কাঠিনে)

আমিও তো ভাই, তারো কিছু বুঝিনে!
আহা সেই রসের সাগর, প্রেমের আকর,
ভুলেও তারে ডাকিনে!

পোষা প্রাণ ভোলা-মন বনের পাখী,
তুচ্ছ সুখের তরে ধোরে তারে পিঞ্জরে রাখি;
তার প্রাণটা কত কাতরে বেড়ায়
দেখেও চোকে দেখিনে।

সরল পশু, সরল শিশু, সরলা নারী,
কতই সবাই ভালবাসে, সবাই আমারি,
আমি সেই ভালবাসা পেতে পটু,
ফিরে দিতে জানিনে।

নূতন রূপের রাশি, প্রাণের হাসি হাসে যুবতী,
মনের কুতূহলে কৌতুকিনী, মধুর মূরতি;
আমি তার মায়ের মতন আদর কোরে
নয়ন ভোরে হেরিনে।

জ্যোস্নায় তরুলতা মনের কথা কহই করে যায়,
বাতাসে হেলে দুলে বাহু তুলে আলিঙ্গন চায়,
আমি কাতান্ ধোরে কাট্‌তে দাঁড়াই,
সাধের সোহাগ—
তাদের, সাধের সোহাগ মানিনে।

তোমার উদার স্নেহে
সুখে প্রাণ আছে দেহে,
কৃপা কর হে করুণাময় দয়ামায়া-বিহীনে!
।৩।

২য় দল।

বাউলের সুর—রাগিণী পাহাড়ী—তেতালা।

প্রেমের মানুষ চেনা যায়!
তার হাসির মুখশশী, খুসি কোটে চেহারায়।

সদাশিব, সদানন্দ, সরল অন্তর,
কেহ নাহি আপন্ পর;
সে জানেনা দুনীয়াদারি, ভালবাসে দুনীয়ায়।

আপন্ মনে আপনি মগন,
চুলু চুলু ঢোলে দু-নয়ন,
সে কি যেন মধুর বাঁশী সদাই শুনিতে পায়।
॥৪॥ [ক্রমশঃ

শ্রীবিহারিলাল চক্রবর্ত্তী।

নারের জমীদার—গোবিন্দরাম মিত্র।

পলাশী যুদ্ধের পূর্ব্বে, প্রাচীন কলিকাতায় 'গোবিন্দ রামের হড়ী", "জগৎশেঠের কড়ি", "বনমালী সরকারের বাড়ী" ও "উমিচাঁদের দাড়ী" এই চারিটি অভিধেয় প্রসিদ্ধ ছিল।

এই প্রবন্ধে গোবিন্দরাম মিত্রের বিবরণ প্রদান করা আমাদের মূল উদ্দেশ্য হইলেও উল্লিখিত প্রবাদবাক্য সংলিপ্ত "জগৎশেঠ", "বনমালী সরকার," ও "উমিচাঁদের" সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটী কথা বলিব। জগৎশেঠের নাম কলিকাতায় যে এই সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতিলাভ করিয়াছিল তাহার আর বিচিত্র কি? সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী এডমণ্ড বার্ক বলিয়াছিলেন—"Their (the Jagut Setts') transactions were as Extensive as those of the Bank of

England." বস্তুতঃ মুরশীদাবাদ, কলিকাতা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক গদীতে তাঁহাদের অসংখ্য টাকা খাটিত। দেশের রাজকার্য্য ও রাজস্ব বন্দোবস্তে তাঁহারা যথেষ্ট সহায়তা করিতেন। যে বিপ্লবে নবাবের সর্ব্বনাশ হয়, বাঙ্গালার মসনদের মুসলমানের অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্নিত রক্ত-পতাকার পরিবর্ত্তে ইংরাজের সিংহচিহ্নিত পতাকা প্রোথিত হয়—সেই বিপ্লবে বাঙ্গালার অন্যান্য দিক্‌পালদিগের ন্যায়—জগৎশেঠেরাও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। "জগৎশেঠ" শব্দটী ইংরাজিতে অনুবাদ করিলে "Banker of the world" হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতেই তাঁহাদের ক্ষমতার ও নাম-গৌরবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

বনমালী সরকার কুমারটুলীতে বাস করিতেন। কলিকাতায় তখন বড় বড় বাড়ীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল। বাঙ্গালী টোলায় কয়েকখানি ইংরাজের ক্যাক্‌টরি ও দুর্গ এবং স্থানে স্থানে ইংরাজের বাসোপযুক্ত ২।৩ খানি অট্টালিকা ব্যতীত এই সময়ে বড় বাড়ী প্রায় দেখা যাইত না। যে চৌরঙ্গী আজকাল গগনস্পর্শী সুধাধবলিত সৌধমালায় বেষ্টিত, তাহা এই সময়ে জঙ্গলময় ও কয়েক খানি সামান্য কুটীরপূর্ণ ছিল। সমস্ত কলিকাতার মধ্যে বনমালী সরকারের বাড়ী বিশেষ বিখ্যাত ছিল। বনমালী সরকার জাতিতে সদ্‌গোপ। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বরে বাস করিতেন। সরকার মহাশয়ই সর্ব্ব প্রথমে ভদ্রেশ্বর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমে পটনার Commercial Resident-এর নিকটে দেওয়ানী করিয়া বীয় অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করেন। ইহার পর, তিনি কলিকাতায় কোম্পানীর অধীনে Deputy Trader-এর কর্ম্মে নিযুক্ত হন। এই কার্য্যেই তাঁহার লক্ষ্মী শ্রী যথেষ্ট বাড়িয়া উঠে। তাঁহার সুবিখ্যাত বাড়ী, পলাশীযুদ্ধের দুই চারি বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল—এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার পরিত্যক্ত অগাধ ঐশ্বর্য্য সেই সময় হইতেই তাঁহার ইষ্ট দেবতা শ্রীশ্রী৺ শ্যামসুন্দরের সেবায় ব্যয়িত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার বংশের সহিত সংশ্লিষ্ট কেহ এখনও বর্ত্তমান আছেন কি না তাহা আমরা জানি না। না থাকাই বিশেষ সম্ভব।

উমিচাঁদের সম্বন্ধে ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই কিছু না কিছু অবগত আছেন। তাঁহার দীর্ঘশ্মশ্রু সেই সময়ে অতিশয় খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। কলিকাতা কৌন্সিল ও মুরশীদাবাদ দরবারের মধ্যে তাঁহার দাবাই কথোপকথন চলিত। জনরব এই—তাঁহার উত্তেজনায় নবাব সেরাজ-উদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। ইংরাজেরা এই বিষয়ে সন্দেহ করিয়া ১৭৫৬ অব্দের প্রারম্ভে তাঁহাকে কারাবদ্ধ করেন। পরে তিনি নবাবের সহায়তায় কারামুক্ত হন। অপার সার্কুলার রোডে তাঁহার এক বৃহৎ বাগান ছিল। এই বাগানে কলিকাতা আক্রমণের সময় সেরাজের সৈন্যেরা তাঁবু গাড়িয়াছিল। এই বাড়ীওয়ালা উমিচাঁদই ধূর্ত্ত ক্লাইবের চতুরতা-জালে আবদ্ধ হইয়া "জাল সন্ধি পত্রে" প্রতারিত হন। ইংরাজেরা বলেন, যখন উমিচাঁদ জগৎশেঠের বাটীতে এই জাল সন্ধির বিষয় অবগত হইলেন, তখন মূর্চ্ছিত

হইয়া পড়েন ও তাহাতেই তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হয়। ইহা সম্পূর্ণ অমূলক। এই ঘটনার পরও ৫। ৭ বৎসর পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার নাম শুনিতে পাই। বাবু হজুরীমল উমিচাঁদের পরিত্যক্ত বিষয়ের Executor নিযুক্ত হন। উমিচাঁদের নিয়োগানুসারে হজুরীমল প্রায় ২৫০০০ টাকা কোম্পানির দাতব্য ফণ্ডে প্রদান করেন।

এই চারি জন লোক সেই সময়ে কলিকাতার মধ্যে যথেষ্ট ক্ষমতাশালী ও বিত্তসম্পন্ন ছিলেন। গোবিন্দরাম মিত্র কলিকাতা-প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ জব চার্ণক সাহেবের আমল হইতে কোম্পানির অধীনে সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় বুদ্ধিবলে পরিশেষে "সাহেব জমীদারের" পদ লাভ করেন। আজকাল লেফটেনাণ্ট গবর্ণরের কার্য্য যেমন সিবিলিয়ানদের উচ্চতম স্পৃহার বস্তু, সেই সময়ে কোম্পানীর অধীনে 'সাহেব জমীদারের' পদও তদ্রূপ ছিল। দেশীয়েরা গোবিন্দরাম মিত্রকে "সাহেব জমীদার" বলিয়াই জানিত। সাহেবেরা তাঁহাকে, 'ডেপুটী জমীদার," "ব্ল্যাক ডেপুটী" বা "ব্ল্যাক জমীদার" বলিতেন। গোবিন্দরাম মিত্রকে এই সময়ে কলিকাতার সকলেই ভয় করিত। নবাবের ফৌজদার, ইংরাজ প্রেসিডেণ্ট, ও ফ্যাক্টর সাহেবকে লোকে যত দূর না ভয় করিত গোবিন্দরামকে তাহারা তদপেক্ষা ভয় করিত। মোট কথা সেই সময়ে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়া নানা কারণে গোবিন্দরাম বর্দ্ধিতবিক্রম হইয়াছিলেন। তাঁহার বিলক্ষণ লাঠির জোর ছিল, সুতরাং সকলেই তাঁহার লাঠিকে ভয় করিত। এই কারণেই তাঁহার 'ছড়ি" বা "লাঠি" প্রাচীন কলিকাতায় অনেকের নিকটে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

নায়েব জমীদার গোবিন্দরাম মিত্র, কুমারটুলির সুবিখ্যাত মিত্র-পরিবারের সংস্থাপয়িতা। তাঁহার সময় হইতেই "মিত্র-পরিবার" কলিকাতায় যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বর্ত্তমানে এই মিত্র-পরিবার তিনটী শাখায় বিভক্ত হইয়াছেন। একদল তাঁহাদের কুমারটুলির প্রাচীন পৈতৃক ভদ্রাসনে বাস করিতেছেন, অপর শাখা বারাণসীতে, ও কলিকাতার নন্দন বাগানে আজও বর্ত্তমান।

গোবিন্দরামের পূর্ব্বপুরুষদের বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করা অতি দুর্ঘট। তাঁহার পিতা রত্নেশ্বর মিত্র ও পিতামহ বংশেশ্বর মিত্র, চানকের সন্নিহিত কোন গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পিতা ও পিতামহের মধ্যে কেহই কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন নাই। গোবিন্দরামই সর্ব্ব প্রথমে, চানক পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন।

গোবিন্দরাম যখন কলিকাতায় আসিলেন তখন কলিকাতার অবস্থা অতি অল্প মাত্রই উন্নত হইয়াছে। জব চার্ণক সাহেব হুগলী হইতে সুতানুটীতে কুঠী উঠাইয়া লইয়া আসিবার কিয়ৎকাল পরেই গোবিন্দরাম গোবিন্দপুরে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৬৯৬খ্রীঃঅব্দে চিতোর ও বর্দ্ধার তালুকদার শোভাসিংহ বিদ্রোহী হইয়া নবাবের ও ফৌজদারের ক্ষমতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাতে ইউরোপীয় বণিকসম্প্রদায় অত্যন্ত ভয় পাইলেন। তাঁহারা আপনাদিগের বাণিজ্যাগার ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য গৃহগুলি সুরক্ষিত করিবার জন্য সুবাদারের অনুমতি প্রার্থনা

করিলে সুবাদার তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। ইংরাজ গোপনে দুর্গ প্রস্তুত কার্য্য অর্দ্ধ সমাপ্ত করিয়াছিলেন, এক্ষণে প্রকাশ্য আজ্ঞা পাইয়া উত্তমরূপে দুর্গ সংস্করণ করিয়া লইলেন। এই সময়ে বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, ইংরাজের ক্ষমতাও অনেকটা বাড়িয়া ছিল; সুতরাং অনেকে আসিয়া কলিকাতায় ও গোবিন্দপুরে বাস করিতে লাগিল।

কি কারণে উত্তেজিত হইয়া সুপ্রসিদ্ধ জব চার্ণক সাহেব হুগলী ও তৎসন্নিহিত বাণিজ্যোপযোগী স্থান সমূহ ছাড়িয়া একেবারে কলিকাতায় আসিয়া পড়িলেন তাহার কারণ অনুসন্ধান করা এই প্রসঙ্গের উদ্দেশাভুক্ত না হইলেও, আমরা পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তাহা এস্থলে উল্লেখ করিব। একদিন হুগলীর কুঠীতে স্বয়ং জব চার্ণক অন্যান্য ফ্যাক্টর ও কোম্পানীর কর্ম্মচারি পরিবৃত হইয়া মধ্যাহ্ন সময়ে ভোজন করিতেছিলেন, এমন সময়ে নদীর ভাঙ্গন আরম্ভ হওয়াতে হুগলীর কুঠীর কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া ভাগীরথীগর্ভে প্রবেশ করিল। ভাগীরথী তখন এত হীনতেজা ছিলেন না, বিশেষতঃ সেই সময়ে দেশে ঘোর বন্যা উপস্থিত, সুতরাং এক দিবসের মধ্যেই একটু একটু করিয়া হুগলীর কুঠীর অধিকাংশ অংশই নদীগর্ভশায়ী হইল। কর্ম্মচারিরা প্রাণে বাঁচিল বটে, কিন্তু বাণিজ্যদ্রব্য গুলি তরঙ্গগ্রাস হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। চার্ণক ও তাঁহার সঙ্গীগণ এই আকস্মিক বিপৎপাতে আহার ত্যাগ করিয়া উঠিলেন; তরঙ্গের প্রতিরোধ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইল কিন্তু প্রকৃতির প্রচণ্ড বলের সহিত মানব কতক্ষণ যুঝিতে পারে? মালামালের সহিত কোম্পানীর হুগলীর কুঠি কতক নদীগর্ভে প্রবেশ করিল। চার্ণক এই স্থান হইতে কুঠী উঠাইয়া লইয়া গিয়া অদূরে একটী অভিনব স্থল মনোনীত করিলেন। কয়েক মাসের মধ্যে সেই নূতন স্থলে নূতন কুঠী নির্ম্মাণ হইল। কুঠীর চারি দিক প্রাচীর দিয়া বেষ্টন করা হইল। মধ্যে কাজ চলিবার উপযুক্ত কয়েকটী Warehouse (মালগুদাম) ও কর্ম্মচারি দিগের থাকিবার নিমিত্ত দুই চারিটী দ্বিতল ব্যারাক প্রস্তুত হইল—অন্যান্য কার্য্যও ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। কিন্তু ইহাতেও আবার নূতন ব্যাঘাত উপস্থিত হইল—এই কুঠির অংশে পাশে অনেক বড় বড় বাঙ্গালী সওদাগর ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক বাস করিতেন। তাঁহাদের অবস্থা ও ক্ষমতা বড় অবহেলার যোগ্য ছিল না। তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার কোম্পানীর Warehouseএ মাল যোগাইতেন—উল্লিখিত নূতন কুঠীর দ্বিতল গৃহগুলির উপর ছাদের উঠিলেই ইহাদের বাড়ীর সমস্ত ঘটনা দেখা যাইত। অসূর্য্যম্পশ্যা হিন্দুরমণীকে কুঠীর সাহেবেরা যখন তখন দেখিবে—ইহা তাঁহারা বড় পছন্দ করিলেন না। একদিন কুঠীর এক জন সাহেব দালাল ছাদের উপর উঠিয়া পার্শ্ববর্ত্তী কোন গৃহস্থের কন্যাকে কুচিনিকুচি কোন রহস্য করায় হিন্দু অধিবাসীরা বড় ক্ষেপিয়া উঠিল। কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই গোরাদের উপর বড় চটিয়া গেল। কুঠী ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য ফৌজদারের সহায়তা প্রর্থনা করায়, তিনি নবাবের অনুমতির ওজর করিলেন। নবাবের অনুমতি

আদিল। অবচার্চক ইহা শুনিলেন। কুঠীর মধ্যে যে অল্প মাল মজুত ছিল তাহা নৌকায় উঠাইয়া সমস্ত কর্ম্মচারির সঙ্গে আহারে উঠিলেন। যাইবার সময় কুঠীর সকল গৃহে আগুণ লাগাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। ফৌজদারের সেনাগণকে বড় একটা কষ্ট করিতে হইল না, কিন্তু কৌন্সার সাহেব কষ্ট হইয়া কলিকাতার নিকটস্থ "মুখোয়া" (?) থানার জমাদারের উপর অবচার্চককে মালা-সান সমেত ধরিবার জন্য পরোয়ানা পাঠাইয়া দিলেন। এই সময়ে ভাগীরথীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, মগ ও আরাকান জলদস্যুদিগের উৎপাত নিবারণের জন্য নদী-জল মধ্যে লৌহশৃঙ্খল ডোবান থাকিত—এই সকল স্থলে সাধারণের গতিবিধি করিবার সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল। ফৌজদার যখন শুনিলেন, অবচার্চক এই শৃঙ্খল কাটিয়া দিয়া জাহাজ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে তখন বড়ই ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু চার্চকের অদৃষ্ট বড় সুপ্রসন্ন। এই সময়ে নদীর পরপারে দিল্লীশ্বরের সেনাগণ কোন বিশেষ কার্য্যোদ্দেশে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিতেছিল। তাহাদের সহিত প্রচুর পরিমাণে রসদ ছিল না—তায় সম্মুখে দুর্ভিক্ষ। চার্চকের সহিত নৌকায় কুঠির মজুত প্রচুর শস্য ছিল। তিনি এই সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া বাদশাহের প্রসাদ লাভোদ্দেশে উপযাচক হইয়া সেই সমস্ত শস্য সৈন্যদিগের ব্যবহার জন্য অর্পণ করিলেন। ফৌজদারের ভয় ঘুচিল। কয়েক দিন পরে ইহার পরিবর্ত্তে তিনি বাদসাহের প্রতিনিধির নিকট হইতে কলিকাতায় ফ্যাক্টারি করিয়া বাস করিবার হইলেন।*

চার্চক কলিকাতায় আসিলেন। যখন কলিকাতা সুতানুটী ও গোবিন্দপুর প্রভৃতি তিন খানি গ্রাম তাঁহার করতলস্থ হইল, তখন কোম্পানীর বাণিজ্য-জগতে এক যুগান্তর উপস্থিত হইল। বাণিজ্যবৃদ্ধির সহিত চারি দিক হইতেই লোক আসিয়া দলে দলে বাস করিতে লাগিল। এই শ্রীবৃদ্ধির সময়ে গোবিন্দরামও কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন।

গোবিন্দরাম মিত্র অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন. পারসী ও বাঙ্গালাতে তাঁহার বিশেষ দখল ছিল, ইংরাজিও একটু আধটু বুঝিতে পারিতেন, সুতরাং কোম্পানীর অধীনে অনায়াসেই তাঁহার কর্ম্ম জুটিল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময়ে কোম্পানীর কর্ম্মে—বিশেষতঃ কুঠির কাজে নিযুক্ত হইতে পারিলে বিলক্ষণ লাভ ছিল। গোবিন্দরাম মিত্র অতিশয় তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালী ছিলেন বলিয়া অতি শীঘ্রই কুঠির গোমস্তা হইতে অত্যুচ্চ পদে অধিরোহণ করিলেন।

কোন্ সময়ে নিযুক্ত হইয়া কত দিন পর্য্যন্ত গোবিন্দরাম মিত্র কোম্পানীর অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা নির্দ্ধারিত করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে আমরা ডাইরেক্টারদিগের চিঠি পত্রে ও কোম্পানীর অন্যান্য কার্য্য-বিবরণীতে গোবিন্দরাম মিত্রের নামোল্লেখ দেখিতে পাই। উল্লিখিত চিঠিপত্র ও বিবরণী হইতে ইহাই নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয় যে গোবিন্দ-

* Gladwin's Bengal Pt. 1 (1775)

রাম মিত্র ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ও তাহার কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই "ব্লাক্ জমীদার" বা নায়েব জমীদারের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন।

কোম্পানীর তদানীন্তন জমীদারি ও অন্যান্য কার্য্য সম্পাদনের জন্য দুইজন করিয়া প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেন। ইহাদের মধ্যে একজন বিলাতি ও অন্য ব্যক্তি দেশীয়। বিলাতি কর্ম্মচারী "জমিদার" অথবা "White Zamindar" নামে অভিহিত হইতেন ও তাঁহার অধীনস্থ দেশীয় সহকারী "নায়েব জমীদার" বা ব্লাক্ জমীদার" বলিয়া পরিচিত হইতেন। গোবিন্দরাম মিত্রই কোম্পানীর প্রথম নায়েব জমীদার। দেশীয়ের সহায়তা ব্যতীত ইংরাজেরা আজও পর্য্যন্ত কোন কার্য্য একাকী করিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহাদের সেই ঘোরতর অজ্ঞতার সময়ে যে বিচক্ষণ দেশীয়ের সহায়তা সকল বিষয়েই প্রতিপদে আবশ্যক হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই জন্যই গোবিন্দরাম মিত্র তাঁহার উর্দ্ধতন "সাদা" জমীদারকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রথম সহকারী নিযুক্ত হইলেন।

সাহেব জমীদারেরা প্রতি বৎসরের শেষে প্রায়ই বদলী হইতেন। জোর দুই বৎসরের অধিক কাহারও এই কার্য্য করিবার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু নায়েব জমীদারের কার্য্য ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির ছিল। নায়েব জমীদার, ধরিতে গেলে, প্রকৃত পক্ষে, সাহেব জমীদারের কার্য্য করিতেন। তাঁহাকে কখন-বদল করা হইত না, সুতরাং প্রতি বৎসরেই তাঁহার ক্ষমতা যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল। গোবিন্দরাম মিত্র একাদিক্রমে ৩২ বৎসর কাল নায়েবী করিয়াছিলেন, সুতরাং তৎকালে কলিকাতায় তাঁহার ন্যায় প্রকৃত ক্ষমতাশালী কেহই ছিল না। তিনি যাহা মনে করিতেন তাহাই করিতে পারিতেন। সাহেব জমিদার তাঁহার ক্রীড়াপুতলি মাত্র ছিলেন। তিনি সহস্র অত্যাচার করিলে কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি করিবার ক্ষমতা ছিল না। এই জন্যই বোধ হয় "গোবিন্দরামের ছড়ী" বা লাঠির প্রতিপত্তি প্রাচীন কলিকাতায় চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

সহরের আয় নির্দ্ধারণ, জমীর খাজনার সু-বন্দোবস্ত করা, এক তেটিয়ার ছাড় বা ইজারা দেওয়া ও ফারম ইজারা ও পত্তনি দেওয়া সমস্ত ক্ষমতাই সাদা জমীদারের হাতে ছিল। কিন্তু এ সকল বিষয়ে তাঁহার বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি সহজে প্রবেশ করিত না বলিয়া তিনি প্রকারান্তরে নায়েব জমীদারের হাতে এই সমস্ত কাজের ভার দিতেন। ফারম ইজারা দেওয়া সম্বন্ধে কর্ম্মচারির বিলক্ষণ লাভ ছিল। গোবিন্দরাম অনেক ফারম বেনামী করিয়া নিজ নামে জমা করিয়া লইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক উপায়েও তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। নায়েব জমীদারের কার্য্যে বিশেষ লাভ হইতেছে না দেখিয়া ডিরেক্টারেরা ১৭৭৮ অব্দে লিখিয়া পাঠাইলেন "নায়েবজমীদারের কার্য্যে কোম্পানীর কোন বিশেষ লাভ নাই, ইহাতে তাঁহার নিজেরই লাভ অধিক, সুতরাং এই পদটা উঠাইয়া দিলে কার্য্য চলিতে পারে কি না?" এই পত্রে কোন ফল হইল না। ইহার পরও চারি বৎসর পূর্ব্ববৎ নিয়মে কার্য্য চলিয়া আসিতে লাগিল।* পরে ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দে হলওয়েল সাহেব যখন দীর্ঘ সময়ের জন্য

"সাহেব জমীদার" নিযুক্ত হইলেন, সেই সময়ে গোবিন্দরামের পূর্ব্বকৃত কার্য্যের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। হলওয়েল সাহেব জমীদার হইয়াই গোবিন্দরাম মিত্রের নিয়োগের প্রথম হইতে সেই সময় পর্য্যন্ত জমীদারীর সমস্ত কাগজপত্র তলব করিলেন। উত্তর আসিল—১৭৩৮ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বের সমস্ত কাগজপত্র তাঁহার পূর্ব্ব বৎসরের দারুণ ভূমিকম্পে, জলপ্লাবনে ও ঝড়ের চোটে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ও উহার পরবর্ত্তী সমস্ত কাগজ পত্র উইয়ে খাইয়াছে অন্য কাহারও মুখ হইতে এই প্রকার অসার উত্তর বাহির হইলে বোধ হয় তৎক্ষণাৎ হলস্থূল পাধিয়া যাইত। গোবিন্দরাম মিত্র ধরিতে গেলে হলওয়েলের অপেক্ষা প্রকৃত পক্ষে ক্ষমতাবান ছিলেন। তিনি যে মধ্যে মধ্যে অত্যাচার করিতেন ইহা আবালবৃদ্ধ সকলেই জানিত, কিন্তু কেহই এই সময়ে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনিতে সাহসী হইল না। হলওয়েল সাহেবের স্তোক বাক্যে ও অভয়বাণীতেও কি দেশীয় কি অন্য জাতীয় কেহই কোন প্রকার অভিযোগ আনিতে সাহস করিল না। একজন আরমানি সওদাগর গোপনে মিত্রজার বিরুদ্ধে দুই চারিটী কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছিল, তৎক্ষণাৎ কোথা হইতে কোন্ অলক্ষ্য হস্ত আসিয়া তাহার গৃহদাহ করিয়া দিল, তাহার ধন-ভাণ্ডার লুঠ করিল, তাহার জেনানা লুঠিয়া লইয়া গেল। সে ব্যক্তি দুর্দ্দৈব দেখিয়া এ বিষয়ে একবারে নিরস্ত হইল।

হলওয়েল সাহেব বেগতিক দেখিয়া তৎকালীন কলিকাতার কৌন্সিলের সম্মুখে গোবিন্দরাম মিত্রের নামে প্রকাশ্য অভিযোগ করিলেন। তাঁহার অভিযোগের মূল মর্ম্ম এই যে "গোবিন্দরাম মিত্র অন্যায় উপায়ে, প্রতারণা করিয়া কোম্পানীর তহবিলের দেড় লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন, এই সমস্ত টাকা যাহাতে বিচার মতে কোম্পানীর তহবিলে ফিরিয়া আসে তাহার উপায় করা বিশেষ আবশ্যক।" অভিযোগের সঙ্গে সঙ্গে দুই চারিটী সামান্যতর প্রমাণ পাইয়া হলওয়েল সাহেব আরও বলিলেন—"যতদিন পর্য্যন্ত না গোবিন্দরাম মিত্র উল্লিখিত দেড় লক্ষ টাকা কোম্পানীর তহবিলে ফিরাইয়া দিবেন ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ও ঘর বাড়ী কোম্পানীর কঠিন পাহারার মধ্যে থাকিবে, ও তাঁহার পুত্র রঘুনাথ মিত্র জামিন স্বরূপে কোম্পানীর নিকটে আবদ্ধ হইবেন।" কিন্তু হলওয়েল সাহেব এত করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কৌন্সিলের সদস্যগণ এমন কি স্বয়ং প্রেসিডেন্ট সাহেব পর্য্যন্ত গোবিন্দরাম মিত্রের নিমকভোজী ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা হলওয়েল সাহেবের এই অবমাননাকারী প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। প্রহরীবেষ্টিত করিয়া গোবিন্দরাম মিত্রকে আবদ্ধ করা দূরে থাক্—তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ গুলিই তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া একটা কৈফিয়ত চাহিয়া বসিলেন। সাত দিনের মধ্যে গোবিন্দরাম দুই দফা কৈফিয়ৎ পাঠাইলেন। কৈফিয়ৎ গুলি ইংরাজীতে লিখিত। বলা বাহুল্য ইহা ফাক্‌টরীর কোন উচ্চপদস্থ সাহেব কর্ত্তৃক গোবিন্দরামের উপদেশেই লিখিত হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

রাজর্ষি।*

মুখপাত ভাল দেখিয়া যদি কোন গ্রন্থকে ভাল বলিতে হয়, তবে এ গ্রন্থ খানি নিশ্চিত ভাল। যেরূপ উপকরণে ইহার প্রথম ভাগ রচিত, তদ্রূপ উপকরণে যদি ইহার দ্বিতীয় ভাগ গঠিত হইত, তাহা হইলে গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় সামগ্রী হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমরা সে রূপ উপাদেয় সামগ্রী লাভে বঞ্চিত হইয়াছি। যাহা হউক, গ্রন্থের প্রথম ভাগ ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র আয়তনে একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। ক্ষুদ্র আয়তন মধ্যে যাহা সম্পূর্ণ হয়, তাহা প্রায় নাটকীয় গুণে অলঙ্কৃত হইয়া পড়ে। ইহার প্রথম ভাগে তাহাই ঘটিয়াছে। কি দৃশ্য-যোজনা, কি ঘটনা-সংস্থান, কি হৃদয়-বেদনা, সর্ব্বাংশেই এ ভাগকে নাটকীয় রসে পরিপূর্ণ করিয়াছে। বালিকা 'হাসি' এ নাটকের প্রথম সূচনা করিয়া দিল। বালিকার তরুণ হৃদয় ভুবনেশ্বরীর নরবলি; রুধির স্রোতে সহসা সিহরিয়া উঠিল। সেই সিহরণ যেন তাড়িৎ গুণে রাজার হৃদয়কে সিহরিয়া দিল। সেই সিহরণ বালিকার মজ্জায় মজ্জায় আঘাত করিল। বালিকা রোগাক্রান্ত হইয়া অনন্ত শয্যায় বিসর্জ্জিতা হইল। তদবধি রাজার মনে বিষম বেদনা বোধ হইল। তাঁহার হৃদয়-দ্বার একদা খুলিয়া গেল। একটি বসন্ত-কুসুম তাঁহার হৃদয়ে প্রথম প্রস্ফুটিত হইল। সহসা যেন বসন্তানিল হৃদয়ে প্রবাহিত হইল। হৃদয়-তরঙ্গ ফিরিয়া গেল। তাহার স্রোত বিপরীত দিকে বহিল। আজি তিনি যেন আর এক রাজ্যে আসিয়া পড়িলেন। এ চমক এত সহসা ঘটিল, যে তাঁহাতে নাটকীয় ভাবের বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। এইরূপ হৃদয়পরিবর্ত্তনে তিনি যেন এক মধুময় প্রেমরাজ্য দেখিতে পাইলেন। সেই হৃদয়ে একদা রাজ্যমধ্যে বলিদান উঠাইয়া দিলেন।

একদিন রাজার হৃদয় যেরূপ হঠাৎ ফিরিয়া গিয়াছিল, সেরূপ কয় জন লোকের কয় দিন ঘটে? কিন্তু আমাদের রাজার একদিন এরূপ ঘটিয়া থামে নাই। প্রেম একবার হৃদয়ে প্রবেশ করিলে, তাহাকে ক্রমেই প্রসারিত করিতে থাকে। গোবিন্দ-মাণিক্যের হৃদয় তদ্রূপ ক্রমশই প্রসারিত হইয়াছিল। তিনি যখন রাজ্যত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া লোকালয়ের বাহিরে পর্ব্বত-শিখরে বসিয়া নির্জ্জনের সুখ ও পবিত্রতা, এবং পার্ব্বত্য দেশের শোভা সম্ভোগ করেন, এমত সময় দেখিলেন "নির্জ্জনে ধ্যান-পরায়ণা প্রকৃতি যে স্নেহ-ধারা সঞ্চয় করিতেছে, সজনে লোকালয়ের মধ্যে তাহা নদীরূপে প্রেরণ করিতেছে--যে তাহা গ্রহণ করিতেছে, তাহার তৃষ্ণা নিবারণ হইতেছে, যে করিতেছে না, তাহার প্রতিও কোন অভিমান নাই। গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন, আমিও আমার এই নির্জ্জন সঞ্চিত প্রেম সজনে বিতরণ করিতে বাহির হইব, বলিয়া তাঁহার পর্ব্বতাশ্রম ছাড়িয়া তিনি বাহির হইলেন।" এক্ষণে রাজার

---

* শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। আদি-ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১২৯৩।

হৃদয়রাজ্য কিরূপ প্রসারিত হইয়াছে একবার তাহার এইরূপ ছবি আঁকিলেন। "পূর্ব্বে যে পৃথিবীকে মাঝে মাঝে মাতৃহীনা বলিয়া বোধ হইত, সেই পৃথিবীকে আনতনয়না চিরজাগ্রত জননীর কোলে দেখিতে পাইলেন। পৃথিবীর দুঃখ শোক দারিদ্র, বিবাদ, বিদ্বেষ দেখিলেও তাঁহার মনে আর নৈরাশ্য জন্মিত না। একটিমাত্র মঙ্গলের চিহ্ন দেখিলেই তাঁহার আশা সহস্র অমঙ্গল ভেদ করিয়া স্বর্গাভিমুখে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত। আমাদের সকলের জীবনেই কি কোন না কোন দিন এমন এক অভূতপূর্ব্ব নূতন প্রেম ও নূতন স্বাধীনতার প্রভাত উদিত হয় নাই, যে দিন সহসা এই হাস্যক্রন্দনময় জগৎকে এক সুকোমল নবকুমারের মত, এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রেম ও মঙ্গলের ক্রোড়ে বিকসিত দেখিয়াছি! যে দিন কেহ আমাদিগকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে না, কেহ আমাদিগকে জগতের কোন সুখ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না, কেহ আমাদিগকে কোন প্রাচীরের মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না! যে দিন এক অপূর্ব্ব বাঁশি বাজিয়া উঠে, এক অপূর্ব্ব বসন্ত জাগিয়া উঠে, চরাচর চির যৌবনের আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যায়!"

এইরূপ একদিন গোবিন্দ মাণিক্যের হৃদয়ে যখন প্রথম বসন্ত উদয় হইয়াছিল, তখন তিনি রাজাদেশ প্রচার করিলেন যে, যে রাজ্যমধ্যে বলি দিবে, তাহার নির্ব্বাসন হইবে। এ কথা শ্রবণমাত্র রাজ-পুরোহিত রঘুপতি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন। রাজ্যের যে তিন বল থাকে,—ধর্ম্মবল, অর্থবল, ও লোকবল,—রাজ-পুরোহিত তাহার অন্যতম। তাহার হাতে ধর্ম্মবল। রাজার মন ফিরাইবার জন্য চেষ্টা করিলে যখন তিনি বিফল হইলেন, তখন তিনি রাজাই বিপক্ষে নিষ্ফল প্রয়োগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। রাজ্যমধ্যে এখন দুইটি বলের দ্বন্দ্ব বাধিল। এক দিকে ধন ও জন বলে বলীয়ান রাজা, অন্য দিকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ রাজ-পুরোহিত। এ দ্বন্দ্ব বড় সাধারণ দ্বন্দ্ব নয়। পুরোহিত নিজ বলে সমগ্র প্রজামণ্ডল ক্ষেপাইয়া তুলিলেন। রাজভ্রাতা ভীতস্বভাব ও দুর্ব্বলমতি নক্ষত্ররায় এবং সেবক জয়সিংহকে নিজ অভিসন্ধি সাধনের উপায় স্বরূপ স্থির করিয়া কোন মতে রাজাকে সরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই ঘোর দ্বন্দ্ব বাধিলে রাজাও নিজ আদেশ রক্ষার জন্য স্থির ও অচঞ্চল রহিলেন। তিনি কিছুতে বিচলিত হইবার পাত্র নহেন। যদিও অন্তরে অন্তরে মনুষ্য প্রেমে তাঁহার হৃদয় গলিয়াছিল, কিন্তু বাহিরে তিনি অস্তাচলগিরির ন্যায় অটল রহিলেন। শুধু অটল নহে, তিনি শুদ্ধ প্রেম অস্ত্র দিয়া যেরূপে রঘুপতির বাণ সকল ব্যর্থ করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার চরিত্রকে গাম্ভীর্য্য ও মহত্ত্বে পরিপূর্ণ করিল। তিনি তাঁহার সাধু উদ্দেশ্যের সৎ সাহসে পূর্ণ হইয়া অতি তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। নির্ভীক হৃদয়ে শত্রু সমক্ষে সহসা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্তব্ধ করিতেন। তাঁহার নিভৃতালয়ে জয়সিংহ তাঁহাকে কাটিতে আসিয়া, শিশুর সহিত তাঁহার প্রেমক্রীড়ায় পরাভূত এবং তাঁহার বিশ্বস্তচিত্ততা ও প্রশান্তভাবে পরাস্ত হইয়া নিষ্কোষিত অসি দূরে নিক্ষেপ করিল। যে ভ্রাতৃস্নেহে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল, সেই স্নেহে ভ্রাতাকে বদ্ধ

করিয়া তাঁহাকে প্রতিকূলাচরণ হইতে নিবৃত্ত করিলেন। এ সকল দৃশ্যাভিনয়ে পাঠকের হৃদয় নিশ্চয় সমবেদনায় উদ্বোধিত হয়। পাঠক নাটকীয় রসে পরিপূর্ণ হয়েন।

ওদিকে রঘুপতিও কম নন। তিনি কিছুতে দমিবার বা অপ্রতিভ হইবার পাত্র নহেন। এক প্রহরণ বিফল হইলে, তাঁহার বুদ্ধির উদ্ভাবনী শক্তি অমনি অন্য উপায় তৎক্ষণাৎ নির্দ্ধারণ করিয়া দিত। কিরূপে নিজ বলকে প্রয়োগ করিতে হয়, কিরূপে লোককে গড়িতে ও বাঁধিতে হয়, তিনি সে কৌশল বিলক্ষণ জানিতেন। তাঁহার এক একটি কৌশল-প্রয়োগের অভিনয় যেন নাটকীয় দৃশ্যে প্রতীত হয়। উপস্থিত বুদ্ধি প্রভাবে তিনি এরূপ কৌশল উদ্ভাবন করিতেন, যাহাতে হঠাৎ বিলক্ষণ ফল ফলিত। এই কৌশলে তিনি যাহা আয়োজন করিয়া আনিতেন, রাজা নিজগুণে তাহা ব্যর্থ করিয়া দিতেন। রাজার ধীরতা বিপদকেও আশঙ্কিত করিত, তাঁহার স্থিরতা জগৎকে স্তব্ধ করিত, তাঁহার বিশ্বস্তচিত্ততা শত্রুকেও মুগ্ধ করিত, এবং তাঁহার প্রশান্তভাব চারি দিকে শান্তি বিস্তার করিত। তিনি ধর্ম্ম-সাহসে সাহসী হইয়া নির্ভীক হৃদয়ে শত্রুকে দমন করিতেন। তাঁহাকে দেখাইত, তিনি একলাই এক মহাবল। সহ্য অদ্রির অঙ্গে সমুদ্রের কত উত্তাল তরঙ্গ লাগিতেছে, অদ্রি অচল ও অটলভাবে দণ্ডায়মান। রঘুপতির যত তরঙ্গ সে অঙ্গে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া ফিরিয়া আসিতেছে, রঘুপতি তত নূতন নূতন তরঙ্গ তুলিয়া সেই অঙ্গে আবার বিক্ষেপ করিতেছেন। ইহাতে রঘুপতির অন্তর্বলের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা যেন অনুমান করিতে পারি না, রঘুপতি-হৃদয়ের কি প্রচুর বল, কি প্রচুর ক্ষমতা! এ বল উপর্য্যুপরি ঘোর ঘর্ষণ করিতে পারে। এ বল শক্তি ক্ষয় হইবার নয়। কতবার তুমি রঘুপতিকে পরাস্ত করিবে? কতবার তুমি রঘুপতিকে দমাইয়া দিবে? রঘুপতি নিজ হৃদয়প্রাচুর্য্য-ক্ষমতায় আবার তখনি তেজস্বী হইয়া উঠিয়াছেন।

আর জয়সিংহ! তোমার প্রকৃতি কি মধুর! অঙ্গে অঙ্গে সেই মধুরতা কেমন প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিতেছিল। তোমার হৃদয়কন্দর সরল ভক্তিতে বুঝি পরিপূর্ণ। শুধু ভক্তি নহে, প্রেমেও পরিপূর্ণ। সেই সরল ভক্তি যখন জয়সিংহকে অসৎ পথে লইয়া যায়, হৃদয়ের সাধুভাব ও প্রেম তখনি উদ্রিক্ত হইয়া তাহাকে মুক্তিপথে আকর্ষণ করে। রঘুপতি তাহাকে নিজ কৌশলে আবদ্ধ করিয়া যখন বধ-কার্য্যে প্রেরণ করিয়াছেন, অমনি তাহার হৃদয়-উৎস উৎসারিত হইয়া তাহাকে সেই নৃশংস ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে। তিনি একবার ভক্তিতে সেই নৃশংস সংকল্পে অটল হইয়া উঠিয়াছেন, অমনি তাহার হৃদয় যেন দ্বিগুণ বলে জাগরিত হইয়া সে সংকল্প হইতে তাহাকে বিচলিত করিয়াছে। তিনি দেবতাকে প্রেমের প্রতিমা ভাবিয়া সরল ভাবে ভক্তি করিয়া আসিতেছিলেন, সেই প্রেমভূমি রঘুপতি যখন টলাইয়া দিল, তাহার ভক্তিরাজ্য একেবারে টলিয়া উঠিল। প্রেমাস্পদ না পাইলে, ভক্তির যে দাঁড়াইবার স্থল নাই, জয়সিংহ তাহা বিলক্ষণ প্রতীত করিয়া দেয়। ভক্তি বড়, কি প্রেম বড়, জয়সিংহের চরিত্রে ইহারই দ্বন্দ্ব। তিনি এ দ্বন্দ্ব সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন— প্রেমপ্রাচুর্য্য তাঁহার অন্ধ ভক্তিকে টলাইয়া

দিয়াছে জয়সিংহ এই চরিত্র-গৌরবে আমাদিগের নিকট বড় মধুর বোধ হইয়াছিল। যেন এ পাপ সংসার তাঁহার প্রেম বিকাশের যোগ্যস্থল নহে বলিয়া তিনি সে সংসার সহসা পরিত্যাগ করিলেন। ইহ সংসার তাঁহার অন্তরে মহা দ্বন্দ্ব বাঁধাইয়া দিয়া তাঁহার হৃদয়দেশ হইতে শান্তিকে একেবারে তাড়াইয়া দিয়াছিল। শান্তিবিরহিত হইয়া তিনি নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই শান্তি পাইবার জন্য তিনি যেন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

গ্রন্থের প্রথম ভাগ যে কিরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম। এই সূত্রপাত ভাল দেখাইয়া গ্রন্থকার যেন আমাদের সুধা আরও উদ্রিক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সে সুধা নিবারণ হইল না, এই আমাদের দুঃখ।

গ্রন্থের প্রথমভাগ সমাপ্ত হইলে আমরা এক ভিন্ন রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম। এখানে আর এক নূতন দেশ—নূতন দেশে নূতন লোক। বলিতে গেলে দ্বিতীয়ভাগ হইতে আমাদের আর এক নূতন উপন্যাস আরম্ভ করিতে হইল। অনেক উপন্যাসেরই প্রারম্ভ-ভাগ তত সরস হয় না। তাহাতে রসের ঈষৎ সঞ্চার মাত্র হইতে থাকে। ক্রমে গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে সরস হইয়া পড়ে। এ গ্রন্থে ঠিক ইহার বিপরীত ঘটিয়াছে। ইহার প্রথমভাগ অত্যন্ত সরস, তার পর গ্রন্থ ক্রমশঃ নীরস হইয়া পড়িয়াছে। সে স্থলে রঘুপতির সহিত নক্ষত্র রায় নির্ব্বাসিত হইল, বলিতে গেলে, সেই স্থলেই গ্রন্থ এক প্রকার শেষ হইয়াছে। তার পর, গ্রন্থ ক্রমশঃ নীরস হইয়া আসিয়াছে। তার পর, প্রায় ২০০ পৃষ্ঠায় চক্ষু বুলাইয়া আসিলাম কি না, রঘুপতি মন্ত্রণা করিয়া নক্ষত্র রায়কে ত্রিপুরার সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করিলে গোবিন্দমাণিক্য সে সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। দুই কথায় এইটুকু বলিয়া দিলেই যথেষ্ট হইত। তজ্জন্য গ্রন্থকে অনর্থক এত বিস্তৃত করিবার প্রয়োজন ছিল না। যদি দেখিতে পাইতাম, এই বিস্তারিত ক্ষেত্র মধ্যে ঔপন্যাসিক পাত্রগণের অধিকতর চরিত্রস্ফূর্ত্তি হইয়াছে, অথবা গ্রন্থ ক্রমশই সরস হইয়াছে, তাহা হইলে আমাদের শ্রম সফল হইত। রঘুপতির নির্ব্বাসন হইতে গোবিন্দমাণিক্যের সিংহাসন ত্যাগ পর্য্যন্ত রাজর্ষি-চরিত্রে একটিমাত্রও রেখাপাত হয় নাই। আমরা যেখানে রাজাকে রাখিয়া আসিয়াছিলাম সেই খানেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলাম। রাজার হৃদয়ে যে প্রেমাঙ্কুর প্রস্ফুরিত হইয়াছিল, কই, সে অঙ্কুর আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল না! রাজকার্য্যের দুই বৎসরে তাঁহার প্রেমের বিস্তার কিছুই হয় নাই। তাঁহার সংসারের দিকে চাই, দেখি, তাঁহার পুত্র নাই, কলত্র নাই, দাস দাসী নাই, ভ্রাতৃজায়া নাই, রাজপরিবারের কেহই নাই। পরিবার ক্ষেত্রেই মানুষের প্রেমবাঞ্ছা ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। গোবিন্দমাণিক্যের সে ক্ষেত্র মরুভূমি প্রায় ছিল। ধার করা একটি পালিত শিশুমাত্রে কি আমাদের সমুদায় পারিবারিক স্নেহ ও বৃত্তি সমস্ত হইতে পারে? তিনি পারিবারিক ক্ষেত্র কিছুই কর্ষিত করেন নাই। আবার দেখুন, গোবিন্দমাণিক্য প্রথমভাগে যেরূপ চরিত্রদৃঢ়তা, সংসাহস, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, অপক্ষপাতিতা, ঔদার্য্য প্রভৃতি গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন, তার পর দুই বৎসর রাজ-

কার্য্য পরিচালনে কি তাহার কিছুরই স্ফূর্ত্তি হয় নাই? গ্রন্থকার ঘটনাবলিকে এরূপে সাজাইতে পারেন নাই, যাহাতে তিনি সে সকল গুণের অধিকতর পরিচয় দিবার স্থল পান। ঘটনা-যোজনায় তাঁহার সৃষ্টিশক্তি ক্ষূর্ত্তি দীন। শুদ্ধ রাজর্ষি সম্বন্ধে আমরা বলি না। রঘুপতির বুদ্ধিকৌশল, কূটচক্রিতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দৃঢ়সংকল্প ও অধ্যবসায়, প্রভৃতি গুণ আমরা প্রথমভাগে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, দ্বিতীয়ভাগে তাহার অধিক দেখি নাই। দ্বিতীয়ভাগে রঘুপতি নিজ অভিসন্ধি সাধন জন্য যত কৌশল করিয়াছিল, সে সমস্ত কৌশলই বিফল হইয়াছিল। তিনি কেবল রাজ-প্রদত্ত অর্থবলে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কৌশল যদি অকৃতকার্য্য হয়, তবে কি প্রয়োগকারীকে তত কৌশলী বলা যায়? যে কৌশল সকল না হয়, সে কৌশল-প্রয়োগে লোকে অনেক সময় হাস্যাস্পদ হইয়া পড়ে। মোগল-শিবিরে রঘুপতিও কিয়দংশে হাস্যাস্পদ হইতেছিলেন, এমত সময় অর্থবল তাহাকে রক্ষা করিল। আর, দুর্ব্বলমতি, ভীতস্বভাব, অসারচিত্ত ও বিলাসী নক্ষত্ররায়কে পরিচালনে যে সামান্য কৌশলের পরিচয় হইয়াছিল, তাহাতে রঘুপতির বিশেষ বাহাদুরি হয় নাই, এবং তাঁহার চরিত্রও কিছু উন্নত হয় নাই।

দ্বিতীয় ভাগে কেবল নক্ষত্ররায়ের চরিত্র কিছু পরিস্ফুট হইয়াছে। নক্ষত্ররায় এবং গোবিন্দমাণিক্য উভয়ই রাজপুত্র, উভয়েরই হাতে রাজৈশ্বর্য্য। নক্ষত্র সেই ঐশ্বর্য্য আপনার ইন্দ্রিয় সেবায় ব্যয় করিয়া একজন ঘোর বিলাসী হইয়াছিলেন, কিন্তু গোবিন্দমাণিক্য সেই ঐশ্বর্য্যধামে ও সেই ভোগ এবং প্রলোভনপূর্ণ সংসারে কেমন প্রশান্তচিত্তে ঋষির ন্যায় ত্যাগী ও নির্লিপ্ত হইয়া এক উৎকৃষ্ট চরিত্রের অভিনয় করিতেছিলেন তাহা গ্রন্থকার যদি পাশাপাশি দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলে পাপচিত্রের কলঙ্ক এবং পুণ্যচিত্রের পবিত্রতা শতাংশে বর্দ্ধিত হইত। অনেক উপন্যাসে পাপচিত্র থাকে বটে, কিন্তু সুলিখিত উপন্যাসের ধর্ম্ম এই, তাহাতে পাশাপাশি পুণ্যচিত্রও অতি উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হয়। অন্ধকার ও আলোকের একত্রে এইরূপ সমাবেশ হইলে অন্ধকারকে দ্বিগুণ অন্ধ দেখায় এবং আলোককে দ্বিগুণ উজ্জ্বল করিয়া তুলে। সুলিখিত উপন্যাসের আর একটি ধর্ম্ম এই, তাহাতে পুণ্যচিত্রের এত ভাস্বর ছবি অঙ্কিত হয় যে, তাহাতে পাপচিত্রকে অনেকাংশে মলিন করিয়া ফেলে। পাপ, পুণ্যের প্রবলতায় ডুবিয়া থাকে। এ গ্রন্থে এ দুয়ের কিছুই হয় নাই। নক্ষত্ররায়ের বিলাসচিত্র দ্বিতীয় ভাগের নগ্নক্ষেত্রে একাকী দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পার্শ্বে ঋষিচরিত্র অঙ্কিত নাই। তাহার পাপচিত্রের মলিনতা পুণ্যচিত্রে বর্দ্ধিত হয় নাই। এরূপে এ পাপচিত্র দেখাইবার প্রয়োজন কি ছিল? এ চরিত্র এত উচ্চ নহে যে ইহার গরিমা প্রকাশ করিতে হইবে? ফলতঃ এ চিত্র অতি সামান্য। গ্রন্থকার এ চিত্র আঁকিতে গিয়া সহরের বড় মানুষের একটি বয়াটে ছেলের একখানি ফটোগ্রাফ দিয়াছেন। তাহা তো আমরা দুবেলা দেখিতেছি। সে ফটোগ্রাফ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া আর বেশি কি ফল হইবে?

গ্রন্থের নাম রাজর্ষি। সুতরাং এ গ্রন্থে রাজর্ষি চরিত্রের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও সু-অঙ্কিত

চিত্তের সকলেই প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। আমরা রাজর্ষি জনকের কথা শুনিয়াছি বটে, কিন্তু তিনি কিরূপে ঋষির ন্যায় রাজকার্য্য চালাইতেন তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ কুত্রাপি প্রাপ্ত হই নাই। সুতরাং আমাদের অনুমান করিতে হইয়াছে যে, যে রাজভোগ ভোগের চূড়ান্ত, জনকরাজ সেই রাজভোগ মধ্যে অবস্থিত হইয়া অনাসক্ত ও ত্যাগী ঋষিচরিত্র সংগঠন করিয়া থাকিবেন, এবং সেই ভোগের মধ্যে নিতান্ত নিস্পৃহ ভাবে সমুদায় রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। যে অনুমান জনকের কল্পনা পূর্ণ করিয়াছে, সেই অনুমান রাম রাজত্বেরও কল্পনা পূর্ণ করিয়াছে। রামচন্দ্রকে ব্যাস মহাভারতে ব্রহ্মার মুখ দিয়া "রাজর্ষিবর্য্য" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন; শুনিয়াছি সেই রাজর্ষি-প্রতিম রামের রাজ্য বড় সুখের রাজ্য ছিল। রাজর্ষি রাম তাহা কিরূপে এত সুখময় করিয়াছিলেন, রামায়ণে যদিও তাহার বিশেষ ঐতিহাসিক বিবরণ নাই, কিন্তু সেই কাব্যের ঘটনাবলি-অঙ্কিত সরস চিত্রে আমাদের কল্পনা এত পূর্ণ হয় যে, আমরা অনুমানে যেন রাম-রাজত্বের সুখানুভব করিতে পারি। এই সমালোচ্য গ্রন্থেও আমরা নীরস ঐতিহাসিক বিবরণ খুঁজি নাই, কিন্তু রাজর্ষির ঔপন্যাসিক চিত্র দেখিতে চাহিয়াছিলাম। গ্রন্থকার যাঁহাকে রাজর্ষি বলিয়াছেন, তাঁহার চরিত্র প্রথমে তিনি যেরূপে আঁকিলেন, তাহাতে বড়ই আশা হইয়াছিল, বুঝি পরে রাজর্ষিচরিত্র দেখিতে পাইব। কিন্তু হায়, সে আশা বৃথা! গ্রন্থকার এমত ক্ষেত্র বিনাস্ত করিতে পারেন নাই, যে ক্ষেত্রে তিনি রাজর্ষির গুণাবলির ক্রীড়া দেখাইতে পারেন; কিরূপ গুণের সমাবেশ হইলে একজন রাজা রাজর্ষি হইতে পারেন, গ্রন্থকার তাহা দেখাইতে পারেন নাই। পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে অনেকে রাজমুকুট ধারণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজর্ষি কয়জন ছিলেন? ঋষির চরিত্র ব্রাহ্মণ অঙ্গে সাজিয়াছিল, রাজার চরিত্র ক্ষত্রিয় অঙ্গে শোভা পাইত। ব্রাহ্মণ ঋষির গুণাবলি ক্ষত্রিয় রাজ অঙ্গে সমাবিষ্ট হইলে, রাজা যদি প্রধান প্রধান রাজগুণ বিসর্জ্জন দিয়া সমাকৃতভাবে ব্রাহ্মণ ঋষি হইয়া পড়েন, তাহা হইলে কি তাঁহাকে রাজর্ষি বলিব? না, যে ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য্যের মত ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে শোভিত হইয়া নিজ ব্রাহ্মণের গুণাবলি বিসর্জ্জন দেন, তাঁহাকে ঋষি বলিব?, তবে যিনি ঋষির ধর্ম্ম ও রাজার ধর্ম্ম একত্রে ধারণ করিতে পারেন, যিনি এই দুঃসাধ্য ব্রতে সিদ্ধ হইতে পারেন, তিনি যে একজন অসাধারণ রাজা, তাহার আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এরূপ রাজা কেবল ভারতেই জন্মিয়াছিল। এরূপ রাজা রাজগণের চূড়ামণি ও আদর্শ। এরূপ রাজা লাভ করা এই জন্য অত্যন্ত দুর্লভ। ঋষি, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ; রাজা, ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ। রাজর্ষি এই দুই শ্রেষ্ঠতার মিলন। পূর্ব্বকালে রাজর্ষির অঙ্গে ঋষি ও রাজার গুণাবলি কেমন একত্রে মিশিয়াছিল, তাহা অনুমান করিতেও একটু আনন্দ আছে। এরূপ গঙ্গা যমুনার মিলন দৃশ্য বড়ই সুন্দর। আজি রাজর্ষি গ্রন্থখানি পাইয়া আমরা মনে মনে ভাবিয়াছিলাম, গ্রন্থকার বুঝি সেই সুন্দর মিলন-দৃশ্য দেখাইবেন—ঔপন্যাসিক ক্ষেত্রে একটি মনোরম রাজর্ষি-চিত্র গড়িয়া দিবেন। রাজর্ষি বলিলেই আমাদের মনে যে "এক-প্রকার অভূতপূর্ব্ব ভক্তিরসের সঞ্চার হয়,

আজি বুঝি সেই ভক্তিরসের আস্বাদ লাভ করিব। কিন্তু গ্রন্থকার যাঁহাকে রাজর্ষি বলিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের সে ভক্তির উদয় হয় নাই। রাজর্ষির কোন্ গুণ গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রে পাওয়া যায়? তিনি কি তাপস ছিলেন, না যাজ্ঞিক ছিলেন না রক্ষসিং ও জ্ঞানী ছিলেন? এইরূপ থাকিয়া তিনি কি ত্যাগী ঋষি চরিত্রে রাজগুণ মিশাইয়াছিলেন? তিনি কি বীরের অঙ্গে ঋষির শান্ত ভাব মিশাইয়াছিলেন? তিনি একজন সাধু ও সদাশয় লোক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। কিন্তু সাধু ও সদাশয় লোক হইলেই কি ভাল রাজা হইতে পারে? সাধু লোকেই যে ভাল রাজা হইতে পারে, এরূপ সচরাচর ঘটে না। গোবিন্দমাণিক্যই এ কথার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। যে রাজ-অঙ্গে প্রধান প্রধান রাজগুণেরই সমাবেশ নাই, তিনি কিরূপে রাজ-আদর্শ রাজর্ষি নামে সম্মানিত হইতে পারেন? গোবিন্দমাণিক্য রাজা ছিলেন সত্য, কিন্তু প্রধান প্রধান রাজগুণ তাঁহাতে কি ছিল? প্রজারঞ্জন করা রাজার যে প্রধান ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মই তাঁহার ছিল না। তিনি কেমন প্রজারঞ্জন করিয়াছিলেন এই দেখুন গ্রন্থকার তাহা নিজ মুখেই পরিচয় দিতেছেন :—

"পূর্ব্বদ্বার দিয়া সৈন্যসামন্ত লইয়া নক্ষত্র মাণিক্য রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। কিঞ্চিৎ অর্থ ও কটিকতক অনুচর লইয়া পশ্চিমদ্বারাভিমুখে গোবিন্দমাণিক্য যাত্রা করিলেন। নগরের লোক বাঁশি বাজাইয়া ঢাক ঢোলের শব্দ করিয়া হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির সহিত নক্ষত্ররায়কে আহ্বান করিল। গোবিন্দমাণিক্য যে পথ দিয়া অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন, সে পথে কেহই তাঁহাকে সম্মান করা আবশ্যক বিবেচনা করিল না। দুই পার্শ্বের কুটীরবাসিনী রমণীরা তাঁহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া গালি দিতে লাগিল। ক্ষুধায় ও ক্ষুধিত সন্তানের ক্রন্দনে তাহাদের জিহ্বা শাণিত হইয়াছে। পরম গুরুতর দুর্ভিক্ষের সময় যে বৃদ্ধা রাজদ্বারে গিয়া আহার পাইয়াছিল এবং রাজা স্বয়ং যাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, সে তাহার শীর্ণ হস্ত তুলিয়া রাজাকে অভিশাপ দিতে লাগিল। ছেলেরা জননীর কাছ হইতে শিক্ষা পাইয়া বিদ্রূপ করিয়া চীৎকার করিতে করিতে রাজার পিছন পিছন চলিল। দক্ষিণে বামে কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সম্মুখে চাহিয়া রাজা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন।"

কেবল বাকি ছিল তবে কুলার বাতাস দিয়া তাঁহাকে বিদায় করা। এই তাঁহার প্রজারঞ্জনের চিত্র। গ্রন্থকার বলিতে পারেন যে গোবিন্দমাণিক্য নরবলি রহিত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকৃতিবর্গের এত বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। দেশমধ্যে দুর্ভিক্ষ ঘটাতে সেই বিরাগ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সুতরাং প্রজাকুল তাঁহাকে সেই দুর্ভিক্ষের কারণ জানিয়া অভিশাপ ও গালি বর্ষণ করিয়াছিল। এ কথা ঠিক হইলেও হইতে পারে। কিন্তু গ্রন্থকার কি ইতিহাস লিখিতেছিলেন; না কাব্য গড়িতেছিলেন? রাজর্ষিচরিত্র গড়া যদি তাঁহার অভিপ্রেত হয়, তবে ত তিনি গ্রন্থভাগকে অবশ্য অন্যরূপেও দেখাইতে পারিতেন। হিন্দু-কল্পনা রামের পুণ্য রাজত্বকালে রাজ্যমধ্যে কোন দৈব-দুর্ঘটনা অনুমান করিতে পারে নাই। জনকরাজের রাজ্যমধ্যেও কোন অশান্তি ঘটে নাই। আমাদের রাজ-

বির রাজ্যে অশান্তি প্রবেশ লাভ করিল কেন? গ্রন্থকার এ কল্পনা না করিলেই ভাল হইত। আবার দেখুন, যে দেশে নরবলি হইত, সেই নরবলি নিবারণ হইলে কি সে দেশের সমস্ত লোক ক্ষেপিয়া উঠে, না ঠিক ইহার বিপরীত ঘটে। আমাদের অনুমান হয়, সে দেশের অনেক লোকেই সন্তুষ্ট হইবে। তা যদি হয়, তবে প্রজাকুলের যে ভাগ সন্তোষলাভ করিয়াছিল, তাহাদের সন্তোষের পরিচয় কই? আর যে ভাগ রুষ্ট হইয়াছিল, রাজর্ষির নিজগুণে এবং রাজত্বের সুখবিধানে, তাহারা সে রোষ ভুলিয়া যায় নাই কেন? গোবিন্দ যদি ভাল করিয়া প্রজারঞ্জন করিতে জানিতেন, যদি প্রজাকুলের কেবল সুখ ও শান্তি দেখিতেন, তাহা হইলে অবশ্য তাহাদের অনুরাগভাজন হইতেন। তাহারা সকল ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে অনুক্ষণ আশীর্ব্বাদ করিত। নরবলি নিবারণ হওয়াতে প্রকৃতিবর্গ যদি এতই ক্ষেপিয়া থাকে, তবে তাহারা সেই বলি নক্ষত্রের সময়ে পুনঃ স্থাপিত করে নাই কেন? আবার ভুবনেশ্বরীর মন্দির* ধূমধামে পূর্ণ হয় নাই কেন? রঘুপতির আশা মিটে নাই কেন? সে যাহা হউক, যে রাজার রাজ্যে প্রজাকুল সুখে না থাকে, এবং রাজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী না হয়, সে রাজ্য কি রাজর্ষির রাজ্য! যে রাজার রাজ্যে প্রজার শান্তি নাই, তাহা কি রাজর্ষির রাজ্য হইতে পারে? হিন্দু-কল্পনা এমন অনুমান করিতে পারে না।

প্রজারঞ্জনে গোবিন্দমাণিক্য কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে আর একটি প্রধান রাজগুণের কথা বলিব। রাজ্য ও প্রজাকুলকে রক্ষা করা রাজার আর এক প্রধান ধর্ম্ম। সে ধর্ম্মে গোবিন্দমাণিক্য কেমন ভূষিত ছিলেন, তাহা নক্ষত্রমাণিক্য কর্ত্তৃক রাজ্য আক্রমণ সময় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি তখন আস্তে আস্তে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেলেন। যে রঘুপতি ও নক্ষত্র রায়কে দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রবল দর্পে আট বৎসরের জন্য রাজ্য নির্ব্বাসন দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন, আজি কি বলিয়া সেই কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাহাদিগকে রাজ্য মধ্যে তিনি প্রবেশ করিতে দিলেন? কই, এখন তাঁহার সে তেজস্বিতা ও বলদর্প কই? সে দৃঢ়তা ও ন্যায়পরায়ণতা কই? রাজার কি এই ধর্ম্ম! গোবিন্দ যে প্রেম-অস্ত্রে পূর্ব্বে শাণিত অসিকে প্রতিরোধ করিয়াছিলেন, এখনও তিনি প্রথমে সেই প্রেম-অস্ত্র—ভ্রাতৃস্নেহের সেই কোমল অস্ত্র—প্রয়োগ করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন সে অস্ত্র নিষ্ফল, তখন তিনি বিনা রক্তপাতে রাজ্য ত্যাগ করিয়া গেলেন। এ রূপ কার্য্যে গৌরব ও মহত্ত্ব আছে বটে, কিন্তু রাজার পক্ষে নহে। এ কার্য্যে সাধুর গৌরব আছে বটে, কিন্তু রাজার পৌরুষ নাই। সিংহাসনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে। কেবল দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িত থাকিয়া রাজমুকুট ধারণ করা যায় না। এই রূপ শয্যায় শায়িত থাকিয়া এক

---

*গ্রন্থকার বলিয়াছেন "ভুবনেশ্বরী", কিন্তু আমরা জানি, সতীর—

"দক্ষিণ চরণ খানি পড়ে ত্রিপুরায়।
নল নামে ভৈরব, 'ত্রিপুরা দেবী' তায়॥"

ভারত চন্দ্র।

দিন বঙ্গাধিপ এইরূপ সময়েই রাজধানীর পশ্চাদ্দ্বার দিয়া পুরুষোত্তমে পলাইয়া গিয়াছিলেন। এই রূপ সময়ে আজি গোবিন্দমাণিক্য নগরের পশ্চিম দ্বার দিয়া আস্তে আস্তে বনবাসে গেলেন। বঙ্গাধিপ সমরের কুৎসা কমলে দেশকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। গোবিন্দমাণিক্যও তদ্রূপ ত্রিপুরা রাজ্য একজন অসার বিলাসীর হস্তে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। যে বাহুবলে একদা তিনি দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন, আজি সে বাহুবল কোথায়! তিনি কি বলিয়া রাক্ষসের হাতে ছেলেকে সমর্পণ করিয়া গেলেন! ইহাতে কি তাঁহার প্রেম পরিতৃপ্ত হইল! রাজা কি তখন এই অসিপূর্ণ রক্তময় সংসার ত্যাগ করিয়া বনবাসের প্রেমরাজ্যে যাইতেছিলেন? যদি তাহাই হয়, তবে কি তাঁহার একবার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল না, যে তাঁহার অবর্ত্তমানে ত্রিপুরার দশা কি হইবে? তিনি যাইলে যে ত্রিপুরা কেবল ক্রন্দনে পূর্ণ হইবে! সে ক্রন্দন যদি তিনি নিবারণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার কি গৌরব ও মহত্ত্ব হইত না। সে ক্রন্দন নিবারণ করা কি তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল না? সে ক্রন্দন নিবারণ করিতে পারিলে কি তিনি সুখী হইতেন না, তাঁহার প্রেমের পরিতৃপ্তি সাধন হইত না? তিনি একদিকে দেশকে ক্রন্দনে ভাসাইয়া গেলেন, অন্য দিকে তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দুই দশটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৎ কার্য্য করিতে গেলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের ক্রন্দন-রোল কি একবারও তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করে নাই? যদি সে ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের শান্তিভঙ্গ করিয়া থাকে, তবে তিনি কি বলিয়া স্থির হইয়াছিলেন? কিরূপে তিনি হৃদয়-বেদনা শান্ত করিয়াছিলেন? কিরূপে তাঁহার প্রেমের ব্রত পালিত হইতেছিল? গ্রন্থমধ্যে এ সমস্যার মীমাংসা কোথায়? যে রাজা প্রজারঞ্জন করিতে অসমর্থ, রাজ্য ও প্রজাকুলকে রক্ষা করিতে অক্ষম, তিনি কিরূপ রাজা? যাঁহাতে প্রধান প্রধান রাজগুণ ও ক্ষত্রিধর্ম্ম নাই, তিনি কিরূপে আদর্শরাজ রাজর্ষি হইতে পারেন? রাজর্ষিরা কি গোবিন্দমাণিক্যের ন্যায় একজন কাপুরুষের মত রাজ্য ও প্রজাকুলকে ভাসাইয়া দিয়া চলিয়া যায়? জনকরাজর্ষি কি রাজ্যত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন? না, তিনি রাজ্যে অবস্থান করিয়া, রাজদণ্ড বহন করিয়া এবং রাজছত্রে শোভিত হইয়া রাজর্ষি নামে সম্মানিত হইয়াছিলেন। যদি বল, রাজা হইয়া রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিতে পারিলে রাজর্ষি হওয়া যায়, তবুও গোবিন্দমাণিক্য রাজর্ষি নহেন। তিনি রঘুপতির জন্যই কিছুকালের জন্য সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন মাত্র, সে ত্যাগ তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত নহে। তিনি পরে আবার সেই সিংহাসন গ্রহণ করিয়া ছিলেন। সন্ন্যাসক্ষেত্রে তাঁহার অনেক দূর জ্ঞান ও চরিত্রবিকাশ হইতেছিল বটে, কিন্তু তখন তিনি আর রাজা নাই। সন্ন্যাসক্ষেত্রে তিনি যেরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা সন্ন্যাসীর কার্য্য, রাজার কার্য্য নহে; সুতরাং তাহা রাজর্ষির কার্য্য নহে। সে কার্য্যে তাঁহার হৃদয়-প্রেমের বিকাশ হইতেছিল বটে, কিন্তু তাহাতে রাজগুণের কিছুমাত্র বিকাশ হয় নাই। যদি বিকাশ হইয়া থাকে, গ্রন্থকার তাহা দেখাইলেন কই? সন্ন্যাসক্ষেত্র হইতে

ফিরিয়া গিয়া তিনি পুনরায় রাজ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কিরূপে রাজর্ষির ন্যায় রাজ্য করিয়াছিলেন, তাহা ত গ্রন্থকার দেখাইলেন না। যেখানে তাহা দেখাইবার অবসর হইল, গ্রন্থকার সেখানে একেবারে পট নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। রাজর্ষির চরিত্র তিনি কোনখানে আঁকিতে পারিলেন না। না সিংহাসন ত্যাগের পূর্ব্বে, না তাহা পুনর্গ্রহণের পর। সুতরাং রাজর্ষির চিত্র সম্যকরূপে অসম্পূর্ণ রহিল। আমরা এ গ্রন্থে একজন সামান্য সাধু লোকের চরিত্র চাই না, রাজর্ষির চরিত্র চাই।

উপন্যাসের মন্ত্রণা-কল্পনার দোষে অপরাপর পাত্রগণেরও চরিত্র স্ফূর্ত্তি পায় নাই। সুলিখিত উপন্যাসের গুণ এই যে, তাহাতে ঘটনাস্ফূর্ত্তির সহিত উপন্যাস ক্রমে সরস হইতে থাকে। যিনি ঘটনাজাল এরূপে বিন্যস্ত করিতে পারেন, যাহাতে উপন্যাসের ক্রমে ব্যাপ্তি হইতে থাকে, তিনিই উপন্যাসকে সরস করিতে পারেন। যে উপন্যাসের প্রারম্ভে পাত্রগুলির কেবল রাহা বেহা পড়ে, সেই উপন্যাসের কলেবর বৃদ্ধির সহিত পাত্রগণের চিত্রফলক ক্রমশঃ বর্ণ-গৌরবে পূরিয়া উঠিতে পারে। অযোধ্যাকাণ্ড পর্য্যন্ত, বলিতে গেলে, রামায়ণের একভাগ শেষ হইয়াছে। সেখানে আমরা দশরথ কৈকেয়ী প্রভৃতির চরিত্র এক প্রকার শেষ করিয়াছি। কিন্তু ঐ চরিত্রগুলি যেমন শেষ হইল, অন্য কতিপয় চরিত্রের কেবল প্রারম্ভ মাত্র দেখিলাম। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, ভরত প্রভৃতি চরিত্রের রূপপাত মাত্র দেখিলাম। ক্রমশঃ এই পাত্রগণের চরিত্র-গৌরব বাড়িতে লাগিল। শুদ্ধ ইহাদিগের নয়, উপন্যাস বিকাশের সহিত সুগ্রীব, হনুমান, বিভীষণ প্রভৃতি অনেকগুলি নূতন নূতন পাত্রেরও উদয় হইল। শুদ্ধ উদয় নয়, তাহাদিগের সহিত পরিচয় হইল এবং ঘনিষ্ঠতা বাড়িল। এতদূর ঘনিষ্ঠতা জন্মিল যে, তাহাদিগকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশদরূপে দেখিতে পাইলাম। রামায়ণে যাহা ঘটিয়াছে, মহাভারতেও তাই। পঞ্চভ্রাতার নির্ব্বাসন হইল, আমরাও হস্তিনাপুর পার হইলাম। কিন্তু পূর্ব্বে আমরা যে সকল চরিত্রের রেখাপাত মাত্র দেখিয়াছিলাম, ক্রমশঃ ঘটনাজালে সেই সকল চরিত্রের গৌরব সাধন হইল। অনেক নূতন চরিত্রেরও ক্রমে সমাবেশ হইল। পরে সেই পাত্রগণের চরিত্র-বিকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। পঞ্চপাণ্ডব, কৃষ্ণ, কৌরবগণ, ভীষ্ম, কর্ণ, বিদুর, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, অভিমন্যু, রথীগণ, সামন্তগণ প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। কিন্তু বড় কথা ছাড়িয়া দিন। ছোট ছোট উপন্যাস গ্রহণ করুন। দুর্গেশনন্দিনী, ও মৃণালিনীতে আমরা কি দেখিতে পাই? দুর্গেশনন্দিনীর আয়েষা ও বিমলাকে দেখুন, মৃণালিনীর পশুপতি, মনোরমা, গিরিজায়া এবং হেমচন্দ্রকে দেখুন। গ্রন্থের প্রারম্ভে কি ছিল, আর শেষে কি দাঁড়াইল? কিন্তু এ গ্রন্থে কি তাহা ঘটিয়াছে? এ গ্রন্থের প্রথমে আমরা যে সকল চরিত্র লইয়া উপন্যাস আরম্ভ করি, সেই রঘুপতি, রাজর্ষি জয়সিংহ ও নক্ষত্ররায়ের বিষয় লইয়া আমরা দেখাইয়াছি, গ্রন্থকার তাহাদিগের চরিত্র গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে কিরূপ প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। দ্বিতীয়ভাগে অনেক নূতন লোকের সহিত আমাদের আলাপ পরিচয় হইল।

সুলিখিত উপন্যাসে দেখিতে পাওয়া যায়, যে, এইরূপ নূতন দেশের নূতন লোক এত-দূর চিত্তাধিকার করে যে তাহাতে উপন্যাস ক্রমশই নীরস হইতে থাকে। নূতন পাত্র ও পাত্রীগণের চিত্র ক্রমে উজ্জ্বল ও উজ্জ্বলতর হইতে থাকে। অবশেষে তাহারাই সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলে। কারণ, তাহারাই গ্রন্থের উপাখ্যান ক্রমে গড়িতে থাকে। তাহাদের ভাগ্য উপাখ্যানের সহিত এরূপ জড়িত হয় যে, তাহাদের পরিণামের উপরই গ্রন্থের পরিণাম-ফল প্রধানতঃ নির্ভর করে। সুতরাং তাহারা পাঠকের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু এ গ্রন্থে সেরূপ ঘটে নাই। দ্বিতীয় খণ্ড খুলিয়া আমরা যে সকল নূতন লোক দেখিলাম, তাহাদিগের ভাগ্য উপন্যাসের সহিত অধিক সংশ্লিষ্ট হয় নাই। তাহাদের চরিত্রাঙ্কনও এত উচ্চ উজ্জ্বল, ও ভাস্বর নহে যে তাহাতে পাঠকের চিত্ত অধিকার করিতে পারে। তাহারা ছায়ার মত আসিল, ছায়ার মত চলিয়া গেল। মনে তাহাদের চিত্র কিছুই অঙ্কিত হইল না!

এ গ্রন্থে পাত্রগণের যেরূপ চরিত্র-দোষ ঘটিয়াছে, তাহা আমরা বলিলাম। এক্ষণে আর একটী প্রধান দোষের কথা বলিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করিব। গ্রন্থে রসের খেলা খুব কম। যাহাতে হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে, আকর্ষণ করিয়া তাহাকে তরঙ্গ তুফানে নাচাইয়া তুলে, ঘাত প্রতিঘাতে তাহাকে উচ্ছলিত করিতে থাকে, এ গ্রন্থের উপাখ্যানে সে রসের খেলা নাই। এ গ্রন্থের এক মাত্র রস হিংসা। এই হিংসার খেলা একবার মাত্র বাড়িয়াছিল। গ্রন্থের প্রারম্ভে এই হিংসা জোর করিয়া উঠিয়াছিল। রঘুপতির বিদ্বেষভাব যত প্রতিরুদ্ধ হইতেছে, জয়সিংহ ও নক্ষত্ররায় তাহা যতই বিফল করিতেছে, পাঠকের মনে তাহাদের ঘাত প্রতিঘাত ততই লাগিতেছে। ঘাত প্রতিঘাতেই রসের বৃদ্ধিসাধন হয়। যে উপাখ্যানে ঘটনার বিরোধ নাই, যাহাতে প্রকৃতির সহিত প্রকৃতির সংগ্রাম নাই, হৃদয়ের বিপক্ষে হৃদয়ের যুদ্ধ নাই, তরঙ্গ তুফান নাই, সে উপাখ্যান নিতান্ত রসহীন। রঘুপতি সংকল্প করিতেছে, কিন্তু তাহার সংকল্প প্রতি ঘাতে যেমন বিফল হইতেছে, অমনি তাহার হৃদয়ে প্রতিঘাত লাগাতে সেই হৃদয় আবার কেমন নিজ সংকল্প সিদ্ধির উদ্দেশে ধাবিত হইতেছে,—এই উদ্যোগে এবং এই হৃদয়ের খেলাতে পাঠকেরও হৃদয় একটু নাচিয়াছিল। কিন্তু সে নৃত্য ও তরঙ্গ রঘুপতির নির্ব্বাসনে শেষ হইল। সেই যে শেষ হইল, আর দেখা দিল না। তাহার পর রঘুপতি বুদ্ধি ও অর্থবলে গোবিন্দের সহিত সংগ্রাম বাঁধাইবার চেষ্টা করিলেন মাত্র। সে সংগ্রাম বাঁধিল না। সুতরাং গ্রন্থ একেবারে নীরস হইয়া পড়িল। বিল্বন ঠাকুরকে গ্রন্থকার একটু তুলিতেছিলেন, কিন্তু বিল্বনের সমর-চেষ্টা বিফল হওয়াতে তিনিও মন হইতে ছায়ার মত অদৃশ্য হইলেন। গ্রন্থ যেমন একটু সরস হইতেছিল, অমনি তাহা শুকাইয়া গেল। নির্ব্বাসনের পর গোবিন্দ মাণিক্যের বিরুদ্ধে রঘুপতির উদ্যোগে কিছুই রসের খেলা নাই। অথচ এই উদ্যোগই গ্রন্থের অধিক ভূমি অধিকার করিয়াছে। সুতরাং গ্রন্থের অধিকাংশই নীরস হইয়া পড়িয়াছে।

এ প্রস্তাবের কলেবর অনেক বাড়িয়াছে। অতএব এই স্থানে আমরা প্রস্তাব

সমাপ্ত করিলাম। সন্ন্যাস ও গ্রন্থের পরিণাম সম্বন্ধেও আমাদের কিছু বক্তব্য ছিল, কিন্তু স্থানাভাব প্রযুক্ত বিরত হইলাম।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু।

য়ুরোপীয় সংস্কৃত শিক্ষা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বেদীয় অভিধান সম্বন্ধে উপনিষৎ শব্দটি অতি গূঢ়ার্থ। উপনিষৎ সমূহের ভাষ্যকারী মুখ্য বৈদান্তিক শঙ্করাচার্য্য বলেন, যে 'উপনিষৎ' এই কথাটি উপ এবং নি পূর্ব্বক 'সদ' ধাতু হইতে সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার নানা প্রকার অর্থ হইতে পারে, তাহার মধ্যে একটি অর্থ—ধ্বংসকারী। অতএব 'উপনিষৎ' শব্দের মুখ্য অর্থ এমন একটি বিদ্যা যাহা ভ্রম বা অজ্ঞানকে ধ্বংস করে। অন্যদিকে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ইহার অর্থ সম্পূর্ণ অন্যরূপ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন 'উপনিষৎ' শব্দে প্রথমতঃ পাঠ শুনিবার নিমিত্ত বিনীতভাবে শিক্ষকের নিকট বসিবার কায়দা বোধ হইত। উপ'র অর্থ নিম্নে, নি'র অর্থ আসু পাতিয়া, সদ্'র অর্থ বসা। পণ্ডিত মোক্ষমূলরের এই মত।* আবার, আচার্য্য গোল্ডষ্টুকার বলেন, † ইহা সম্পূর্ণ সম্ভবপর যে উপনিষৎ গ্রন্থ সকলের সঙ্কলাভ করিবার পূর্ব্বে যে সকল হিন্দু বৈয়াকরণ বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহারা উহাকে গূঢ় বা অবোধ্য অর্থে ব্যবহৃত করিতেন। এবং ঐ অর্থটি ইহার প্রকৃতি প্রত্যয়ের সহিত অসম্বদ্ধও নয়, কারণ ইহার প্রকৃতি প্রত্যয় শব্দ অর্থ, কোন গুপ্ত বস্তুর সমীপে যাওয়া বা জানা। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, কোন সময়েই 'উপনিষৎ' শব্দ প্রাচীন ঋষিগণ কর্ত্তৃক শিষ্যদিগকে প্রদত্ত পাঠ রূপ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু প্রায় সকল সময়েই ইহার অর্থ একরূপ গূঢ় বিদ্যা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যাহা মনুষ্য হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় করিয়া অনন্ত সুখলাভের নিমিত্ত প্রবৃত্ত করে। সে বিদ্যা সাধারণের অবোধ্য। সমুদয় উপনিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য ধরিয়া বিচার করিলে এইরূপ অর্থই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

উপনিষৎ হইতে সংসারের কার্য্য ও স্বভাবের বিষয় জানা যায়, ঈশ্বরও আত্মার স্বরূপ ও ধর্ম্ম সকল জ্ঞাত হওয়া যায়, এবং ইহাও জানা যায় যে আত্মা সকল ঈশ্বরের অংশমাত্র। উপনিষৎ সকলের সহিত বেদান্তদর্শনের উদ্দেশ্য অভিন্ন, এবং পরমেশ্বর এবং জীবাত্মাসম্বন্ধে উপনিষৎ সকল যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছে, উহাদের সম্বন্ধে বেদান্তদর্শনেরও ঠিক সেই মত। ইহাতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে উপনিষৎ এবং গোঁড়া হিন্দু দর্শন গুলির সহিত একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে উপনিষদ্ গুলিতে কোন রূপ দার্শনিক তর্ক বিতর্ক নাই, উক্ত

---

* মূলর সাহেবের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের ৩১৯ পৃষ্ঠা দেখ।

† Goldstucker, 'Panini' (P. 141. Note 161).

দর্শন গুলিতে তাহা আছে। বেদান্তদর্শনে তর্ক বিতর্ক করিয়া এই রূপ স্থির করা হইয়াছে যে, জগৎ সৃষ্টির সময় এক অদ্বিতীয় আত্মা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আমাদের (য়ুরোপীয়দের) দার্শনিক তর্ক বা যুক্তির নিকট ঐ সকল তর্ক দাঁড়াইতে পারে না। তথাপি ইহাদের বাক্যগুলি অনেকাংশে সযুক্তিক অল্প কথায় ব্যক্ত এবং ঔপন্যাসিক রহস্যশূন্য। উপনিষৎ গ্রন্থ গুলিতে দর্শনের উপাদান সামগ্রী লক্ষিত হয় মাত্র। উপনিষদের বিষয়গুলি অতীব বিশৃঙ্খলভাবে উপন্যস্ত, এবং মধ্যে মধ্যে উপন্যাস ও কল্পিত গল্প দ্বারা বিচ্ছিন্ন। উপনিষদের বিষয়গুলি প্রায় কথোপকথনচ্ছলে অবতারিত এবং পুনরুক্তি-দোষে দূষিত। কিন্তু উপনিষদের এই দোষগুলি হিন্দুদিগের চিত্ত অনুসারে বিচার করিলে আমরা সহজে জানিতে পারি যে, কৃতবিদ্যগণ সাধারণতঃ যেরূপ বুঝিয়াছেন, এই উপনিষদ্‌গুলি সেই প্রকার জ্ঞানোন্নতির মূল। যে জ্ঞান সকল সময়ই পৌত্তলিকতার মূলোচ্ছেদের নিমিত্ত এবং নীচান্তঃকরণ পুরোহিতশ্রেণী দ্বারা প্রচারিত শাস্ত্রের অযথা বোধ জন্য প্রচলিত অসৎ অনুষ্ঠান সকলের বিনাশার্থ স্বয়ং চেষ্টমান সকল উপনিষদই সে জ্ঞানের শিক্ষা প্রদান করে।

সকল উপনিষৎ যে এক সময় রচিত নয় ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয়। কিন্তু সংস্কৃত ভাষাতত্ত্বের তাদৃশ শৃঙ্খলা না থাকায় কোন্ উপনিষৎ কোন্ সময় রচিত ইহা ঠিক্ নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। উপনিষৎ সমূহের মধ্যে আরণ্যকগুলিই প্রথমে রচিত হয়। ইহাদের নামেই তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। বিশেষ,পাণিনি ব্যাকরণের আলোচনায় কোন একস্থানে কাত্যায়ন ঋষি আরণ্যক শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে এই শ্রেণীর উপনিষৎ অরণ্যের মধ্যে নির্জ্জনে অধীত হইত বলিয়া ইহার নাম আরণ্যক হইয়াছে। অরণ্যে বসিয়া শাস্ত্রালোচনা করিবার কতকটা কারণও বুঝা যায়। তখনকার লোকেরা বিবেচনা করিয়াছিলেন, যে জীবনের রহস্য বিষয়ে চিন্তা করিবার সময় মন হইতে জগতের যাবদীয় সম্বন্ধ অপসৃত করা উচিত। আরণ্যক গ্রন্থগুলির সহিত ব্রাহ্মণ গ্রন্থদিগের যেরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় অন্য শ্রেণীর উপনিষদ্ গুলির সহিত ব্রাহ্মণ গ্রন্থের সেরূপ সংস্রব নাই। বৃহদারণ্যক নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ শুক্ল যজুর্ব্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণের অংশবিশেষ। ঐতরেয় আরণ্যক ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অংশ। ছান্দোগ্য উপনিষৎ যদিও কোনও স্থানে আরণ্যক নামে অভিহিত হয় নাই, তথাপি উহা সামবেদের অন্যতম ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত। ব্রাহ্মণগ্রন্থ সমূহে যে ভাবে গল্পগুলি সন্নিবেশ হইয়াছে ঐ প্রথম শ্রেণীর উপনিষৎগুলিতেও ঠিক সেই মতে মধ্যে মধ্যে গল্পের সন্নিবেশ করা হইয়াছে। উপনিষদে ঐ সকল আখ্যায়িকার গূঢ় বা সাধারণের বুদ্ধির অবোধ্য ভাবে সন্নিবেশ থাকায় উহাদের বিশেষ সম্মান লক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর উপনিষৎ গুলিতে কাল্পনিক ইতিহাস বা আরোপিত কথার উল্লেখ নাই। ইহারা সংক্ষিপ্ত এবং দার্শনিক মতের অনুগত। অনেকগুলি অথবা অধিকাংশ উপনিষদই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এবং এই সকল উপনিষৎ গ্রন্থগুলি যে আরণ্যক গ্রন্থ হইতে অনেক পরিবর্ত্তিত তাহা স্পষ্টই প্রতীয়

মান হয়। তৃতীয় শ্রেণীর উপনিষৎগুলিতে বৈদিক দেবতত্ত্বের সহিত নব্য সাম্প্রদায়িক বিবিধ ধর্ম্মবিষয়ক মতগুলির সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই শ্রেণীর উপনিষৎ গুলিতে পরমব্রহ্মকে [redacted]দেবের (ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর) অন্যতর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর উপনিষদের অধিকাংশই অথর্ব্ব বেদের সহিত সম্বন্ধ বা তাহার অনুগত। এই উপনিষৎ গুলির বিশদ পরিচয় দিবার জন্য আমরা ক্রমশঃ উহাদের বাক্যাদি উদ্ধৃত করিয়া এক একটি উদাহরণ দিতে ইচ্ছা করি। আগামী বারে আমরা তাহার সম্যক্ আলোচনা করিব। [ক্রমশঃ।

শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী।

সাহিত্য।

সাহিত্য কি?

সাহিত্য কি, বুঝাইতে একটা কিছু নূতন বলা শক্ত কথা। সাহিত্য কি, কেহ বলিতে বসিলে অনেকে নূতন-কিছু জানিবার জন্য আগ্রহসহকারে শুনিতে বসেন। হায়, তাঁহার কি কষ্ট, যে শুধু মাত্র জানে যে তাহার শ্রোতৃবর্গ কি শুনিতে চান!

এদিকে, সাহিত্য কি, এ বিষয়ে পণ্ডিতবিদ্যার মত একটা কোন স্থির সিদ্ধান্ত নাই। সাহিত্য অনেকটা রাজনীতির মত। রাজনীতিজ্ঞদিগের ন্যায় প্রায় প্রত্যেক সাহিত্যবিদেরও লক্ষ্য, আদর্শ, প্রণালী এবং উপকরণ বিভিন্ন; অনেকটা আপনার রুচির উপর নির্ভর করে।

অথচ বিজ্ঞান-দর্শনাপেক্ষা মানুষের কাছে সাহিত্যের আদর অধিক। যে লেখে প্রায়ই সাহিত্য লিখিতে বসে। কেন? কেন বাল্মীকি কালিদাস এত আপনার-আপনার, আর্য্যভট্ট পতঞ্জলি এত পর-পর? সাহিত্যবিদ্ মানুষের হৃদয়-ব্যথা!

অথচ যাঁহারা জীবনযাত্রার জন্য শিক্ষা চান, তাঁহাদিগকে সাহিত্যের আবশ্যকীয়তা-সম্বন্ধে কিছু বুঝান যায় না। সাহিত্য ভরণ পোষণের কোন একটা উপায় করিয়া দিতে পারে না। সাহিত্যকে শুদ্ধ সাহিত্যেরই জন্য শিখিতে হয়। সাহিত্য-চর্চ্চার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে বা নির্দ্দিষ্ট কোন ফল লাভ নাই।

সাহিত্য-রসজ্ঞতা চর্চ্চা-সাপেক্ষ; সাহিত্য-রসবোধ সকলেরও নাই। সকলেরই যেমন সুরবোধ থাকে না, সাহিত্য-বোধশক্তি তেমনি অনেকেরই নাই। অনেকের প্রকৃতি সাহিত্যোপযোগী নহে। তাঁহারা যদি সাহিত্যের চর্চ্চা করেন, তাহা ভাসা ভাসা—উপরে উপরে। সংবাদপত্রের সংবাদস্তম্ভ বা মাসিক পত্রের সংক্ষিপ্ত সমালোচনার পত্রগুলিই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট। সাহিত্য-চর্চ্চাকারীদিগের যতটুকু পঠনেচ্ছা, চিন্তা, ধৃতি, এবং স্মৃতিশক্তি আবশ্যক, সেটুকু নাই।

সাহিত্য চর্চ্চাকারীদিগের হাতেও পানি-

কটা অবসর থাকা উচিত। হৃদয়ে এবং সংসারে কতকটা শান্তি থাকা প্রয়োজন। চলিতে চলিতে, গল্প করিতে করিতে, সংসারের কথা ভাবিতে ভাবিতে দুই চারিখানা পাতা উল্টান, সাহিত্য-চর্চ্চা—কিছুরি চর্চ্চা নহে।

আবার সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে হইলে আগে বা সঙ্গে সঙ্গে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি সকল বিদ্যাই একটু একটু আয়ত্ত করিতে হয়। একটু একটু বলিবার অর্থ—দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতিতে সাহিত্যের যে যে অংশটুকু ছড়ান, সে সেটুকু না বুঝিলে সাহিত্য অসম্পূর্ণ থাকে।

এত শ্রম স্বীকার, অথচ কিছুই নাই, তবু কেন মানুষ সাহিত্য এত ভাল বাসে? কেন শিক্ষার মধ্যে সাহিত্য-চর্চ্চাই অবশ্য-কর্ত্তব্য?

সাহিত্যের ফলাফল।

জগতের এবং জীবনের কতকগুলি বিষয়ের 'কি' প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। কিন্তু তাহাদের আবশ্যকানবশ্যকীয়তা বুঝি ফলাফল দেখিয়া। সাহিত্যও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ফলাফল পরোক্ষতঃ।

যদি আপনার সঙ্কীর্ণতার গণ্ডির মধ্যে কীটের মত বাস করা উচিত বোধ না হয়, যদি বাস করিতে না পারা যায়, তবে সাহিত্যের চর্চ্চা করা উচিত। দেখা যায়, সাহিত্য কত হৃদয়ে প্রলেপ দেয়; গর্ব্ব, আত্মম্ভরিতা এবং স্বার্থপরতাকে দমন করে, দেখা যায়, সাহিত্য আত্মাকে উজ্জ্বল করে; ভবিষ্যৎকে নিকটে আনে, বর্ত্তমানকে মধুর করে। জগতকে, প্রকৃতিকে, স্বজাতিকে আত্মীয়স্থল করিয়া দেয়। নিদ্রিত ভাব-সমূহকে জাগরিত করে, নীতিজ্ঞান এবং কল্পনাকে প্রখর করে; জ্ঞানকে সম্পূর্ণ ও চিরনূতন করিয়া রাখে।

যদি মানুষের উচিতই হয়—নিয়মিত সুসংযত, বিনীত ও ন্যায়বান হওয়া, দেখা যায়, [redacted] সেই ঔচিত্যে প্রধান সাহায্য-কর্ত্তা। সাহিত্যই তাহার উদাহরণ-দাতা। দেখা যায়, সাহিত্যই মানুষের চিত্ত, বুদ্ধি, হৃদয়, কার্য্য এবং জীবনকে পূর্ণ করিয়া গঠিত করিতে চেষ্টা করে; মহদাদর্শসমূহ সর্ব্বদাই চক্ষের সম্মুখে রাখে। সাহিত্যই ইন্দ্রিয়ের সংযমকারী, মস্তিষ্কের সুস্থতা চালনার সহায়, আমোদের পরিমাণে, পরিশ্রমে অধ্যবসায়। সাহিত্যই মানুষের হৃদয়, সুখ, দুঃখ, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি, এবং মানুষের অভাব, অদৃষ্ট, স্বভাব, ব্যবহার প্রভৃতি বুঝাইয়া দেয়, দুঃখী তাপীর উপর সহানুভূতি জন্মাইয়া দেয়।

একদিকে বলা উঠিয়াছে—বিজ্ঞান-দর্শনের চর্চ্চা কর, নহিলে উন্নতি নাই; সাহিত্য চাই না। সাহিত্য-চর্চ্চায় মানুষের শ্রমশীলতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে না, দিন দিন মানুষকে নিস্তেজ অড়পিণ্ডবৎ করিয়া তুলে। সাহিত্য-চর্চ্চাকারীরা কেবল স্বপ্ন ও খেয়ালে ঘুরিতে পারে, হাতে-হেতুড়ে কোন কাজে লাগে না।

কথাটা ঠিক। কিন্তু এ দোষ সাহিত্যের নহে, সাহিত্যের অপব্যবহারের ফল। কে বলিল, প্রকৃত সাহিত্য-চর্চ্চায় মানুষ মনুষ্যত্ব হারায়? প্রকৃত সাহিত্য মানুষকে সৌন্দর্য্য বুঝায়, সরলতা শিখায়। মানুষ মানুষ হয়, মনুষ্যত্ব হারায় না! সাহিত্যের মর্ম্মে মর্ম্মে হিতবাদ, সংযমবাদ, জ্ঞানবাদের কত-লহরী খেলিতেছে। নিজের কিছু না জানিয়া, না

মানিয়া কেবল কলে ঘোরা, ধুঁয়ার উড়াও মনুষ্যত্ব নহে। কে বলিল সাহিত্য-চর্চ্চার মানুষ কেবল পেয়ালে ঘুরে? মিল্টন, গেটে প্রভৃতির কথা তুলিব না, প্রকৃত হাতে-হেতুড়ে বীকন্সফিল্ড, গ্লাডষ্টোন সাহিত্যে [redacted]

সাহিত্যের অপব্যবহার।

যখন সাহিত্যের অপব্যবহারের কথাটা উঠিল, তখন অপব্যবহারটা কি, আলোচনা করা যাক্।

সাহিত্য-শিক্ষা যে সে কতকগুলা পুস্তক পড়া নহে। সাহিত্য শিক্ষা—মানুষ কি, মানুষ কি হইতে পারে, মানুষের কি হওয়া উচিত, ইহাই বুঝাইয়া দেয়। আমাদের সাহিত্য কি ইহাই বুঝাইয়া দিতেছে?

আমরা যে কোন পুস্তকবিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারি, পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত শতকরা ৮০।৮৫ হারে সচরাচর উপন্যাস বিক্রীত হয়; সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে ক্বচিৎ দু চারি খানা। ইংলণ্ডেও প্রায় এইরূপ, স্কটলণ্ডে এবং আমেরিকায় ইহার অর্দ্ধেক। ফ্রান্স এবং জার্ম্মনির হার আমি জানি না। সাহিত্যের অন্য গাহিতে বসিয়া, সাহিত্যের এক প্রধান অঙ্গের আমি নিন্দা করিতেছি না। আমিও উপন্যাসভক্ত। যাহে উপন্যাসকে আমি সাহিত্যের অপব্যবহার বলি; ফিলডিং, স্কট, থ্যাকারে, ডিকন্স, ব্রণ্টে, জর্জ ইলিয়েট, বঙ্কিমের আদর করা উচিত, এবং হইবেও। শতকরা ৩৩।৩৪ খানা উপন্যাস পড়া আমার মতে যথেষ্ট।

আর এক। আমরা পুস্তক সংগ্রহে অনাগ্রহ। আমরা পুস্তক চাহিয়া পড়ি, বা লাইব্রেরী হইতে লইয়া আসি, একবার মাত্র পড়িয়া ফেরত দি। আমরা কতকগুলি পুস্তক সংগ্রহ করা যে কর্ত্তব্য, তাহা বিবেচনা করি না। আমি, এমন কি যাঁহাদের যথেষ্ট অর্থসচ্ছলতা আছে, নিজের লাইব্রেরী করিবার ক্ষমতা আছে, এমন অনেকগুলি জমিদার, রাজা, রায়বাহাদুরও, পুস্তক চাহিয়া পড়েন। ষ্টেট্‌সম্যান, ইংলিসম্যান লওয়া আছে—দেউড়ীর শোভার জন্য, বাড়ীতে এক খানা অভিধানও নাই! পুস্তক কেবল ফটো তুলিবার সময় হস্তের শোভা-সম্পাদন জন্য নহে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কতকগুলি ভাল পুস্তক নিজের রাখা উচিত। কেন না এমন কতকগুলি পুস্তক আছে, যাহা একবার বা দুইবার পড়িলে পত্ত দিবসের সংবাদপত্রের মত পুরাতন হয় না। কতকগুলি পুস্তক আছে, যাহা চিরনূতন। বৎসরে একবার বা সহস্রবার পড়—প্রতিবারেই তুমি নূতন-কিছু শিখিবে; নূতন আনন্দ উপভোগ করিবে। এই Masterpiece-গুলি প্রায়ই পড়িতে হইবে, বুঝিতে হইবে, উপভোগ করিতে হইবে। এই Masterpiece-গুলি দ্বারা তোমার জীবন গঠিত করিতে হইবে, ইহাদের মধ্যে তোমায় বাঁচিতে হইবে।

আর কতকগুলি পুস্তক আছে যাহার কোন কোন অংশ অতি সুন্দর। সে অংশসমূহ দাগ দিয়া রাখিতে হয়, সময়ে সময়ে দেখা উচিত। এ গুলিও সংগ্রহ করা আবশ্যক। এই জন্য বেকন বলেন, "Some books are to be tasted, others to be swallowed and some few to be chewed and digested."

আর একটী বড় আশ্চর্য্যের বিষয় দেখা যায়, বাঙ্গালায় যাঁহারা লেখক তাঁহারাই

পাঠক। লেখকের নিকট ভিন্ন পুস্তকের আদর নাই। আবার যাঁহারা পড়েন, তাঁহারাই লেখক। পড়িলেই লেখক হইতে হইবে, এ বড় ভয়ঙ্কর কথা! ঘরে ঘরে এত প্রতিভা ফুটিলে সাহিত্য জ্বলিয়া যায়! ভয় এই,—সাহিত্যে ভীরুতা এবং বেষারেষিতে ভরিয়া যায়; প্রকৃত প্রতিভা লইয়া একটা মতামতি থাকে না। ভয় এই,—ইহাতে নিজ পরিবার মধ্যে অশান্তি, শিক্ষিতদিগের মধ্যে সাহিত্যের উপর একটা বিরাগ জন্মাইয়া দেওয়া, আর নিজের ইহকাল নষ্ট করা। আমি আমার পাঠকবর্গকে হাতে ধরিয়া অনুরোধ করি, একটু বুঝিয়া, আপনাকে চিনিয়া, লেখক হইবেন। দেখিবেন,—

"The world with masters is so covered o'er,
There is no room for pupils any more."

দেখিবেন, যাঁহারা এ সাহিত্যপ্লাবিত যুগে সুলেখক বলিয়া নাম কিনিতে পারিয়াছেন—তাঁহারা কত চেষ্টা, কত পরিশ্রম করিয়াছেন; কত অধ্যবসায় এবং কতখানি বুদ্ধি ও হৃদয় লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নূতন কিছু বলা, বা মনের ভাব sincerely প্রকাশ করা, এবং সেই কথা জগতের কথা হওয়া—যাঁর তাঁর কাজ নহে।

আমরা যখন সাহিত্যের গুরুত্ব বুঝিতেছি না, বলিতে পারি, আমরা সাহিত্য উপভোগও করিতেছি না।

কি কি পড়িতে হইবে?

ইহার উত্তর দিতে একজন প্রকৃত পণ্ডিতের আবশ্যক। আমার সে গর্ব্ব নাই। এ বিষয়ে সকলেরও একমত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে, বন্ধুত্ব ভাবে কথার মত, দুই চারিটা কথা কওয়া মন্দ নহে।

সাহিত্যের মধ্যে কি কি পুস্তক পড়িতে হইবে, এক কথায়, এমন এক-একজন গ্রন্থকারের বলা,—"who has enriched the human mind, who has really added to its treasure, who has got it to take a step further; who has discovered some unequivocal moral truth, or penetrated to some eternal passion, in that heart of man where it seemed as though all were known and explored; who has produced his thought, or his observation, or his invention under some form, no matter what, so to be great, large, acute, and reasonable, sane and beautiful in itself; who has spoken to all in a style of his own, yet a style which finds itself the style of every body,—in a style that is at once new and antique, and is the contemporary of all the ages."*

কোন এক গ্রন্থকারের গোঁড়া হওয়া উচিত নহে। ইহাতেই সাহিত্য-পাঠের দোষভাগ লক্ষ হয়। লেখক হইলে তাঁহার mannerism এর প্রতি পাঠকের একটা অন্ধ ভক্তি জন্মে। অনুকরণকারীর এবং একদেশদর্শীর মূল্য অতি অল্প।

কোন গ্রন্থ পড়িতে হইলে, তাহার রচয়িতার জীবনী (যদি পাওয়া যায়) সঙ্গে সঙ্গে পড়া উচিত। নহিলে মূল কথা পাওয়া যায় না, অনেক সময় বুঝা যায় না, ভাল লাগে না। মানুষটী ও বিষয়টী (man and matter) দুইটীই আয়ত্ত করা উচিত; এবং

* Sainte Beuve.

লেখকের সময়াবস্থাও (age) জানা উচিত।

কবিতা, নাটক, প্রহসন, রহস্য, উপন্যাস, বক্তৃতা, প্রবন্ধ, উপদেশ, হেয়ালী প্রভৃতি সাহিত্যের বিভাগ অনেক; পুস্তকও অসংখ্য। সাধারণ এক ব্যক্তি সাহিত্যের সকল বিষয়ে সুপণ্ডিত হইতে পারেন না। যাঁহার যে বিষয়ে রুচি বা লক্ষ্য, তিনি সেই বিভাগের প্রথম, বা দ্বিতীয় শ্রেণীর সমস্ত পুস্তক পড়িতে পারেন, ক্ষতি নাই। বরং সে বিভাগে তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান বা অধিকার জন্মিবে। কিন্তু বলিয়া রাখি,—"To spend too much time in studies, is sloth; to use them too much for ornament, is affectation; to make judgment only by their rules, is the humour of a scholar."*

সাহিত্যের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, একদিন কোন কোন পুস্তকে এক একটা আন্দোলন উঠিয়াছিল; আজ আর তাহা নাই। আজও তোমাকে যে সেই পুস্তকগুলি জীবনের সহচর করিতে হইবে, তাহা আমি বলি না। সেই পুস্তক বা পুস্তকগুলি যে কাজ করিতে ফুটিয়াছিল, সে কাজ সমাধা হইয়া গিয়াছে। এখন সে সময় নাই, ইচ্ছা হয় ত সে ধরণের পুস্তক এক আধ বার দেখা ভাল।

কি কি পড়িতে হইবে, সাধারণ সাহিত্য-চর্চ্চাকারীদিগের জন্য এই প্রবন্ধে আমার একটী পুস্তকের তালিকা দেওয়া উচিত ছিল। দিলে, হয়ত, অনেকের সহিত মতে মিলিত না; আমি যাহা ভালবাসি, হয়ত অনেকে তাহা বাসেন না। এবং তালিকা দেওয়াও সহজ ব্যাপার নহে। তবে, যাঁহারা পাশ্চাত্য সাহিত্যে কিছু ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে আমি—Stopford Brooke, Mrs. Oliphant, Frederic Harrison, Carlyle, Emerson প্রভৃতি মহাত্মার পুস্তক-নির্ব্বাচন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ বা পুস্তকগুলি পড়িয়া আপন আপন রুচি অনুযায়ী পুস্তক নির্ব্বাচন করিতে পরামর্শ দি। Emerson বলেন:—(১) "Never read a book that is not a year old; (২) Never read any but favoured books; (৩) Never read any but what your like." Lord Lytton-এর মত,—"In science, read by preference the newest books; in literature, the oldest."

বাঙ্গালা সাহিত্য-পুস্তক-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি না। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্য" এবং শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বসুর "বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা" হইতে যথেষ্ট উপদেশ পাওয়া যায়। এই দুইখানি পুস্তক প্রচারিত হইবার পর আরও কয়েকখানি উত্তম পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; পাঠকগণ একটু অনুসন্ধান করিলে নিজেরাই জানিয়া লইতে পারেন।

সাহিত্য-চর্চ্চায় আমরা আত্ম-হারা। য়ুরোপের অনেকেই ৪ টী ভাষা শিখেন। শিখিবার সহজ উপায়ও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কালিদাস, সেক্ষপীর, গেটে, মোলেয়ার, হিউগো, এবং দান্তে প্রভৃতির মূলগ্রন্থ (original) পড়া উচিত।

উপসংহার-কালে একজন প্রধান সাহিত্য-বিদের* কিছু কথা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আমার এ প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতা সম্ভবতঃ

* Bacon.

* Morley.

ইহাতেই ঢালিয়া যাইবে। কথাটি বড়ই সারগর্ভ, সাহিত্য-চর্চ্চা-কারী মাত্রেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য। তাহা এই—

"Bacon is right, as he generally is, when he bids us read not to contradict and refute, nor to believe and take for granted, nor to find talk and discourse, but to weigh and to consider. *Yes, let us read to weigh and to consider.*"

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

ও পারে।

১

এ পারে নাই ফুলের খেলা
বয় না কো মলয় বাতাস,
বসন্ত আসিবে কেমনে গো?
আসিবে কেমনে মধুহাস?

২

ঘোর মরুময় ভূমি হেথা,
পড়িতেছে নাহি যায় গণা
কত যাত্রী মরণের কোলে
ছাইতেছে তপ্ত বালুকণা।

৩

প্রদোষের মধুর কিরণ
হেথা যেন গরল সমান,
সঙ্গীতের নির্ঝরিণী জল
নাহি করে হেথা কেহ পান।

৪

কোথা পাখীদের গীতসুধা?
উষার পরশ-গীত কোথা?
ফলফুলহীন গর্ব্ব-তরু
শুধু একা দাঁড়াইয়া হেথা!

৫

উহার পরেতে ব'সে কই
কোন্ পাখী হরষিত প্রাণে?
ওর ক্ষুদ্র ছায়াখানি ল'য়ে
কা'হারে তুষিবে ছায়াদানে?

৬

বাসনা আকুলি ওঠে কেঁদে
হেথা নাই আম্রের ছায়া,
সুখস্মৃতিগুলি মরমর—
জীর্ণ হ'য়েছে তাদের কায়া।

৭

শিহরিয়া দেহ মন প্রাণ
অশান্তির তপ্ত বায়ু বয়,
কখন দহিয়া যেতে হবে
এই শুধু এই হেথা ভয়!

৮

যদি বা তাদের দেশ হ'তে
কৃপা করি দু-একটি তান
আসে সুকোমল করিবারে
হৃদি, ক'রে ফেলে গো পাষাণ।

৯

এমনি প্রকৃতি-বিপরীত
হেথায় সকল কাজ বঁধু,
বরষে না বারি মেঘজাল
বালুকার কোলাহল শুধু!

১০

চল বঁধু চল হেথা হ'তে
এ পারে আর রয়নাকো
উতরাই আইল এ পার
ওই র'য়েছে প্রেমের সাঁকো!

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আঁধারে আলোক।

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥"

ভগবদ্গীতা। ১০।২০।

ঘোরা অমানিশি। ঘনঘোর কৃষ্ণমেঘে দিগ্‌মণ্ডল সমাচ্ছন্ন। ভীম তামস অন্ধকারে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত। থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ-ভাগ্নি ভয়ঙ্কর প্রদীপ্ত লেলীহান্ জিহ্বা বাহির করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চমকাইতেছে। সেই বিষম বিদ্যুৎ-চমকে শরীর শিহরিয়া উঠিতেছে—চক্ষু ধাঁধিয়া যাইতেছে;—অন্ধকারে অন্ধকার আরও ঘনীভূত—আরও বিভীষিকাময় হইতেছে। জগৎ স্তম্ভিত। জীবকুল সংজ্ঞাহীন—নিদ্রার মোহিনী মায়া-বরণে আবরিত। তরুরাজির শোভাময় শ্যামল দেহ অনন্ত অন্ধকারগর্ভে নিমগ্ন।—যেন মহাপ্রাণে ক্ষুদ্র প্রাণ মিলিয়া গিয়াছে। জীব-প্রাণ সমীরণ স্তব্ধ। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ-চমকে চমকাইয়া ঘনশ্বাস ফেলিতেছে। দীর্ঘকায়া প্রবাহিনী প্রবাহহীন;—যেন বিষাদ-সাগরে গা ঢালিয়া আলুথালুভাবে অনন্ত শয়ানে শায়িত আছে। কাল মেঘের কাল ছায়া সেই স্রোতস্বিনীবক্ষে পতিত হইয়াছে;—যেন পবিত্র-হৃদয়া কোমল-প্রাণা প্রেমময়ী সুন্দরী, মলিন কৃষ্ণবসনে সর্ব্বাঙ্গ সমাচ্ছাদিত করিয়া, পাপ-জগৎ-চক্ষু হইতে আপনার লাবণ্যময়ী পবিত্রকান্তি লুকাইয়া রাখিয়াছে। পৃথিবী নিস্তব্ধ। কিন্তু, কি সুন্দর মহান্ নিস্তব্ধতা! ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী ভীমরূপ অন্ধকারের বিরাট শরীরে কোমলতাময়—আবেশময় নিস্তব্ধতা গা ঢালিয়া যেন চুয়ে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। কি মনোহর! পরমপুরুষের কি অনির্ব্বচনীয় মহান্ অভিব্যক্তি! কি সুন্দর!

সম্মুখে অনন্ত অন্ধকার-ক্রোড়ে, কলোলিনী আবেশময় অবশ অঙ্গে—কেমন এক ভাবে পড়িয়া আছে। পার্শ্বে ভীষণ শ্মশান। সেই মহা শ্মশানে শত সহস্র জ্বলন্ত-চিতায় মহা ঘোর অন্ধকাররাশি প্রদীপ্ত শিখায় ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। আমি আকুল-প্রাণে বালুকাময় নদীগর্ভে বসিয়া আছি।—বসিয়া কত কি ভাবিতেছি। সে আকাশ পাতাল ভাবনার শেষ নাই—কূল-কিনারা নাই। ভাবনার ঘোরাবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি, এমন সময়ে নিকটে একটা শৃগাল হঠাৎ ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল।—সে বিকট চীৎকারে আমার চমক ভাঙ্গিল। তখন সন্ত্রাসে চারিদিকে চাহিলাম—দেখি—সম্মুখে একটা বিকট নর-কপাল খল্ খল্ অট্টহাস্যে জ্বলন্ত আঁধার রাশি লহরে লহরে উদ্গীরণ করিতেছে। সে জ্বলন্ত আঁধার লহরী যেন অনন্ত ছায়াপথ তরঙ্গায়িত করিয়া বিশ্ব-ত্রিভুবন গ্রাস করিতে ছুটিতেছে। ভয়ে, আমার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল—চক্ষু মুদ্রিত করিলাম।

কিন্তু হায়, এইত পরিণাম। এইত জীব-জগতের শেষ অবস্থা, তবে কিসের জন্য এত ভয়? এই নর-কপালেইত আমার পরিণাম।—নর-কপালইত আমার এই যত্নে রক্ষিত সোণার শরীরের শেষ পরিণতি হইবে!

দুদিন পরে এই প্রজ্জ্বলিত আঁধার তরঙ্গে আমার হৃদয় আঁধারে মিশিয়া খেলিতে থাকিবে। আজ প্রধূমিত আঁধার-রাশিতে বেষ্টিত আছি,—কাল এই আঁধারই আমার ধূ ধূ জ্বলিয়া আমার শেষ করিবে! তখনত উভয়ে মিলিয়া এই অদ্ভুত বিশ্ব-রহস্যের আঁধারমাখা সঙ্গীত আঁধারমাখা ঘোর অট্টহাসো গাহিতে থাকিব। তখনত উভয়ে কেমন ভাই-ভাই প্রাণে-প্রাণে মিলিয়া প্রীতি-আলিঙ্গন করিতে থাকিব। আজ তোমার সহবাস ঘৃণা করি, তোমাকে দেখিলে ভয়ে কাঁদিয়া উঠি, কাল কিন্তু তোমারই মুখে মুখ দিয়া প্রীতি-ভরে চুম্বন করিব। হায়, তবে এ কৃপা ভয় কেন?

"ভয়! আমায় দেখিয়া ভয়!" সহসা যেন এই কথা বলিয়া সেই নর-কপাল বিকট হাস্য করিয়া উঠিল। তখন আমার কি হইল জানি না। কেন তেমন হইল তাহাও বলিতে পারি না। মুহূর্ত্তমধ্যে এ ত্রিসংসার ভুলিয়া গেলাম—আমার আমিত্ব উড়িয়া গেল। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই ভীম নরকপালের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। দেখিতে দেখিতে দেখি, সেই বিকট নর-কপাল যেন ক্রমিক বর্দ্ধিত হইয়া সহস্র সূর্য্যোদ্ভাসিত প্রদীপ্ত রজতগিরির ন্যায় এক মহাভয়ঙ্কর ভীমমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে!—সেই বিরাট-শরীরে এই অনন্ত জগৎ বিশ্ব-সংসার পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। সেই মহাভীম বিরাটপুরুষের সর্ব্বাঙ্গে প্রদীপ্ত চিতাভস্ম অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জ্বলিতেছে—যেন জ্বলন্ত রজত-তুষার সেই মহাকায়ের উপর দিয়া লাফাইতে লাফাইতে ছুটিতেছে!—গলদেশে প্রলম্বিত নৃমুণ্ডমালা করালদার কোটীবদনে নীলাভ চিতাগ্নি-শিখা জ্বালিয়া বিশ্বসংসার দগ্ধ করিতেছে! গগনব্যাপী ভীম জটাজুট শত-সূর্য্য-প্রদীপ্ত প্রজ্জ্বলিত শিখার ন্যায় অনন্ত ব্যোমপথে ছুটিতেছে। আর সেই বিরাট-মূর্ত্তির ভীমভুজদ্বয় অনন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। চক্ষু মুদিলাম। কতক্ষণ পরে আবার চাহিলাম। তখন দেখি,—সেই বিরাট পুরুষের এক হস্তোপরি এক দিব্য পরমসুন্দর শিশু স্ফুটিতোন্মুখ পদ্মকোরকের ন্যায় হাসিতেছে। সে হাসিতে কত সুধা ক্ষরিতেছে—কত মুক্তা ঝরিতেছে—কত চন্দ্র হাসিতেছে—কত পারিজাত ফুটিতেছে! সে সুধামাখা প্রাণহরা অর্দ্ধস্ফুট হাস্যধ্বনিতে কত ভ্রমর মধুর ঝঙ্কার দিতেছে—কত সুন্দর ক্ষুদ্র পাখী স্বর্গীয় স্বর-লহরীতে আকাশ মাতাইয়া গাহিতেছে! কুসুম সুষমা-গঠিত শিশু যেন কোন স্বপ্নরাজ্যের সুদূর স্বর্গীয় সঙ্গীততরঙ্গে ভাসিতেছে! আর অন্য হস্তোপরি এক পূতিগন্ধময় ভীষণাকার গলিত শব বিকটদশন-পংক্তি বিস্তার করিয়া বিভীষিকাময় অট্টহাসো বিশ্বচরাচর সন্ত্রাসিত করিতেছে। সে হাসিতে ঝলকে ঝলকে জ্বলন্ত আঁধার ছুটিতেছে—ঘন-ঘোর চিতাধূম উদ্গীরিত হইতেছে—মহা-শ্মশানের মহাভয়ঙ্কর প্রেতমূর্ত্তি নাচিতেছে। সে বিকট হাস্য-ধ্বনিতে কত শৃগাল পৈশাচিক মুখব্যাদানে বিকট চীৎকার করিতেছে—কত ভীমাকার কাক বিকৃতস্বরে চতুর্দ্দিক কাঁপাইয়া প্রতিধ্বনিত করিতেছে!

তখন দেখিতে দেখিতে দেখি, সেই বিরাট-পুরুষের সর্ব্বসংহারক বিরাট মুখ-মণ্ডল অনন্ত ব্যোমপ্রদেশ অতিক্রম করিল। সেই অনন্ত-যোজন-বিস্তৃত অতি-ভীম-

ভয়ঙ্কর ভ্রূ ভঙ্গি-করাল বদনগহ্বরে নীলাভ-জ্বলন্ত-অন্ধকার মহাবেগে ভীম-শব্দে আলোড়িত হইতেছে। সেই ঘোরাবর্ত্তনে কত কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বুদ্বুদের ন্যায় নিমিষে উত্থিত হইয়া জ্বলিতেছে—আবার নিমিষেই নিবিয়া সেই অনন্ত-অন্ধকার গর্ভে কোথায় ডুবিয়া যাইতেছে! ঘুরিতে ঘুরিতে কত গ্রহ কত উপগ্রহ বিলীন হইয়া যাইতেছে। আবার কত গ্রহ হইতে কত উপগ্রহ সমুৎপাদিত হইয়া সেই ভীষণ অন্ধকারাবর্ত্তে ঘূর্ণাকারে ছুটিতেছে। কত সৌরমণ্ডল কত জ্বলন্ত ধূমকেতুর প্রচণ্ড আঘাতে পলকে চূর্ণীকৃত হইয়া আণবিক আকারে পরিণত হইতেছে। কত অনন্ত কোটি কোটি চন্দ্র—কত অনন্ত কোটি কোটি পৃথিবী আপন আপন কেন্দ্রে ঘুরিয়া, কত কোটি কোটি সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ঐককেন্দ্রিক হইয়া বৈদ্যুৎবেগে ঘুরিতেছে! আর কত পরার্দ্ধ কোটি কোটি সৌরজগৎ—এক নিত্য, অক্ষয়, অনাদি, অনন্ত মহাশক্তিকে প্রদক্ষিণ করিয়া—কত পরার্দ্ধ পরার্দ্ধ ক্রোশ পরিধি লইয়া ভীমবেগে ঘুরিতেছে! সেই অতিভীষণ আয়ত বদন-গহ্বরে কত কোটি কোটি যোজন-বিস্তৃত ছায়াপথ শুভ্রবস্ত্রের ন্যায় আঁধার-বক্ষে ভাসিতেছে।—আর সেই দীপ্তমান্ নীহারিকামণ্ডল ভেদ করিয়া কত ঘূর্ণমান সৌরমণ্ডল মহাবেগে ছুটিয়া খেলা করিতেছে।

সেই কাল-পুরুষের সম্মুখে এক বিরাট ত্রিশূল।—অনন্ত-ভেদী সেই ভীমত্রিশূলের সুশাণিত অগ্রভাগে মহাপ্রলয়াগ্নি থাকিয়া থাকিয়া মহাভীমশব্দে সহস্র-শিখায় জ্বলিয়া উঠিতেছে। কত শশী-সূর্য্য-সমন্বিত অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সেই করাল মুখমধ্যে বৈদ্যুতিক বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে, ঘন নিশ্বাস-প্রজ্বলিত ভীষণ নাসারন্ধ্রপথে-ছুটিয়া বাহির হইয়া, সেই সম্মুখস্থ ভয়ঙ্কর প্রলয়-বহ্নি-শিখায় আহুতি দিয়া পড়িতেছে, এবং নিমেষমধ্যে সেই জ্বলন্ত শিখা-তরঙ্গে বিলীন হইয়া মহাবেগে তরঙ্গায়িত হইতেছে। কত পরার্দ্ধ যোজন বিস্তৃত অতি ভীষণ নাসারন্ধ্র দিয়া প্রদীপ্ত নীলাভ অন্ধকার নিশা মহাবেগে ভীমশব্দে বাহিরিতেছে; সেই জ্বলন্ত নিশ্বাস-তরঙ্গে কত প্রলয় বিষাণ এককালে ধ্বনিত হইতেছে! সেই প্রলয়-নিশ্বাসে কত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড—কত প্রজ্বলিত ধূমকেতু তড়িত-বলে ছুটিতেছে, এবং তাহাদেরই প্রচণ্ড আঘাতে কত রাশিচক্র পলকে ভস্মীভূত হইয়া অণু পরমাণু আকারে সেই প্রজ্বলিত মহা প্রলয়াগ্নি-শিখায় বিলীন হইতেছে।

কি প্রহেলিকাময় ভীষণ দৃশ্য! কি অদ্ভুত মহান্ বিশ্বরহস্য!! পলকের জন্য এই অচিন্তনীয় মহান্ দৃশ্য চক্ষে ভাসিল—আবার পলক মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইল। ভয়ে ও বিস্ময়ে যুগপৎ হৃদয় স্তম্ভিত হইল—সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। চক্ষে এই পরিদৃশ্যমান জগৎসংসার মহাবেগে ঘুরিতে লাগিল। সন্ত্রাসে চক্ষু মুদিয়া আসিল। ধারণাশক্তি লুপ্তপ্রায় হইল। তখন এই অনন্ত সংসার কোথায় যেন ভাসিয়া গেল। ক্ষণেকের জন্য আপন সত্তা বিস্মৃত হইলাম। সকলই যেন ছায়াবাজির খেলা—সকলই যেন ভীষণ জাগ্রত-স্বপ্নের ভয়াবহ দুঃখমাখা স্মৃতি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

এই বিষম অবস্থায় শূন্যপ্রাণে সংজ্ঞা-

হীনের ন্যায় বসিয়া আছি, এমন সময়ে অকস্মাৎ প্রাণের ভিতর দিয়া কি জানি কেমন একটা বিদ্যুৎ যেন চমকাইয়া গেল। প্রতি অসাড় অবশ শিরার ভিতর দিয়া কি এক অভিনব শক্তি যেন ছুটিয়া গেল। তখন স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় চমকাইয়া উঠিলাম। মুদিত নয়ন বিস্ফারিত হইল।—দেখি, সেই শ্মশানপার্শ্বেই বসিয়া আছি—অনন্ত অন্ধকাররাশি আমাকে ঘেরিয়া তেমনই নৃত্য করিতেছে! এবার আঁধারময় ক্ষুদ্র হৃদয় দিগন্তব্যাপী বিশ্বগ্রাসী অন্ধকার দেখিয়া নাচিয়া উঠিল—মহাপ্রকৃতির ভীষণতা-মাখান, শান্ত, সুন্দর স্বগম্ভীর ভাবে বিমোহিত হইল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত অনন্ত অন্ধকারে—এই ক্ষুদ্র হৃদয়ব্যাপ্ত শান্ত অন্ধকার আকৃষ্ট হইল। ক্রমে অন্ধকারাবৃত ক্ষুদ্র প্রাণ সেই অনাদি অনন্ত অন্ধকারের মহাপ্রাণে মিশিতে লাগিল।—যেন পরমাত্মায় জীবাত্মার সমাবেশ হইতে লাগিল। তখন শিহরিতশরীরে—স্তম্ভিতহৃদয়ে ডাকিলাম—"প্রভো! অনাদি অনন্ত দেব! তুমি কোথায়?"

অকস্মাৎ সেই সুপ্রশান্ত স্বগম্ভীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া গেল। এই শব্দাঘাতে সেই নির্ব্বাত নিষ্কম্প অনন্ত শূন্যদেশ তরঙ্গায়িত হইল। তখন সেই অনন্ত অন্ধকার ভেদ করিয়া—অনন্ত প্রদেশ আলোড়িত করিয়া—অনন্ত ব্যোমপথে ধ্বনিত হইল—"তুমি কোথায়?" বায়ু কাঁপিয়া উঠিয়া শন্ শন্ শব্দে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কাঁদিয়া বলিল—"তুমি কোথায়?" কল্লোলিনী যেন ঐ শব্দময়ী সঞ্জীবনী-শক্তিবলে প্রাণ পাইয়া ক্ষুদ্র বীচিমালা বক্ষে দোলাইয়া স্বগীয় সুমধুর সঙ্গীত গাহিয়া উঠিল—"তুমি কোথায়?" বিদ্যুদ্দাম নিষেধের জন্য অন্ধকার-পরিব্যাপ্ত মেঘমণ্ডল বিতাড়িত করিয়া তীব্র-হাস্যচ্ছটায় বিশ্বভুবন ভাসিত করিয়া হাসিয়া বলিল—"তুমি কোথায়?"

এই শব্দে সম্মুখস্থিত সেই ভীষণ নরকপালটাও যেন আমার প্রতি চাহিয়া খল্ খল্ বিকট-হাস্যে হাসিয়া উঠিল। বড় ভীত হইলাম। তখন, সেই ভয়ভঞ্জন বিপন্নবান্ধব অনাথনাথকে একমনে ডাকিতে লাগিলাম। "দয়াময়, পাপীর গতি, কোথায় প্রভু?" পাপীর সে ডাক বুঝি দয়াময় শুনিলেন। তখন অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে চাহিয়া দেখি—হৃদিসরসে এক শোভাধার প্রস্ফুটিত নীলপদ্ম অপূর্ব্ব জ্যোতিতে ভাসিতেছে। সেই নীলোৎপলোপরি কিরীটকুণ্ডলধারী নীলিমাময় এক চতুর্ভুজ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ স্মিতবদনে বিরাজ করিতেছেন। সেই দৃশ্যের ভিতর অনন্ত পূর্ণপুরুষের নীলাভ অনন্ত জ্যোতিতে ক্ষুদ্র হৃদয় স্তম্ভিত হইল। সম্মুখে অন্ধকার-বক্ষে সেই নীলিমাময় কমনীয়-কান্তি অপূর্ব্বমূর্ত্তি ভাসিতেছে।—পরম পুরুষের চারু-হাস্যচ্ছটায় দিগন্তব্যাপ্ত অনন্ত অন্ধকার হাসিতেছে। সেই নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব বপুতে পূর্ণপুরুষের পূর্ণবিকাশ। যেদিকে তাকাই, প্রতি পদার্থেই সেই শান্তির উৎস সৌম্যবপু অনন্তপুরুষ অনুনিবিষ্ট রহিয়াছে। দেখিলাম—অনন্ত আকাশে সেই অনন্তদেব পূর্ণজ্যোতিতে বিরাজ করিতেছেন। নদ, নদী, পর্ব্বত, তরু, লতা, ফল, পুষ্প, শস্য—চেতন অচেতন যাবতীয় পদার্থেই সেই মহাপুরুষ বিরাজিত রহিয়াছেন। প্রতি বালুকণা, প্রতি জলকণিকা, প্রতি হিমানিবিন্দুতে

সেই অনন্ত তেজঃপুঞ্জ পরমপুরুষ অন্তর্নিহিত রহিয়াছেন। অন্ধকারের অনন্ত আঁধারময় প্রতি পরমাণুতে সেই দ্যুতিমান্ পূর্ণ-পুরুষ সুন্দর পরিস্ফুটভাবে বিকসিত রহিয়াছেন।—কোটি কোটি চন্দ্র যেন সুধামাখা জ্যোৎস্না ছড়াইয়া সেই অন্ধকারবক্ষে ভাসিতেছে! তখন সবিস্ময়ে প্রাণ আকুল হইল। সেই অনাদি অনন্ত পুরুষের নীলাভ জ্যোতির্ম্ময় রূপচ্ছটায় চক্ষু ঝলসিয়া গেল। মনে মনে সেই অনন্ত দেবের চরণে শত সহস্র প্রণাম করিলাম।

চক্ষু চাহিলাম। কিন্তু কৈ, সে মোহন মূর্ত্তি প্রেমের উৎস সবিতৃমণ্ডলমধ্যস্থ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কোথায়? কেবল সেই ঘোর অন্ধকার। সর্ব্বভুবনগ্রাসী অনন্ত অন্ধকার! সকলই আবার সেই অনন্ত অন্ধকারের অনন্তগর্ভে ডুবিতেছে। কিন্তু এবার অন্ধকার বড় ভাল লাগিল।—অন্ধকার দেখিয়া পুলকে শরীর শিহরিয়া উঠিল। যেন প্রতি অন্ধকার-কণিকাতে সেই সর্ব্ব-ভুবন-মনোহর প্রসন্নানন জ্যোতিষ্মান্ মূর্ত্তি অন্তর্নিবিষ্ট থাকিয়া সচরাচর ব্রহ্মাণ্ড আলোকিত করিতেছেন!

শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র।

ভারতের সৈনিক-বিভাগ।

কোষকার লিখিয়াছেন, 'বল' শব্দের অন্যতর অর্থ—সৈন্য। তোমার আমার পক্ষে যাহাই হউক, রাজাদিগের পক্ষে অর্থটা বড়ই সঙ্গত। যদি রাজ্য বিস্তার করিয়া সুশৃঙ্খলে তাহা রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে সৈন্যবলের ন্যায় রাজার প্রধান সহায় আর নাই। অর্থবল বড় বল বটে, কিন্তু অর্থ আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারে না। রাজ-অর্থের অনেক শত্রু। সেই শত্রুহস্ত হইতে তাহা সুরক্ষিত রাখিবার একমাত্র উপায় সৈন্যবল। মুসলমানের অর্থের অপ্রতুল ছিল না, তাহার কোষাগার বিবিধ রত্নে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু তাহার সৈন্যবল শেষ সময়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছিল. মুসলমান তাহার ভাণ্ডার রক্ষা করিতে পারিল না; যে প্রকৃত বলবান্ সে আসিয়া তাহা কাড়িয়া লইল। ইহাই সাধারণ নিয়ম। যে রাজা হীনবল তাহার পক্ষে রাজ্যবিস্তার তো দূরের কথা, করপ্রাপ্ত রাজ্য রক্ষা করাও বড় কঠিন। পায় পায় শত্রু। সকলেই লোলায়িত দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে, কি সুযোগে মুখের গ্রাস ছোঁ মারিয়া লইবে তাহার ফিকির খুঁজিতেছে, এমন অবস্থায় বিশিষ্ট সৈন্যবল না থাকিলে তাহার রাজ্য আর কি টিকে? সৈন্য রাজ্যের প্রাণ। সৈন্যবল না থাকিলে রাজার রাজ্য রক্ষা হওয়া বড়ই কঠিন।

কাজেই রাজ্যের অন্যান্য বিষয় চিন্তার পূর্ব্বে সেই রাজ্য যাহাতে বজায় থাকে তাহার জন্য রাজা মাত্রেরই সর্ব্বপ্রথমে সৈন্যবলসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। কিন্তু উপযুক্তরূপ সৈন্যরাখিতে হইলে, খরচ আছে। সৈনাদিগের বেতন, খোরাক পোষাক দিতে হয়, তাহারা তাহাদিগের

শিক্ষার জন্যও অনেক ব্যয় আছে। সৈন্য যখন রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ, তখন তাহার জন্য ব্যয়কুণ্ঠ হওয়া রাজার উচিত নহে। কিন্তু তাই বলিয়া আবার অযথা ব্যয়ও কর্ত্তব্য নহে। সৈন্যগণ দৃঢ়িষ্ঠ, সুশিক্ষিত ও সমরপটু হইবে, ইহার জন্য সম্ভবমত যে ব্যয় আবশ্যক তাহা অগ্রে করিবে, কিন্তু অন্যায় ব্যয় করিয়া রাজ্য অর্থশূন্য করিবে না। প্রজার অর্থেই রাজার ভাণ্ডার পূর্ণ হয়, প্রজারাও ন্যায্য খরচের জন্য অর্থ দিতে কুণ্ঠিত নহে। কিন্তু ন্যায়ের নামে লইয়া রাজা যদি সেই অর্থের যদৃচ্ছা অপব্যবহার করেন তাহা হইলে তাহাদিগের কষ্টের পরিসীমা থাকে না। রাজার অর্থের আবশ্যক হইলেই প্রজাদিগকে তাহা যোগাইতে হইবে; যাহা ন্যায্য খরচ, কি করিবে কাঁদিয়া ককাইয়াও তাহা দিতে হইবে, কিন্তু রাজা যদি না বুঝেন, দশ টাকার জায়গায় বিশ টাকা ব্যয় করেন তাহা হইলে প্রজারা পারিবে কি প্রকারে? প্রজারা জানে, রাজ্যের জন্য সৈন্যবল বিশেষ প্রয়োজন। কেবল রাজার জন্য নহে, তাহাদিগেরও জন্য বটে। রাজা রক্ষা না হইলে তাহারা নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে পারিবে না, কথায় কথায় ভিন্ন দেশীয়েরা আপত্তি হইয়া লুঠ পাট করিবে, দাঙ্গা লড়াই বাধাইবে, স্ত্রী-পুত্রদিগকে প্রাণে মারিবে, যদি জয় করিতে পারে নূতন রাজ্য শাসনের জন্য না জানি কতই কঠোর নিয়ম স্থাপনা করিবে। কাজেই সেই বিপদ হইতে নিরাপদে থাকিবার জন্য রাজা রক্ষার প্রধান সহায় স্বরূপ সৈন্য রাখিবার নিমিত্ত পেটে না খাইয়াও তাহারা রাজার হস্তে অর্থ প্রদান করে। রাজা সেই অর্থেই সৈনিক বিভাগ রক্ষা করেন। সুতরাং সে অর্থ খরচের পূর্ব্বে রাজার বুঝা উচিত, তিনি যাহা ব্যয় করিবার কর্ত্তা বটে; কিন্তু তিনি প্রজাদিগের প্রতিভূ ভিন্ন আর কিছুই নন। অযথা দু টাকার স্থানে চারি টাকা ব্যয় করিয়া প্রজাদিগকে করভারে পীড়িত করিলে তিনি ধর্ম্মের নিকটে দায়ী।

ভারতের সৈনিক-বিভাগে আমরা এই নীতি-বহির্ভূত কার্য্য দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। ভারতরাজ সুসভ্য, ধার্ম্মিক ও ন্যায়বান্ বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, অথচ আজও তাঁহারা কিরূপে এমন অন্যায় কর্ম্ম করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারি না। ভারতের প্রজা দীনহীন দরিদ্র, অথচ তাহাদিগের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না! রাজা যে কর চাহিতেছেন, নীরবে তাহাই দিতেছে,—সৈন্য রাখিবার জন্য যে খরচ দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য তাহা সে জানে, নিজে এক সন্ধ্যা খাইয়াও সে ব্যয় দিতেছে। কিন্তু ইংরাজ সে টাকার ন্যায় ব্যবহার না করিয়া বাহুল্য খরচ করিলে সে কুলাইবে কেমন করিয়া? তথাপি কথা নাই। এক সন্ধ্যা খাইত, শেষ সেই এক সন্ধ্যা আধপেটা খাইয়াও কর দিল। ইংরাজ তথাপি ছাড়ে না, বলে—আরো দাও। কাজেই সে আধপেটা আহারও বন্ধ হয়। এদিকে ইংরাজ সেই প্রকার বুকের রক্ত-শোষা টাকায় আপনাদিগের জাতি-ভায়াদিগের উদর পূর্ণ করিতে লাগিল। ইহাই কি ইংরাজের উচিত?

ইংরাজ বলিবেন, 'যখন জান, সেনা নহিলে রাজ্য রক্ষা হয় না, তখন তাহার জন্য খরচ না করিলে চলিবে কেন?' খরচ করিতে তো কেহ বারণ করিতেছে না।

তাহাতে শুধু রাজার কেন, যে প্রজা স্ত্রী পুত্রকে পেটে মারিয়া কর দিতেছে তাহারও স্বার্থ আছে। যাহা ন্যায়ের কথা, যাহা মহিলে নয়, তাহাতে কে আপত্তি করিবে? কিন্তু ইংরাজ যদি বুঝিতেন, যদি সে অর্থের ন্যায় ব্যবহার করিতেন, ভারতের সৈনিক বিভাগে যাহা ন্যায্য খরচ তাহাই যদি প্রজাদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে আর এ আর্ত্তনাদ উঠিত না; প্রজারা যেন নির্ব্বাকে যাহা বলিতেছে তাহাই শুনিতেছে, কিন্তু তাহা হইলে আর মর্ম্মের ভিতর হইতে এরূপ দীর্ঘ নিশ্বাস বহিত না। ইংরাজের ভারতীয় সেনা বিভাগে ব্যয় অতি বিচিত্র। ভারতে সর্ব্বশুদ্ধ তাঁহাদের ১ লক্ষ ২০ হাজার ৪৭৬ জন সেনা আছে। ইহার মধ্যে গোরা ৬৩ হাজার ৭১ জন, আর নেটিভ ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৪০৫ জন। যথা—

	গোরা	নেটিভ
গোলন্দাজ—	১১৩২৯	১৮৬১
অশ্বারোহী—	৪৬৯২	১৮৫৭৫
ইঞ্জিনিয়ার—	২৮৪	৩২৫১
পদাতি—	৪৬৭৬৬	১০৬৭১৮
	৬৩০৭১	১২৭৪০৫

দেখা যাইতেছে, দেশীয় সৈন্য সংখ্যায় অধিক,—বৃটীশ সৈন্যসংখ্যার দ্বিগুণ। সকল শ্রেণীতেই দেশীয় সৈন্য বেশী, কেবল গোলন্দাজ শ্রেণীতে কম। ৫ গুণেরও অধিক কম হইবে। দেখিবামাত্র হঠাৎ মনের ভিতর কেমন একটা কারণ জানিবার জন্য ঔৎসুক্য হয়। দেশীয়গণ কি তবে ভাল গোলন্দাজ হইতে পারে না? ইংরাজ এতদুত্তরে যাহাই বলুন, কিন্তু কথাটা মনে লাগে না। বুঝি, আর কোন গূঢ় কারণ আছে। সিপাহী-মিউটিনীর পূর্ব্বে সৈন্য-তালিকা এরূপ ছিল না। তখন দেশীয় গোলন্দাজই বেশী ছিল। কিন্তু এখন তাহার এরূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে কেন? কামান ইংরাজের বজ্রাস্ত্র, সেই কামান চালান ইংরাজ সহজে অন্যকে শিখাইতে চাহে না। সিপাহীবিদ্রোহ হইতে ইংরাজের এই জ্ঞান জন্মিয়াছে। বুঝি, তাই গোলন্দাজ শ্রেণীতে দেশীয়দিগের সংখ্যা এত কম হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সে কথা থাক। এক্ষণে দেখা যাউক, ভারতের এই ১ লক্ষ ২০ হাজার ৪৭৬ জন সেনার খরচ কত পড়ে। যাহা পড়ে তাহা অবশ্য সমস্তই ভারতকেই দিতে হয়, ইংলণ্ড তাহার এক কার্ত্তিও দেন না। ভারতকে এই জন্য বৎসরে ২০ কোটী টাকা যোগাইতে হয়। একি সাধারণ কথা! শুনিলে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতে হয়, এই ২০ কোটী টাকার মধ্যে মাত্র পাঁচ কোটী টাকা ১ লক্ষ ২৮ হাজার নেটিভ সৈন্যের জন্য খরচ হয়, আর বাকি ১৫ কোটী ৬০ হাজার গোরা সৈন্যের সেবায় ব্যয়িত হয়। ভগবান্ জানেন, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে!

বলিবে, বৃটীশ সেনা রাখিতে সহজেই বেশী খরচ পড়ে। অন্যান্য য়ুরোপীয় রাজ্যের মত বৃটনে সৈন্য-সংগ্রহের সুবিধা নাই। অন্যান্য দেশে রাজা যাহাকে ইচ্ছা পল্টনে ভর্ত্তি করিতে পারেন, কিন্তু বৃটীশ পার্লেমেণ্ট এ ক্ষমতা হইতে রাজাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। কাজেই সৈনিক সংগ্রহ করিতে সেখানে বেশী অর্থের প্রয়োজন হয়। ইংলণ্ড হইতে ভারতে

সৈন্য পাঠাইতেও অল্প খরচ নয়। উত্তম কথা। কিন্তু কথাটা কি, এত খরচ পত্র করিয়া বৃটীশ সৈন্য নাই বা পাঠাইলে। ভারতে যে বৃটীশ সৈন্য আছে সে তো কেবল সম্ভ্রমের ঠাট মাত্র। একটা কথা আছে—কাজে কুড়ে ভোজনে দেড়ে। ভারতের বৃটীশ সেনা অধিকাংশ তাহাই। কাজের বেলায় কেবল হাঁক ডাক সার, হাতে হেতেড়ে বড় একটা সহজে কিছু হইয়া উঠে না, অথচ এক একজন এক একটী কুম্ভ-কর্ণের উদর লইয়া বসিয়া আছেন; সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতেছেন, তথাপি কিছুতেই পেট ভরে না। শীতের প্রবল উত্তুরে বাতাসে, বর্ষাতে ভীষণ বর্ষাবাতে, নিদাঘের অনল-বর্ষী খররৌদ্রে অনাহারে বা কদন্ন ভোজনে প্রাণান্তিক কষ্ট সহিবার বেলা নেটিভ, আর পুরস্কার ও বাহবা লইবার সময় গোরার দল। যুদ্ধ করিতে, তোপের মুখে যাইতে, মরিতে আগে কালা সম্প্রদায়, আর উপাধির বেলা রবার্টসের দল। তাই বলিতেছিলাম, এ বৃটীশ সৈন্য রাখিয়া সম্ভ্রমের ঠাট বজায় রাখিবার কি প্রয়োজন? রাখিতে হয়, রাখ; কিন্তু তাহার জন্য দরিদ্র প্রজার কলিজার অধিক প্রিয় এত পরিশ্রমের অর্থ জোর করিয়া গ্রহণ করা কি রাজধর্ম্ম? তোমাদের কটা যুদ্ধ তোমরা বৃটীশ সৈনিকের রণকুশলতায় জিতিয়াছ? আজ তোমরা কেন, যদি ভারতের সৈনিক তোমাদিগের জন্য অস্ত্র না ধরিত, তোমার ক্লাইভ কি কখন এখানে স্থান পাইতেন? তার পর, এত দিন ধরিয়া তো দেশীয় সৈনিকের বল ও সমরপটুতা দেখিলে, সে দিনের মিসর-যুদ্ধে কি হইল? ভারতের সৈনিক সেই বিরাটীয় ভূমে কি অপূর্ব্ব কীর্ত্তি প্রচার করিয়া আসিল? অন্যে নয়—তোমাদিগেরই জেনেরাল তাহাদের কত প্রশংসা গাহিলেন, মহারাণীও কত সাধুবাদ করিলেন,—তবে দেখিয়া শুনিয়াও কি ইহাদের বলে সন্দেহ হয়? ভারতে এত বায়ে বৃটীশ সৈন্যের কিসের প্রয়োজন?

তবে একটা কথা আছে। সকল দিক্ ঘাট ঘাট বাঁধিয়া কাজ করা উচিত। পরে পস্তান বড় দোষ। বলিবে, 'ভারতীয় সৈন্যের উপর এতই কি বিশ্বাস! তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া যদি বৃটীশ সৈন্য সব ছাড়াইয়া দিই, সুযোগ, তার পর যদি ভারতীয় সৈনিকেরা বিপক্ষ হইয়া বসে, তখন উপায়? বিদেশ বিভূঁই—কে রক্ষা করিবে? শেষ সপরিবারে ভারত-সাগরে ডুবিয়া মরিতে হইবে, শ্বেত-দ্বীপে ফিরিয়া সে সংবাদ দিবার জন্যও এক প্রাণী থাকিবে না। বৃটীশ সৈন্য ছাড়াইয়া দিয়া এই সাত সমুদ্রপারে নিঃসহায় অবস্থায় থাকিব কোন্ যুক্তি-বলে? ইহাদের উপর এতই কি বিশ্বাস?' কথাটা তোমাদিগের পক্ষে সঙ্গত বটে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তোমরা কি আজও ভারতীয়দিগকে বিশ্বাস করিতে পারিলে না? তোমরা নাকি অকৃতজ্ঞ, তাই এ কথা বল, তাই ভারতবাসীর রাজভক্তিতে সন্দেহ কর। "মহতী দেবতাদ্বেষা নর-রূপেণ তিষ্ঠতি"—আমরা চিরকাল যাহারা এই কথা বলিয়া আসিতেছে তাহাদের রাজভক্তিতে সন্দেহ করিও না। এক দিন Nineteenth Century নামক কাগজে তোমাদেরই একজন স্বজাতীয়—মহামতি হাইওম্যান-তোমাদিগকে ভারতীয়ের অচলা রাজ-ভক্তির বিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অনেক

কথা বলিয়াছিলেন। বেশি দিনের কথা নয়, স্মরণ আছে তো? দুঃখ হয়, সে কথা আর তুলিয়া কি করিব? তোমরা কে—কোথায় ছিলে—সামান্য বণিক্ বাণিজ্য করিতে আসিয়া ভারতে কেমন করিয়া এ অটল রাজ্য স্থাপন করিলে—সে সব মনে পড়ে না কি? মনে পড়ে না কি, পাশীর সেই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র হইতে কি রাজপুতানায়, কি মহীশূরে, কি মারহাট্টাভূমে, কি পঞ্চনদে, সাগরে, ভূধরে, মরুভূমে যেখানেই তোমাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছে, সেখানেই ভারতীয়গণ কর্ত্তৃকই সে ধ্বজদণ্ড প্রোথিত হইয়াছে। অধ্যাপক সিলী (Seeley) যথার্থই বলিয়াছেন, ভারত ভারতীয় কর্ত্তৃকই বিজিত হইয়াছে। তবু—তবুও অবিশ্বাস! তবুও সন্দেহ!

ইংরাজ এক সিপাহীবিদ্রোহের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন। কিন্তু, মূলে সে দোষ কাহার? তোমরা আপনাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে—ভারতবাসীর যাহা প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়তর সামগ্রী সেই ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিবে—দোষ কাহার? কিন্তু তাও বলি, সে কটা রেজিমেণ্ট—কটা সিপাই ক্ষেপিয়াছিল? তাহাতেই যখন তোমরা পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়িয়াছিলে, আজও যখন তাহার শঙ্কা ঘুচে না, তখন এক লক্ষ ২৮ হাজারের কাছে তোমাদের ৬৩ হাজার কোথায় লাগিবে? সকলে মিলিয়া ফুৎকার দিলে ও মুষ্টিমিত সৈন্য কোথায় উড়িয়া যাইবে তাহা ভাবিয়াছ কি? মনে করিও না যে, তেমন দিন আসিলে উহারা তোমাদিগের শাসন অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে। কিন্তু সে জন্য তোমাদের নাই। ভারত সে দেশ নহে। ভারতীয়েরা তেমন জাতি নহে। তবে তোমরা নাকি শঙ্কা কর, সন্দেহ কর, অবিশ্বাস কর, তাহাই এ কথা বলিলাম। ভাল, তোমাদিগের ভিতরে ভিতরে যদি সেই ভয়ই থাকে, একটু স্থির হইয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে সে ভয়ের কোন কারণই দেখিতে পাইবে না সে যখন ছিল, তখন ছিল, এখন আর তাহা নাই। কেন নাই তাহা ভারতের সৈনিকদিগের অধুনাতন শ্রেণী ও অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেই সহজে স্পষ্ট বুঝা যায়।

মিউটিনীর পূর্ব্বে প্রায় এক দেশ ও এক জাতি হইতেই সৈন্য সংগ্রহ করা হইত। অযোধ্যা ও পঞ্জাবই তাহার প্রশস্ত ক্ষেত্র ছিল। হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবী ভিন্ন অন্য জাতীয় সৈন্য প্রায় ছিল না। কিন্তু এখন আর সে ব্যবস্থা নাই। এখন, নানা জাতি হইতে সৈন্য সংগৃহীত হইয়া থাকে। এক রেজিমেণ্টে চারি পাঁচটী ভিন্ন ভিন্ন জাতি দেখা যায়। এক বেঙ্গল আর্মির পদাতি দল আট কোম্পানি, এবং অশ্বারোহী দল আট স্কোয়াড্রণে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগ স্বতন্ত্র জাতি লইয়া গঠিত। শিখ, পাঠান, পঞ্জাবী, মুসলমান, হিন্দুস্থানী, গোর্খা, এবং ওরধা—এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতিতেই আজিকার সৈন্য-অঙ্গ সংগঠিত। ইহাদের দেশ স্বতন্ত্র, ধর্ম্ম স্বতন্ত্র, প্রকৃতি স্বতন্ত্র। এক জাতি অন্য জাতিকে হিংসা করে, এক জাতি অন্য জাতিকে কাফের বলিয়া ঘৃণা করে, এক জাতি অন্য জাতির ছায়া মাড়াইলেও আপনাকে অপবিত্র জ্ঞান করে। কেহ কাহারও অনুরক্ত নহে, কেহ কাহারও মতানুবর্ত্তী নহে, কেহ কাহারও মঙ্গল প্রার্থী নহে। সবাই বিধর্ম্মী, বিজাতি,—

মত, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যে পরস্পর-বিরোধী। কখনও এই সকল জাতি যে এক হইয়া, এক মন্ত্র সাধনা করিয়া, এক উদ্দেশ্যে প্রাণ ঢালিবে সে আশাও নাই, সে ভরসাও নাই, সে ভয়ও নাই। তবে, কেন তোমরা ভীত হও, কেন তোমরা সন্দেহ কর? আর, তোমরা এত বৃদ্ধ, সত্যই কি তোমরা এই সহজ কথাটা বুঝিতে পার না? পার বৈ কি। তবে কথাটা এই, যে, ত্রিশ কোটী সৈন্য রাখিতেই হইবে ভারতের টাকায়, যেমন করিয়া হউক, স্বজাতির উপর খাটাইতেই হইবে। তবে লোকে বলিলে তাহার একটা জবাব দেওয়া ত চাই। ও ভাই! কথার কথা—স্তোকবাক্য—ছুতা!

[ক্রমশঃ

দুইখানি ছবি।

(১)

অশ্রু-প্রস্রবণ। *

যুবার আকৃতি অশ্রু-প্রস্রবণে
হইতেছে পরিণত,
যুগল নয়নে উথলিত ধারা
ধীরে ধীরে প্রসারিত,
ললাট ভ্রূণ মস্তক কুন্তল
হয় নাই চিহ্ন-হারা,
অবশিষ্ট দেহ হ'য়ে বিগলিত
হইয়াছে অশ্রুধারা;
সম্মুখে দাঁড়ায়ে বিহ্বল আকার—
রমণী যুবার চেয়ে,
বিস্ময়ের সহ উথলি সলিল
বিন্দু বিন্দু গণ্ডে ঝরে॥

চিত্র তলে লেখা—
"কাঁদালে কাঁদিবে হাসালে হাসিবে
বিধাতার নিবন্ধন;
স্নেহে অনাদর করিলে কি দশা
হের অশ্রু-প্রস্রবণ॥"

(২)

বিশাল প্রান্তর জ্যোতি বিভাসিত
মধ্যস্থলে বসি তার,
কবি গাহে গান আপনার মনে
স্তব্ধ বিশ্ব চারি ধার,
শুনিতে সে গান রবি শশী তারা
তড়িৎ জলদ রাশি
নামি শূন্য হ'তে কবির চৌদিকে
ফিরিছে রয়েছে ভাসি;
ছায়ার আকারে কানন ভূধর
সাগর তটিনী সর—
দেশ মহাদেশ কুটীর প্রাসাদ
কীট পশু পক্ষী নর
বেষ্টিয়া কবিরে ভাসে শূন্যপটে
যেন অচেতন প্রাণ,
বসি তার মাঝে আপনার মনে
কবি গাহে প্রেম-গান।

ঈশান।

---

* Ovid's Metamorphoses অনুকরণে লিখিত।

পিয়ারা বেগম।

উদ্যানে চাঁদ উঠিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে, লতা দুলিতেছে, নদী হাসিতেছে—বৃক্ষে বৃক্ষে, লতায় লতায়, প্রাণে প্রাণে হাসি মিশাইয়া গিয়াছে। যেন সুদূর হইতে কাহার হাসি গড়াইয়া আসিয়া সর্ব্বে তাপিতের প্রাণ শীতল করিতেছে, মেঘ মন্দ মন্দ ভাসিয়া যাইতেছে, চকোর উধাও হইয়া তাহার সুধা পান করিতেছে। সুদূর শূন্য হইতে যেন কিসের ঢেউ উঠিয়াছে,—বুঝি স্বর্গের বাতাস বহিতেছে! এক দিক হইতে একটি পুরুষ ও অপর দিক হইতে একটি রমণী আসিয়া সেই খানে দাঁড়াইল। হাতে হাত দিয়া, গাছের তলায়, পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল,—লতাগুলি ঝুলিয়া পড়িল, ফুলগুলি ঝরিয়া পড়িল, রমণীর চিকুরদাম বাতাসে উড়িতে লাগিল,—তাহার পর—তাহার পর, উভয়েই ধীরে ধীরে কোথায় চলিয়া গেল।

* *

আমাতে ও সুরৎমলে খুব ভাব। ছেলেবেলা হইতে এক সঙ্গে খেলা, এক সঙ্গে বসা, ও এক সঙ্গে পড়াশুনা হইত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অনেকে বাল্যকালের সরলতা হারাইয়া ফেলে--কিন্তু আমাদের তাহা আদৌ ঘটে নাই। সজীব, অথচ লতাপূর্ণ দুইটী সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলের মত চিরদিনই হাসিয়া বেড়াইতাম। আমার পিতা ও সুরতের পিতা পরস্পর মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ। সুতরাং তাঁহারা আমাদের পরস্পরের এই মিলনে সাতিশয় আনন্দিত হইতেন। আমি কোন দিন সুরতের মাতাকে 'মা' বলিয়া তাঁহার কোলে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিতাম, সুরৎও সেইরূপ কতদিন আমার মাতার কোলেতে শয়ন করিয়া রাত্রি কাটাইত। তাহাতে উভয় জননীরই যে কি আনন্দ হইত, তাহা আর কি বলিব! কেহই মনে করিতেন না যে, এটী আমার ছেলে ও ওটী পরের ছেলে। দিন যাইতে লাগিল। ক্রমে আমরা বড় হইলাম।

২

মুসলমান রাজত্বে আমাদের বাস। আমাদের উভয়ের পিতাই আওরঙ্গজীবের অধীনে ক্ষুদ্র জাইগীরদার, প্রজা। ষোল বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে আমাদের জনকদ্বয় আমাদিগকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। আমরা ঢাল, তলওয়ার, বর্ষা, সড়্‌কি প্রভৃতি মহোল্লাসে শিক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্রমে মাল, কুস্তি, মল্লযুদ্ধ সবই অভ্যস্ত হইল। আমাদের রণখেলা দেখিয়া দর্শকগণ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, সকলেই একবাক্যে আমাদের প্রশংসা করিত, তাহা শুনিয়া গুরু হৃষ্টচিত্তে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেন। বিশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়েই আমরা উভয়েই অসাধারণ সাহসী ও বলবান বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিলাম। আমাদের বীরত্বে ও রণোল্লাসে বাদশাহ পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

৩

দুই চারি দিনের মধ্যেই গোলকুণ্ডা দেশের রাজার সহিত বাদশাহের যুদ্ধ। সুরৎ ও আমি উভয়েই সেই যুদ্ধে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। আমি আমার পিতার মত করিলাম—কিন্তু সুরতের পিতা নিষেধ করিলেন, "এ যুদ্ধে তোমরা যাইতে পাইবে না।" পরে সুরতের পিতার দেখাদেখি আমার পিতাও আমাকে কি ভাবিয়া যাইতে দিলেন না। আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না,—বোধ করি আমরা উভয়েই পিতার এক মাত্র সন্তান বলিয়া তাঁহারা কিসের একটা আশঙ্কা করিলেন।

৪

আমি নিবৃত্ত হইলাম, কিন্তু সুরৎ কিছুতেই শুনিল না। রাত্রি প্রভাতে বাদশাহের সৈন্য যুদ্ধার্থে কুচ করিবে,—সন্ধ্যার পর আর সুরৎকে কেহ দেখিতে পাইল না।

৫

অনেক অনুসন্ধান হইল। সমস্ত রাত্রি সকলে মিলিয়া খুঁজিয়া বেড়াইলাম। সুরতের পিতা, আমার পিতা, অনুচরবর্গ এবং আমি নানা স্থান অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু সুরতকে কোথাও পাওয়া গেল না। আমি বাদশাহের সৈনিকনিবাসে গিয়া ভাল করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসাবাদ করিলাম, তথাপি কেহই কোন খবর বলিতে পারিল না। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল, বাদশাহের সৈন্য রাজপথ জুড়িয়া খুব ঘোরঘটা করিয়া বীরদর্পে চলিয়া গেল। জগতের অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া প্রাতঃসূর্য্য ধীরে ধীরে বড় বড় অট্টালিকার পার্শ্ব হইতে উত্থান করিতে লাগিল। মৃদু মধুর বাতাস বহিতে লাগিল। শেষ আমরা শূন্যমনে প্রান্ত ক্লিষ্ট হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

হায়! সুরতের মাতার শোকের কথা আর এখন কেমন করিয়া বর্ণন করিব? —মাগী বুঝি তখন যথার্থই পাগল হইয়া গিয়াছে তাহার আর অন্য কথা নাই, অন্য কার্য্য নাই,—কেবল হা সুরৎ! হা সুরৎ!—চোকের ধারার বিরাম নাই, বুকে করাঘাতের নিবৃত্তি নাই! আমার মাতা অনেক সান্ত্বনা করিলেন, আমিও গিয়া কত বুঝাইলাম। শোকাতুরা কিছুতেই মানিল না। তাহার কাতরতা ও দীর্ঘ নিশ্বাসে সকলেরই চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল।

৬

তাহার পর সাত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। পিতা মাতার চক্ষের ধারা এক প্রকার শমিত হইয়া গিয়াছে,—আর কে কত ঢালিবে বল? প্রকৃতির এক দিক দিয়া ফুল ঝরিয়া পড়িতেছে, আবার অন্য দিক দিয়া সেইখান হইতেই নূতন নবীন ফুল ফুটিয়া উঠিতেছে। নহিলে পৃথিবী বাঁচিবে কি প্রকারে? দুঃখ রোগ শোক চারিদিকে, প্রতিপদে মৃত্যু আসিয়া গ্রাস করিতেছে—এখানে এক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিলে, প্রকৃতির চিরগঠনশীল হস্তের ক্ষণ মাত্র বিরাম পাইলে, হয়ত এতদিন আমরা কোথায় সরিয়া পড়িতাম! তিল তিল করিয়া অণু পরমাণু হইতে একটী জীব সৃজিত হইতেছে, তিল তিল করিয়া এক একটী অণু পরমাণু মধ্যেই আবার তাহা কোথায় মিলাইয়া, মিশাইয়া যাইতেছে! আমি ঘরে বসিয়া একখানি পার্শি কাব্য-

গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলাম, তাহার দুই ছত্র বাঙ্গালায় অনুবাদিত করিলাম,—

'কোথা নয়, চিত্র নয়, সকলি মোহের ভুলে—
আজি বা দুদিন বাদে রহিবে মাটির তলে।'

এমন সময়ে সেখানে কে আসিয়া দাঁড়াইল! ঘোর কালো ছায়ার মত একটী মনুষ্যাবয়ববিশিষ্ট আকৃতি আসিয়া উপরোক্ত দুই ছত্র কবিতার উদ্দেশ্যে বলিল,—

"ঠিক কথা, কিন্তু বন্ধন যে ছিঁড়িবার নয়!"

আমি চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলাম—সুরৎ!—হাঁ সুরতই ত বটে!—সুরৎ! সুরৎ!—আমি আর কথা কহিতে পারিলাম না! কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! সে শরীর নাই, সে কান্তি নাই—সে তেজঃগর্ব্ব-বিস্ফারিত চক্ষু যেন চিরদিনের মত অন্ধকারে লীন হইয়া গিয়াছে—দেহ অস্থি-চর্ম্মমাত্রসার! কি পরিবর্ত্তন!

৭

সুরৎ আসিয়া আমার পার্শ্বে উপবেশন করিল। আমি তখন প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহাকে নানা প্রশ্ন করিলাম। 'আমাদের ফেলিয়া এতদিন কোথায় গিয়াছিলে?'—এতদিন পরে কি মনে পড়িল?—আর, তোমার এ অবস্থাই বা কেন?'

সুরৎ কোন কথাই কহিল না, কেবল স্থির নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টিতে কোন লক্ষ্য নাই, কোন ভাব নাই, কোন ভাষা নাই। স্থির অবিচলিত দৃষ্টিতে কেবল অনন্ত অন্ধকার বিরাজ করিতেছে।

আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া সুরতের পিতা মাতাকে খবর দিলাম। তাঁহারা শুনিবামাত্র ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু হায়! বৃদ্ধ জনক জননী প্রত্যাশা করিতেছিলেন এক,—দেখিলেন আর! সে মূর্ত্তি দেখিয়া হতভাগিনী জননী আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না—উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল।

৮

সন্ধ্যার পর উষা, উষার পর সন্ধ্যা পর্য্যায়ক্রমে আসিতেছে, আবার চলিয়া যাইতেছে,—সুরৎ এখন বাটীতেই বাস করে। আর কোথাও চলিয়া গেল না বটে, কিন্তু দিন দিন বড় কৃশ ও ক্ষীণ হইতে লাগিল।

ইহার কারণ?

আমি অনেক জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন উত্তর পাইলাম না, রোগও ত কিছু দেখিতে পাই না, তবে এ নির্জ্জীবতারই বা কারণ কি?

অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর আমি ভাবিলাম, একবার দেশ পর্য্যটন করাইয়া দেখি। নানা দেশ, নানা লোক এবং নানা জিনিষ দেখিয়া মন যদি একটু সুস্থ হইতে পারে। এ যে শারীরিক রোগ নয়, তাহা আমি এক প্রকার বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কেন না আমার মনে হইতেছে, সুরৎ প্রথমে আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াই বলিয়াছিল, "বন্ধন যে ছিঁড়িবার নয়!"

৯

সুরতের বন্ধন দড়ি কি, তাহা আমি ঠিক জানি না, তথাপি আমি এক প্রকার সিদ্ধান্ত করিলাম যে, ইহা প্রেম! নহিলে এমন সর্ব্বগ্রাসী, সর্ব্বসংহারকারী মূর্ত্তি আর কাহার? যে প্রেমের গুণে নদী বহিয়া যায়, ফুল ফুটিয়া উঠে, জ্যোৎস্নায় জগৎ

হাসিতে থাকে, সেই অসীম অনন্ত প্রেমের তলেই আবার নদীতে ঘোর তরঙ্গ উঠে, প্রকৃতির মধ্যে ভীষণ প্রলয়কল্লোল উত্থিত হয়, মহেশ্বরের দীর্ঘ জটাঘটায় চারিদিক সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

১০

যদিও সুরৎ আমাকে কিছুই ভাঙ্গিল না, তথাপি আমি সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সুরতের পিতার নিকটে নিঃশঙ্কচিত্তে দেশ পর্য্যটনের কথা পাড়িলাম। তিনি শুনিয়া সম্পূর্ণ মত করিলেন।

তাহার পর সুরৎকে সব কথা বলিলাম। শুনিয়া, সুরৎ একটু হাসিল। বলিল,—"কেন?"

আমি বলিলাম, "তুমি না বল, কিন্তু আমি এক প্রকার বুঝিতে পারিয়াছি। যাহার যেমন রোগ, তাহার তেমনি ঔষধও ব্যবস্থা।"

"বেশ।"

১১

অনেক দেশ পর্য্যটন হইল। শেষ ঘুরিতে ঘুরিতে দিল্লী সহরে আসিয়া পড়িলাম। মনে হইল, কিছুতেই ত কিছু হইতেছে না—শুনিয়াছি দিল্লীর অপেক্ষা প্রসিদ্ধ সমৃদ্ধিশালী নগর ত আর নাই, যদি এই স্থানে কোন রকমে সুরতের মন আকর্ষিত করা যায়!

সব বৃথা। দিল্লী সহরে পা দিয়াই সুরৎ বলিল, "আবার এখানে কেন? এখান হইতে শীঘ্র পলায়ন কর—শীঘ্র পলায়ন কর!"

আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, তথাপি দ্বিরুক্তি না করিয়াই তৎক্ষণাৎ অনুচরবর্গের সহিত সুরৎকে লইয়া দেশান্তরে চলিলাম।

১২

ঘোর বন। অনুচরগণ কেহই সঙ্গে নাই। কেবল সুরৎ আর আমি। ধীরে ধীরে পাখা পত্র সরাইতেছি আর অগ্রসর হইতেছি। সুরৎ পথপ্রদর্শক হইয়া অগ্রে অগ্রে চলিয়াছে, আমি তাহার পশ্চাদনুসরণ করিয়াছি।

কোথায়?

কেমন করিয়া বলিব, সে কোথায়! খালি জানি অসীম সাহস আর সম্মুখে আশার মরীচিকা! সুরৎ বলিয়াছে, আজ তাহার অধিষ্ঠাত্রীকে দেখিতে যাইতেছে।

১৩

আমি প্রথমে বিশ্বাস করি নাই—কেন না এ ঘোর বনে তাহার অধিষ্ঠাত্রী কেমন করিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ দেখিয়া আমার সমূহ কৌতূহলের উদ্রেক হইল। ভাবিলাম, যাইতেই বা ক্ষতি কি? নিতান্ত দুর্ব্বলকায় নহি যে, বন্য পশুতে ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে। রাজপুত—সশস্ত্রে আছি, তাহাতে ভীতিরই বা কারণ কি?

তাহার পর—চারি দিকে ফুল ফুটিয়াছে, প্রজাপতি বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যাইয়া উড়িয়া বসিতেছে, আর চতুঃপার্শ্বে সেই বনবৃক্ষ পরিবেষ্টিত নন্দনোপম ক্ষুদ্র মৃত্তিকাখণ্ড, দেবতাদিগের হাস্য-বিকসিত শুভাশীর্ব্বাদে যেন সিক্ত হইয়া গিয়াছে। কি শান্তি, কি মাধুরিমাই তথায় বিরাজ করিতেছে!

সেই ক্ষুদ্র মৃত্তিকাখণ্ডের মধ্যস্থলে অসীম আকাশের নীচে একটী গত-জীবন মানব-

শরীরের সমাধি জাগিতেছিল। তাহার দুই পার্শ্বে দুইটী বকুল গাছ—আপাদমস্তক পুষ্পে আচ্ছাদিত হইয়া রৌদ্রতাপ ও বর্ষার ঘোর বৃষ্টিপাত হইতে যেন সতত রক্ষা করিতেছে।

সেই সমাধির পার্শ্বে গিয়া সুরৎ উপবেশন করিল।

১৫

তখন, সুরৎ তাহার হস্ত হইতে একটী অঙ্গুরীয় খুলিয়া আমার হাতে দিল, বলিল, "এই অঙ্গুরীয় যাঁহার, তিনি এখন এই সমাধির তলে সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। আমিও শীঘ্র তাঁহার নিকটে গমন করিব। অতএব আমাদের প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ এই অঙ্গুরীয় তুমি রাখিয়া গেলাম—যত্নে রাখিও।"

তাহার পর সুরৎ ধীরে ধীরে সেই সমাধির তলে শয়ন করিল। কে জানে—সেই সময় বকুল গাছ হইতে ঝুর্ ঝুর্ করিয়া অনেক ফুল ঝরিয়া পড়িল—বুঝি দেবতারা তাহাদের উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।

আমি অঙ্গুরীয়টী হস্তে লইয়া পড়িয়া দেখিলাম—লেখা রহিয়াছে—

"পিয়ারা বেগম।"

শ্রীসুরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

ভৌতিক প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিক শক্তি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পরস্পর-বিরোধী তত্ত্ব সকলেরও সামঞ্জস্য হইতে পারে, এই কথাটি না বোঝাতেই Kantএর দর্শনের এরূপ অসম্পূর্ণতা আমরা দেখিতে পাই। এই জন্যই তিনি ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রভৃতি তত্ত্ব-যুগলের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ দেখিয়াও, তাহাদের পারস্পর্য্য সম্বন্ধ বুঝিয়াও, তাহাদের আভ্যন্তরীণ গূঢ় সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তাহাদের পরস্পর বিরোধী ভাবের প্রতি তিনি এতদূর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন যে, তাহাদের নিত্য সম্বন্ধ বুঝিয়াও তাহাদের গূঢ় সামঞ্জস্যের সম্বন্ধাতীত অদ্বৈত তত্ত্বের প্রতি সম্যক মনোযোগ দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। এই জন্যই তিনি তাহাদের মধ্যে কেবল একটা বাহিরের সম্বন্ধ দেখিয়াই তাহাদের একটা বাহ্যিক সামঞ্জস্য করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু এটা আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, জ্ঞান যদি বস্তু মাত্রেরই অস্তিত্বের সহিত জড়িত থাকে, যদি প্রাকৃতিক পদার্থ মাত্রেরই অস্তিত্ব বুঝিতে হইলে তাহাকে জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ বুঝিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদের সঙ্গে জ্ঞানের একটা বাহ্যিক বিরোধের সম্বন্ধ থাকিলে চলিতে পারে না। দেশ কালের অন্তর্গত একটা ভৌতিক পদার্থের সহিত আর একটা ভৌতিক পদার্থের যেরূপ সম্বন্ধ, জ্ঞানী আত্মা এবং জ্ঞেয় ভৌতিক পদার্থের মধ্যে যদি সেইরূপ কেবল মাত্র একটা বাহ্যিক সম্বন্ধ ব্যতীত আর শ্রেষ্ঠতর নিগূঢ়তর সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে সেই সম্বন্ধ কখন জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারিত না। একটা পদার্থের

সহিত আর একটা পদার্থের যে সম্বন্ধ লক্ষিত হয় তাহা উক্ত পদার্থ দ্বারা কেহই জানিতে পারে না—সে সম্বন্ধ কেবল তাহাদের অতীত, তাহাদের বিরোধের অতীত—অপর এক জ্ঞানের পক্ষেই সম্ভব। আমরা অবশ্য এক ভাবে জগতের অন্যান্য অসংখ্য সত্তার মধ্যে একটী মাত্র সত্তা। এক ভাবে অবশ্য আমরা জগতের দেশ কালের অন্তর্গত প্রাকৃতিক পদার্থ বিশেষ ব্যতীত আর কিছুই নহি, সুতরাং এদিক দিয়া দেখিলে জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতার মধ্যে পদার্থের সহিত পদার্থের সম্বন্ধ অপেক্ষা গূঢ়তর উচ্চতর সম্বন্ধ কিছুই দৃষ্ট হয় না। কিন্তু Kantএর কথা যদি আমরা প্রকৃত ভাবে বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহা দ্বারা ইহাই বুঝিয়াছি যে জ্ঞের আত্মার জীবন কেবল এই টুকু দেখে নিঃশেষিত হয় না, প্রত্যুত তাহার একটা উচ্চতর স্বভাব আছে, যে স্বভাবে সে দেশ কালাতীত পুরুষ হইয়া, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতার অতীত হইয়া, তাহাদের সম্বন্ধের ভিত্তি স্বরূপ অবস্থান করে। আত্মার এই স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য করিলে আমাদের প্রতীতি হইবে যে আপাততঃ জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের মধ্যে একটী বিরোধের সম্বন্ধ লক্ষিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহাদের বিরোধ জ্ঞানেরই অন্তর্গত। জ্ঞেয় পদার্থ সকল সহজ দৃষ্টিতে জ্ঞাতার বিরোধী তত্ত্ব হইলেও, তলাইয়া দেখিলে, তাহারা জ্ঞাতারই জীবনের অভ্যন্তরে নিহিত। আত্মার যে স্বভাবটি দেশ কালের অন্তর্গত পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির অধীন সেইটুকুকে বুঝিতে হইলেও আত্মার উচ্চতর স্বভাবের সাহায্যে—তাহারই আলোকে বুঝিতে হইবে।—প্রকৃত জ্ঞানের আলোকে নিহিত থাকিয়া, তাহারই গভস্থ হইয়াই জ্ঞেয় পদার্থ সকল আপনাদের অস্তিত্ব লাভ করিতেছে। স্বাধীনতা ও নিয়ম প্রভৃতি আমাদের আলোচ্য অন্যান্য তত্ত্বমিথুনের সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার যুক্তি অবলম্বন করিলে ইহাই প্রতীত হইবে যে তাহাদেরও মধ্যে এইরূপ একটা সামঞ্জস্যের ভিত্তি আছে।—ইহাদের মধ্যে যে বিরোধের সম্বন্ধ আছে সেটি অবশ্য আমাদের দৃঢ়ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা আগে দরকার, কারণ এই বিরোধেই তাহাদের অস্তিত্ব; কিন্তু তাই বলিয়া যদি কেহ বলিয়া বসেন যে তাহাদের একেবারে কোন রূপ সামঞ্জস্য নাই, তাহা হইলে যে কেবল তাহাদের কোন সামঞ্জস্য নাই এই কথাই প্রমাণ হয় তাহা নয়, অধিকন্তু সেই সঙ্গে সেই বিরোধেরও অস্তিত্ব নষ্ট হইয়া যায়। Kant প্রমাণ করিয়াছেন এই সকল তত্ত্ব-মিথুনের মধ্যে নিত্য বিরোধের সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু কেবল যদি বিরোধেরই উপর নির্ভর করা যায় তাহা হইলে তাহাদের নিত্য সম্বন্ধটুকুও চলিয়া যায়। সুতরাং সেই সম্বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে বিরোধও চলিয়া যায়। যাহার মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই, তাহাদের মধ্যে বিরোধ-সম্বন্ধও থাকিতে পারে না। শত্রুর সহিত বিবাদ করিতে করিতে যদি আমরা এরূপ প্রতিজ্ঞা করি যে, সে যে দেশে থাকিবে আমি সে দেশে পর্য্যন্ত থাকিব না, তাহা হইলে তাহার সহিত যে কেবল আমার সকল প্রকার সদ্ভাবের সম্ভাবনা চলিয়া যায় এরূপ নয়—বস্তুতঃ সেই সঙ্গে সঙ্গে সকল বিরোধও চলিয়া যায়। আমরা যে ভূমির উপর দাঁড়াইয়া ঝগড়া করি সে ভূমিটুকুও যদি আমা-

দের সাধারণ ভিত্তি না হয়, তাহা হইলে আমাদের বিবাদের অস্তিত্ব অসম্ভব। বস্তুতঃ সকল বিবাদেরই একটা সীমা থাকা আবশ্যক; এমন একটী গণ্ডি থাকা দরকার যাহার বাহিরে গেলে আর বিবাদ থাকে না। ধনুকের কাষ্ঠখানাকে বক্র করিতে করিতে এমন একটা অবস্থা আসে যেখানে আরও বক্র করিতে গেলে ধনুক গাছটি ভাঙ্গিয়া যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার বক্রভাবেরও ধ্বংস হয়। সুতরাং Kant-এর মতে তিনি ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক নিয়ম এবং স্বাধীনতা প্রভৃতি তত্ত্ব সকলের মধ্যে নিত্য বিরোধের সম্বন্ধ স্বীকার করেন, তাঁহাকে দেখাইতে হইবে যে তাহাদের বিরোধ সত্ত্বেও তাহাদের নিত্য সম্বন্ধের ধ্বংস নাই, এবং উহাদের মধ্যে একটি অপরটির বিরোধী হইলেও একটি অপরটির অন্তর্গত। তাঁহাকে দেখাইতে হইবে যে ভৌতিক জগৎ আপাততঃ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিরোধী হইলেও বস্তুতঃ তাহাতেই তাহার অস্তিত্ব এবং জীবন; দেখাইতে হইবে যে স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে নিয়ম স্বাধীনতার সম্পূর্ণ বিরোধী হইলেও, স্বাধীনতার প্রকৃত বিকাশ নিয়মেরই রাজ্যে এবং নিয়মের প্রকৃত অর্থ স্বাধীনতারই মধ্যে। মূল কথায় বলিতে গেলে ইহাই প্রমাণ করিতে হইবে যে, জ্ঞান যে কেবল জ্ঞেয় বিষয়ের বিরোধী তত্ত্ব তাহা নয়, বস্তুতঃ সেই জ্ঞান জ্ঞেয় বিষয় সকলের আধার এবং বিকাশভূমি। Kant ইহাদের পরস্পরের নিত্য সম্বন্ধ দেখিয়াও তাহাদের গূঢ় সম্বন্ধ দেখেন নাই। দেখেন নাই যে ইহাদের জীবন এভাবে সংশ্লিষ্ট যে একটিকে ছাড়িলে অপরটির জীবন শূন্য, তাহাদের অস্তিত্ব কল্পনার ছায়ায় পরিণত হয়। Kant বুঝাইয়াছেন যে জ্ঞানবিযুক্ত বিষয় আমাদের বোধগম্য হইতে পারে না। কিন্তু এটিও ঠিক যে বিষয়বিযুক্ত বিষয়ী, জ্ঞেয় পদার্থশূন্য জ্ঞানও তদ্রূপ কাল্পনিক অস্তিত্ব মাত্র। অস্তিত্ব অর্থে যেমন জ্ঞেয় বুঝিতে হইবে, সেইরূপ জ্ঞান বলিলেই একটা কিছুর জ্ঞান বুঝিতে হইবে। আত্মজ্ঞানের পক্ষে যেমন ইদংজ্ঞান দরকার, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞান এবং প্রেমবিকাশের জন্যও বাসনা রাজ্যে নিয়মের কঠোর শাসন অবশ্য প্রয়োজনীয়। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও আমরা বুঝিতে পারি যে প্রেম বৈরাগ্যময় স্বাধীনতা আপাততঃ বাসনার কঠোর নিয়ম শাসনের বিরোধী হইলেও—আংশিক ভাবে ইহারা পরস্পরের বিরোধী হইলেও—ইহারা কখনই সম্পূর্ণরূপে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।

এই সকল তত্ত্বমিথুন যদি প্রকৃত পক্ষে কোনরূপেই পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে না পারে, তাহা হইলে ইহাদিগকে বিভিন্ন তত্ত্ব বলিবার অধিকার কোথায় আর রহিল। যখন দেখিতে পাইতেছি একখান চালের একটী দিক ছাড়িলে অপর দিক থাকিতে পারে না; তখন তাহার দুদিকে দুরকম বাঁধ দেওয়া থাকিলে সেই দুটা দিককে দুইটা বিভিন্ন বস্তু মনে করা কোনরূপে সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। একটা জিনিষেরই দুইটী দিক মাত্র। সেইরূপ এই সকল তত্ত্বমিথুনকেও বিভিন্নরূপযুক্ত একই তত্ত্ব বলি না কেন? প্রত্যুত আধ্যাত্মিক এবং ভৌতিক স্বাধীনতা এবং নিয়ম প্রভৃতি তত্ত্ব সকলের বিভিন্ন বিভিন্ন ক্ষেত্র কোথায়ও নাই। আধ্যাত্মিক জগৎ এই দৃশ্যমান প্রকৃতির অপর দিক মাত্র; এবং স্বাধীনতা নিয়মেরই অপর পৃষ্ঠা মাত্র।

অথবা এ কথাও বলা যাইতে পারে একই জিনিষকে বিভিন্ন প্রণালীতে পাঠ করিলে যেরূপ বিভিন্ন অর্থ বোধ হয় এখানেও সেইরূপ। প্রকৃতিকে যখন কেবল এক-দেশদর্শী বিজ্ঞানের চক্ষে পাঠ করি তখন বোধ হয় এই প্রকৃতি কেবল অহরহঃ পরি-বর্ত্তনশীল শতধা বিখণ্ডিত অসংখ্য শক্তির সমাবেশ মাত্র—আত্মার স্বাধীনতা আমাদের সীমা স্বরূপ এবং আমাদের বন্ধন রজ্জু স্বরূপ বিরাজ করিতেছে। আবার যখন দর্শনের উচ্চতর ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া পূর্ণতর জ্ঞানের আলোকে প্রকৃতির বিশাল বক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখন বুঝিতে পারি যে এই প্রকৃতি আত্মার লীলাভূমি, তাহারই বিকাশক্ষেত্র মাত্র। প্রকৃতির নিয়ত-বিরোধী ক্রিয়া সকলকে তখন আত্মার বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় ক্রিয়া বলিয়া মনে হয়! মানুষের জীবনের প্রতি একভাবে দেখিলে মনে হয় যে ইহা একটি ঘোর সংগ্রাম-ক্ষেত্র মাত্র। মনে হয় মানুষ বুঝি কেবল অসংখ্য প্রাকৃতিক শক্তির শিখরে পরিবর্ত্তনশীল গতির বিরুদ্ধে বিবাদ করিতেই জন্মিয়াছে। এই ভাবে প্রকৃতির ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ধার্ম্মিক ব্যক্তির মনে ভীতির সঞ্চার হয় এবং এই সংযমী ব্যক্তিরা এই রক্তমাংসময় শরী-রকে ও নানাপ্রলোভনপরিপূর্ণ সংসারকে আপনার পরম শত্রু বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায়, এই সকল ঘটনাকেই আবার অন্য আলোকে পাঠ করিলে প্রতীয়মান হয় যে এই জীবন সংগ্রামের শত্রু জিত হইবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে? এই শত্রু জিত হইবেই হইবে এই বিশ্বাসেই এ সংগ্রামের জন্ম এবং এই বিশ্বাসেই জয় লাভের সম্ভাবনা। প্রত্যুত প্রকৃতিকে জয় করিয়া তাহার উপর আধি-পত্য করিয়া আত্মার জীবনের বিকাশেরই জন্য ইহার সৃষ্টি। পূর্ণতর জ্ঞানের আলোকে দেখিলে বুঝিতে পারিবে এই জীবন-সংগ্রাম কোন বিপরীত শক্তির সহিত নয়—প্রত্যুত এ সংগ্রাম আত্মার নিজেরই সঙ্গে; ঐ শত্রু নিজেরই ভিতরে অবস্থিত আর এ সংগ্রামের আঘাত প্রতি-ঘাত জনিত যে কষ্ট সে কষ্ট আত্মার বিকাশের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং অবশ্যম্ভাবী শুভফলপ্রসূ যন্ত্রণা।

আমরা যে তত্ত্বটি বুঝাইতে চেষ্টা করি লাম, সেটা ভাল করিয়া না বুঝিতে পারিলে লোকে সাধারণত দুইটি অপমীমাংসায় উপনীত হয়। আত্মা এবং জড়জগতের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিতে, তাহাদের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ দেখিতে গিয়া হয়ত কেহ কেহ আত্মার উপর এতটা জোর দিতে পারেন, যে জড়জগতকে আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত আত্মার বিকাশভূমি বলিতে গিয়া বলিয়া বসেন যে আত্মাই একমাত্র সৎ বস্তু, জড়জগৎ কেবল বিকারগ্রস্ত আত্মার স্বপ্নময় অসৎ কল্পনা মাত্র। আত্মা জড়ের অপেক্ষা মহত্তর তত্ত্ব; অথবা জড়-জগৎ এক ভাবে আত্মার জীব-নের অন্তর্গত এ কথা বলিতে গিয়া হয়ত জড়-জগতের নীচতর অস্তিত্বের প্রতি সম্যক মনোযোগ না দেওয়া হইতে পারে, তাহার অস্তিত্ব আত্মার অন্তর্গত এ কথা বলিতে হয়ত কেহ বলিতে পারেন যে জড় জগৎ নাই—সে কেবল বিকার-প্রণোদিত অবাস্তব ছায়া মাত্র! অথবা আত্মা এবং ভৌতিক প্রকৃতির মধ্যে উভয়ের

কাহাকেও প্রাধান্য না দিয়া উভয়েরই অতীত অদ্বৈত তত্ত্বের উপর এতটা জোর দেওয়া যাইতে পারে যে সমগ্র প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ অর্থশূন্য করিয়া ফেলা যায়। প্রকৃতির স্বপ্নময় জীবনের অতীত নির্বিশেষ-পুরুষের অন্বেষণ করিতে গিয়া হয়ত প্রকৃতিকে একেবারে ভুলিয়া যাইতে পারি, বিবাদের সামঞ্জস্য করিতে গিয়া জ্ঞান এবং জ্ঞেয়ের প্রতি একই প্রকার অস্তিত্ব আরোপ করিতে পারি, এবং তাহাদের অতীত পুরুষের উপর অপরিমিত ঝোঁক দিয়া হয়ত আমরা ভুলিয়া যাইতে পারি যে সেই অতীন্দ্রিয় পুরুষ জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নয়—জ্ঞান এবং জ্ঞেয় ও অতীত পুরুষ জ্ঞান ব্যতীত আর অন্য কিছুই নহে। এই ভাবে যদি জগতের প্রতি লক্ষ্য করা হয় তাহা হইলে দেশকে কেবল অদ্বৈত তত্ত্বের বারিধি সদৃশ মহান জীবনের সতত চঞ্চল উর্ম্মিমালায় পরিণত করিতে এবং সত্য এবং অস্তিত্ব কেবল সেই অখণ্ড অদ্বৈত তত্ত্বেই আরোপিত করিতে হয়।

প্রকৃত সত্যকে ভাল করিয়া না বুঝিয়া সত্যের উভয় দিকে সমান ভাবে মনোযোগ না দেওয়াতেই এইরূপ অপমীমাংসায় উপনীত হইতে হয়। জ্ঞান, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের বিরোধের অতীত সামঞ্জস্যের ভিত্তির স্বরূপ এবং তাহাদের পরস্পর বিরোধী দ্বৈতভাবের মধ্যে অদ্বৈত তত্ত্ব—এই কথাটা একটু এক দিক টানিয়া বুঝিলে জ্ঞেয় প্রাকৃতিক জগৎকে স্বপ্নের ক্রীড়ায় পরিণত করিতে হয়। কিন্তু এ প্রকার সর্ব্বগ্রাসী মায়াবাদ মনুষ্যের সহজ জ্ঞানের ভিত্তি একেবারে নষ্ট করিয়া দেয়। মানুষের ধর্ম্ম-জীবনের বিকাশভূমিকে ঐন্দ্রজালিক মায়ায় পরিণত করে। আর মায়া বলিলেই যে জগতের একটা ব্যাখ্যা হইল তা নয়। জগতের অস্তিত্বের একটা ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এবং মায়াই যদি জগতের কারণ হয় তাহা হইলে মায়ারও একটা ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রত্যুত এই মায়া যখন মায়াতীত জ্ঞানের নিত্যসঙ্গী, যখন একের অভাবে অপরটি শূন্যে পরিণত হয়, তখন একটির উপর আর একটির শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতে গিয়া একটির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নষ্ট করিবার কোন কারণ নাই।

এই মায়াবাদের বিরুদ্ধে তর্ক করিতে গিয়া আর একটি ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা। ইহার বিপরীতে তর্ক করিতে গিয়া যদি কেহ এমন বলেন যে প্রকৃতি এবং আত্মা উভয়েই সমানভাবে সত্য, অথবা প্রকৃতির উপর আত্মার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই, তাহা হইলে বুঝিব যে তিনি Kant-এর দর্শনের মূল তত্ত্ব ভুলিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে Kantএর দর্শন যদি কিছু করিয়া থাকে তাহা হইলে তাহা ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে জ্ঞানবিবর্জ্জিত বিষয় কিছুই হইতে পারে না। এ কথাটি আংশিক বুঝিয়া যেমন পূর্ব্বোক্তরূপ মায়াবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনি সেই মায়াবাদের বিরুদ্ধে বলিতে গিয়া যদি কেহ বলেন যে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় উভয়েই সমান সত্য এবং দ্বন্দ্বরহিত পরমাত্মা উভয়ের মধ্যে সমানভাবে আপনাকে বিকাশ করিতেছেন, তাহা হইলেও এই তত্ত্বটিকে ঠিক বোঝা হয় না। কারণ যদি বলা যায় যে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের মধ্যে কোনরূপ বিভিন্নতা নাই, তাহাদের সত্তার কোনরূপ তারতম্য নাই, তাহা হইলে

কোনরূপ বিরোধেরই অর্থ থাকে না। আর, বিরোধ থাকে না বলাও যা আর বিকাশ না থাকা বলাও তা। যদি বল পরমাত্মা সমানভাবে জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতার মধ্যে প্রকাশিত, তাহা হইলে তাহার শেষ অর্থ এই দাঁড়ায় যে পরমাত্মা আদৌ প্রকাশিত নন। বিকাশের অর্থই জ্ঞানের নিকট বিকাশ, এবং জ্ঞানের জীবন বিরোধ এবং বিভিন্নতায়। সুতরাং বিকাশ হইলেই, পরমাত্মাকে আপনার অদ্বৈত তত্ত্বকে বিরোধের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে হইবে। বিরোধশূন্য বিভিন্নতাবিবর্জ্জিত বিকাশ সোনার পাথরবাটীর ন্যায় অসঙ্গত কথা মাত্র।

[ক্রমশঃ।

শ্রীবশম্বদ মিত্র।

বাঙ্গালীর বিলাত যাওয়া।

বাঙ্গালীর বিলাত যাইবার কারণ কি? অনেকেই বলিবেন শিক্ষার জন্য। বহু অর্থব্যয় ও শ্রম-স্বীকার করিয়াও এখানে যে সকল বিষয়ের শিক্ষালাভ করা যায় না, সেই সকল বিষয় শিক্ষা করিবার জন্য বাঙ্গালীরা বিলাত গিয়া থাকেন। এখানে আইন পড়িয়া মোক্তার, উকিল, এটর্ণি, মুন্সেফ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজ হইতে পারা যায়; কিন্তু ব্যারিষ্টার ও সিভিলিয়ান হইবার উপায় নাই। এখানে রীতিমত কৃষি-বিদ্যা শিক্ষার (কৃষকদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত শিক্ষা ব্যতীত) কোন রূপ শিক্ষালয় বা সুদক্ষ শিক্ষক নাই; সুতরাং কৃষিবিদ্যা-শিক্ষার্থীকে বিলাতেই কৃষিবিদ্যা শিখিতে হইবে। সাহেব মহলে চিকিৎসা করিতে হইলে এখানকার মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষিত চিকিৎসক হইলে চলিবে না, সুতরাং বিলাতের চিকিৎসা-শিক্ষা ব্যতীত সে অভিপ্রায় সাধনের অন্য উপায় নাই। এইরূপ গবাদি-পশু-চিকিৎসক, ট্রাম্পীয়-রথাদি-কল-নির্ম্মাতা, এবং চিত্রকর, অধ্যাপক, বক্তা প্রভৃতি হইতে হইলে দুর্ভাগ্য বাঙ্গালীর বিলাত যাওয়া ব্যতীত অন্য উপায় নাই। এ সকল ইংরাজ শাসনের কায়দা মাত্র। মৃত মহাত্মা দ্বারিকানাথ মিত্রের ন্যায় উকীলই হউন, আর স্বর্গীয় দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় চিকিৎসকই হউন, ব্যারিষ্টার ও সিভিল সার্জ্জনের কায়দা একটু স্বতন্ত্র। দেশী ও বিলাতী শিক্ষার একটু ভিন্ন মর্য্যাদা।

এক্ষণে বিলাত গমন ও তন্নিবন্ধন জাতীয় স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য কি না, তদ্বিষয়ে একটু বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কতিপয় বিষয় শিক্ষার জন্য বিলাত গমন যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা বোধ হয় সকলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবেন। যে সকল বিষয়ের চর্চ্চা আমাদের দেশে আদৌ হয় না, অথচ যে সকল বিষয়ের অভাব অহরহঃ আমাদের দেশে দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং যে সকল অভাবজনিত বিঘ্ন-বিপত্তি দ্বারা আমাদের জাতীয় উন্নতি হইতেছে না, সেই সকল বিষয়ের জন্য বিলাত গমন, এমন কি জাত্যন্তর পরিগ্রহও

আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যেও পরিগণিত হইতে পারে।

রাজনীতি শিক্ষা আমাদের দেশে সামান্যমাত্রই হইয়া থাকে, এবং যে সে ব্যক্তিরও শিখিবার অধিকার নাই। কতিপয় সংখ্যক লোক যাঁহাদের রাজ্যশাসন-সম্বন্ধে সামান্যমাত্র সংস্রব আছে তাঁহারাই সামান্যমাত্র চর্চ্চা করিতে পান। কিন্তু মনিবের মনের মতন না হইলে চাকরের কোন কথাই গ্রাহ্য হয় না। সুতরাং এখানে থাকিয়া তাঁহাদের সে সামান্য সংস্রব কিছুই নহে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ যদি পার্লেমেণ্টের সভ্য হইতেন, কে না স্বীকার করিবেন যে ভারতের সৌভাগ্য-রবি হিন্দুসমাজে এক দিনের তরেও কিরণ প্রদান করিত। একথা শুনিয়া কোন্ দুর্ভাগা ভারতসন্তানের চক্ষুতে আনন্দাশ্রু বিগলিত না হইত? ইহার জন্য স্বদেশ ছাড়িয়া চির বিলাতবাসী হইতে পারা যায়, ইহার জন্য হ্যাট কোট পরা কালা বাঙ্গালীকে গৌরাঙ্গ ইংরাজের অপেক্ষাও সুন্দর দেখায়, এবং ইহার জন্য জীবন বিসর্জ্জনও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

দরিদ্র বাঙ্গালীর ছিন্ন বস্ত্র সেলাই করিবার জন্য সূচ সুতাও বিলাতের সামগ্রী, ও বিলাতের কারিকর নির্ম্মিত; ভিক্ষার্জ্জিত কদর্য্য তণ্ডুল সিদ্ধ করিবার জন্য অগ্নুৎপাদক দেয়াশালাইও বিলাতের সামগ্রী, ও বিলাতের কারিকর-নির্ম্মিত। এই সকল পরহস্তোৎপাদিত দ্রব্যের জন্য আমরা প্রতিক্ষণ পরের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছি। এই সকল অনর্থের নিরাকরণ হেতু যদি কেহ বিলাত যান এবং দেশে প্রত্যাগত হইয়া যদি তিনি বিলাতী শিক্ষা প্রভাবে ও নিজ বুদ্ধি-চাতুর্য্যে দেশেই ঐ সকল দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারেন, তাহা হইলে বাঙ্গালী কৃষ্ণবর্ণ কোট পেণ্টুলেনে যদি সমগ্র ভারতকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া তোলেন, তাহা হইলেও ভারতের তাদৃশ ক্ষতি হয় না। কিন্তু ব্যারিষ্টার হইয়া মুন্সব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ও জমীদারদিগের কার্য্যাধ্যক্ষ হইবার জন্য লালায়িত হইয়া, এবং সিভিল সার্জ্জন ও বিলাতী ডাক্তার হইয়া ভিজিট কমাইয়া দেশীয় চিকিৎসকদিগের অন্ন মারিয়া সাহেব হইয়া থাকা ভাল দেখায় না। আমরা দেখিতে পাই, অনেকেই এখান হইতে Third class, Second class অবধি অধ্যয়ন করিয়া দুই তিন বৎসর পরে বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আইসেন। তাঁহারাই আবার সামান্যমাত্র fee লইয়া হাইকোর্ট হইতে আরম্ভ করিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে পর্য্যন্ত practice করিয়া থাকেন দেখিতে পাওয়া যায়। হ্যাট্ কোটের কি অদ্ভুত মহিমা! মোকদ্দমা হারিলেও তাঁহাদের বিশেষ ক্ষতি হয় না। ইহাতে আমরা অসন্তুষ্ট নহি। কিন্তু ইহাতে একটী বিষম সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে দেখিয়া মধ্যে মধ্যে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া থাকি। দেখিতে পাই যাবতীয় উকিল মোক্তারের কার্য্য আজকাল প্রায়ই ব্যারিষ্টার ও এটর্ণি দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। দেশীয় উকিলদিগের দুরবস্থা ক্রমেই বাড়িতেছে। যদিও বৎসর বৎসর ২০০।৩০০ ছোটবড় উকীল হইতেছেন, তাঁহারা সংসারে কিছুই করিতে পারিতেছেন না। কেহ বা উচ্চ শ্রেণীর কেরাণী হইতেছেন, কেহ বা বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইতেছেন। কেহ

বা Pettifogger হইয়া উকীলের ব্যবসা রাখিতেছেন। প্রতি বৎসরের ব্যারিষ্টার আমদানিতে তাঁহাদের দফা রফা হইবার যোগাড় হইয়াছে। ক্রমে এইরূপ দাঁড়াইবার উপক্রম হইয়াছে যে, ওকালতী কার্য্য-টা কেবলমাত্র বিলাত-ফেরত ব্যারিষ্টারদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইবে। এখনকার উকীলদিগের দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে সেই কার্য্য সাধন করিতে বহু ব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিয়া বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিতে হইবে, অর্থাৎ ব্যারিষ্টারেরাই বর্ত্তমান কালীন উকীলদিগের স্থান অধিকার করিবেন। এবং দেশীয় আইন শিক্ষার আর সামান্য মাত্র আদর থাকিবে না।

ডাক্তারদিগের সম্বন্ধেও বিলাতী শিক্ষা অবিকল এইরূপ। তবে যাঁহারা ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজসরকারে চাকরী পাইয়া থাকেন তাঁহাদের অবস্থা স্বতন্ত্র। তাঁহারা নিজে কতকটা সুখ স্বচ্ছন্দতা উপভোগ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা দেশের বা সমাজের কি বিশেষ উপকার হইয়া থাকে? আর যাঁহারা কেবল ২।৩ বৎসর মাত্র বিলাতে থাকিয়া L. R. C. P. প্রভৃতি উপাধি লইয়া সাহেব ডাক্তার হইয়া আইসেন তাঁহারাও অপর সাম্প্রদায়িক লোকের ন্যায় দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। মূর্খের দেশ—সুতরাং লোকে ভড়ঙ্গে ভুলিয়া যায়। ইংরাজী পরিচ্ছদপরিহিত দেখিয়া ধার করিয়া তাঁহাদের উদর পূর্ণ করিবে, অথচ দেশীয় সুশিক্ষিত অধিকতর উপযুক্ত লোকদিগকে ডাকিবে না। স্বীকার করি যে ইংলণ্ডাদি বিজ্ঞানের দেশ, তথায় বিজ্ঞান শিক্ষা ভালরূপই হইয়া থাকে, চৈতন্য বিদ্যা (Medical Science) ভাল রূপেই লোকে শিখিয়া থাকে। তাই বলিয়া কি এখানে ভাল চিকিৎসক হইতে পারে না? ৺ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনকৃষ্ণ মিত্র ও চন্দ্রকুমার দে প্রভৃতি মহাত্মারা বিলাত গিয়া চিকিৎসাবিদ্যা শিখেন নাই। অথচ, বোধ হয় সাহস করিয়া বলিতে পারা যায়, যে অনেক সুশিক্ষিত সিভিল সার্জ্জন ইঁহাদের চিকিৎসা প্রণালী আদর করিয়া অবলম্বন করিতে পারেন। তাই বলিয়া আমরা বিলাতী চিকিৎসা শিক্ষার বিরোধী নহি। যাঁহার ইচ্ছা হইবে বিলাত কেন, আমেরিকায় গিয়া শিক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু বিলাত-ফেরত হইয়া দেশীয় ডাক্তারদিগের মতন চলিলে এখানে শিক্ষা করিতে কি ক্ষতি ছিল? বাঙ্গালিকে Surgeon Major ও Civil Surgeon-এর পদে অভিষিক্ত দেখিলে নিশ্চয়ই আমাদের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, কিন্তু বিলাতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া দেশীয় রাজাদিগের Family Doctor কিম্বা মিউনিসিপালিটীর নিযুক্ত চিকিৎসক হইতে দেখিলে বস্তুতঃই আমাদের বড় কষ্ট হইয়া থাকে। এ সকল কার্য্য দেশীয় চিকিৎসকেরা করিবেন। বিলাত হইতে আসিয়া এ সকল বিষয়ে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। ইহাতে হইবে যে, ধুতি পিরাণ পরা দেশী ডাক্তারের পেশা ক্রমে উঠিবে, সুতরাং দেশীয় চিকিৎসা শিক্ষার শিথিলতা জন্মিবে; পরিশেষে চলতি ডাক্তার হইতে বিলাত যাইতে হইবে।

দেশের উন্নতি সম্বন্ধে ত এইরূপ কতকটা দেখিলাম। এক্ষণে সমাজ সম্বন্ধেও একবার বিচার করিয়া দেখা উচিত। বিলাত-ফেরত

ব্যক্তি মাত্রেই জাতীয় যাহা কিছু পরিত্যাগ করিয়া থাকেন কেন? জাতীয় খাদ্য, জাতীয় আচার পদ্ধতি, এমন কি দেশীয় ভাষা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। কই রাজা রামমোহন রায়, ৺ কেশবচন্দ্র সেন, আচার্য্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও ঠাকুর গোষ্ঠীর বাবুরা ত বিলাত গিয়া সাহেব হন নাই। এরূপ না করাতে তাঁহাদের মান মর্য্যাদার ত সামান্য মাত্রও ত্রুটী হয় নাই। কর্ম্মস্থলে রাজ-প্রথানুযায়ী পরিচ্ছদ - পরিধানে তাদৃশ দোষ হইতে পারে না, কিন্তু ঘরে, হিন্দুর ছেলের হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী চলিতে কি দোষ হইয়া থাকে? সমাজকে এরূপ পদদলিত করার কি আবশ্যক হইয়া থাকে? সকল জাতিই নিজ নিজ সমাজ সংরক্ষণে সমধিক আগ্রহ-শীল। কিন্তু বলিতে পারি না এই সকল মহানুভব ব্যক্তিরা কি কারণে সমাজের উপর এতাদৃশ খড়্গ-হস্ত হইয়া থাকেন। স্বীকার করিলাম দুই তিন বৎসরের মধ্যে সভ্যতার ও জ্ঞানের স্রোত তাঁহাদের ধমনীতে হঠাৎ ছুটিয়া উঠে, তাঁহারা এ অজ্ঞান, অসভ্য ভারতের কিছুই লইতে ইচ্ছা করেন না; কিন্তু তাঁহাদের একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখা উচিত যে তাঁহাদের যে দেশে গিয়া সভ্যতা ও জ্ঞানের উদয় হয় সেই দেশের পণ্ডিত লোকেরা এই অসভ্য ভারতের সামাজিক অনেক সামগ্রী লইতে সমব্যস্ত হইয়াছেন। অধিক কথা কহিবার আবশ্যক নাই। তাঁহারা মহাত্মা কর্ণেল অলকটের প্রতিমূর্ত্তি খানি একবার হৃদয়ে ভাবিয়া দেখুন। ইংলণ্ডীয় যুক্তি কৌজ স্ত্রী পুরুষে ভারতের বেশ ভূষা, রীতিনীতি অবলম্বন করিতেছেন। কিন্তু অনুকরণ-প্রিয় বাঙ্গালী দেশীয় যাহা কিছু ত্যাগ করিয়া বিদেশীয় সমস্তই যত্নের সহিত গ্রহণ করিতেছেন। একবার ভ্রমেও ভাবিয়া দেখিলেন না যে ইহাতে জাতীয় গৌরব ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে ও দেশ ছারখার হইতেছে। বিলাসপ্রিয় হইয়া যে ভারতের দিন দিন দুরবস্থা করিতেছেন তাহা কেহ ভাবিয়াও দেখিবেন না।

ইংরাজের রাজত্বেই কেবল বাঙ্গালী সাহেব হইতে ভাল বাসেন কিন্তু ইউরোপীয়েরা মুসলমান রাজত্ব কালে যখন ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা ত কই দেশে গিয়া ইজের চাপ্‌কান্ মোগলাই পাগড়ী ধারণ করিতেন না? হ্যাট্‌কোট সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি সাধন না করিয়া বরং কালা বাঙ্গালীকে অধিকতর বেয়াড়া দেখাইয়া থাকে। পেণ্টুলেন, চাপ্‌কান, চোগা পাগড়ী ত রাজকীয় পরিচ্ছদ। কিন্তু অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালীর তাহা ভাল লাগিবে না। কেহ কেহ বলিতে পারেন ইংরাজী পরিচ্ছদ ধারণ করা, ইংরাজী চালে চলা পশারের পক্ষে সুবিধা করিয়া থাকে। এ কথা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। পশার করা নিজের বিদ্যা বুদ্ধিও ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। ডাক্তার সরকার প্রভৃতি চিকিৎসকগণ ত ইংরাজী পরিচ্ছদ পরিয়া চিকিৎসা করেন না। এ সম্বন্ধে আমরা ব্যারিষ্টারদিগকে আদালতের কার্য্য সময়ে কিছু বলিতে পারি না। কারণ তাঁহারা রাজানুসারে আদালতে গাউন পরিতে বাধ্য। কিন্তু বাড়ী গিয়া তাঁহারা কেন দেশীয় বেশ ভূষায় এরূপ অনাদর করিয়া থাকেন? এ বিষয়ে আমরা বাবু রাধা-গোবিন্দ কর মহাশয়কে ধন্যবাদ করিয়া

থাকি। তিনি একজন বিলাতশিক্ষিত সুচিকিৎসক, কিন্তু তিনি সমাজ ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ ধারণে তাঁহার প্রতি সকলেরই প্রীতি আছে। বাবু আনন্দমোহন বসুর সম্বন্ধেও আমরা এমন গল্প শুনিয়াছি যে তিনি নাকি বিলাত হইতে, আসিয়া গাউন না পরিয়া চোগা চাপকান লইয়া প্রথমে আদালতে গিয়াছিলেন, তাহাতে ব্যারিষ্টার মহল তাঁহাকে স্বদলচ্যুত করিবার জন্য উদ্যোগ করে, কেহ তাহার সহিত আলাপ করিত না, কেহ বা তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কামরায় বসিতে দিতেও আপত্তি করিত। অগত্যা আনন্দমোহন বাবু কয়েকজন বন্ধুর পরামর্শে চোগা চাপকান ছাড়িয়া বিলাতি পোশাক গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। কথাটা কতদূর সত্য জানি না, কিন্তু এই সম্প্রদায়ের লোক যে বাঙ্গালীর জাতীয় গৌরবস্থল সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

উপসংহারে আমরা স্বীকার করিব যে এই সকল লোক হারাইয়া আমাদের সমাজের ও দেশের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। বিলাত ফেরত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অধিকাংশই বুদ্ধিমান ও সুপণ্ডিত। তাঁহারা বিলাত না গিয়া দেশে থাকিলেও যে বড় লোক হইতেন তাহার সন্দেহ নাই। তাহা হইলে তাঁহারা বিলাত সংক্রামক রোগে আর পীড়িত হইতেন না। দেশের জন্য তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিত। সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা দেশের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা ছিল। তাই বলি আর বৎসর বৎসর বহু লোকের দেশকে দরিদ্র করিবার জন্য বিলাত যাইবার আবশ্যকতা নাই। তবে সিভিলিয়ান হইতে, রাজনীতি, কৃষিবিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা শিখিতে বিলাত যাওয়া উচিত। কিন্তু যাহার জন্য বিলাত না যাইলে নয়—সেই সিভিল সার্ভিসধারীদিগের সম্বন্ধেও সে দিন ডাক্তার লিটনার (Dr. Leitner) বিলাতের East India Association সভায় কি বলিয়াছেন তাহা মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত। স্থান থাকিলে আমরা সে বক্তৃতার অধিকাংশই উদ্ধৃত করিয়া দিতাম, কিন্তু সে স্থান ইহাতে নাই। প্রথমতঃ সিভিল-সার্ভিস সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া শেষে বিলাত ফেরতদিগের বিলাতীয়ের অনুকরণ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন; "It is only when he becomes an imitator of Europeus that his creative talant in art and in capacity for Goverument and learning are greatly weakened." ইহার অধিক এ বিষয়ে আর কি বলা যাইতে পারে? বাস্তবিক যাহার নিজত্বই রহিল না, তাহার নিকট অপরের প্রত্যাশা কি? ডাক্তার লিটনার এই জন্য বিলাত-শিক্ষিত অপেক্ষা দেশীয় শিক্ষিত খাঁটি দেশীয়দিগকে সিভিল-সার্ভিসে ভর্ত্তি করিতে পরামর্শ দেন। শুধু Leitner নন, Mr. Davies ও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। 'যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর' কথাটা বড়ই ঘৃণাবহ। আমি যার অনুকরণ করিতে পাগল, সেই আমাকে ঘৃণা করে, ইহার অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি আছে? তবে কেন এ বিড়ম্বনা? ময়ূরের দলে যখন মিশিতে পারিবই না, তখন কেন ছুটা ময়ূরপুচ্ছ কুড়াইয়া আপনার কাকত্ব ঢাকিবার চেষ্টা? কেন এ আত্ম-বঞ্চনা! ঘরে পরে এ গঞ্জনা কেন? এ দুকূল মজান কিসের জন্য?

নিশ্চয় অন্ত বিলাত যাইতে হয় যাউন, কিন্তু তাই বলিয়া আপনাকে ভুলিব কেন? সুখের বিষয় আজ কাল এ স্রোত অনেকটা ফিরিতেছে বলিয়া বোধ হয়। এই ত চাই। ইহাই ত কামনা।

দেশের লোক দেশে ফিরিয়া আসিবেন, দেশের চালে চলিবেন, দেশের উন্নতি করিবেন, ভারত সমাজ আদর করিয়া তাঁহাদিগকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র।

নায়েব জমীদার গোবিন্দরাম মিত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মিত্রজা মহাশয় যে প্রকার ধরণে জবাব লিখিয়া কৌন্সিল ও প্রেসিডেন্ট সাহেবের সম্মুখে পেশ্ করিলেন—আজ কালকার দিনের হইলে তাহা লইয়া হলস্থুল বাঁধিয়া যাইত। অভিযোগের উত্তর পত্রের প্রতি পংক্তিতেই তিনি প্রভূত ক্ষমতার পরিচয় দিতে ত্রুটি করেন নাই। বেনামী করিয়া কারম ইজারা লওয়া সম্বন্ধে তাঁহার নামে যে অভিযোগ আসিয়াছিল তদুত্তরে তিনি লিখিলেন—"আমি বেনামী করিয়া কতকগুলি কারম নিজ নামে ইজারা লইয়াছি বটে—কিন্তু তাহা গোপনে লই নাই—আমার উপরওয়ালা সাহেব কর্ম্মচারী এ বিষয়ে আমাকে সম্মতি দেওয়াতেই আমি এ প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহা ব্যতীত নিজ নামে যে সমস্ত কারম ইজারা লইয়াছি—তাহার জন্য কোন উপর ওয়ালার অনুমতি লই নাই বটে, কিন্তু অনুমতি না লইয়াও আমি অন্যায় কার্য্য করি নাই। আপনারা অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন—বাঙ্গালার সকল জমীদারের উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীরা কম বেতন পাইয়া থাকে তাহাদের পদগৌরবের উপযুক্ত যান, বাহন, চাকর, বেহারা, আরদালী, আসাবরদার ইত্যাদি রাখিবার খরচ তাহাদের সেই স্বল্প বেতন হইতে কুলাইয়া উঠে না। এ প্রকার স্থলে তাহারা অন্য উপায়ে স্বীয় পদোচিত গৌরব রক্ষা করিয়া প্রভুর মান রক্ষা করে, প্রভুরাও এ সমস্ত বিষয় জানিতে পারিয়াও কোন প্রকার আপত্তি বা উচ্চবাচ্য করেন না। ইহাই দেশপ্রচলিত প্রথা। আমি মোটে পঞ্চাশ মুদ্রা বেতন পাই ও কোম্পানীর অধীনে উচ্চ পদের চাকরি করি—এ প্রকার স্থলে পদোচিত গৌরব রক্ষা করিবার জন্যই আমি এইরূপ করিয়াছি। দেশপ্রচলিত প্রথানুসারে ইহা কোন রূপে দূষণীয় নহে।" গোবিন্দরামের এই প্রকার জবাবদিহির বিরুদ্ধে হলওয়েল সাহেব কিছুই বলিতে পারিলেন না—কিন্তু অন্য প্রকার অভিযোগ আনিয়া তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—"গোবিন্দরাম অনেক কারমের প্রকৃত আয় গোপন করিয়া কোম্পানির প্রচুর ক্ষতি করিয়াছেন—কতকগুলি কারম নিজে বেনামী করিয়া লইয়াছেন বলিয়া অনেক স্থলে দর কমাইয়া দিয়াছেন, অনেক স্থলে প্রজার নিকট হইতে প্রাপ্যের উপরও আদায় করিয়াছেন, এ প্রকার গর্হিত কার্য্যের জন্য দেশের প্রচলিত প্রথানুসারে তাঁহাকে 'তুড়ুম লাগান' অথবা বেত্রাঘাত করা উচিত।" কিন্তু মজলিসের অন্যান্য সদস্যেরা এক বাক্যে উত্তর করিলেন—"we are not dis-

posed to inflict the lash or fetters on the first native in the settlement." মিত্রজা মহাশয় যে কেবল শাস্তিভোগ হইতে রক্ষা পাইলেন এমত নহে—এই প্রকারে সঞ্চিত অর্থের সমস্ত অংশই তাঁহার অধিকারে রহি এই ঘটনাদ্বারা বিশেষ রূপে উপলব্ধি হয়—"গোবিন্দরামের লাঠীর" বা টাকার জোর সেই সময়ে অতিশয় অধিক ছিল। একে কোম্পানীর অধীনে তিনি বড় চাকরি করিতেন, তাহাতে আবার প্রচুর বিত্তশালী ছিলেন, সুতরাং সকল বিষয়েই তাঁহার ক্ষমতার প্রাচুর্য্য ছিল ও সেই ক্ষমতার সহায়ে তিনি হলওয়েল সাহেবের অভিযোগগুলি উড়াইয়া দিলেন।

কেবলমাত্র গোবিন্দরাম মিত্রই যে অন্যায় উপায়ে এই প্রকার অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা নহে, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে কোম্পানীর চাকরির ন্যায় সঙ্গত উপায়ে কেহই ধনী বলিয়া পরিগণিত হন নাই। পলাশী যুদ্ধের পর ক্লাইবের দেওয়ান রামচাঁদ ও মুন্সী নবকৃষ্ণ বাহাদুর নবাবের অন্তঃপুরস্থ ভাণ্ডারের আট কোটী টাকার কথা আদতে তাঁহাকে জানিতে দেন নাই। সকল কথা চাপিয়া রাখিয়া মীরজাফর, আমিরবেগ খাঁ, রামচাঁদ, ও নবকৃষ্ণ এই টাকা আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লন। দেওয়ান রামচাঁদ মোটে ৬০ টাকা তলব পাইতেন; কিন্তু এই ঘটনার দশ বৎসর পরে প্রায় সওয়া কোটী টাকা মজুত রাখিয়া পরলোক গমন করেন। নবকৃষ্ণ মুন্সীও দেওয়ানজীর সহিত সমান বেতন পাইতেন, কিন্তু পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পরে মহা সমারোহে দুর্গোৎসব করেন, ও মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রায় নয় লক্ষের উপর টাকা ব্যয় করেন। তাঁহাদের ইংরাজ প্রভুরাও এ প্রকার উপায়ে অর্থ সঞ্চয়ে বড় পিছপাও ছিলেন না। নিতান্ত দুরদৃষ্ট না হইলে তখন নাধারণ ইংরাজে ভারতে আসিত না। কিন্তু তাহারা এখান হইতে যাহা সঞ্চয় করিয়া লইয়া যাইত, তাহাতে রাজার হালে কাটাইত। "বেনামী" ও "দস্তকী" কারবার ইহাদের একচেটিয়া ছিল।

গোবিন্দরাম হলওয়েলের অভিযোগ ব্যাপারে মুক্তি লাভ করিবার কিয়ৎ কাল পরে ইংরাজদের সহিত নবাব সরকারের অবনিবনাও হইয়া উঠিল। আলিবর্দ্দি ইহলোক ত্যাগ করিলেন ও নবাব মির্জ্জা মহম্মদ সেরাজউদ্দৌলা বাঙ্গালার মসনদে উপবেশন করিলেন। ইংরাজের সহিত নানা কারণে তাঁহার অকৌশল বাধিয়া উঠিল। ইতিহাস-পাঠকের নিকট সে সকল ঘটনার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। নবাব ঘটনাবশে উত্তেজিত হইয়া কলিকাতা আক্রমণ করিলেন।

শুনিতে পাওয়া যায়—নবাবের কলিকাতার দুর্গ আক্রমণ কালে গোবিন্দরাম তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিলেন। কোম্পানীর নিমকহালাল বলিয়া তিনি প্রভু-পক্ষ পরিত্যাগ না করিয়া—ভবিষ্যৎ শোচনীয় পরিণামের বিষয় না ভাবিয়া—ইংরাজ-সৈন্যের সহিত মিশিয়া নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। দুর্গ অধিকৃত হইলে চৌপালায় চড়িয়া, অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া হাস্যমুখে নবাব সেরাজ-উদ্দৌলা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সরকারী হুকুমানুসারে স্বল্পক্ষণ স্থায়ী সেই দুর্গমধ্যস্থ দরবারে গোবিন্দরামকে প্রহরী বেষ্টিত করিয়া আনা

হইল। সেরাজ তাঁহাকে কঠিন প্রহরীবদ্ধ করিয়া রাখিতে আজ্ঞা দিলেন। মুরশীদাবাদে তাঁহাকে চালান দেওয়া হইবে, এ কথারও আভাস দেওয়া হইল।

নির্জ্জন অন্ধতমসাবৃত কারা-প্রকোষ্ঠে বসিয়া গোবিন্দরাম মিত্র স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তির প্রভাবে কারামুক্তির উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অর্থবল তাঁহার প্রধান বল বলিয়া বিবেচিত হইল, তিনি দুই এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিকে হস্তগত করিয়া নবাবের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া পাঠাইলেন। কিরিঙ্গিদিগের উপরেই নবাবের মর্ম্মান্তিক ক্রোধ, সুতরাং গোবিন্দরাম অনেক কাকুতি মিনতির পর মুক্তিলাভ করিলেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে চোপদারের উপর পরওয়ানা হইল।

১১৬৪ সালে কর্ণেল ক্লাইব ও ওয়াটসন আসিয়া বাঙ্গালার পলাশী ক্ষেত্রে দেখা দিলেন। পলাশীর রাজসমরে, ঘোর চক্রান্তে বেষ্টিত হইয়া বিশ্বাসঘাতকতার ঘুমময় আবরণ ভেদ করিতে না পারিয়া নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হইয়া ভগবানগোলায় পলায়ন করিলেন। ইংরাজের বজ্রনাদী কামানের মুখে তাঁহার রক্তপতাকা চিরকালের জন্য হীনপ্রভ হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। ইংরাজ সিংহ চিহ্নিত পতাকা উড়াইয়া জাফর আলি খাঁকে মহাসম্মানের সহিত বাঙ্গালার মসনদে বসাইয়া উৎসবানন্দ ভোগ করিতে মহা সমারোহে কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন।

ইংরাজ জয়োৎসবে মত্ত হইয়া রণবাদ্য করিতে করিতে কলিকাতার ক্যাবুটরিতে ফিরিয়া আসিতেছেন শুনিয়া গোবিন্দরাম মিত্র পূর্ব্ব প্রভুদের সহিত সাক্ষাৎ বাসনায় যাত্রা করিলেন। পলাশী বিপ্লবে ইংরাজ প্রভুদের মস্তক ঘূর্ণিত হইলেও তাঁহারা প্রাচীন কর্ম্মচারী গোবিন্দরামকে অতি সহজে চিনিলেন। ক্লাইবের নূতন বন্দোবস্তে "ব্লাক জমীদারের" কাজ উঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব হওয়াতে গোবিন্দরাম মিত্র, কোম্পানীর তরফে কলিকাতা পুলিশের ফৌজদার নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন ক্ষমতার যতটুকু অপূর্ণতা ছিল, এই নূতন পদপ্রাপ্তিতে তাহা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণতা লাভ করিল।

ইংরাজ কলিকাতার পুরাতন দুর্গ ছাড়িয়া দিয়া নূতন স্থল নির্ব্বাচিত করিয়া দুর্গ নির্ম্মাণে কৃতসংকল্প হইলেন। বর্ত্তমান কষ্টম হাউসের অধিকৃত স্থানে প্রাচীন দুর্গ অবস্থিত ছিল, গোলার মুখে তাহা উড়াইয়া দিয়া ইংরাজেরা গোবিন্দপুরে দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়মের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইল। ফোর্ট উইলিয়মের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যেন ভারতের বক্ষে ইংরাজের প্রভুত্ব ক্ষমতা চিরকালের জন্য দৃঢ় নিবদ্ধ হইল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময়ে, গোবিন্দপুরে অনেক অবস্থাপন্ন বাঙ্গালীর বাস ছিল। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বংশের পূর্ব্বপুরুষ জয়রাম ঠাকুর এই সময়ে গোবিন্দপুর ত্যাগ করিয়া পাথুরিয়াঘাটায় বাস করেন। জয়রাম ঠাকুর যে কারণে বাধ্য হইয়া গোবিন্দপুর ত্যাগ করেন, গোবিন্দরাম মিত্রও সেই কারণে বাধ্য হইয়া কুমারটুলীতে বাস করেন। গোবিন্দপুরে ইংরাজের দুর্গ নির্ম্মাণই তাঁহাদের এই প্রকার বাস পরিবর্ত্তনের প্রধান

কারণ। গোবিন্দরাম গোবিন্দপুর ত্যাগ করিলেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে "গোবিন্দপুর" নামও লোপ পাইল।*

কুমারটুলিতে আসিয়া মিত্রজা মহাশয় পঞ্চাশ বিঘা ভূসম্পত্তি বিক্রিয়া লইলেন। তাহার উপর তাঁহার প্রকাণ্ড পুরী নির্ম্মিত হইল। চারিদিকে চক্ ও চাঁদনী সমেত সুবৃহৎ পূজার দালান ও তাহার পশ্চাতে অন্তঃপুরস্থ প্রকোষ্ঠগুলি নির্ম্মিত হইল। বাহিরের বৈঠকখানা সংলগ্ন ত্রিতল হর্ম্ম্যের সকল ভাগে "চীনের পাথরে" সুমণ্ডিত করিয়া "রংমহল" নির্ম্মিত হইল। এই "রংমহলে" উৎসবাদি উপলক্ষে নৃত্য গীতের উৎস বহিত। "নন্দনবাগান" তাঁহার প্রমোদকানন হইল, পূর্ব্বে নন্দনবাগান কলিকাতার সীমার বাহিরে অর্থাৎ "মারহাট্টা ডিচের" বহির্ভাগভুক্ত ছিল, গোবিন্দরাম স্বীয় ক্ষমতাবলে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া তাহা কলিকাতার অন্তর্ব্বর্ত্তী করিয়া লইলেন। "নন্দনবাগান" প্রকৃতই নন্দন কানন হইয়া উঠিল। একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহাতে দুইটী "জলটুঙ্গি" বা জলনিবাস নির্ম্মাণ করা হইল। মিত্রজা মহাশয় "নন্দনবাগান" কলিকাতার সীমাভুক্ত করিয়া যেরূপ নাম বাড়াইয়া গিয়াছিলেন বর্ত্তমানে তাহা তাঁহার বংশধরগণের পক্ষে নামকরণে অসুবিধাজনক হইয়া পড়িয়াছে। আজ কাল কলিকাতার হার অনুসারে নন্দনবাগানের খাজনার হার নিরূপিত হইয়া থাকে। তাঁহার বংশধরগণের বর্ত্তমান অসচ্ছলতা ও বিষয় বিভাগ নিবন্ধন ইহা তাঁহাদের পক্ষে বিষম বোঝা হইয়া পড়িয়াছে।

গোবিন্দরাম মিত্র মহা সমারোহে দুর্গোৎসব ও কালী পূজা করিতেন। শাস্ত্রের বর্ণনার মর্ম্ম যথাসম্ভব রক্ষা করিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ আরম্ভ হইত। স্বয়ং মিত্রজা মহাশয় আদ্যোপান্ত এই ব্যাপারের তদন্ত করিতেন। "মহাশক্তি", "লক্ষ্মী" প্রভৃতির গাত্র হরিতাল-রঞ্জিত না করিয়া সুবর্ণপাতে মণ্ডিত করা হইত। ডাকসাজের গহনার পরিবর্ত্তে সেই সুদীর্ঘ প্রতিমা-মূর্ত্তিগুলি আদ্যোপান্ত স্বর্ণালঙ্কারে মণ্ডিত করা হইত। প্রতিমার "কাঠাম" অতিশয় বৃহৎ হইত বলিয়া প্রত্যেক দেব দেবী মূর্ত্তি কাঠামর সহিত অসংলগ্ন ভাবে নির্ম্মিত হইত ও বিসর্জ্জনের সময় "মহাপাত্রা" "চতুর্দ্দোল" "পালকী" প্রভৃতি করিয়া সেই প্রতিমাগুলি বিসর্জ্জন হইত। গহনাদি বহুমূল্য বস্তু গুরুদেব খুলিয়া লইতেন ইহা তাঁহারই প্রাপ্য ছিল। পূজার পনর দিন পূর্ব্বে শাস্ত্রসম্মত বিধানে বোধন বসিত ও প্রতিদিন এই উপলক্ষে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন ও কাঙ্গালী ভোজন হইত। মোট কথায় শরতের প্রারম্ভ হইতেই মিত্রজার প্রকাণ্ড পুরী আনন্দ-কোলাহলে উৎসবময় ভাব ধারণ করিত। আজ কালকার দিনে ঘোর তামসিকতাময় শারদীয়োৎসবে এ পবিত্র চিত্র অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু শত

---

* কেহ কেহ বলেন গোবিন্দরাম মিত্র হইতেই "গোবিন্দপুর" নামের উৎপত্তি। কিন্তু অপর পক্ষের মতে কলিকাতার সর্ব্ব প্রাচীন অধিবাসী শেঠ দিগের "গোবিন্দজীউ বিগ্রহের নাম হইতেই "গোবিন্দপুর" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে কারণেই নামের উৎপত্তি হউক না কেন, ফোর্ট উইলিয়মের নির্ম্মাণের পর হইতেই ইহা লোপ পাইয়াছিল।

বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার মহামান্যার যে প্রকার ষোড়শোপচারে অর্চ্চনা হইত আজ কাল তাহার ছায়া মাত্র কেবল অপরিস্ফুট ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। মিত্রজার আমলের "পঞ্চাশরণী" নৈবিদ্যের কয়েকখানি থাল আজও মিত্র পরিবারের কোন সরিকের স্বত্বাধীনে রহিয়াছে।

মন্দির প্রতিষ্ঠা ও অতিথিশালার ব্যাপারেও মিত্রজা কোন প্রকার ত্রুটি প্রকাশ করেন নাই। চিৎপুরের ভগ্নপ্রায় নবরত্ন তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তি। এই নবরত্নের সান্নিধ্যে তিনি একটী সুবৃহৎ "জোড়াবাঙ্গলা" নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহাতে "গোকুলচন্দ্র," "বলদেব," প্রভৃতি বিগ্রহ ও কয়েকটী শালগ্রাম শিলা ষোড়শোপচারে পূজিত হইত। "জোড়াবাঙ্গলায়" সন্নিবিত বলিয়া এই নবরত্নও "জোড়াবাঙ্গলা মন্দির বলিয়া কথিত হইত।

ইংরাজ মহলে মিত্রজার বিশেষ ক্ষমতা ছিল বলিয়া কোন কোন মহোৎসব উপলক্ষে বড় বড় ইংরাজেরা তাঁহার বাটীতে আসিয়া আমোদ আহ্লাদে মগ্ন হইতেন। তৎকালীন ইংরাজেরা বাঙ্গালীর সহিত বড় মিশিয়া থাকিতেন, কিন্তু "ডিনার পার্টির" নাম গন্ধও ছিল না। ক্লাইব, ভান্সিটার্ট প্রভৃতি গবর্ণরগণ দুই একবার মিত্রজার অতিথি হইয়াছিলেন।

১১৭৩ সালের আষাঢ় মাসে—অশীতি বৎসর বয়সে প্রভূত ক্ষমতাশালী নায়েব জমীদার গোবিন্দরাম মিত্র অতুল ঐশ্বর্য্য ও পুত্র কন্যা রাখিয়া সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন। তাঁহার "লাঠীর জোর" তাঁহার সহিত শেষ হইয়াছিল। তিনি ইংরাজের আমলে যে প্রকার উচ্চপদে প্রভূত ক্ষমতা পরিচালন করিয়া চাকুরী করিয়া গিয়াছিলেন—ভবিষ্যতে কোন বাঙ্গালীর অদৃষ্টে সেই প্রকার সম্মান ঘটে নাই। দুঃখের বিষয় তাঁহার সকল কার্য্যের কোন লিখিত বিবরণ নাই। নানা স্থান হইতে "খণ্ডাংশ" সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইল, পাঠক তাহাতেই গোবিন্দরাম মিত্রের পরিচয় পাইবেন।

গোবিন্দরাম মিত্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রঘুনাথ মিত্র পিতৃ-পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। রঘুনাথ মিত্র মহারাজ নন্দকুমার প্রভৃতির সমসাময়িক ছিলেন। মহারাজা নন্দকুমারের যে বৎসর ফাঁসী হয় রঘুনাথ সেই বৎসরে ইহলোক হইতে অপসৃত হন। পিতার পূর্ব্ব গৌরব বজায় রাখিয়া দান ধ্যানাদিতে ব্যস্ত থাকিয়া তিনি পিতার মৃত্যুর পর যত দিন জীবিত ছিলেন, ততদিন সুখে কাটাইয়া ছিলেন। পিতার ন্যায় পূর্ণ সমারোহে দুর্গাপূজা ও কালীপূজা করিয়া তিনি অনেক পরিমাণে পিতৃনাম রক্ষা করিয়াছিলেন। রঘুনাথ মিত্রের একটী অবিনশ্বর কীর্ত্তি আজও বনগ্রামে বর্ত্তমান আছে। বনগ্রামের অন্তর্গত বৈরামপুর গ্রামে ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের সময় সাতিশয় জলকষ্ট উপস্থিত হওয়াতে রঘুনাথ মিত্র বহুব্যয়ে এক সুদীর্ঘ সুগভীর পুষ্করিণী খনন করিয়া দেন। পুষ্করিণীর সহিত একটী আম্রকানন তৈয়ার করিয়া দেন। এই সমস্ত আমগাছে যে ফল হইত তাহা সাধারণের সম্পত্তি। এই আম পাকাবস্থাতেও কৃষ্ণবর্ণ থাকায় আজও ইহা "কেলোর আম" বলিয়া পরিচিত। বৈরামপুরের রঘুরাম মিত্রের পুষ্করিণীটী আজও "মিত্তিরপুকুর" বলিয়া পরিচিত হইয়া

আসিতেছে। পিতার মৃত্যুর পর রঘুনাথ মিত্র প্রায় দশ বৎসর জীবিত ছিলেন। ১১৮২ সালের প্রারম্ভে চারি কন্যা, দুই পুত্র ও কয়েকটী প্রপৌত্র রাখিয়া তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

• সুবিখ্যাত সার এড্ওয়ার্ড কোলব্রুক ও এইচ কোলব্রুক সাহেবেরা বরাবরই এই প্রাচীন মিত্র পরিবারের পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর কৃষ্ণচরণ মিত্র আসিয়া কোলব্রুক সাহেবকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। এই সময়ে কলেক্টার সাহেবের দেওয়ানের কার্য্য অতিশয় লাভজনক ও গৌরবসূচক ছিল, অনেকেই এই উচ্চপদ লাভের চেষ্টা করিতেন। কিন্তু উপযুক্ত মুরুব্বি না থাকিলে প্রায়ই বিফল-মনোরথ হইতেন। এই কাজে যেমন উপরি পাওনার সংখ্যা অধিক ছিল, তদ্রূপ পদোচিত ক্ষমতাও বড় কম ছিল না। প্রকৃত পক্ষে দেওয়ানই মূর্ত্তিমান কলেক্টার সাহেব হইয়া উঠিতেন। কৃষ্ণ বাবু এই পদ লাভ করিয়া পিতামহের পূর্ব্ব ক্ষমতা অনেকটা সজীব করিয়া তুলিলেন। গোবিন্দরামের মৃত্যুর পর কৃষ্ণ বাবুর সময়ে মিত্র পরিবারের যে প্রকার সজীব ও আনন্দ-কোলাহলময় অবস্থা হইয়াছিল, ইহার পরে আর কখনও সেরূপ হয় নাই। ইহার পরেই পৈত্রিক এজমালি সম্পত্তি ক্রমশঃ বিভাজিত হইতে থাকে।

রঘুনাথের দ্বিতীয় পুত্র বাবু কৃষ্ণচরণ মিত্র হইতে এই সময়ে মিত্র পরিবারের যে প্রকার শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি সাধিত হয়, ইহার অব্যবহিত পরে গৃহবিবাদে সেই উন্নতির মূলে দৃঢ় কুঠারাঘাত পড়ে। অনেকে বলেন কৃষ্ণ বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র অভয়চরণ মিত্র হইতেই এই গোলযোগ প্রথম উৎপন্ন হয়। কৃষ্ণ বাবু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অভয় বাবুকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রতিভাশালী দেখিয়া কোলব্রুক সাহেবের নিকটে পরিচিত করিয়া দেন। খুল্লতাতের পৃষ্ঠপোষকতায় অভয় চরণ ২৪ পরগণার কলেক্টারের দেওয়ানীপদে নিযুক্ত হন। অভয় বাবু স্বীয় বুদ্ধি ও প্রতিভার সহায়ে শীঘ্রই কলেক্টর সাহেবের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন। এই সময়ে কলিকাতা জরিপ হইবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কলেক্টার সাহেব এই কার্য্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও পূর্ণ ক্ষমতা স্বীয় দেওয়ান অভয় বাবুকে অর্পণ করেন। অভয় বাবু অতিশয় দক্ষতার সহিত এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সরকার হইতে খুব বাহাদুরি লইলেন।

এই জরিপি কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পর শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণের সহিত মিত্র পরিবারের, বিশেষতঃ অভয় মিত্রের, বিবাদ বাঁধিয়া উঠিল। শোভাবাজারের অন্যান্য অংশ মাপ হইয়া গেল। মহারাজ নবকৃষ্ণের সুবৃহৎ পুরীর মাপ আরম্ভ হইল। বহির্ব্বাটীর সমস্ত কার্য্য শেষ হইয়া গেলে অন্তঃপুরাধিকৃত স্থানগুলি মাপিবার আবশ্যকতা হইল। মহারাজ নবকৃষ্ণ স্বীয় অন্তঃপুরের ভিতর কোম্পানীর লোক প্রবেশ করিতে দিতে নিতান্ত নারাজ হইলেন। তিনি মিত্রদ্বয়কে বলিলেন, "অন্তঃপুর আর মাপিয়া কি হইবে, একটা মোটামুটি মাপ ধরিয়া দিবেন।" কর্ত্তব্যপরায়ণ অভয়চরণ মহারাজের এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না। মহারাজ নবকৃষ্ণকে পরিবারবর্গ স্থানান্তরিত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া তিন সপ্তাহের জন্য সময় দিলেন। মহারাজ নবকৃষ্ণকে অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত

হইতে হইল। কিন্তু তিনি মনে মনে অভয় মিত্রের উপর জাতক্রোধ হইয়া প্রতিহিংসা লইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে সময়ে তাঁহার পূর্ব্ব প্রভু হেষ্টিংসের আমল হইলে তিনি ইহার যাহা একটা করিতে পারিতেন। কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিস্ সাহেব সেই সময়ের গবর্ণর। সুতরাং অভয় মিত্রেরই ভেদ্ বজায় রহিল।

মহারাজা নবকৃষ্ণের অন্তঃপুর মাপ হইয়া গেল। তিনি সহসা অভয় মিত্রের খুল্লতাত কৃষ্ণচরণ মিত্রের নামে তাঁহার পিতৃকৃত দেনার জন্য এক নালিশ করিলেন। খত খানি সঙ্গে সঙ্গে আদালতে দাখিল হইল। তখন মিত্র পরিবার এজমালিতে ছিলেন, সুতরাং অভয় বাবু প্রভৃতি সকলেই ইহাতে জড়িত হইবার সম্ভাবনা হইল। মহারাজ নবকৃষ্ণের দাখিলী খত খানি প্রকৃত হইলেও কৃষ্ণচরণ মিত্র প্রমাণ প্রয়োগের সহিত নিম্নলিখিত জোবানবন্দী দিলেন—"খত খানিতে যে দস্তখত আছে তাহা আমার পিতা রঘুনাথ মিত্রের দস্তখত বটে কিন্তু ঐ খতের লিখিত বেবাক টাকা মায় সুদ আমরা পরিশোধ করিয়াছি। মহারাজ নবকৃষ্ণের সহিত আমার পিতা মহাশয়ের অতিশয় বন্ধুতা থাকায় টাকা দেওয়ার সময়ে ঐ খতখানি ফিরাইয়া লওয়া হয় নাই। মহারাজ নবকৃষ্ণ মিথ্যা করিয়া এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছেন।" আদালত প্রমাণ পাইয়া এই ঘটনা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন, ও মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া গেল। মহারাজ নবকৃষ্ণ এই ব্যাপারে বড় মনস্তাপ পাইলেন।

বাবু কৃষ্ণচরণ মিত্র ঢাকার কলেক্টার সাহেবের দেওয়ানী করিতেন। তিনিই বংশের মধ্যে প্রথমে দেওয়ানী কর্ম্মে নিযুক্ত হন। এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই কার্য্যে দক্ষতা দেখাইয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রাজচন্দ্র মিত্রের বিবাহ সময়ে নন্দন বাগানের বাটীতে যে প্রকার সমারোহ হইয়াছিল, গোবিন্দরাম মিত্রের মৃত্যুর পর মিত্রবংশে সেরূপ আর ঘটে নাই। তখনকার বড় লোকেরা কেবলমাত্র বাড়ীতে কামান সাজাইয়া রাখিতে পাইতেন, কিন্তু তাহাতে আওয়াজ করিবার ক্ষমতা ছিল না। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন তাঁহারাই কালে ভদ্রে, কোন মহোৎসবে কামান দাগিতে পারিতেন। কৃষ্ণচরণ বাবুর এইরূপ দুই কামান ছিল, তিনি তৎকালীন গবর্ণর লর্ড কর্ণওয়ালিস্ সাহেবের নিকট এই বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা করাতে তাহা তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর হইল। অনেক উপরিওয়ালা তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সুতরাং এই বিবাহ উপলক্ষে কোর্ট উইলিয়ম দুর্গ প্রাকার হইতে কয়েকটী তোপের আওয়াজ করা হইয়াছিল। এ প্রকার রাজসম্মান ইংরাজের রাজ্য হইয়া অবধি আজও পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী পান নাই। বাবু কৃষ্ণচরণ মিত্র নন্দন-বাগানে যে বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা আজও বর্ত্তমান আছে, এখনও তথায় মিত্রবংশধরেরা বাস করিতেছেন।

কৃষ্ণচরণ মিত্রের পৌত্র কাশীশ্বর মিত্র পরিণামে বিশেষ খ্যাতাপন্ন হইয়া উঠিলেন। ইংরাজি ভাষায় তিনি অভিনয় সুদক্ষ ছিলেন—তৎকালীন অনেক বড় বড় সভা সমিতিতে তাঁহাকে উপস্থিত থাকিতে দেখা

যাইত। হুগলীর প্রধান সদর আমিনের পদে অতিশয় দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট অতিশয় প্রশংসা লাভ করেন। বাবু কাশীশ্বর মিত্র কলিকাতায় একটী "শবদাহের ঘাট" স্থাপন করিয়া তৎকালীন একটী প্রধান অভাব মোচন করিয়া দিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত কাশীশ্বর বাবুর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল।

গোবিন্দরাম মিত্রের বহুশাখা-বিস্তৃত বংশের মধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের সকলের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতে গেলেও প্রবন্ধের কলেবর অতিরিক্তরূপে বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে, সুতরাং আমরা তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন বাবু অভয় চরণ মিত্র ও বারাণসীর বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

অভয় বাবুর সম্বন্ধে আমরা উপরে দুই চারিটী কথা বলিয়াছি। চব্বিশ পরগণার কলেক্টারের দেওয়ান হইয়া তিনি স্বাধীন ভাবে অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করেন। সৎ কর্ম্মেও তাঁহার যথেষ্ট ব্যয় ছিল। গোবিন্দরাম মিত্রের প্রথা অনুসারে তিনিই মহা সমারোহে দুর্গা ও কালী পূজা করিয়াছিলেন। তিনি কতদূর দাতা ছিলেন তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাতেই প্রমাণ হইবে। এক সময়ে অভয় বাবুর কুলগুরু কুমারটুলির বাটীতে শুভাগমন করেন। পিতা অতিশয় গুরুভক্ত ছিলেন,—সুতরাং গুরুদেব প্রায়ই কুমারটুলিতে আসিয়া থাকিতেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে গুরুদেব অভয় বাবুকে বলিলেন—"বৎস অভয়চরণ, আমি এত বড় বনিয়াদি পরিবারের গুরু, বিশেষতঃ তোমার ন্যায় প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তি আমার প্রধান শিষ্য—এতবার কলিকাতায় যাতায়াত করিয়াছি, অন্যান্য বড় লোকের বাটীতে গিয়াছি—কিন্তু কখনও লাখ টাকা একত্রে কতগুলি হয় দেখিলাম না।" অভয় বাবু গুরুকে লাখ টাকা দেখাইবার জন্য দুই দিন সময় প্রার্থনা করিলেন। তৃতীয় দিবসে কাছারী হইতে বাটী প্রবেশ করিয়া গুরুদেবকে লইয়া একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া, স্তূপাকার রৌপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন—"এই দেখুন গুরুদেব! লাখ টাকা কতগুলি, এগুলি আপনাকেই দেওয়া হইয়াছে।" গুরুদেব এ প্রকার অভাবনীয় ঘটনায় অতিশয় বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তিনি প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া এ লক্ষ টাকা গ্রহণ করিলেন। এই সময় হইতে মিত্র পরিবারের গুরুবংশের অবস্থা অতিশয় উন্নত হইয়া উঠে। আজ কালও মিত্র বংশীয় অনেকের অপেক্ষা এ গুরু বংশের অবস্থা স্বচ্ছল বলিয়া বোধ হয়। আজও লোকে "লাখ্ টাকা" দানের কথা উঠিলে—"অভয় মিত্রের" গল্প করিয়া থাকে।

জানি না কোন্ পাপে এই সময়ে মিত্র পরিবারের মধ্যে মহা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠিল—কি কারণে শান্তি সমুদ্রে সহসা অনিবার্য্য দাবানল জ্বলিয়া উঠিল? এত বড় একান্নবর্ত্তী পরিবার যাহাতে দুই বেলায় ২।৩ শত পাত পড়িত—যাহা চিরকালই মহোৎসবময় বলিয়া বোধ হইত, তাহা এই সময়ে গৃহ বিবাদ আরম্ভ হওয়াতে ক্রমশঃ অবনতির অন্ধকারময় গহ্বরে নামিতে লাগিল। এই সময়ে অভয় বাবু তাঁহার

খুল্লতাত কৃষ্ণ বাবুর নামে আদালতে এক-খানি বিষয় সম্বন্ধে এক নালিশ উপস্থিত করিলেন। নানা প্রকার গোলযোগে ও বিশৃঙ্খলায় ঋণদায় ঘটিতে লাগিল ও ক্রমে হইতে সাধারণ সম্পত্তি বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইল। অভয় বাবু গোবিন্দরাম মিত্রের অনেক বিষয় বেনামে খরিদ করিলেন। কৃষ্ণ বাবু বেনামে "নন্দনবাগান" কিনিয়া লইলেন। আনন্দময় মিত্র রাজসাহী জেলার ডিহি ব্যাস পরগণার জমীদারি স্বীয় নামে ক্রয় করিলেন। ইহার পর কৃষ্ণ বাবুর সহিত অভয় বাবুর বিবাদ তৎকালীন কলিকাতার বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন বাবু নিমাই মল্লিক ও বৈষ্ণবচরণ মল্লিকের দ্বারা নিষ্পত্তি হয়।

জীবনের শেষ ভাগে অভয় চরণ মিত্রজা মহাশয় মৈনপুরীর কলেক্টার সাহেবের অধীনে দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া ১৮০৮ খৃঃ অব্দে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মস্থলে গমন করেন। মৈনপুরী হইতে তিনি অযোধ্যা, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া পুনরায় কর্ম্মস্থলে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার শরীরের অবস্থা ক্রমে মন্দ হইয়া আসিতেছিল, সেই বিদেশে পরিবারবর্গ কেহও নিকটে ছিলেন না—একমাত্র খুল্লতাতপুত্র শম্ভুচন্দ্র তাঁহার অধীনে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বাটী প্রত্যাগমনের নিমিত্ত আয়োজন করিতেছিলেন, এমন সময়ে সহসা কালব্যাধি আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ১২১৫ সালের কার্ত্তিক মাসে অভয় চরণ মিত্র আত্মীয় স্বজন পরিত্যক্ত হইয়া বিদেশে জীবলীলা সম্বরণ করিলেন।

শম্ভুচন্দ্র এই আকস্মিক বিপদ্‌পাতে অতিশয় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অর্থবল থাকিলেও তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার গঙ্গাযাত্রার কোন উপায় করিতে পারিলেন না বলিয়া বড় মর্ম্মপীড়া পাইলেন। মৈনপুরী হইতে ফরেক্কাবাদ প্রায় এক দিনের পথ। অষ্টাদশবর্ষীয় কর্ত্তব্য-পরায়ণ শম্ভুচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া শেষ কৃত্য করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। যুবকের প্রতিজ্ঞা নানাবিধ অসুবিধা ও বাধা সত্ত্বেও পূর্ব্ববৎ স্থির রহিল। প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া কয়েকজন ব্রাহ্মণ বাহক সংগ্রহ করিয়া একখানি পালকীতে ভ্রাতার শবদেহ তুলিলেন। দিবারাত্র অবিশ্রান্ত চলিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া সেই পালকীর পার্শ্বে পার্শ্বে থাকিয়া দীর্ঘ পথ অতিবাহিত করিয়া ফরেক্কাবাদে উপস্থিত হইলেন। ফরেক্কাবাদে জাহ্নবী-তীরে সুগন্ধি চন্দন কাষ্ঠে যথোচিত-উপায়ে শবদাহ হইয়া গেল। ক্ষুণ্ণমনে কাতর হৃদয়ে ভ্রাতৃবিরহ-শোক হৃদয়ে ধারণ করিয়া শম্ভুচন্দ্র কলিকাতায় আসিলেন। শম্ভুচন্দ্র অভয় বাবুর খুল্লতাত কৃষ্ণচরণ মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

কলিকাতার বাটীতে এই শোচনীয় সংবাদ উপস্থিত হইলে, অভয় চরণের বিধবা পত্নী যথেষ্ট শোকসন্তপ্ত হইলেও প্রফুল্ল হৃদয়ে পরলোকে স্বামী সঙ্গে অনন্ত মিলনে মিলিত হইবার অভিপ্রায়ে প্রকৃত আর্য্যললনার ন্যায় স্বামীর "খড়ম" হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত চিতানলে আত্মসমর্পণ করিলেন। ইহলোকে কেবল অভয় মিত্রের ছয় পুত্র, অতুল সম্পত্তি ও অক্ষত সম্মান পড়িয়া রহিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি গোবিন্দরাম মিত্রের বংশধরগণের মধ্যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হওয়ায়

তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ পৌত্র আনন্দময় মিত্র কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বারাণসী ধামে বাস করিলেন। রাজসাহির জমীদারির আয় তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, সুতরাং বারাণসীতে আসিয়া তিনি এক উচ্চদরের ধনীর ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। আনন্দময়ের পুত্র রাজেন্দ্র বাবুই বারাণসীতে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করেন। বহুকাল বারাণসীতে বাস করার জন্য রাজেন্দ্র বাবু প্রকৃত হিন্দুস্থানী হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু পৈত্রিক ক্রিয়াকলাপাদি কিছুই ভুলিয়া দেন নাই।

কাশীধামে রাজেন্দ্র বাবু যে প্রকার সমারোহের সহিত দুর্গোৎসব করিতেন, তাহাতেই এই অঞ্চলে তাঁহার যশোরাশি বিশেষরূপে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। মিত্রবংশের প্রথম পুরুষ গোবিন্দরাম মিত্র যে প্রকার উচ্চদরের শক্তিপূজা করিতেন, রাজেন্দ্র বাবু তাহা অপেক্ষা সমারোহের আরও এক মাত্রা বাড়াইয়াছিলেন। এই মহোৎসব উপলক্ষে তিনি প্রায় ২৫০০০ টাকা ব্যয় করিতেন। দরিদ্রকে অন্ন দান বস্ত্রহীন ব্যক্তিকে বস্ত্র দান করিয়া তিনি সকলেরই আশীর্ব্বাদভাজন হইতেন। নৃত্য গীত ও মহোৎসবাদির আয়োজনেরও ত্রুটি হইত না। এই উপলক্ষে অনেক বড় বড় লোক তাঁহার বাটীতে নিমন্ত্রিত হইতেন। স্বয়ং কাশীরাজও এই সময়ে নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার বাটীতে পদার্পণ করিতেন।

রাজেন্দ্র বাবুর প্রতিমা বিসর্জ্জন ব্যাপার অতিশয় সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। প্রতিমা বিসর্জ্জনের অব্যবহিত পূর্ব্বে চারি পাঁচ শত আশা সোটা, ও বল্লম, বহুল রজত ছত্র, সূর্য্যমুখী, অরুণক, মহীমার্ত্তব প্রভৃতি লইয়া বহুতর লোক অগ্রে ধাবিত হইত। মধ্যে স্বর্ণখচিত রৌপ্যময় চতুর্দ্দোলে, মনোহারিণী দশভূজামূর্ত্তি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র দেবতা। পশ্চাতে কতকগুলি হস্তী অশ্ব উপযুক্ত আরোহীতে সুশোভিত—এই প্রকার মহাসমারোহের সহিত প্রতিমা লইয়া গিয়া জাহ্নবীগর্ভস্থ করা হইত। একে ত বারাণসীতে বিজয়ার দিন বিসর্জ্জনের বড় ধুম, রাজেন্দ্র বাবুর সময়ে, ইহা আরও বাড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে গঙ্গাতীরে এত জনতা হইত যে কোতোয়ালির সাহায্য ব্যতীত শান্তি রক্ষা করা নিতান্ত অসম্ভব বোধ হইত।

রাজেন্দ্র বাবু তাঁহার স্বাভাবিক দানশীলতা ও আমীর-আনা চালের জন্য বারাণসীর সাধারণ্যের নিকট রাজা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি অনেক উপাধিধারী রাজার অপেক্ষা উচ্চদরের কার্য্য করিয়া স্বীয় নাম চিরবিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দ্বারে শত শত অস্ত্রশস্ত্র শোভিত প্রহরী পুরী রক্ষা করিত, তাঁহার নাকরাখানা হইতে প্রতি প্রহরে নহবৎ বাজিত,—তাঁহার অতিথিশালায় শত শত অভুক্ত ভিক্ষুক প্রতিদিন অন্ন পাইত, তাঁহার রাজপথে বা বিশ্বেশ্বর দেখিতে বাহির হইবার আশায় শত শত দীন দুঃখী পথের দুই পার্শ্ব জুড়িয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। পরিবে যেমন তাঁহার দর্শনেচ্ছা করিত, অনেক বড় বড় লোকও তদ্রূপ তাঁহার বন্ধুত্ব প্রয়াসী হইয়া তাঁহার বাটীতে আসিতেন। তাঁহার সময়ে বারাণসী দেখিতে যে সমস্ত বড় বড় জমীদার আমীর ওমরাহ ও নবাব আসিতেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে চেষ্টা করি

তবে অবশ্যই গুরুতর রোগের জন্য বিশেষ চিকিৎসা আবশ্যক। কিন্তু, প্রথমতঃ মনে রাখা কর্ত্তব্য, আরম্ভ হইতেই কিছুই গুরুতর হইয়া উঠে না। আর তাহা হইলেও তাহার জন্য চরক, সুশ্রুত, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি রহিয়াছে। আমাদের কিসের অভাব? পূর্ব্বকালে সামান্য অসুখের জন্য কেহ কখন ডাক্তার বৈদ্যের শরণাপন্ন হইত না। গাছগাছড়া ও জাড়িগাড়া খাইয়াই রোগমুক্ত হইয়া উঠিত। এখনও সেই সব রহিয়াছে তবে লোকে বুঝে না, বুঝিতে চাহে না, অনর্থক তিলে তাল করিয়া তোলে, সামান্য সর্দ্দি কাশী হইলেই ডাক্তার ডাকিয়া আনে, বিলাতী তীব্র ঔষধ সেবনে বাঙ্গালীর দুর্ব্বল দেহ জর জর করিয়া ফেলে, শেষ ভুগিয়া ভুগিয়া ধনে প্রাণে মারা পড়ে—এই সব আলোচনা করিয়াই সামান্য সামান্য পীড়ার জন্য আমরা নিম্নলিখিত টোট্‌কা ও মুষ্টিযোগ গুলি লিখিলাম। ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে যে বিশেষ ফল দেখিবে সে বিষয়ে আমাদের দৃঢ় প্রতীতি আছে।

অজীর্ণ—অধিক মাংস খাইয়া অজীর্ণ বা পেট গরম হইলে ২ তোলা পরিমাণে শুকনা কাশীর চিনি মুখে রাখিয়া ক্রমে ক্রমে খাইলে দুই ঘণ্টার মধ্যে জীর্ণ হইয়া যায়। মাছি খাইলে কাশীর চিনি মুখে রাখিলে কোন প্রকারে বমি হয় না।

অম্লরোগ—শ্বেত চন্দন আধ তোলা টাটকা মাখন আধ তোলা একত্রে মিলাইয়া প্রাতে ৩।৫ দিন খাইলে অম্লরোগ আরাম হয়।

অর্শ—মটর কড়াইয়ের মত ছোট ছোট বুনো ওল মরদার চুসির ভিতর করিয়া প্রাতে একবার করিয়া ৩।৪ দিন খাইলে অর্শ রোগ আরাম হয়। (২) এক তোলা আতপ চাউল, আধ তোলা অতি চারা নিমের শিকড় একত্রে বাটীয়া ৩।৪ দিন খাইলে অর্শ আরোগ্য হয়। উচ্ছে পাতার রসও ইহার পক্ষে বড় উপকারী।

আমাশয়—সজিনার পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া ঐ জল অল্প গরম থাকিতে আধ পোয়া আন্দাজ প্রত্যহ ২ বার খাইলে আমাশয় আরোগ্য হয়। কাঁচা আঁব ভাতে ও গেঁড়ির ঝোল উপকারক।

ওলাউঠা—রেশমের ঘুনসিতে একটি পয়সা ছেঁদা করিয়া বা তাঁবার মাদুলি কোমরে পরিলে ওলাউঠা প্রায় হয় না।

যদ্যপি কোন ঔষধি নিকটে না থাকে তবে রোগী যত জল খাইতে চাহে তত জল দিবে ইহাতে কএকবার খুব পরিষ্কার ভেদ ও বমি হইয়া রোগী সারিতে দেখা গিয়াছে। জলের সহিত কিঞ্চিৎ লবণ মিশাইলে শীঘ্র উপকার হয়।

নিম্নলিখিত দেশীয় ঔষধটি অতি চমৎকার, ইহা সকল সময়েও সকল স্থানে পাওয়া যাইতে পারে। ইহাতে শত শত রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছে। ইহা রোগের প্রথমে দিলে রোগী অবশ্যই আরোগ্য হয়। এজন্য ইহা ১৮৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনেক খবরের কাগজে ছাপান হইয়াছিল। আর সর্ব্ব সাধারণের উপকারার্থে এখানেও লিখিতে বাধ্য হইলাম।

লঙ্কা (শুখনা) গুঁড়া	এক রতি
উত্তম হিং	এক রতি
ঐ আফিম	আধ রতি
ঐ কর্পূর	আধ রতি

এই সমুদয় উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ একো গুড়ের সহিত গুলি বাঁধিবে। ওলা-

উঠার লক্ষণ বা অজীর্ণ হইবামাত্র এক গুলি এক ছটাক চিনির পানায় গুলিয়া কিঞ্চিৎ লেবুর রস দিয়া দিবে, আর যে পর্য্যন্ত উপকার না হয় আধ বা এক ঘণ্টা অন্তর ঐরূপ দিবে, যদ্যপি ঔষধ খাইবামাত্র তুলিয়া ফেলে তবে তৎক্ষণাৎ আবার ঐরূপ দিবে যে পর্য্যন্ত ঔষধি হজম না হয় মুখকে ৬ গুলির অধিক কখন দিবে না, আর বালককে সিকি বা অর্দ্ধমাত্রা বয়স বিবেচনা করিয়া দিবে। আর প্রত্যেক মাত্রায় সিকি বা অর্দ্ধেক গুলির অধিক দিবে না।

অতিশয় তৃষ্ণা থাকিলে নিম্নলিখিত ঔষধ আধ ছটাক আধ ঘণ্টা অন্তর দিবে।

উত্তম দেশি মদ	১২ ছটাক
লঙ্কা (শুখনা ও বড়)	২০ টে
রসুনের রস	১।০ তোলা
ভাল একো গুড়	১ পোয়া
সামান্য লবণ	১ মাসা

সমুদয় দ্রব্য উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া ঐ মদে গুলিয়া ছাঁকিয়া লইবে।

এ ঔষধি প্রস্তুত করিবার সুবিধা না হইলে এক সের শীতল জলে আধ পোয়া লেবুর রস, ও আধ পোয়া চিনি, আর উপরিলিখিত ঔষধির একটি গুলি গুলিয়া ছাঁকিয়া সেই জল ২ বা ৩ চামচ আধ ঘণ্টা অন্তর দিবে। রোগীর হাত পা হিম হইয়া গেলে গরম জল বোতলে পুরিয়া বা আগুনে সেক দিবে অথবা গুঁট বা ইটের গুঁড়া গরম করিয়া মালিশ করিবে।

কাটা ঘা—যদ্যপি কোন প্রকার ঔষধি নিকটে না থাকে তবে নিম্নলিখিত কড়ারটি অতি চমৎকার। একোগুড়, ও ঘরের সমভাগে সর্ষের তৈলে মিলাইয়া ক্ষতস্থানে লাগাইয়া কাপড় জড়াইয়া দিবে। সাবধান থাকিবে জল না লাগে, যত বড় আঘাত হউক না কেন অবশ্য তিন দিনে আরোগ্য হইবেক। প্রথম দিবস ভিন্ন আর ঔষধ লাগাইতে হইবেক না। কিন্তু জল লাগিলে অতি বিপরীত হইবে। ক টার স্থানে দুর্ব্বাঘাস চিবাইয়া দিলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

কানপাকা—পানীয়াড়ার গাছ কাটিলে যে জলবৎ এক প্রকার রস নির্গত হয় ঐ জল ২।১ বার কানের ভিতর দিলে কানপাকা আরোগ্য হয়।

কাশী—শুকনা বেলপাতার গুড়া মধু দিয়া মাড়িয়া এক আনা পরিমাণ বড়ি তৈয়ার করিয়া, ঐ বড়ি প্রাতে ও বৈকালে একটা মুখে রাখিলে কাশী আরোগ্য হয়। তুলসী পাতার, আদার বা পানের রস এবং শুঁটের ক্বাথ উপকারক।

লবঙ্গ, পিপুল, আমলকী, শুলফের বীজ, বংশলোচন, বহেড়া প্রত্যেক এক এক তোলা, কাল মরিচ ৫ তোলা, সোঁট ৮ তোলা আর ১৯ তোলা মিছিরি—সমুদায় কুটিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া শিশিতে করিয়া রাখিবে। যে সময়ে কাশি হইবেক সেই সময়ে আধ মাসা এই ঔষধ খাইবে; কিন্তু তাহার পর দুই ঘণ্টা জল খাইবে না।

ক্রিমি—ভাঁট পাতার রস বা আনারসপাতা চুণের জলে ছেঁচিয়া সেই রস, বা জাম খাইলে আরোগ্য হয়।

কুক্কুর-দংশন—ইহার এক উত্তম ঔষধি এই যে গাধার মাংস বা রক্ত ৬ মাসা গুড়ের সহিত ৩ দিন খাইতে দিলে আর কোন পীড়া থাকিবে না। ইহাতে শৃগালবিষও নষ্ট হয়।

গরল—শিরীষের শিকড় মনসার আঠার

সহিত বাটিয়া লাগাইলে সকল প্রকার গরল আরোগ্য হয়।

ঘা—কয়েৎ বেলের কাষ্ঠ হকার জলে চন্দনের ন্যায় ঘসিয়া কত স্থানে লাগাইয়া তাহার উপর হকার জলে নেকড়া ভিজাইয়া পটি বাঁধিয়া ১ দিন অথবা ২ দিন রাখিলে পারা সংযুক্ত অথবা যত দিনের যে প্রকারের ঘা হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ব্রণ হইলে পাকা গাব খাইবে।

চক্ষু রোগ—খাঁটি সরিষার তৈল চক্ষুতে ফুট দিলে সকল প্রকার চক্ষু উঠা, পিচুটি পড়া ২।৩ দিনে আরোগ্য হয়। (২) লাউ গাছের কচি আঁকড়ার রস চক্ষুতে ফুট দিলে চক্ষু উঠা সারে। চোখ বড় কর কর করিলে গরম দুধের ভাব বড় উপকারক।

ছানি—এ রোগের অতি সহজ ও চমৎকার ঔষধ এই যে ভাল দেশি নিষেদল অতি পরিষ্কার পাত্রে খুব পিসিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া উহা কিঞ্চিৎ মাত্রায় প্রত্যহ ছানির উপর ছড়াইয়া দিলে ২০।২৫ দিনের মধ্যে ছানি কাটিয়া চক্ষু পরিষ্কার হইবেক। যে সময়ে উক্ত ঔষধি লাগাইবে সেই সময় এক তোলা ঘি গরম করিয়া এক তোলা চিনি আর কিঞ্চিৎ সোল মরিচের গুঁড়া বেশ মিশাইয়া লাড়ু পাকাইয়া সকালে খাইবে।

ছুলি—হলুদের ফুলের ভিতর যে এক প্রকার জল থাকে ঐ জলে চন্দন ঘসিয়া ঐ চন্দন গাত্রে লেপন করিলে ছুলি আরোগ্য হয়।

জ্বর—শিউলি ফুলের পাতার অল্প পরিমাণে সৈন্ধব লবণ দিয়া রগড়াইয়া রস বাহির করিয়া ঐ রস আধ ছটাক আন্দাজ মধু দিয়া প্রাতে দুই দিন খাইলেই সহজ জ্বর আরোগ্য হয়। আর বেলপাতা ও কালমেঘের রস এবং চিরতা ও নিমছালের কাথ দেওয়া যাইতে পারে। পিত্তের জ্বরে আনারস উপকারক।

টাক—পুরাতন সজিনা গাছের ছালের রস টাকের উপর ঘসিয়া দিলে ২।৪ দিনের মধ্যে টাকের উপর চুল উঠে। সজিনার বীচির তৈল মাথায় ব্যবহার করিবে। অথবা একটা পেয়াজ দুই খানা করিয়া তাহার উপর কিঞ্চিৎ কাশীর চিনি ছড়াইয়া টাকের উপর প্রত্যহ ঘষিলে চুল উঠিবে।

তৃষ্ণা বা নেকার—আমসত্ত্ব মুখে রাখিবে।

দাদ—গোদালের কচি পাতা নেবুর রসে বাটিয়া প্রলেপ দিলে দাদ এক দিনেই সারে।

দাহ—পলতা, ওলক ও আমলার রসে দাহ আরোগ্য হয়।

দাঁত—চিকি সুপারির ভস্ম ১ তোলা, বাঁশের কয়লা ১০ তোলা, দগ্ধ করা তুঁতে সিকি তোলা একত্রে মাড়িয়া মাজন প্রস্তুত করিলে ঐ মাজনে দাঁত নড়া, দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়া ইত্যাদি আরাম হয়।

নিম্নলিখিত মঞ্জনটি বড় চমৎকার, ইহা দ্বারা মুখ প্রত্যহ দুই এক বার ধৌত করিলে সকল প্রকার দন্তরোগ আরোগ্য হয়, এবং নড়া দাঁত পর্য্যন্ত কিছু দিনের মধ্যে শক্ত হইয়া উঠে আর রক্ত বা পূঁজ পড়া একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, যে দাঁতে বা মাড়িতে ব্যথা সেখানে মাজন টিপিয়া টিপিয়া দিতে হইবেক।

ফুল খড়ি	৫ তোলা
চিকি সুপারি (ঝলসান)	৩ তোলা
হরিতকী চূর্ণ	৩ তোলা

শাপড়ি খয়ের	২	তোলা
উনুনের পোড়া মাটি	২	তোলা
কটকিরি (কাঁচা)	১	তোলা
ঐ পোড়া		তোলা
তুতে ভস্ম		তোলা
কর্পূর		তোলা
গোলমরিচ		তোলা
লবঙ্গ		তোলা
নিমপাতা		তোলা
দোক্তা তামাক		তোলা
ছোট এলাচ		তোলা
আফিম	।০	তোলা

এই সমুদয় মসলা উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া বোতলে পুরিয়া রাখিবে। যদ্যপি ইহা অধিক কাল বা কটু বোধ হয় তো ফুলখড়ি চূর্ণ কিছু বেশি করিয়া মিশাইয়া লইবে। বাসভেরাণ্ডার দাঁতন বা বাসভেরাণ্ডার আটা দাঁতে লাগান অতি উপকারক।

ধবল—বাঁচে কলার খোসার ভস্ম, তালের জটার ভস্ম, গোদন্তী হরিতালের সহিত সমভাগে জলের সহিত বাটিয়া এক সপ্তাহ প্রলেপ দিলে গাত্রে সাদা সাদা দাগ হইলে তাহা কাল হইয়া যায় এবং ক্রমে কাল দাগ উঠিয়া গিয়া স্বাভাবিক বর্ণ হয়।

নালী ঘা—গাওয়া ঘি ১ পোয়া, ভাল মোম ৪ তোলা, তেপাতি গাছের রস ১ ছটাক। প্রথমতঃ ঘি আগুনে চড়াইয়া খুব গরম হইলে মোম দিয়া আবার জ্বাল দিবে, তাহার পর নামাইয়া ঐ তেপাতি পাতার রস দিয়া পুনরায় আগুনে চড়াইয়া জ্বাল দিবে যে পর্য্যন্ত না সেই রস উত্তমরূপে মিলিয়া যায়; পরে নামাইয়া ইহাতে ১ সের শীতল জল ঢালিয়া দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। পরে শীতল হইলে ঐ ঘৃত কাচের বা পাথরের পাত্রে রাখিবে। ঘা নিম জলে ধুইয়া ঐ ঘি পুরাতন তুলার উপর দিয়া পটি করিয়া বাঁধিবে, ইহাতে সকল প্রকার নূতন ও পুরাতন ঘা অতি শীঘ্র আরোগ্য হইবেক, আর যদ্যপি বহু দিবস আরোগ্য না হয় এবং তাহার ভিতর নালী হইয়া সর্ব্বদা পোর পড়ে তাহা হইলে অশ্বত্থ ছাল, চিকি শুপারি, খরগোসের হাড়, কচ্ছপের পিঠের হাড় ও ভাত এই সকল পোড়াইয়া তাহার ছাই সমভাগে মিশাইয়া ঘায় প্রত্যহ ৫।৬ বার টিপিয়া টিপিয়া দিবে, তাহাতে পোর বন্ধ হইয়া পীড়া আরোগ্য হইবে। খরগোসের হাড় না পাইলেও ক্ষতি নাই। এ ঔষধিতে ভগন্দর পর্য্যন্ত আরোগ্য হইতে পারে। হাকরমালীর আঠা নালি ঘার পক্ষে বড় উপকারক।

পক্ষাঘাত—পুরাতন (অভাবে নূতন) গাওয়া ঘৃত একসের ও সদাবরীর রস এক সের একত্রে মিলাইয়া উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা গরম করিয়া যদ্যপি ১০।১২ ঘণ্টা কাল মালিস করা যায় তাহা হইলে পক্ষাঘাত আরাম হয়।

পাঁচড়া—পুরাতন বেগুণ গাছের পাতার এক তোলা ভস্ম, আধ ছটাক সর্ষপ তৈলে মিশ্রিত করিয়া পাঁচড়ায় দিলে অতি শীঘ্র আরাম হয়। হলকসা ফুলের পাতা হুঁকার জলের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে এক দিনে আরোগ্য হয়।

পালাজ্বর—এক দিন অন্তর হইলে নিমুকালতা জ্বরের দিবস প্রাতঃকালে হাতে তাগা বাঁধিলে এক দিনেই জ্বর আরোগ্য হয়। (২) সাদা বক ফুলের পাতার রস নেকড়ার পুঁটলি করিয়া ঘ্রাণ লইলে ঠক্

দিন অন্তর কিম্বা ২ দিন অন্তর জ্বর এক দিনেই আরোগ্য হয়। উক্ত টোট্‌কা, বাসী হাতে বাসী মুখে করিবে।

পেটের পীড়া—আপাঙের শিকড়ের রস আধতোলা পরিমাণে ২।৩ দিন খাইলে উদরাময় আরোগ্য হয়, কিন্তু ইহা গর্ভবতী স্ত্রীলোককে দিবে না। মুথার রস ও বেল-শুঁঠার কাথ উপকারক। পথ্য—গরম ভাত জলে ধুইয়া ও কই মাছের ঝোল দিয়া খাইলে শীঘ্র পরিপাক হয়।

পৃষ্ঠস্তম্ভ, উরুস্তম্ভ, প্রভৃতি—চিতার শিকড় বাটিয়া প্রলেপ দিলে আরাম হয়। আর ঘুঘুগির ডিমের কুসুম সমভাগ কলি চুনের সহিত মিলাইয়া প্রলেপ দিলেও সারে।

প্রমেহ—বটের আটা কোটা ঈষৎ কাশীর চিনির সহিত মিশাইয়া স্নানান্তে গিলিয়া খাইবে। পাকা গাব ও চেড়সের তরকারি উপকারক।

প্রীহা যকৃৎ—বিষ কাঁটালের পাতার রস এক কাঁচ্চা পরিমাণে প্রাতে ১ বার করিয়া এক সপ্তাহ খাইলে আরোগ্য হয়।

বহুমূত্র—যজ্ঞ ডুমুরের বীচির গুড়া এক আনা পরিমাণ কাশীর চিনির সহিত খাইলে বহুমূত্র আরোগ্য হয়। কেবল মাখন-তোলা দুগ্ধ খাইয়া ২০।২৫ দিন থাকিতে পারিলে এ রোগ আরাম হয়। মোচার রস, যজ্ঞ-ডুমুরের রস, ঝিঙ্গা পোড়ান রস, বা কিস্‌-মিস্‌ উপকারক।

বাধক—ওলটকম্বলের শিকড় সিকি ভরি ও মরিচ ৮টা, জলে বাটীয়া ২। ৩ দিন খাইলে স্ত্রীলোকদিগের বাধক বেদনা আরাম হয়। (ঋতুকালীন খাইতে হয়)।

বিছা ইত্যাদি তাড়ানর ঔষধ—আঁবের কশী এক পোয়া, এক পোয়া জলে ১০।১২ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া পরে ছাঁকিয়া সেই জল বোতলে পুরিয়া রাখিবে, বিছা, বোলতা, ভিমরুল প্রভৃতি কামড়াইলে ঐ জল দষ্ট স্থানে ২।৪ ফোটা দিলে অচিরাৎ জ্বালা নিবারণ হয়।

বোল্‌তা বা মৌমাছি কামড়াইলে সরিষা বা কেরসিন তৈল লাগাইবে। মাকড়সা কামড়াইলে ঘি আর লবণ মিশাইয়া লাগাইবে। হুঁয়াপোকার কাঁটা লাগিলে চুণ লাগাইবে। হাতে চুবিপোকা লাগিলে তেলাকুচার পাতা হাতে রগড়াইবে।

বিষ ঘা—বিষাক্ত হইয়া কোন স্থান স্ফীত হইয়া বেদনাযুক্ত হইলে ছাগলনাদি, পোড়া ছাই, তেলাকুচা পাতার রসের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে ১২ ঘণ্টার মধ্যে স্ফীত স্থান পাকিয়া পুঁজ নির্গত হইয়া আরোগ্য হয়।

বিষ ভক্ষণ—যে কোন প্রকার বিষ পান করুক না কেন প্রথমতঃ খুব বমি করাইয়া করাইয়া তাহার পর এক তোলা জঙ্গলি নটে শাকের শিকড় পিষিয়া চারি তোলা জলে গুলিয়া খাওয়াইবে, এইরূপ দুই তিন দিন দিবে, তাহার পর এক ছটাক চালনি জলে কিঞ্চিৎ লেবুর রস দিয়া তিন চারি দিন খাইতে দিবে। তাহা হইলে কোন শেষ উপসর্গ থাকিবে না। বিষাক্ত ঔষধ অধিক মাত্রায় খাইলে গোহাগা খাইতে দিবে।

মাথা ধরা—লবঙ্গ বাটিয়া, কিম্বা সর্ষপ বাটিয়া মাথায় প্রলেপ দিলে মাথা ধরা অতি শীঘ্র আরোগ্য হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্র—সোরার জল, স্থলপদ্ম পত্রের রস বা তেলাকুচা পাতার রস খাইলে প্রস্রাব হয়।

মৃগী—ইহার চমৎকার দেশি ঔষধি এই যে উটের নাকের পোকা দুই বা তিনটা, কাঠবিড়ালির বৃষ্টা আধ ছটাক, কেউটে সাপের অর্দ্ধেক খোলস, আর শোঁট এক-খানা এই সমুদায় পিষিয়া ৩ মাসা গুঁড়া লইয়া কাগজে জড়াইয়া পীড়ার সময়ে ৩।৪ দিন নাকে ঘুম দিলে অবশ্য পীড়া আরোগ্য হইবেক।

মেহ ঘটিত জ্বর—চাঁপাফুলের পাতার রস এক কাচ্চা মধু দিয়া প্রাতে ২। ৩ দিবস খাইলে আরোগ্য হয়। (২) কাঁচা কলসার ছাল ২ তোলা পরিমাণে থেঁত করিয়া ২ তোলা নিছরির সহিত ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে এক সপ্তাহ খাইলে মেহ ও মেহ-ঘটিত জ্বর অরোগ্য হয় আর উহাতে ধাতু পুষ্টি করে।

রক্তপাত—গাঁদা ফুলের পাতা বাটিয়া আঘাত কিম্বা কাটার জন্য রক্তপাত হইলে ঐ স্থানে লাগাইলে রক্ত বন্ধ হয়, ও বেদনা নিবারণ করে। কটকিরি ও বাবলার আটার গুড়া দিলেও রক্ত বন্ধ হয়। দূর্ব্বা, আম্রা-পান, কুকুরিম বা ডুমুরের রস বা শীতল জল বা বরফ দিলে রক্ত বন্ধ হয়।

রক্তপিত্ত বা বাতরক্ত—একটা বেলপাতা ৪। ৫ গাছা দুর্ব্বাঘাসের সহিত প্রত্যহ প্রাতে বাটিয়া খাইলে এক মাসের মধ্যে রক্তদোষ বা বাতরক্ত আরোগ্য হয়।

রাতকানা—দেশি পানের রস এক ফোটা করিয়া সন্ধ্যার সময় চক্ষুতে দিলে রাতকানা দশ মিনিটের মধ্যে আরোগ্য হয়।

শূল ব্যথা—হঠাৎ নূতন শূলব্যথা উপস্থিত হইলে কালু চা (চিনি ও দুধ না দিয়া) এক গেলাস গরম গরম খাইলে দাস্ত খোলসা হইয়া উপকার হইবেক। যে সময়ে ব্যথা অতিশয় প্রবল হইয়া রোগী অতিশয় কষ্ট পায় সে সময়ে তাহাকে চিত করিয়া শোয়াইয়া নাইএর চারিদিকে শোয়ার গুঁড়া ছড়াইয়া সরু নেকড়া দিয়া ঢাকিয়া উহার উপর শীতল জলের ঝাপটা মারিলে তৎক্ষণাৎ ব্যথা কমিয়া যাইবেক। বরফের টুকরা বা শীতল জলের পটী বা নীল নাইএর চারিদিকে লাগাইলেও অনেক উপকার হয়।

সর্প বিষ—সদাবরীর মূল বাটিয়া সর্পদষ্ট স্থানের উপর দিলে এবং ঐ মূলের রস ১০ মিনিট অন্তর খাওয়াইলে সর্প বিষ নষ্ট হয়। ঘৃত ও কাঁঠাল বিষনাশক।

সর্প দংশন—বিষ আঁকড়ার পাতার রস অল্প পরিমাণে ক্ষত স্থানে দিলে সর্প বিষ নিবারণ হয়।(২) জয়পাল ঘসিয়া চক্ষুতে ফুট দিলেও সর্প বিষ নিবারণ হয়। আমরুলের পাতার রস আধ ছটাক পরিমাণে ১৫ মিনিট অন্তর খাইলে উপকার হয়। সাপে কামড়াইলে তৎক্ষণাৎ এক তোলা ফট্‌কিরি পিষিয়া গরম জলে মিশাইয়া খাওয়াইলে অতিশয় বমকার হইবে; তাহার পর যজ্ঞ ডুমুরের ছালের রস এক ছটাক খাওয়াইয়া দিবে। অথবা তেঁতে কচরিয়া (বুনো কাঁকুড়ের) শিকড় এক তোলা ও ২।০ টে গোলমরিচ জলে পিষিয়া খাওয়াইয়া দিবে, বা অকুলা কাঁকুড়ের শিকড় পিষিয়া সমভাগ ঘির সহিত দষ্ট স্থানে লাগাইবে ও খাওয়াইয়া দিবে। অজ্ঞান হইয়া পড়িলে পুরাতন দেয়ালের মাটি এক মটর পরিমাণে পানের বোঁটার রসে খাইতে দিবে। শিরীষ গাছের পাতা, ফুল, ফল, শিকড় ও ছাল জলে পিশিয়া লাগাইবে, খাইতেও

নসা লইবে। অথবা চাঁপানটিয়ার শিকড় চালুনি জলে বাটিয়া ঘির সহিত খাইবে।

মনসা, শ্বেত করবী, বক, শ্বেতকুঁচ, কনক ধুতুরা ও শ্বেত আকন্দ এই সকল গাছের মধ্যে যথাপ্রাপ্ত গাছের শিকড় সমভাগে লইয়া জলে পিষিয়া খাওয়াইবে ও নামাইয়া দিবে।

শ্রীক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

হেমচন্দ্র।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বড় রৌদ্র। গাছে পাতায় চারি দিকে যেন ধূ ধূ আগুন জ্বলিতেছে, আর একেলা পৃথিবী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে সেই বেড়া-আগুনে পুড়িতেছে। বায়ু অগ্নিবৃষ্টি করিতেছে, রাস্তার ধুলাগুলা গাত্রদাহে এদিক্ ওদিক্ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। জগৎ স্থির, নীরব, স্তম্ভিত। মাঠে গরু চরে না, গাছে পাখী ডাকে না, পথে লোক চলে না;—সর্ব্বত্র খাঁ খাঁ করিতেছে। বেলা আন্দাজ ১টা।

বসন্তপুর অতি ক্ষুদ্র গ্রাম, তাহার রাস্তা ঘাটগুলিও অতি ক্ষুদ্র, তাহার কোথাও বড় একটা কাহারও সাড়া মিলে না। কেবল পথের পার্শ্বে ক্বচিৎ একটা ষাঁড় চোখ বুজাইয়া রোমন্থ করিতেছে, ক্বচিৎ একটা কুকুর জিহ্বা বিস্তার করিয়া শুইয়া ধুঁকিতেছে, ক্বচিৎ বা দুই জন কাঠুরিয়া গায়ে তেল, কাপড়ে জলপান, কাঁধে কুঠার লইয়া সূর্য্যের উদ্দেশে নানা অভদ্রোচিত গালি পাড়িতে পাড়িতে হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছে। তা ছাড়া, অধিকাংশ স্থল নির্জ্জন। আর নির্জ্জন ছিল না কেবল সেই রাস্তার ধারে এক খানি ছোট দোকান। দোকানের সুমুখে একটা প্রকাণ্ড মাচা, তার উপর নারিকেল পাতার ছাউনি; পাতাগুলা কতক বুনিয়া পড়িয়াছে, কতক রৌদ্রে পুড়িয়া ঝরিয়া গিয়াছে, কোন খানে পাতার সখা পর্য্যন্ত লক্ষিত হইতেছেনা, সুতরাং সেই মাচার নিচে যে ডাবের কাঁড়ি গাদা হইয়া পড়িয়া আছে, তাহা সূর্য্যের তাপে ভাল রকমই ঠাণ্ডা হইতেছিল। দোকানের ভিতর এক ধারে শুণ পাতিয়া খুঁটি ঠেসান দিয়া বসিয়া গ্রামের দুই এক জন মোড়ল তামাক খাইতেছে, আর দোকানীর সঙ্গে গল্প করিতেছে। উপস্থিত সকলেই প্রায় সেই গল্পে যোগ দিয়াছে, সবাই হাসিতেছে, বকিতেছে, হাত নাড়িতেছে, মুখভঙ্গি করিতেছে; কেবল এক ধারে নীরবে দুই জন বসিয়া আছে। উভয়েরই পায়ে এক হাঁটু ধুলা, উভয়েরই পরিধের অতি মলিন, উভয়েই শীর্ণ—উভয়ে উভয়ের সঙ্গী। তাহারা দুইজনেই আগন্তুক। দুই জনেই ব্রাহ্মণ। একজন শ্যামবর্ণ, আর একজন ঘোর কৃষ্ণ। একজন নতমুখে বসিয়া

চিন্তা করিতেছে, আর একজন এক এক বার মাথা হেঁট করিতেছে আবার তৎক্ষণাৎ তির্য্যকনয়নে এদিক্ ওদিক্ চাহিতেছে, আর কত কি ভাবিতেছে। ইহারা অন্য কেহ নয়, আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত হেমচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ।

হেমচন্দ্রের চিন্তার কূল কিনারা নাই। সে কি একটা? কোন্‌টা রাখিয়া কোন্‌টা ভাবিবে? একেবারে যে সব গুলা আসিয়া মনের ভিতর হোলপাড় করিতেছে! তেমন একটা ঘটনা ঘটিলে লোকে অধীর হইয়া পড়ে, আর এ উপর্য্যুপরি বিপদের পর বিপদ, সে কেমন করিয়া সামলাইবে? ভগবন্ কেন এমন করিলে? যাহাকে মারিবে মনে কর তাহাকে কি এমনই করিয়া মারিতে হয়! সেই মা—সেই আনন্দময়ী জননী চিরদিনের জন্য অভাগাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন—আজও দশ রাত্রি অতীত হয় নাই—সে শোক কি ভুলিবার? তার পর এ কি! বসুমতী! বসুমতী কে? কেন তাহার জন্য প্রাণ কাঁদে? ঘোর দুর্য্যোগের সময়ে একবার বিজলীর ন্যায় দেখা দিয়া, অভাগার অন্ধকার হৃদয় আরও অন্ধকারতর করিয়া, কোথায় লুকাইল? হেমের স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে এ কেবল তাহারই অদৃষ্টফল। নহিলে সেই প্রকৃতিপুতলী এতদিন তো কোথাও যায় নাই! তাহার মাতা, প্রতিবেশীমণ্ডলী, গ্রামস্থ সকলেই যে তাহার জন্য হাহাকার করিতেছে। বুঝি তাহার সহিত দেখা না হইলে সে বালিকার এ অবস্থা ঘটিত না। হেম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, মাতৃশ্রাদ্ধের পর একটু সুস্থির হইয়া ভাল করিয়া তাহার অনুসন্ধান করিবে; কিন্তু কি দৈববিড়ম্বনা! হেম তাড়াতাড়ি চতুর্থের দিন বহিয়া যায় বলিয়া, ছুটিয়া বাড়ী আসিল, বাড়ী প্রবেশ করিতে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহারা ভগ্নহৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিল, সে বহুজনপূর্ণ প্রকাণ্ড পুরী শূন্যময়, ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ, একা বিরাজ ভিন্ন সে বাড়ীতে আর কেহ নাই। বিরাজ হেমকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সব বলিল। শুনিয়া হেম বসিয়া পড়িল, অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিল না। বহুক্ষণ পরে হেম উঠিয়া দাঁড়াইল, বাষ্পপীড়িত কণ্ঠে বলিল "বিরাজ, আমি আসি।" তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল। বিরাজ বলিল "রাত্রি হইয়াছে, কোথা যাইবে, মুখে জল দাও।" হেম কোনও কথা বলিল না। কথা বলিবার ক্ষমতা তখন তাহার ছিল না। নির্ব্বাকে বাহিরে আসিল। বাহিরে রামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়াছিল, সে হেমের মূর্ত্তি দেখিয়া ব্যাকুল বনিয়া গেল। কিছু বলিতে সাহস করিল না। সংক্ষেপে হেম তাহাকে দুই এক কথায় সব বুঝাইয়া তাহার হাত ধরিয়া বাটীর বাহির হইলেন! অবাক্ হইয়া বিরাজ দাঁড়াইয়া রহিল। সেই রাত্রেই হেম কত স্থানে খুঁজিল, কত লোককে মনোরমার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিল, কেহই কিছুই উত্তর দিতে পারিল না। তখন দুইজনে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, রৌদ্র বৃষ্টি তুচ্ছ করিয়া, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অন্বেষণ করিতে লাগিল। পাঁচ দিন কাটিয়া গেল, কোন সন্ধানই মিলিল না। বড় রৌদ্রে ঘুরিতে ঘুরিতে হতাশাসে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আজ দুইজনে আসিয়া এই দোকানে বসিয়া পড়িল। বসিয়া পর্য্যন্ত হেম কেবল আপনার দুর্ভাগ্যের বিষয়ই আলোচনা করিতেছে। মনোরমা—মনো-

হয়া কোথায়? সংসারের একটী মাত্র যে বন্ধন ছিল তাহাও ভগবান্ ছিন্ন করিয়া দেন! বিধাতঃ তোমার এ কেমন বিচার ঠাকুর? এই কি তোমার দয়াময় নামের মহিমা? হেম প্রতিজ্ঞা করিল, যদি মনোরমার দেখা না পাই তবে এ শূন্য পৃথিবীর বোঝা হইয়া আর থাকিব না। কিন্তু তাহাও তো এখন হইতেছে না, আজও যে মাতৃ-অশৌচের কাচা গলা হইতে নামে নাই! নয় দিন হইয়া গেল, কাল অশৌচান্ত পরশ শ্রাদ্ধ। তাহারই বা কি হইবে? সে কথা মনে হওয়ায় হেম আকুল হইয়া উঠিল, এতদিন এ কথা ভাবিবার অবসর পায় নাই। কি হইবে? উপযুক্ত সন্তান জীবিত থাকিতে মাতার প্রেতকৃত্য হইবে না? বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। হেম গাঁটে হাত দিয়া দেখিল আর পাঁচ গণ্ডা পয়সা মাত্র সম্বল আছে, সে তো আর দুই দিন রামকৃষ্ণের আফিমের খরচেই যাইবে। রামকৃষ্ণ আর কিছু খায় না খায় দুবেলায় আধ ভরি আফিম নহিলে কোন মতেই চলে না। একদিন মৌতাতের সময় একটু বহিয়া যাওয়ায় তিনি মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিলেন, হেম সেই পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণের জন্য আগে আফিমের যোগাড় রাখিয়া তবে অন্য কিছু করিত। হেম দেখিল, পাঁচ আনার পয়সা মাত্র—আর কিছু নাই। চক্ষে জল আসিল। নিঃশব্দে তাহা মুছিয়া ফেলিল। একবার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিবার জন্য প্রাণ আকুলি ব্যাকুলি করিয়া উঠিল, হেম তাহা পারিল না। পারিলে বুঝি ভাল হইত। বড় কষ্টে এক মাত্র সান্ত্বনা রোদনে; সে রোদনে যে বঞ্চিত তাহার আর হতভাগ্য আর নাই।

হেমের চিন্তার আর তো 'ওর' নাই, রামকৃষ্ণও নিশ্চিন্ত নহে। ভাবিতেছে, "এ কি? কোথায় শ্বশুরালয়ে কিছু টাকাটা সিকাটা পাওনার আশায় গেলাম, তা না হইয়া এ কি বিপদ্ জড়াইয়া ধরিল? চলিয়া গেলেও তো যাইতে পারি, কিন্তু তাও যে পারি না কেন? হেমকে এ বিপদে একা ফেলিয়াই বা যাইতে মন সরে না কেন? শ্যালক তো গণ্ডায় গণ্ডায় অনেক আছে, তাহাদের কাহারও অন্য মন তো কখন এমন হয় না, তবে হেমের জন্য হঠাৎ কেন এমন হইল? এ অতি অন্যায়। কুলীনের হৃদয়ে এত দয়া ভাল নয়। অতি শক্তটা বড় খারাপ; ইহাতে ব্যবসা মারা যাইবার লক্ষণ। আর মনোরমা?—মনোরমা স্ত্রীটা নিতান্ত মন্দ নয়। তাহাকে পাইলে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু পাওনা সম্বন্ধে আর কস্মিন্ কালে কোন সম্ভাবনা নাই। পিতার আজ্ঞা, শ্বশুরবাড়ী হইতে মাসিক অন্ততঃ দশ টাকা না পাইলে স্ত্রী গ্রহণ নিষেধ। পিতৃ-আজ্ঞাই বা অবহেলা কি করিয়া করা যায়?" রামকৃষ্ণ একটু বিষণ্ণ হইল, নিস্তব্ধে মনের তোলপাড়ে পিতৃ-আজ্ঞা ও স্ত্রী গ্রহণ দুইটী বিষয় তুলনা করিতে লাগিল। সহসা পেটের ভিতর চিড়িক্ পাড়িয়া উঠিল। সেই বসুমতীদের বাড়ীতে যে আহার হইয়াছিল, তার পর আজ কয় দিন একরূপ আহার নাই বলিলেই হয়। পথে পথে দোকানে ঘাটে দুই এক আনার জল খাবারে সে ক্ষুধার কি হইবে? ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় রামকৃষ্ণ একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিল। দেখিল, সেই দোকানের দক্ষিণ ধারে একটা মাচার উপর তবকে তবকে আহারীয় সামগ্রী সাজান রহিয়াছে

ইহা সে দোকানে প্রবেশ করিবার সময়েই দেখিয়াছিল। এখন একবার ভাল করিয়া দেখিয়া তাহাদিগের সহিত তাহার সেই উদ্রিক্ত ক্ষুধার কি সম্বন্ধ তাহাই বিচারে প্রবৃত্ত হইল। আগে বলা হয় নাই, ইহা একখানি ময়রার দোকান। সেই মাচার উপর ছোপাও চেঙ্গারি করা চিঁড়া, মুড়কি, মুড়ি, কোথাও থালার উপর কদমা, বিরখণ্ডি, বাতাসা, আর সকলের উপর এক থালা সন্দেশ—এ সব এক সঙ্গে মিলিয়া কি অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়া রামকৃষ্ণের সম্মুখে বিরাজ করিতেছে! রামকৃষ্ণ আরও একটু ঊর্দ্ধদৃষ্টে চাহিল। দেখিল, তাহারই উপর একদিকে শিকায় চারি পাঁচ খানি সৈ রহিয়াছে, আর পার্শ্বে কাঁচার পাকায় এক কাঁদি মর্ত্তমান কলা ক্ষুদ্র এক গাছি দড়ি অবলম্বনে রূপের দোলায় দুলিতেছে। রামকৃষ্ণ আরও দেখিল, মাছি, মৌমাছি, বোলতা সেই স্থানটীকে একেবারে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। দেখিয়া রামকৃষ্ণের মনে বড়ই কষ্ট হইল। এই সব সামগ্রী দেবতা ব্রাহ্মণের সেবায় না লাগিয়া কি না কতকগুলা বৎসামান্য কীট পতঙ্গের ভক্ষ্য হইতেছে, ইহা ভাবিয়া রামকৃষ্ণ ময়রার চতুর্দ্দশ পুরুষের উদ্দেশে মনে মনে বিস্তর গালি দিল। ভাবিল, "ময়রা জাতি কি বোকা, আমি রামকৃষ্ণ শর্ম্মা—স্বকৃতভঙ্গের বেটা—আমি আসিয়া ইহার দোকানে বসিয়াছি, দোকান পবিত্র হইয়া গেল, তা, ও কি না চিনিতে পারিল না, এমন সুযোগ হাতে পাইয়াও এত বড় পুণ্যটা সঞ্চয় করিতে পারিল না। বেশি কি, ফলাহারের যোগাড়টা ভাল রকম করিয়া দিলেই হইত; দক্ষিণা! তাহা না হয় নাই লইতাম।"

রামকৃষ্ণ যতক্ষণ ময়রা জাতির নির্ব্বুদ্ধিতা ভাবিয়া তাহার উদ্ধারের পথ আলোচনা করিতেছিল, ময়রার পো ততক্ষণ তক্তাপোষের উপর বসিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে হুঁকা টানিতেছিল, আর মোড়লদের সঙ্গে গল্প করিতেছিল। দোকানী ব্রাহ্মণ দুই জনকে দেখিয়া, এক সঙ্গে দুইটা খরিদ্দার লাভ হইল ভাবিয়া, "আসুতে আজ্ঞে হয়, বসুন" বলিয়া প্রথমে বড় খাতির যত্ন করিয়াছিল। এখন দেখিল, এ ছুয়ো খরিদ্দার, ভাবগতিক বড় ভাল নহে। সুতরাং দোকানীও আপনার পূর্ব্বের ভাব পরিবর্ত্তন করিল। এখন আর সে তেমন যত্ন করিয়া কথা কহে না, পা ধুইতে বলে না, নজে তামাক সাজিয়া আগে রামকৃষ্ণকে হুঁকা দেয় না। এখন তামাক খাইবার বড় ইচ্ছা হইলে ঘপবার চাহিতে চাহিতে তবে দোকানী একবার কলিকাটী খুলিয়া দেয়, তাও যাহা দেয় সে পোড়া 'গুল' মাত্র। দোকানীর ব্যবহারে রামকৃষ্ণ মনে মনে বড়ই চটিয়া গেলেন। তাহার সর্ব্বনাশের বিধান সূচক অনেক কথা মনে মনে উচ্চারণ করিয়া মৌনভাবে বসিয়া রহিলেন। দোকানী গদিয়ান হইয়া সেই ভাবেই তামাক খাইতে খাইতে গল্প করিতে লাগিল।

গল্পটা এমন কিছু একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয় লইয়া হইতেছিল না। কথায় কথায় যাহা উঠিতেছিল, তাহাই লইয়া আলোচনা হইতেছিল। যাহার যতদূর অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শন সে সেই সমস্ত প্রয়োগ করিতে ত্রুটী করিতেছিল না। প্রথমতঃ সেই দিনের সেই প্রচণ্ড রৌদ্র লইয়াই গল্প উঠিল। রৌদ্রের কথা যখন পড়িল তখন

অবশ্যই সেই রৌদ্রের ভাবী ফল যাহা তাহারও কথা পড়িল। সুতরাং অজন্মা ও সাধারণ শস্যের অবস্থা-ঘটিত আলোচনা আরম্ভ হইল। অজন্মা হইতেই মন্বন্তরের কথা। এই সময়ে নাকে হইতে একজন একটু টীকা করিয়া স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন, ঘোর কলি বলিয়াই এই সব দুর্ঘটনা ঘটিতেছে, পৃথিবী আর অল্প কালই থাকিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্রমে মন্বন্তর হইতে ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের কথা উঠিল। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার বর্ণনা আরম্ভ হইল। তাহা কেহ দেখে নাই, সকলেরই শোনা কথা, যে যেমন শুনিয়াছিল সে তেমনি বলিতে লাগিল; যে শুনে নাই সে আরো বেশী করিয়া বাড়াইয়া বলিল। সেই মন্বন্তরে নাকি পেটের দায়ে কত লোকে পুত্র কন্যা বিক্রয় করিত, কত কত বড় ঘরের মেয়ে অনাহারে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। ইহাই ধরিয়া প্রসাদ বলিল, সে ছেলেবেলা তার আয়ির মুখে শুনিয়াছে, তাহার আয়ির পিসতুতো ননদের শ্বশুরের নাকি সেই সময়ে একটী মেয়েকে কুড়াইয়া পায়, তার মত রূপ বিশ্বসংসারে কেহ কখন দেখে নাই। প্রসাদ যখন বলিল, তখন, নফরই বা ছাড়িবে কেন? সেও এমনি দুই একটা দৃষ্টান্ত দিয়া গল্প বড়ই জমাইয়া তুলিল। তখন অন্য কথা গিয়া স্ত্রীলোকের রূপের কথা আন্দোলন হইতে লাগিল। নিধু বিধু, হারাণী পরাণী, জগা মাগা ইত্যাদি অনেক নামের পর শেষ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল, আজ দুই দিন হইল যে মেয়েটীকে পদ্মর মা পথে একেলা দেখিয়া বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইবার জন্য যত্ন করিয়াছিল তাহার মত রূপ কেহই কখন দেখে নাই।

কথাটা হেমের কাণে বাজিল। অমনি সর্ব্বশরীর যেন চাঁই করিয়া উঠিল। হেম আপনার চিন্তা রাখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য একবার সেই গল্পের প্রতি মন দিল। রামকৃষ্ণ তখনও তাহার নিজের উচ্ছিষ্ট ক্ষুধা আর সম্মুখে শোভমান অথচ সেই অস্পৃষ্ট দ্রব্য-সামগ্রী, আর তরুণীভার্য্যার বৃদ্ধ স্বামীর ন্যায় সেই সব দেবভোগ্য সামগ্রীর অধিকারী এই নির্ব্বোধ বোকা মন্বন্তর বেটা এই সকল তত্ত্বের মীমাংসা লইয়া বিব্রত ছিল; সুতরাং এ গল্পের প্রতি মন দিবার সময় তাহার ছিল না।

হেম শুনিলেন, দোকানী বলিতেছে. "মেয়েটী বোধ হয় কোন বড় ঘরওয়ানা হইবে।"

অন্য একজন বলিল "তাই বা কেমন করিয়া বলি। পরনে তো দেখিলাম, এক-খানি সামান্য চিকুট!"

দোকানী বলিল "বোধ হয় বড় ঘরের মেয়ে, এখন আর সে অবস্থা নাই। বড় বিপদে না পড়িলে কি অমন করিয়া হাঁটিয়া বেড়ায়?"

নফর বলিল "আহা, যখন সকলে আসিয়া তাহার বাপ মার কথা জিজ্ঞাসা করিল, মেয়েটী একটীও কথা কহিতে পারিল না, কেবল ডাগর ডাগর চোক দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, দেখিয়া এমনি দুঃখ হইল!

দোকানী বলিল "কে আছে মা আছে কিছুই বলিল না?"

প্রসাদ বলিল "কোন মতেই তো বলিবে না, তার পর পদ্মর মা তাহার সিঁথের সিঁদুর

ও হাতে কলি দেখিয়া বিস্তর পীড়াপীড়ি করায় শেষ নাকি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল, তাহার ভাই ও স্বামী দুইজনে তাহার মার মৃত দেহ সৎকার করিতে গঙ্গায় লইয়া গিয়াছিল, সে আজ আট দিন হইল, আজও তাহাদের দেহ ফিরে নাই, তাই, সে পাগলের মত তাহাদের খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। সেই ভাই ও স্বামী ভিন্ন আর তাহার কেহই নাই।"

হেম নীরবে শুনিতেছিল, কথাগুলা যেন সীসের মত হাড়ে হাড়ে বাজিল। বসিয়া থাকিতে কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। চোখ দিয়া জল কাটিয়া আসিতে লাগিল। "মনোরমা—কোথায় বোন্, এই যে আমি" —চীৎকার ছাড়িয়া কাঁদিবার ইচ্ছা হইল। হেম তাহা পারিল না। তখনই আবার শুনিল, ফকিরচাঁদ বলিতেছে, 'তোরা সব এক এক জন এক একটী বোকার রাজা। ও সব মিথ্যে—সব মিথ্যে। বলে,—নষ্টা কান্না গতি—নষ্ট মেয়ে মানুষের অনেক কান! আমি এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে হলপ করে বলতে পারি, সে মেয়ে কখনই ভাল নয়। সে নিশ্চয়ই কার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল, ছোঁড়া এখন পালিয়েছে, আর ছুঁড়ী পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে। তা হবে না? ও তো কথাই আছে—

'আগে না বুঝিলে বাছা যৌবনের ভরে,
পশ্চাৎ কাঁদিতে হবে অকাতর করে।'

—কথা গুলা বিষাক্ত শরের মত হেমের কানে গিয়া আঘাত করিল। হেমের কণ্ঠা হইতে সর্ব্বাঙ্গ মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল, সর্ব্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, হেট মুখে কপাল টিপিয়া বসিয়া হেম মনে মনে বলিল 'মা গো, আর কেন মা, কোথায় আছ ডাকিয়া নাও।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অনেকক্ষণ একভাবে বসিয়া থাকিয়াই হউক, শ্রম ক্লান্তি অবসাদ বা মনের একাগ্রতা জন্যই হউক, অথবা বিধাতার কৃপাবশতই হউক, সেই ভাবে নতমুখে বসিয়া বসিয়া আপনার অবস্থা চিন্তা করিতে করিতে হেমের একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। সহসা কানের গোড়ায় একটা বিষম চেঁচামেচিতে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ রগড়াইয়া হেম চাহিয়া দেখিল, দোকানীতে ও রামকৃষ্ণে বড় ঝগড়া বাঁধিয়াছে, যে সমস্ত লোক বসিয়া গল্প করিতেছিল তাহারা সেখানে কেহই নাই। হঠাৎ এরূপ বিবাদের কারণ কি হেম তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, কিন্তু শুনিল, রামকৃষ্ণ বলিতেছে, আমি বেদের গাঙ্গুলি—বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান, কত রাজরাজড়ায় আমার পা পূজা করবার জন্য লালায়িত, আর আমি স্বইচ্ছায় তোর দোকানে পায়ের ধুলা দিয়াছি, তুই তো তুই, তোর চৌদ্দপুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার হইয়া গিয়াছে, তা তুই ছোটলোক তার মর্য্যাদা কি বুঝবি? তুই কিনা—"

"রামকৃষ্ণের সে কথা শেষ না হইতেই দোকানী বলিয়া উঠিল—দেখ ঠাকুর, চৌদ্দপুরুষ তুলো না, ভাল হবে না বলছি। আমি ছোট লোক হই ছোট লোকই আছি, তুমি না হয় বড় লোক; কে তোমায় ঐ কাটা পা পূজো কর্ত্তে চায় সেখানে যাও, এখানে আর গোল করিও না।"

রামকৃষ্ণ রাগিয়া বলিল "কি এত-দূর আস্পর্দ্ধা দেবতা ব্রাহ্মণে হতশ্রদ্ধা

আমি কে তা চিনিলি না, আমায় বলিস্ কি না উঠিয়া যাও।”

দোকানী একটু হাসিয়া বলিল “চিনিয়াছি, ঠাকুর তোমায় চিনিয়াছি। কেন আর ঘাঁটাইয়া দু কথা শুনিবে! কুলীন বামন কি আবার বামন! কুলীনের কি ভাত আছে?”

রামকৃষ্ণ অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল—বসিয়া ছিল, দাঁড়াইয়া উঠিল, বলিল “কি! এত বড় কথা! উচ্ছন্ন যেতে হবে জান না।”

দোকানী বলিল—“উচ্ছন্ন যেতে হয় আমি যাইব, তুমি এখন যেখানে যাবে যাও। উঠ, ঠাকুর, তোমার সঙ্গীকে ডাক, বাহিরে যাও, আমি ঝাঁপ বন্ধ করি, ঘুম পাইয়াছে।”

ধীরে ধীরে হেম মাথা তুলিল, বলিল “ডাকিতে হইবে না, আমি আপনিই উঠিতেছি, তা এর জন্য এত দাঙ্গা হাঙ্গামা কেন, বাপু?”

দোকানী উত্তর করিল—“সহজে না হইলেই দাঙ্গা হাঙ্গামা করিতে হয়।”

বেশি কথা কহিবার সময় হেমের নহে, বেশি কথা কহা হেমের স্বভাবও ছিল না। ধীরে ধীরে বলিল “উঠিতেছি।”

এই সময়ে ঝনর ঝনর কড়র শব্দে একখানি ঘোড়ার গাড়ি সেই দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। নিকটে না আসিলেও দূর হইতেই সে চিরক্ষত শব্দে বুঝা যাইত, গাড়ীখানি তৃতীয় শ্রেণীর। দোকানের সম্মুখে রাস্তার ধারে একটা প্রকাণ্ড বাদাম গাছ। সেই গাছতলায় আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। গাড়িখানি দেখিয়া হঠাৎ তাহা কি রঙের তাহা ঠিক করিয়া উঠা বড়ই কঠিন। মীমাংসা করিতে গেলেও এ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ দেখা গিয়া থাকে। বর্ত্তমান দর্শক বলিবেন, গাড়ীখি লাল—ঠিক্ লাল নয়—একটু একটু মেটে লাল রঙের; আরোহী বলিবেন, ইহার কিছুই রঙ নাই, তিনি গাড়ীতে উঠিবার সময়ে রঙের কোনও চিহ্ন দেখেন নাই; কিন্তু গাড়োয়ান কিছুতেই এ সব স্বীকার করিবে না, সে বলিবে সে অনেক টাকা খরচ করিয়া তাহাতে বার্ণিশ করিয়াছিল। তা যাই হউক, সূর্য্যের কিরণে পুড়িয়াই হউক, আর রাস্তার সুরকির গুঁড়া লাগিয়াই হউক, গাড়ি খানি আচক্রদীর্ঘ রাঙা রঙে রঞ্জিত। রোদ্রোধর্ম্মে এক দিক্ একটু মুষাইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং এক দিকের চাকা উঁচু ও একদিকের নীচু হইয়া রই কথা। কত কাষ্ঠখণ্ডের তালিকা সংযোগে তাহা নির্ম্মিত তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। এক দিকুকার একখানা দরজা, কি জানি কেন, নির্ম্মাতার স্মৃতিভ্রংশে গঠিতই হয় নাই, রৌদ্র নিবারণের জন্য সে দিকে একটা মোটা কাপড় টাঙান রহিয়াছে। সে গাড়ির বিচিত্র বর্ণ, বিচিত্র গঠন, বিচিত্র শব্দ, বিচিত্র গতি। এ-হেন শকটের বাহকদ্বয়ও অবশ্যই যে বিচিত্র জীব হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই, নহিলে সেই কঙ্কালসমষ্টিদ্বারা যে গাড়িটানারূপ বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদিত হইতে পারে তাহা কেহ কখন বিশ্বাস করিতে পারে না। একটার মেরুদণ্ড অপরটার মেরুদণ্ড হইতে উচ্চতায় অন্যূন এক ফুট ৫ ইঞ্চি হইবে। প্রথম যখন পৃষ্ঠদেশ হইতে মাপ চলিত, তখন যে ছোট, সে তাহার সহযোগীর সহিত উচ্চতা পোষাইয়া লইবার জন্য তাহার মেরুদণ্ডটী পিঠ হইতে অনদিনের মধ্যে

এতই ছাড়াইয়া তুলিয়াছিল যে, আর অল্প দিনেই প্রায় সমকক্ষ হইতে পারিত; কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীও যখন দেখাদেখি আপনার মেরুদণ্ড পিঠের উপর ঠেলিয়া তুলিল, এবং তদধিক ক্ষীততার পৃষ্ঠদেশ হইতে মেরুদণ্ডের সম্যক্ বিচ্ছেদ ঘটিবার লক্ষণ হইয়া উঠিল, তখন আর কোন উপায়ই রহিল না। অশ্ব দুটী বিষম বকেয়া চক্ষে জল ঝরিতেছে, মুখে ফেণা উঠিতেছে, পায়ে ক্ষত হইতে রক্ত পড়িতেছে; কিন্তু উপায় নাই—গাড়োয়ান ছাড়ে না; তদধিক আরোহী ও ছাড়ে না,—গাড়োয়ান একটু থামাইতে চাহিলে আরোহী রাগিয়া উঠে। তবে এখন যে থামিয়াছে, সে আরোহীর নিজের গরজে। আরোহী একটী সভ্যবেশধারী বাবু।

গাড়ি দাঁড়াইবা মাত্র আরোহী বাবু গাড়ির দরজা খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া দোকানের দিকে তাকাইলেন। দোকানী তাহা দেখিল, কাজেই হেমের সঙ্গে আর কথা হইল না। দৌড়িয়া দোকানের বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসিল—"কি চাই বাবু, আসুন, তামাক ইচ্ছে করুন।"

বাবুর নামিয়া দোকানে গিয়া একবার 'তামাক ইচ্ছে' করিবার মন হইয়াছিল কি না ঠিক বলিতে পারা যায় না, কিন্তু হঠাৎ দোকানের ভিতর হেম ও রামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার নজর পড়িল; কি জানি কেন, রৌদ্রের ভাণ করিয়া দরজাটী কতক মুদিয়া দিলেন। বোধ হয় তখনই গাড়ি চালাইয়া যাইবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু দেখিলেন দোকানী সম্মুখে দাঁড়াইয়া। একটু থতমত খাইয়া তাহাকে বলিলেন, "আর নামিব না, আমায় একটা ডাব দাও।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া দোকানী দৌড়াইয়া সশব্যস্তে একটা ডাব তুলিয়া মুখ কাটিয়া বাবুর নিকট ধরিল। যদি কেহ দেখিয়া শুনিয়া থাকিত, সে দেখিতে পাইত ডাবের ভিতর হইতে ধুম উঠিতেছে তাহা এত গরম যে স্পর্শ করা দুষ্কর। কিন্তু বাবুটীর সে সব দেখিবার সময় তখন ছিল না। তাড়াতাড়ি জলপান করিলেন, কতক জল উদরস্থ হইল, কতক নাক মুখে চোখে ও কাপড়ে পড়িয়া ঢেউ খেলিতে লাগিল, কতক বা তাহার ভিতর পড়িয়া রহিল, বাবু তাহা ছুড়িয়া ফেলিয়া, পকেট হইতে পয়সা বাহির করিয়া দোকানীকে দিলেন। দোকানী পয়সা দুটী হাতে লইয়া তাহার অচলত্বসচলত্ব পরীক্ষা করিতে লাগিল, কাজেই বাবুর চঞ্চলতা সে বড় অনুভব করিতে পারিল না। বাবু তৎক্ষণাৎ গাড়োয়ানকে গাড়ি ছাড়িবার জন্য হাঁকিলেন। মাতলিবংশধর গজর গজর করিতে করিতে আবার গিয়া আপনার সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। এক বার লাগাম ধরিয়া টানিলেন। ঘোটকদ্বয় ভাবিয়াছিল, এইখানেই বুঝি আজিকার মত তাহাদের গাড়িটানা চাকুরির বিরাম হইল, তাহা ভাবিয়া এক্ষণে মহানন্দে ধীরে ধীরে বেগ নাড়িতেছিল; সহসা লাগামের টান পড়াতে একবার চমকিয়া যুগপৎ দুইজনে পশ্চাৎ চাহিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ পৃষ্ঠের সহিত সেই চিরপরিচিত চাবুকের সংস্পর্শ হইবা মাত্র আর বুঝিতে বাকি রহিল না। দুঃখের একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া, মনের কষ্ট মনে মারিয়া, প্রভুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কণু ঝুণু তালে নাচিতে নাচিতে চলিল। তখন, ঝনুর ঝনুর

ঝড়ের করিতে করিতে এঁকিয়া বেঁকিয়া ছুটিতে ছুটিতে গাড়িখানি চলিতে লাগিল, আর, বাবু ভিতরে বসিয়া নাগরদোলার সুখ অনুভব করিতে করিতে চলিলেন।

তখন দোকানী আসিয়া হেমকে বলিল "কৈ ঠাকুর গেলে না, আর কেন তাক কর, আমার বড় ঘুম পাইয়াছে।"

হেম ঈষৎ বিরক্ত হইল; বলিল "কি রকম ঘুম বাপু তোমার? এই তো ডাব কাটিয়া রাস্তায় গিয়া একজনকে দিয়া আসিলে, তখনত কৈ ঘুমে ঢুলিয়া পড়িলে না।"

দোকানী একটু উত্তেজিত স্বরে বলিল "সে কথা তোমায় কি বলিব, ঠাকুর? আমরা ব্যবসাদার লোক, খদ্দের পেলে আমাদের ঘুমই কি আর রোগই বা কি।"

হেম বলিল "তা, আমরা কি খদ্দের নই?"

"খদ্দের! খদ্দের হ'লে দোকানে কেন, মাথায় করিয়া বসাইতাম। তোমরা কিসের খদ্দের ঠাকুর? এসেছ সেই দুপুর বেলা, এতক্ষণে সিকি পয়সারও সামগ্রী কি নিয়াছ? বরং ঐ ঠাকুর আমার ঢের পয়সার তামাক পোড়াইয়াছেন। তা যাও ঠাকুর, তার আর দাম চাইনে, তোমাদের মত অনেক খদ্দের দেখিয়াছি, এখন যেখানে যাবে যাও।"

দোকানীর সহিত আর কোনও কথা কহিতে হেম পারিল না। বড়ই অপ্রতিভ হইল। অপ্রতিভ দোকানীর কথার জন্য নহে; অপ্রতিভ এই জন্য যে, বেলা যায়, এতক্ষণ ধরিয়া সে কেবল আপনার চিন্তাতেই ব্যস্ত ছিল, রামকৃষ্ণের আহারের জন্য সে কিছুই উদ্যোগ করে নাই। হেম দোকানীকে বলিলেন "অনেক পথ চলিয়া আসিতেছি, তাই একটু বসিয়া ঠাণ্ডা হইতেছিলাম, আর বিশেষ তুমি গল্পে মত্ত ছিলে কাজেই তোমাকে কিছু বলি নাই। তা তুমি শুইতে চাও, শোও, কিন্তু বলিয়া যাও আর দোকান কোথায় আছে, সেখানে গিয়া খাবার খাবার লই।"

দোকানী ভাবিল, খরিদ্দারগুলি নিতান্তই খুঁকি ভুষো নয়, তখন একটু নরম হইয়া বলিল "তা যদি খাবার ইচ্ছে করেন, অন্যত্র যাবার দরকার কি, এখানেই যোগাড় করিয়া দিতেছি।" তখন দোকানী একে একে তাহার দোকানস্থিত দ্রব্যাদির নাম করিতে লাগিল এবং তাহার মধ্যে কি কি আবশ্যক তাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

দোকানীর ব্যবহার দেখিয়া, বড় কষ্টেও হেমের ঠোঁটে একটু হাসি আসিল। হেম রামকৃষ্ণকে বসিতে বলিল। রামকৃষ্ণ ইতিপূর্ব্বেই দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল; তখনও আপনা আপনি রাগে তিনটা হইয়া ফুলিতেছিল। হেমের কথায় বলিল "কি! এখানে! এই পাষণ্ডটার দোকানে জলগ্রহণ! কখনই নয়।"

রামকৃষ্ণের উপর দোকানিও একটু চটিয়াছিল, সে বলিল "ঠাকুর, কুলীন ব্রাহ্মনের বড় রাগ তা আমি জানি, কিন্তু এ শ্বশুরবাড়ী নয়। খালিপেটে অত রাগিলে আপনারই ক্ষতি, এখন ব'সে অনুযোগ কর।"

দোকানীর কথাগুলা রামকৃষ্ণের বড়ই লাগিল; কিন্তু দেখিল দোকানী কেবল কথায় বলিল না, কাজেও তাহাই করি-

হেছে। সে ভাঁয়পা করিয়া পাত পাড়িয়াছে, তাহার উপর চিড়া সাজাইয়াছে, কার্ছে দৈয়ের বাটী রাখিয়াছে, আর সেই সর্ব্ব-মনোহর সেবভোগ বস্তা এক একটী করিয়া কাঁদি হইতে পাড়িতেছে। দেখিয়া রাম কৃষ্ণের জিহ্বায় জল আসিল। সুতরাং সেই জলের স্রোতে রাগের গরমটা ক্ষতক কাটিয়া গেল। রামকৃষ্ণ রাগ করিবার জন্য যতই চেষ্টা করিতে লাগিল, ক্ষুধিত জঠর ততই সেই শোভমান ভোজ্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে লাগিল; কাজেই ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রামকৃষ্ণ তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল।

হেম বলিল 'হাত মুখ ধোও, আহার কর।" তখন হেমের কথা, দোকানীর কথা, আর উদরের কথা এক দিকে, আর একা রাগ এক দিকে; কাজেই রাগ হারিয়া গেল। তখন ক্রোধাগ্নি ও জঠরাগ্নির মধ্যে কোন্ অগ্নি বেশী তীব্রতর তাহা পরীক্ষার নিমিত্ত অগত্যা রামকৃষ্ণ হাত মুখ ধুইয়া যথার্থ বিচারকের ন্যায় সেই ভোজ্যশোভিত পাত্রের নিকটে বসিয়া তাহা উদরসাৎ করিতে আরম্ভ করিলেন। হেমের অশৌচ, হেম দোকানীর জল খাইবে না। হেম কিছু খাইল না।

আহারান্তে দোকানী তামাক সাজিয়া দিল, রামকৃষ্ণ তামাক খাইতে লাগিল, আসিয়া পর্য্যন্ত সেই প্রথম বার ছাড়া এ রকম তামাক সে আর খায় নাই। হেম পয়সার হিসাব করিতে বলিলেন। দোকানী বলিল—'সাড়ে পনর পয়সা। তা যাক, আপনারা ব্রাহ্মণ, আদ পয়সা আর দিবেন না,—পনর পয়সা।"

তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল হেম উঠিবার উদ্যোগ করিলেন। রামকৃষ্ণ আর একবার তামাক খাইয়া উঠিলেন উভয়ে দোকানের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইবা মাত্র হেম দেখিতে পাইলেন সেই বাগানে তখনও সেখানে সেই বাবুটির গাড়ি দাঁড়াইয়াছিল সেই খানে কি একখানি কাগজ পড়িয়া। কৌতূহল বশতঃ তাহা গিয়া কুড়াইয়া লইলেন। দেখিলেন, একখানা চিঠি। ছাঁৎ করিয়া হেমের সেই বাবুর কথা মনে পড়িল। বাবু যখন একবার গাড়ি হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখেন, আবার তখনই কিসের জন্য চক্ষু বন্ধ করিয়া গাড়ীর ভিতর মুখ লইয়া যান, তখনই যেন হেমের কি সন্দেহ হইয়াছিল। হেম চিঠিখানি গাঁটে গুঁজিয়া রামকৃষ্ণকে বলিলেন "সেই যে একখানা গাড়ি আসিয়া এখানে দাঁড়াইয়া ছিল দেখিয়াছিলে?"

"দেখিয়াছি—কেন?"

"সেই বাবুটীকে দেখেছিলে?"

"দেখেছি।"

"চিনিতে পেরেছ?"

"তারে আর চিনি না?"

"কে বল দেখি?"

"শশী।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"শশী!"—কথাটা খট্ করিয়া হেমের কানের ভিতর গিয়া বাজিল। তা, হেম নিজেও তো তাহাই ঠাওরাইয়াছিল; কিন্তু তবু রামকৃষ্ণের মুখে ঐ নাম শুনিবামাত্র যেন একটা নূতন ভাবের উদয় হইল। মানুষের এমন সময় অনেক আসে যখন সে নিজে যাহা বুঝে তাহার প্রতি তখন ততটা লক্ষ্য করে না, কিন্তু যখন অপরের অনুমানের

সহিত তাহার অনুমানের ঐক্য হইয়া যায়, তখন যেন সেই মিলটা একটা নূতন আকার ধারণ করিয়া মনের ভিতর হঠাৎ এক প্রকার বিপ্লব করিয়া তুলে। হেমেরও ঠিক্ তাহাই হইল। সে প্রথম দর্শনেই ভাবিয়াছিল, সে বাবু অন্য কেহ নয় তাহাদের শশীই বটে। কিন্তু তখন এ চিন্তার উপর বড় একটা মনোযোগ দেয় নাই, এখন রামকৃষ্ণের কথা শুনিয়া সে যেন হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। ভাবিল, 'শশী! মহামায়ার ভাই শশী!"

হেম রামকৃষ্ণকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না, ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে চলিল। যাইতে যাইতে হেম আবার ভাবিল "শশীই বটে! কিন্তু শশী কেন আমাদিগকে দেখিয়া গাড়ী হইতে নামিল না, কেনই বা ত্রস্তে দরজার পাশে মুখ লুকাইল? অবশ্যই শশী আমাদিগকে চিনিয়া থাকিবে। মহামায়া মনোরমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে সেই জন্যই কি লজ্জায় আমাদের সঙ্গে দেখা করিল না? তা, তার কি দোষ? মহামায়া তার বোন্; কিন্তু বিরাজও তো তার বোন্!" হেম ভাবিল, ভগবানের কি সৃষ্টি! এক বৃন্তে দুটী ফুল ফোটে, একটী সৌরভে উদ্যান আমোদিত করিয়া শোভা পায়, তার পর কোনও শুষিবালা তাহা তুলিয়া দেবপূজা করে; আর একটী কীটের আবাসভূমি হইয়া সেই আশ্রিত কীট-কুলেই ভূমে পড়িয়া লোকের পদতলে মর্দ্দিত হইয়া পচিয়া গলিয়া যায়। মহামায়া ও বিরাজ সহোদরা—ভগবানের কি বিচিত্র সৃষ্টি! এ কথা ভাবিতে মুহূর্ত্তে হেমের সব কথা মনে আসিল। হায় হায়! কি ছিল আর কি হইল! এমন সংসার একেবারে রাতারাতি ছারখার হইয়া গেল! কেন এমন হইল? কে এমন করিল? জ্বলন্ত ভাতের হাঁড়িতে লাথি মারিয়া কে তাহা চারিদিকে ছড়াইয়া দিল? হেমের একবার তাহার ভাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু এখন নয়; আগে মাতৃকৃত্য হইয়া যাউক, তার পর মনোরমার সন্ধান করিয়া তবে সে অন্য কাজ করিবে। কিন্তু, মনোরমা!—মনোরমার সন্ধান কোথায় মিলিবে? সহসা সেই দোকানীর কথোপকথন মনে পড়িল। অল্পক্ষণ হেম তাহা বিস্মৃত হইয়াছিল। কি ভাবিয়া হেম থমকিয়া দাঁড়াইল। রামকৃষ্ণ কিছু দূরে গিয়া পড়িয়াছিল, হেম তাহাকে ডাকিল। কাছে আসিলে বলিল, "দেখ, এই গ্রামে বোধ হয় মনোরমা আছে। এখানে পদ্মর মার কোথায় বাস তাহার সন্ধান লইতে হইবে।"

রামকৃষ্ণ বলিল "অমন করিয়া তুমি তো সব গ্রামই খুঁজিতেছ, কিন্তু কৈ পাইতেছ না তো? অনর্থক এখানে আর দেরি করিয়া কাজ নাই; সন্ধ্যার ভিতর গঙ্গাতীরে গিয়া পৌঁছিতে পারিব না।"

সে দিন গঙ্গাতীরে পৌঁছিবার কথা ছিল, হেম তথায় গিয়া মাতৃশ্রাদ্ধ করিবে স্থির করিয়াছিল। পরদিন অশৌচান্ত, সুতরাং আজ যাওয়াই চাই। শুধু সেলেই হইবে না, কিছু ভিক্ষারও চেষ্টা দেখিতে হইবে, কাজেই একটু পূর্ব্বে না গেলেই নয়।

হেম বলিল—"তা হউক, আমার খুব মনে হইতেছে এখানেই তাহাকে পাইব। আর জ্যোৎস্না রাত্রি আছে, বেলা যায়, জ্যোৎস্নায় পথ চলিব।"

রামকৃষ্ণ বলিল "তবে চল। কিন্তু পদ্মর মার নাম করিতেছিলে সে কে?"

হেম বলিল "সে এক বুড়ী, আমাদের গ্রামে সর্ব্বদা যাইত আমি তাহাকে চিনি।" হেম সকল কথা রামকৃষ্ণকে ভাঙ্গিলেন না। রামকৃষ্ণও অতসতো বোঝে না, পদ্মর মার অনুসন্ধানে হেমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

জিজ্ঞাসার জিজ্ঞাসায় পদ্মর মার সন্ধান মিলিল। দুইজনে গিয়া তাহার বাড়ী উপস্থিত হইলেন। পদ্মর মা ব্রাহ্মণের মেয়ে, তখন সৈতা তুলিতেছিলেন। হঠাৎ দুইজন বিদেশীকে বাড়ীর ভিতর দেখিয়া বুড়ী কিছু থতমত খাইল। চুল পাকিয়া গিয়াছে, দাঁত পড়িয়া গিয়াছে—রামকৃষ্ণ ও হেম তাহার পৌত্রের বয়সী, তথাপি বৃদ্ধা তাহাদিগকে দেখিবামাত্র মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া সৈতা তোলা রাখিয়া তাড়াতাড়ি একখানি কম্বল আনিয়া দাবায় পাতিয়া দিল। আর, এমনকার মেয়েরা হইলে তখনই অনধিকার-প্রবেশের ধারা বহিয়া নিশ্চয় তাহাদের প্রতি শিনান কোডের একটা ব্যবস্থা করিত। রামকৃষ্ণ ও হেম উঠিয়া বসিল, বৃদ্ধা গিয়া পাশের বাড়ী হইতে একটী বালককে ডাকিয়া আনিল। পৌত্রের বয়সী, তথাপি তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে লজ্জা! হায় সেকাল!

বালক আসিয়া আপনাদের বাড়ী হইতে তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল। হেম তামাক খায় না, সুতরাং হুঁকাটী রামকৃষ্ণের একচেটিয়া হইল। একমনে রামকৃষ্ণ হুঁকা টানিতে আরম্ভ করিল। তখন কিয়ৎক্ষণের জন্য হুঁকার শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শোনা গেল না। হেম দেখিলেন, এ বড় ভাল কথা নহে। সে ভাবিয়াছিল, যাহা বলিবার তাহা রামকৃষ্ণই বলিবে, কিন্তু হুঁকা পাইয়া অবধি রামকৃষ্ণ হইতে সে ভরসার কোন লক্ষণ নাই দেখিয়া হেম প্রথমতঃ বৃদ্ধাকে মাতৃসম্বোধন করিল, তার পর তাহাদের আগমনের কারণ জানাইল।

বৃদ্ধা হেমের মাতৃসম্বোধনেই প্রথমে গলিয়া গিয়াছিল, তার পর যখন জানিল যে হেম মনোরমার ভ্রাতা আর রামকৃষ্ণ তাহার স্বামী, তখন কষ্টের পরিসীমা রহিল না। বলা বাহুল্য, মনোরমাকেই বৃদ্ধা পথ হইতে কুড়াইয়া আপনার বাড়ীতে আনিয়াছিল, এবং গোকানে তাহারই কথা সেই সব লোকে আন্দোলন করিতেছিল। যে সময়ে মনোরমা 'মা মা' করিতে করিতে পথের উপর ধুলায় পড়িয়া মূর্চ্ছা যায়, সেই সময়ে পদ্মর মা তাহার পিত্রালয় হইতে ভাইয়ের সঙ্গে আপনার বাড়ীতে আসিতেছিল পথের উপর বালিকাকে দেখিয়া অতি যত্নে তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল।

হেমের কথায় বৃদ্ধা বড়ই দুঃখ হইল। হেম যদি দেখিতে পাইত তো দেখিত, তাহার চক্ষুদ্বয়ও অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। বৃদ্ধা তখন সেই বালককে মধ্যস্থলে দাঁড় করাইয়া মনোরমা সম্বন্ধে যাহা যাহা জানিত, সব বলিল। বলিল—"আহা, বাছার বয়স আমার মেয়ের বয়সের ছুড়ি, দেখিতে তেমনিটী। আমি হতভাগী, পদ্ম মা'র আমাকে পথের কাঙ্গালিনী করিয়া ফেলিয়া গিয়াছে। সেই পর্য্যন্ত আর কোন ছেলে মেয়ের উপর মায়া করি না; তা তাহাকে দেখিয়া থাকিতে পারিলাম না, মন আপনিই কেমন তাহার জন্য ব্যাকুল হইল। তা, যাহা আমার অদৃষ্টে

ফেলিয়া চলিয়া গেল।" বলা বাহুল্য, বৃদ্ধার কন্যার নাম পদ্ম; সে আজ পাঁচ বৎসর সূতিকাগারে মারা গিয়াছে।

বৃদ্ধার কথা শুনিয়া হেমও বড় কষ্ট হইল। কিন্তু মনোরমা যখন সেখানে নাই, তখন তথায় আর অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নয়। হেম বলিল "তবে এখন আসি

বৃদ্ধা সে দিন কোন মতেই যাইতে দিতে চাহে না। হেমের না গেলেই নয়। অগত্যা বৃদ্ধা বলিল "তবে, এস; মেয়েকে পাইলে একবার আমায় দেখাইয়া লইয়া যাইও।" একদিনেই মনোরমার উপর তাহার বড়ই মায়া বসিয়াছিল। একদিনেই মায়া বসা নিতান্ত অসম্ভব নয়। জানি না, কি ক্ষণে কে কাহাকে কি দেখে যে প্রাণান্ত হইলেও আর সে তাহাকে ভুলিতে চাহে এ দৃষ্টান্ত মনুষ্যচরিত্রে নিতান্ত বিরল

রামকৃষ্ণ হুঁকায় মুখ দিয়া বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিল, হেম তাহাকে পা ঠেলিয়া ডাকিল। ডাকিতে হুঁকা, হুঁকা হইতে কলিকা, কলিকা হইতে আগুন সব পড়িয়া গেল। হেম অপ্রতিভ হইল, তাড়াতাড়ি বিছানা ঝাড়িয়া সে সব উঠাইয়া রাখিল। তখন, বৃদ্ধার কাছে বিদায় লইয়া দুইজনে প্রস্থান করিল।

রামকৃষ্ণ বলিল "কৈ হেম, মনোরমাকে তো পাওয়া গেল না।"

"তাইত!" হেম একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল, আর কিছু বলিতে পারিল না।

তখন দুইজনে নির্ব্বাকে চলিতে লাগিল। অল্পক্ষণমাত্রেই হেম অপেক্ষা রামকৃষ্ণ অনেক আগাইয়া পড়িল। খানিক দূর গিয়া হেমের কি মনে পড়িল, একবার গাঁটে হাত দিল দেখিল, সেই কুড়ান চিঠি গাঁটে গোঁজা রহিয়াছে। কেমন কৌতূহল হইল, ধীরে ধীরে চিঠিখানি বাহির করিয়া হেম তাহা খুলিল ধীরে ধীরে তাহা পাঠ করিল। সর্ব্বনাশ! এ কি! তাহাতে লেখা—"আমি এ কয় দিন ধরিয়া বসুমতীকে কিছুতেই শান্ত করিতে পারিলাম না। দিন রাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া আজ সকাল হইতে তাহার বড় জ্বর হইয়াছে। ভয়ানক গায়ের তাপ। আমি মেয়ে মানুষ, কি করিব? পত্রপাঠমাত্র তুমি সকল কাজ পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিবে।" পত্রে ঠিকানা নাই, লেখিকার নাম নাই।

পত্র পড়িয়া কতক্ষণ হেম স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কে যেন তাহাকে হাত পা বাঁধিয়া আকাশ হইতে ফেলিয়া দিল। মুহূর্ত্তের জন্য কথা কহিবার ক্ষমতা তাহার রহিল না। হেম আবার সে পত্র পড়িল।—আবার পড়িল। সেই একই কথা। এ কি আশ্চর্য্য প্রহেলিকা! কিন্তু, কে এ? লেখিকার নাম নাই—কিন্তু নাই থাকুক, এ নিশ্চয়ই ব্রহ্মঠাকুরুণ। হেম সে গ্রামের অনেকের মুখে শুনিয়াছিল ব্রহ্মঠাকুরুণই বসুমতীকে লইয়া পলাইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সে যেই হউক, লিখোনামার শশীর নামে কেন? তবে কি শশীরই এই কাজ! এই জন্যই কি সে আমাদিগকে দেখিয়া গাড়ীর ভিতর মুখ লুকাইয়াছিল? তা, বসুমতীর সহিত আমাদের পরিচয় আছে সেই বা জানিল কেমন করিয়া? হে-ভগবন্, এ কি রহস্য, ঠাকুর? হেম আবার পত্রের এ পিঠ ও পিঠ চারিদিকে ঠিকানার অনুসন্ধান করিল। কিছুই লেখা নাই।

একেবারে প্রত্যয় হইল না, দুইবার দেখিল, তিনবার দেখিল, ঠিকানা তো নাই। বসুমতী—তাহার সেই বসুমতীর উদ্দেশ পাইল, কিন্তু, সে যে কোথায় তাহা জানিতে পারিল না। সে বালিকা পীড়িত শয্যায়, না জানি কত কষ্টই পাইতেছে। হেম মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল। মনে মনে আক্ষেপ করিতে লাগিল, 'হায়, কেন তখন শশীর গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলাম না? এখন দৌড়িয়া গেলেও কি আর তাহার নাগাল ধরা যাইবে না?" একবার দৌড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করিল, আবার তখনি তাহার অকার্য্যকারিতা মনে হইল। হেম দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িল। আপনার চির-দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া সজোরে কপালে করাঘাত করিল। [ক্রমশঃ

সখের বাউল

বা

বাউল বিংশতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১ম দল।

বাউলের সুর—রাগিণী পাহাড়ী—একতালা

প্রেম নহে এই মরুভূমের তরুর ফল।
সুধু সেই সুধাকরে সুধা করে ঢল ঢল্।

তৃষাতুর চকোর যে জন
ঊর্দ্ধমুখে অনিমেষে চাহে অনুক্ষণ
তার দিবানিশি প্রাণ উদাসী, আঁখি দুটী ছলছল।

বিষামৃত লতা রমণী,
ফলে ফুলে আলো কোরে আছে ধরণী,
তার আননে অমিয়া মাখা, নয়নেতে—
রমণীর নয়নেতে হলাহল।

জুড়াইতে জগত জীবন
ঝুরু ঝুরু কোথা থেকে আসে সমীরণ,
বিনে সেই জগৎ-গুরু কল্পতরু কে আমাদের—
বেলা ভাই, কে আমাদের আছে বল্।

॥৫॥

২য় দল।

বাউলের সুর—রাগিণী পাহাড়ী—একতালা

ফক্কিকার,
ফক্কিকার—ফক্কিকার ফক্কিকার।
আমি চোক্ বুজিয়ে সুধুই দেখি অন্ধকার।
ডুবে ডুবে কতই খুঁজি সাগরের তলে,
কই, মাণিক কই মলে?
তুমি আকাশ-ছোঁয়া ঘোরে চাঁদা
করে দিওনা আমার;
ঘোর ওলট্ পালট্ হচ্ছে কেবল, রচ্ছে সকলি,
গোল্ চাকার মতন চক্রখানি বোঁবোঁ করে
ঘোরে আপনি;
কোন্‌টা গোড়া, কোন্‌টা আগা?
বিশ্ব বিচিত্র ব্যাপার।
আছে বিশ্ব-জয়ী-শক্তিময়ী নারী এ ধরায়,
তাই নরে নিধি পায়;
আমার সেই স্বর্গ, চতুর্ব্বর্গ;
ধারি কেবল প্রেমের ধার।

॥৬॥

১ম দল।

বাউলের সুর রাগিণী ললিত বা পুরবী

চিমে তেতালা।

বেলা নাই, বেলা নাই রে, হয়েছে যাবার বেলা!
ভাঙা হাটে নবীন ঠাটে আরো কত
খেল্‌বি রে রসের খেলা—
ও পাগল মন, খেল্‌বি রে রসের খেলা!

চারি দিক্ ধূঁয়ার আঁকার,
সমুখে বিষম ব্যাপার!
কোথায় পালাব এবার, কে জুড়াবে প্রাণের
জ্বালা!

॥৭॥

২য় দল।

নিধু বাবুর টপ্‌পার সুর—

রাগ ভৈরব—একতালা।

সে মুখ-কমল সদা ঢলঢল
হাসি হাসি, সুখে দেখিরে ভাই!
প্রেমের আনন্দ মাঝে মরণের ভয় নাই।
মধুর মধুর মধুর প্রাণ,
মধুর মধুর মধুর ধ্যান,
অতি মধুর সেই-ই দিন, পূর্ণ পরিতোষ পাই।

না জানি কোথায় কি ফুল ফোটে,
সৌরভে হৃদয় নাচিয়া ওঠে,
মত্ত হয়ে খোলা প্রাণে প্রেমের মহিমা গাই।

॥৮॥

১ম দল।

বাউলের সুর—রাগিণী ভৈরবী—একতালা।

সবই গেছি ভুলে,
আমি সবই গেছি ভুলে!
আজি হে প্রাণের প্রাণ, দাও মনের ধাঁধা খুলে।
ভিতরে কাহারে প্রাণ,
সুখী ভেবে অভিমান,
মরণ যে কি বিষাদ যেন তা জানিনে মূলে।

আহা সে পবিত্র পদ!
পূর্ণ নন্দ, নিরাপদ,
পরম সম্পদ আমার, ত্যজি, পূজি নারী-কূলে।

করুণ কিরণে কার
বিকশিল প্রেম আমার,
সৌরভে উন্মত্ত হ'য়ে কারে দিলেম বিনি মূলে।

স্নেহ ভক্তি ভালবাসা,
মেটেনা—মেটেনা আশা,
পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত বসি সুধাসিন্ধু-কূলে!

॥৯॥

২য় দল।

৺রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের নন্দবিদায় যাত্রার সুর

রাগিণী ভৈরবী—মধ্যমান।

সে দুটী নয়ন!
জীবন আমার।
ত্রিভুবন ভাসিতেছে কিরণে তাহার।
সে সুধাংশু করি পান
জুড়ায়েছে মন প্রাণ,
হেসে খেলে চলে যাব, ভাবনা কি তার!

যে জন্যে এখানে আসা,
পরিপূর্ণ সে পিপাসা।
ফুরিয়া অন্যের আশা থাকিব না আর—
বেশি থাকিব না আর।

॥১০॥

সখের বাউল বা বাউল বিংশতি।

১ম দল।

ভজনের সুর। ভৈরব—কাওয়ালি।

প্রভাত হয়েছে নিশি, আসি ভাই!
আর্ প্রেমের বিরাগ রাগ নাহি চাই।
হইব না পথ-হারা,
ওই জ্বলে শুক্-তারা!
দূর—অতি দূর বাঁশরী শুনিতে পাই।
আহা কি সুগন্ধ-ময়
পবিত্র সমীর বয়,
জাগিয়া প্রাণের পাখী কি ললিত গায় রে!
কতই সাধের চাঁদ
রতির মোহন ফাঁদ,
সাধের স্বপন কেন আপনি ফুরায় রে!
আসিছেন উষা-রাণী
বিকশিত মুখ-খানি,
কেমন প্রফুল্ল প্রভা দিকে দিকে ভায়!
প্রফুল্ল কুসুম বন, নিমগন তারা
দিগ্ দিগন্তর কিবা নূতন দেখায়!
আকাশের নীল জল
অতি ধীর চল চল,
না জানি ভিতরে আছে কি শুভ সুন্দর ঠাঁই!
জাগিছে জগত-বাসী
মুখ সব হাসি হাসি,
দশ দিক্ হাসি রাশি, এমন সুদিন নাই।
কল্পনা-ললনা বুকে
ঘুমায়ে ছিলেম সুখে,
দিনমণি দরশনে লাজে মনে ম'রে যাই।
হে প্রোজ্জ্বল দিনমণি,
মহান্ সত্যের খনি,
উদার আনন্দ মূর্ত্তি!
প্রত্যক্ষ যা দেখি নাথ, সদা যেন দেখি তাই!

॥১১॥

২য় দল।

বাউলের সুর - ললিত ভৈরবী তেতালা।

প্রেমের সাগরে ফুল কমলী
চির-বিকসিত নলিনী!
সৌরভেতে স্বর্গ হাসে, আকাশে থেমে দাঁড়ায়-
দেখ্‌তে তোমায়, থেমে দাঁড়ায় যামিনী।
আননে চাঁদের আলো,
চাঁচর-কুন্তল-জাল,
অধরে আনন্দ-জ্যোতি, নয়নে মন্দাকিনী—
হাসে, নয়নে মন্দাকিনী।
কে তুমি সুষমা মেয়ে
আছ মুখ-পানে চেয়ে
আলো কোরে অন্তরাত্মা, আলো কোরে ধরণী!
সমীর আমোদে ভোর্
ডেকে আনে ঘুম্ ঘোর,
মধুর মধুর গান,
আলসে অবশ প্রাণ,
কে গো, বাজায় বীণা, ঘুমা'য়ে প্রাণে,
প্রাণ যে আমার কি হ'য়ে যায় জানিনি!
জাগিয়া অচেতন,
ঘুমালে জাগে মন,
তুমি সাধের স্বপন-বালা, করুণা-কমলিনী।
ও রাঙা চরণ-তলে
ধর্ম্ম কাম মোক্ষ ফলে,
তুমি, মৃত্যুর অমৃত লতা পাপ-তাপ-হারিণী।
তোমারে হৃদয়ে রাখি
সদাই আনন্দে থাকি,
আমার প্রাণে পূর্ণ-চন্দ্রোদয় সারা দিবা-রজনী।

॥১২॥

[ক্রমশঃ।

শ্রীবিহারিলাল চক্রবর্ত্তী।

সমালোচনা।

শক্তি-কানন। ইহা এক খানি উপন্যাস। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ইহার রচয়িতা। শ্রীশ বাবু বঙ্গ সাহিত্যে অপরিচিত নহেন;- ইঁহারই তত্ত্বাবধায়কতায় 'বঙ্গদর্শন' এক দিন বিশেষ তেজের সহিত চলিয়াছিল। কিন্তু শ্রীশ বাবুর উপন্যাস লেখা এই প্রথম। এই প্রথমেই শ্রীশ বাবু তাঁহার রচনায় যে দক্ষতা দেখাইয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

দেড় শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালার কথা লইয়া ইহা লিখিত। নায়ক জগন্নাথ আচার্য্য কবিকল্পনার একটী মোহিনী সৃষ্টি। জগন্নাথের হরিভক্তি অতুলনীয়। তিনি চাঁদ দেখিতে দেখিতে বিহ্বল হইয়া পড়েন, পাখীরা যখন তাঁহার চারি দিকে নৃত্য করিতে করিতে কূজন করিতে থাকে, তিনি আত্মহারা হইয়া যান; প্রকৃতি তাহার শান্ত শ্যাম ছবি যখন তাঁহার সম্মুখে ধরে তখনই তিনি ভাবে গদগদ হইয়া উঠেন; দূরাগত সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে দুই চক্ষে ধারা বহিতে থাকে, শেষ তিনি এতই বিভোর হইয়া পড়েন যে তখনি তাঁহার "দশা" আসিয়া উপস্থিত হয়—জগন্নাথ তখন ত্রিভুবন তাঁহার হৃদ্‌বিরাজিত সেই বৃন্দাবনধন মুরলীধর হরিমাত্রাত্মক দেখেন, আম্র বৃক্ষকেও কদম্ব বৃক্ষ বলিয়া মনে হয়। প্রসন্ন উদার মূর্ত্তি— তদধিক প্রসন্ন উদার হৃদয়—ভক্তের এরূপ চিত্র বাঙ্গালা উপন্যাসে দুর্লভ।

আর, এই জগন্নাথের পার্শ্বে জগদীশ। আলোকের পাশে অন্ধকার, দিবার পাশে রাত্রি, পুণ্যের পাশে পাপ! গ্রন্থকার এই দুইটী চিত্র পাশাপাশি অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন, ভক্তির কাছে কিছু নাই। ন্যায়, দর্শন, অলঙ্কার মুক্তির পথে কেহই কোন কাজের নয়। কিন্তু ইহা দেখাইতে গিয়া দেখিতে পাই, গ্রন্থকার জ্ঞান-ভক্তি-যোগের শ্রেষ্ঠতা অনেকটা মানিয়া লইয়াছেন। আমরা তাহা বুঝি না। বুঝি, ভক্তিই—ভক্তি অর্থে অবশ্য ভণ্ডামি নহে, সাধারণ ভক্তির কথাও বলি না—প্রকৃত ভক্তিই সাধনার একমাত্র সিঁড়ি; জ্ঞানকে তাহার পিছনে জুড়িয়া দিবার ততটা আবশ্যকতা নাই। জ্ঞান কখন পূর্ণ হয় না; সুতরাং জ্ঞানে ভক্তিকে মার্জ্জিত করা বড় কঠিন কথা। তা ছাড়া, জ্ঞানে তর্ক আনে, তর্কে আঁধার বাড়ায়। তাই সাধক বলিয়াছেন—

"ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।"

জগদীশ দিগ্‌গজ পণ্ডিত, কিন্তু তাহার ভক্তি ছিল না, তাই তাহার সে দুর্দ্দশা ঘটিল। কিন্তু, মহাপুরুষ যখন তাহাকে শক্তি ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তখনও তো তাহার হৃদয়ে সেই নরকের আগুন নিবিল না। বহু চেষ্টা করিয়াও চিত্ত স্থির করিতে না পারিয়া জগদীশ যখন কাঁদিয়া গুরুর পদতলে আপনার হৃদয়ের অবস্থা জানাইল, তখন হতাশ হইয়া যোগী বলিলেন—"অনেক আশা করিয়াছিলাম। এ মহামন্ত্রের যোগ্য পাত্র তুমি, তাহাতে সন্দেহ নাই। জ্ঞানে ভক্তিযোগ না হইলে শক্তি ধর্ম্মের পরিত্রাণ নাই—কোন ধর্ম্মেরই নাই।" গুরুদেবের এ কথায় জগদীশ বিহ্বল হইলেন।

বলিলেন—'আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।' কিন্তু জগদীশ একদিন যখন জগন্নাথকে এইরূপ জ্ঞানভক্তি-যোগের কথা বলিয়াছিলেন, তখন জগন্নাথ প্রশান্তভাবে বলিয়াছিলেন 'যাই বল—ভক্তিই সার। মহাপ্রভু কি জ্ঞানহীন ছিলেন? তিনি জ্ঞান ছাড়িয়া শুধু ভক্তি সার করিয়াছিলেন কেন?' মহাপুরুষ গোড়াতেই ভুল বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহাকে জগদীশের সম্বন্ধে এতটা আশা করিয়া শেষে নিরাশ হইতে হইয়াছিল। এবং সেই জগদীশ তাঁহার গুরুদেবেরই পরামর্শে অবশেষে একদিন তাহার সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞান অতল সাগরে ডুবাইয়া দিয়া বালকের ন্যায় রোরুদ্যমান কণ্ঠে জগন্নাথকে ডাকিয়া বলিয়াছিল—"আচার্য্য, আমায় দীক্ষা দাও—আর সহিতে পারি না।" জগদীশের সেই প্রগাঢ় জ্ঞানে কি ভক্তিযোগ হয় নাই? হইয়াছিল বৈ কি। তাহা নহিলে সেই দার্শনিক নাস্তিক কখনই একদিন ভবানীর পদতলে পড়িয়া হৃদয়-যন্ত্রণায় সেরূপ করিয়া লুটাইতে না। তবে গুরুদেব শেষ তাহার জন্য এ ব্যবস্থা করিলেন কেন? গুরুদেব কহিয়া কিছু না বলুন, কিন্তু তিনি অবশ্যই বুঝিয়াছিলেন ভক্তিই সার, ভক্তিই মুক্তি, ভক্তিই ভূমানন্দের একমাত্র প্রসূতী। তাই তিনি তাঁহার বড় আশার মন্ত্রশিষ্যকে শেষ ভক্ত-প্রধান জগন্নাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। যে ভক্ত, তাহার নিকট শাস্ত্রই কি আর জ্ঞানই বা কি। শিশু ধ্রুব প্রহ্লাদ বিধাতার বরে জন্মভক্ত, তাহারা শাস্ত্রজ্ঞানের ধার কোন দিন ধারে নাই। জ্ঞান তো কখন পূর্ণ হয় না, কিন্তু ভক্তি হয় সে কখন? না, যখন সেই জ্ঞানী সর্ব্বভূতে তাহার উপাস্যকে দেখিতে পায়। কিন্তু সেরূপ জ্ঞানী বড়ই দুর্লভ। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই গীতায় বলিয়াছেন—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

কিন্তু যে ভক্ত, সে জ্ঞানের কোন ধার না ধারিয়াই 'ক' দেখিয়া 'ক'রে কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হয়।

এই উপন্যাসচ্ছলে গ্রন্থকার প্রধানতঃ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, শক্তিধর্ম্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিরোধী ধর্ম্ম নহে, তাহারা একই ধর্ম্ম। জগন্নাথ আচার্য্য বলিতেছেন —"শাক্ত যাঁকে ডাকেন মা জগদম্বে বলে, আমি তাঁকেই ডাকি প্রাণধন শ্রীকৃষ্ণ বলে। তিনি বৎস, তিনি সখে, তিনি স্বামিন্! সকলেই ভক্তি প্রেমের সিঁড়ি। সাধারণতঃ তন্ত্র শাস্ত্রে মা ভিন্ন অন্য সম্বন্ধ ঈশ্বরে প্রযুক্ত নয় বটে, কিন্তু কোথাও কোথাও অন্য সম্বোধনের ছায়া আছে। * * * কালীবিলাস তন্ত্রে কৃষ্ণমাতার রূপ আমার বড় ভাল লাগে—সেইখানে শক্তি ধর্ম্মে বৈষ্ণব ধর্ম্ম মিলিত হয়েছে। অসুরনাশার্থ ভগবতী কালী রূপ ধারণ করলেন, অসুর বিনাশ হোল, কিন্তু তাঁর ক্রোধ নিবৃত্তি হলো না। সৃষ্টি লোপ হয়। দেবতারা কেহ তাঁকে প্রসন্ন করতে পারলেন না, তখন নারায়ণের শরণাপন্ন হলেন। নারায়ণ বালক শ্রীকৃষ্ণ রূপে সেই ভয়ঙ্করী উগ্রচণ্ডা দেবীর কাছে উপস্থিত হলেন—অমনি সে ভয়ঙ্কর ক্রোধের ভাব লয় হল, মাতা সে শিশুকে কোলে তুলে স্তন্য পান করাতে লাগলেন। * * * এ রূপকের অর্থ কি জগদীশ? আমার ত মনে হয় শাক্ত বৈষ্ণবের সন্ধিস্থল এই খানে।"

লেখক এ পুস্তকে কেবল গল্পই লিখিয়া যান নাই, তাঁহার নিজের জ্ঞান ও বিদ্যা বুদ্ধির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। অনেক তত্ত্ব—অনেক মীমাংসার কথা ইহাতে আছে। কিন্তু গল্পপুস্তকের সমালোচনায় গল্পের কোন কথা উল্লেখ না করিয়া এতক্ষণ কেবল অন্য কথাই বলিলাম, সুতরাং গল্প সম্বন্ধেও কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। সমস্ত গল্পটার একটা সংক্ষিপ্ত সার তুলিয়া দিই সে স্থান আমাদের নাই। জগন্নাথ এবং জগদীশ ছাড়া ইহাতে আরও অনেকগুলি চিত্র দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশই যথাযথ বর্ণে প্রতিফলিত হইয়াছে। হরিদাসের

প্রভৃতক্তি ও সরল গোঁড়ামি, লোকনাথের নিষ্কোষ দুষ্টামি, হৈমবতীর লজ্জাসঙ্কুচিত প্রেমভরা ভাব, মৃন্ময়ীর কোমলে কঠোরে গৃহিণীপনা, প্রভার বালিকাসুলভ খেলা ধুলা আর হাঁকাইয়া ডাকাইয়া কথা কহা—এগুলি বড় মধুর। এত মধুর যে ইহাদের পার্শ্বে সেই দুষ্টা নাপিত বৌ ও দুরন্ত কাপালিক উদ্ধবকে দেখিলেই গ্রন্থকারের উপর পর্য্যন্ত আমাদের রাগ হয়।

এ ছাড়া, ভাল পালা আরও আছে। সবই যে নিখুঁত হইয়াছে তাহা বলি না। নাপিত বৌর চরিত্র বড়ই অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়, উদ্ধব আমাদের ভাল লাগে না, ভৈরবের সব কাণ্ডগুলা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। লোকনাথ ও প্রভার চরিত্র আরও যেন একটু ফোটা উচিত ছিল, ফুটিলে ভাল হইত—কিন্তু তেমন ফোটে নাই। আরও খুঁত আছে। ইহার সবই আছে, তবু কি যেন সমস্ত বিষয়ের অভাব রহিয়াছে—তাহা ঘটনা-পারিপাট্য। ইহার প্রত্যেক অবয়ব, প্রত্যেক সূক্ষ্ম কলেবরটী অতি সুন্দরভাবে গঠিত, কিন্তু ইহা যাহার উপর ভর দিয়া খাড়া থাকিবে সেই মেরুদণ্ডের অভাব। একটু নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেই বোধ হয় যেন নড়্‌নড়্‌ করিতেছে। উপন্যাসের শেষ অংশটা বড়ই টানিয়া বুনিয়া ঘোড়াতাড়া দিয়া তাড়াতাড়ি লেখা হইয়াছে।

তাহা হইলেও ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সব দোষ ঢাকিয়া গিয়াছে ইহার ভাষায়। আগা গোড়া এক চমৎকার মোহিনী ভাষায় লিখিত। পাঠক যে ভাষার সৌরভে একেবারে মত্ত হইয়া পড়েন যে অন্যান্য গুণ দোষ বিচারের ক্ষমতা তাঁহার তত থাকে না। আমরা এত মিষ্ট ভাষায় উপন্যাস আর কখন পড়ি নাই। স্থানে স্থানে বর্ণনাগুলি অতি সুন্দর, এত সুন্দর যে তাহা পড়িতে পড়িতে আমরা মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের আশ পাশ সব ভুলিয়া কেবল তাহাই প্রত্যক্ষ করিতে থাকি। লেখকের ইহা সাধারণ ক্ষমতা নহে।

Helps to the engali Course for the Entrance Examination of 1883, শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র প্রণীত।

পুস্তক প্রণয়নে সাহিত্য-বিদ্‌ ভাষা ও ভাবের উপর, কবি কল্পনার উপর, ঐতিহাসবেত্তা ঘটনার সত্যাসত্যের উপর, দার্শনিক গভীর চিন্তাশীলতার উপর এবং গণিত বিজ্ঞানবিদ্‌ সূক্ষ্মতার উপর লক্ষ্য রাখেন। ভিন্নতঃ এক একটির উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়াও বিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগীয় অধিকাংশ গ্রন্থকারগণ উদ্দেশ্য-সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। কিন্তু অর্থ-পুস্তক-লেখককে একবারে পূর্ব্বোক্ত সকল বিষয়গুলির উপর লক্ষ্য রাখিতে হয়। সেই জন্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অর্থপুস্তক অতিশয় বিরল। কেহ ভাষার উপর লক্ষ্য রাখিয়া, ঐতিহাসিক গবেষণার অনুপযোগী হইয়া পড়েন। আবার কেহ দর্শন বিজ্ঞানের পাণ্ডিত্য দেখাইতে গিয়া ভাষার সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া ফেলেন। এইরূপে অর্থ-পুস্তক প্রায়ই দোষশূন্য হয় না। শরৎ বাবু যে সাহায্য-শরণি খানি লিখিয়াছেন ইহাতে সাহিত্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন সম্বন্ধীয় বিষয় মাত্রেরই যাথার্থ্য নিরূপণে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন, এবং প্রত্যেক প্রবন্ধের শেষভাগে প্রবন্ধ-লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং সমালোচনা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহাতে দোষের ভাগ অতি সামান্যই আছে। পুস্তকের কলেবর তাদৃশ স্থূল নহে, কিন্তু একটি মাত্রও আবশ্যকীয় বিষয়ের অসঙ্কুলান হয় নাই। যাহা হউক, পুস্তকখানি যে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগের বিশেষ আবশ্যকীয় তাহার আর সন্দেহ নাই।

বুদ্ধি এবং কার্য্য।

মনুষ্যত্বের এক উপাদান বুদ্ধি, অন্য উপাদান কার্য্য। মাত্র বুদ্ধি থাকিলে মনুষ্যত্বের পূর্ণতা হয় না, মাত্র কার্য্য থাকিলে মনুষ্যত্বের পূর্ণতা হয় না; মনুষ্যত্বের পূর্ণতা বুদ্ধি এবং কার্য্য।

তুমিও মনুষ্য, আমিও মনুষ্য, কিন্তু আমাপেক্ষা মনুষ্যত্ব রক্ষায় তুমি এত শ্রেষ্ঠ কেন? কেন, তাহার কারণ, হয়, আমার বুদ্ধি নাই—আমি নির্ব্বোধ, না হয় এ সংসারে আসিয়া আমি কখন কার্য্য করি নাই, কার্য্য করিবার অবসর পাই নাই। পক্ষান্তরে, আমাপেক্ষা তোমার বুদ্ধি আছে বলিয়া, এবং আমা হইতে তুমি অধিক কার্য্য করিতে জান বা কার্য্য করিতে পাও বলিয়া তুমি আমা হইতে মহৎ, মনুষ্যত্বের গৌরববর্দ্ধনে অপেক্ষাকৃত কৃতিমান্। অপিচ, কেবল বুদ্ধি থাকিলে তুমি পূর্ণ হইতে পারিতে না, অথবা কেবল কার্য্য থাকিলেও পূর্ণ হইতে পারিতে না; তোমার পূর্ণতা তোমার বুদ্ধি এবং তোমার কার্য্য।

বুদ্ধি আবার কার্য্যের জন্য, কার্য্য বুদ্ধির জন্য। হইতে পারে, আমার বিলক্ষণ বুদ্ধি আছে, কিন্তু সে বুদ্ধি আমার হৃদয়ের অন্তঃপুরেই চিরদিন হইতে অবরুদ্ধ রহিয়াছে, কার্য্যক্ষেত্রে কখনও উপগত হয় নাই, মস্তিষ্ক মাত্র বিলোড়ন করিয়াই তাহা আবার স্বস্থানচারী হইয়াছে, সে বুদ্ধির খেলা কার্য্যে কখনও দেখাইতে পারি নাই; অথবা হয়তঃ আমি জগতে আসিয়া অনেক কার্য্য করিয়াছি, কিন্তু কখন তাহার জন্য বুদ্ধির পরামর্শ গ্রহণ করি নাই, আমার কার্য্যে আমার বুদ্ধিকে হস্তক্ষেপ করিতে দিই নাই, আমার বুদ্ধির সম্যক্ বিপ্রকর্ষ বশতই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, আমার বুদ্ধি এবং আমার কার্য্য কখন পরস্পর পরস্পরার্থে নিয়োজিত হয় নাই, সেই জন্যই আজও আমি মনুষ্যত্বের কিছুই সাধিয়া উঠিতে পারি নাই। জগতে মনুষ্য মধ্যে চির-অপরিচিত রহিয়া গিয়াছি। আর তুমি আমারই ন্যায় দুই হস্তপদ লইয়া আসিয়া আপনার বুদ্ধি এবং কার্য্যের একতান চর্চ্চায় আমাকে বহুশত হস্ত পশ্চাতে ফেলিয়া আজ মনুষ্যত্বের উচ্চ মঞ্চে সমাসীন হইয়াছ।

চাণক্য যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরিতেন যদি তাহা কার্য্যে কেবল কুশাঙ্কুরোৎপটনেই পর্য্যবসিত হইত, সে ব্রাহ্মণ যদি বনাশ্রমের লতাদ্রুমবল্লরীর পরিবর্ত্তে নগরে আসিয়া মুকুটশীর্ষ রাজাধিরাজকে আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করাইতে না পারিত, অরণ্যের কাশক্ষেত্র ব্যতীত যদি তাহার কার্য্যক্ষেত্র দূর সম্প্রসারিত হইয়া না পড়িত, তাহা হইলে আজ যুগযুগান্তের পরেও কে সেই বুদ্ধির খেলা দেখিয়া চমকিত হইত, কেই বা সেই কূটতন্ত্রী নীতিবিদের নীতিজ্ঞতার অবনত-মস্তকে পূজা করিত? কে জানিত নেপোলিয়ান বোনাপার্টের নাম যদি সেই কর্সিকার পর্ব্বকুটীরবাসী মেষপালকপুত্র ভূমধ্য সাগরে নীলোর্ম্মিমালার ক্রীড়া দেখিতে দেখিতে কেবল মেষচারণ মাত্রেই

আপনার সকল বুদ্ধি ব্যয়িত করিত? কিন্তু, কোথায় রহিল সেই মেষপালকের অন্যান্য সহচরগণ যখন নেপোলিয়ানের দোর্দণ্ড প্রতাপে য়ুরোপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সন্ত্রাসে থর থর কাঁপিয়া উঠিল! বুদ্ধিবল বড় বল, কিন্তু তাহার সহিত কার্য্যের যোগ চাই। কার্য্য ভিন্ন বুদ্ধির প্রস্ফুরণ নাই, সুতরাং মনুষ্যত্বও নাই।

বিস্‌মার্ক বা গ্লাডষ্টোন যে বুদ্ধি ধরেন হয়ত: তোমারও সে বুদ্ধি আছে, কিন্তু তোমার সে বুদ্ধি দেখাইবার ক্ষেত্র পাও না, তাহার অনুরূপ কার্য্য করিবার অধিকার তোমার নাই; বিস্‌মার্ক গ্লাডষ্টোনের নামে জগৎ কাঁপিতে লাগিল, আর তুমি চিরকালের জন্য অফ্‌টবাক্ শুকের ন্যায় নগণ্য রহিয়া গেলে। অন্যতঃ ম্যাকেষ্টার যে কার্য্য করিতেছে, হয়ত: বুঝাইয়া দিলে সে কার্য্য সচ্ছন্দে করিতে পার, কিন্তু তোমার নিজের বুঝিবার ক্ষমতার অভাব—তোমার বুদ্ধি নাই, ম্যাকেষ্টার বুদ্ধিবলে রাজরাজেশ্বর হইল, আর তুমি বুদ্ধির দোষে চিরদিনের তরে কড়ার কাঙাল থাকিলে। তাহাই বলিতেছিলাম, বুদ্ধি যেমন কার্য্যের জন্য, কার্য্য তেমনি বুদ্ধির জন্য। উভয়ের একত্র যোগেই সফল পুরে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে যে কাহারও অভাব হইলেই শূন্য ব্যতীত আর কিছুই থাকে না।

বুদ্ধি এবং কার্য্যের মধ্যে কে গরিষ্ঠ কে লঘিষ্ঠ তাহা স্থির করা বড়ই কঠিন কথা। সচরাচর দেখিতে পাই, বুদ্ধির প্রাধান্যই স্বীকৃত হইয়া থাকে। সকলের মুখেই শুনিতে পাই, "বুদ্ধিবল বড় বল।" দেশীয় স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত কথায় কথায় বলিয়া থাকেন—

"বুদ্ধি বিনে হা ভাত।
বুদ্ধিগুণে খা ভাত॥"

কথাটার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রমাণ-প্রয়োগেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ নহেন। তাঁহারা বলেন, যাহার বুদ্ধি আছে তাহাকে কার্য্যের জন্য কখনই বসিয়া থাকিতে হয় না, কার্য্যের ভাবনা তাহার নাই। বুদ্ধি আগে, কার্য্য তাহার পরে। কথাটার সমর্থনপক্ষে সহসা অন্যমত করা দুরূহ। কিন্তু তাহা হইলেও, উহা যেমন ঠিক্, তেমনি ইহাও ঠিক্ যে, যাহার তাদৃশ-বিশিষ্টরূপ বুদ্ধি নাই সে যদি কোনও কার্য্যে প্রাণপণ করে, শতবার ব্যর্থচেষ্ট হইলেও সে যদি সেই কার্য্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে দিনে দিনে তাহার ক্ষীণ বুদ্ধি প্রস্ফুরিত হইতে আরম্ভ হয়। ক্রমে এমনই হইয়া পড়ে যে অবশেষে তাঁহার সেই কার্য্যে পটুতা এবং কার্য্যক্ষমতা দেখিয়া অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। অনেক খ্যাতনামা বুদ্ধিধর তাহার নিকট হার মানিয়া যায়। শেষ, কেহ বা আপনার বহুপ্রশংসিত বুদ্ধির পুঁটুলিটি হাতে লইয়া তাহারই দ্বারে আসিয়া উপাসনা করিতে আরম্ভ করে। বুদ্ধির প্রাধান্য সম্বন্ধে প্রমাণ দেখিয়া অন্যমত করিবার সম্ভবনীয়তা যদি না থাকে, তবে কার্য্যের প্রাধান্য সম্বন্ধেও প্রমাণাদি দেখিয়া অন্যমত করিবার সম্ভবনীয়তা নাই।

পর্ব্বত-গহ্বরে দেখিলাম, বহ্নি ধীকি ধীকি জ্বলিতেছে, তাহাতে তেমন তেজ নাই, তেমন জ্বালা নাই—ক্ষীণদীপ্তি, মন্দ-

ভাস, স্তিমিতপ্রায়। অদূরে বিস্তর ইন্ধন রাশি পড়িয়াছিল, সংযোগ করিলাম, বহ্নি তীব্রতেজে জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু, যদি সে ইন্ধন রাশি সংগ্রহ না হইত, ধীরে ধীরে সে বহ্নি মন্দীভূত হইয়া নির্ব্বাণগত হইয়া পড়িত। আমার হৃদয়ের কোন নিভৃততম প্রদেশে হয়তঃ একটু বুদ্ধির আগুন চুপে চুপে সমুদ্ভিত হইতেছিল, যদি কার্য্যের ইন্ধন তাহাতে সংযোজনা করিতে পারিতাম, বহ্নি অচিরাৎ জ্বলিয়া উঠিত, কিন্তু সে ক্ষমতা ছিল না, অগ্নি ধুমাইয়া ধুমাইয়া নিভিয়া গেল। বুদ্ধি অগ্নি, কার্য্য তাহার কাঠ। অগ্নি থাকিলে জ্বলে না, কাঠ থাকিলেও জ্বলে না; অগ্নি ও কাষ্ঠে একত্র হইলেই জ্বলিয়া থাকে। যে তাহা বুঝে না, একটু আগুন পাইয়াই আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া তাহা জ্বালিতে যায়, তাহাকে ব্যর্থচেষ্টতার কষ্ট-ভোগ করিতে হয়। তাহাতে হয় এই যে, ফুঁ পাড়িতে পাড়িতে শেষ সমস্ত আগুন-টাতে ছাই পড়িয়া আসে। কার্য্যের ক্ষেত্র যাহার নাই, কার্য্য করিবার সুসময় বা স্বাধীনতা যে পায় না, সহস্র বুদ্ধি থাকিলেও মনুষ্য মধ্যে সে নিতান্তই নগণ্য মাত্র।

কত অসংখ্য রত্ন সমুদ্রের অজানা গহ্বর মধ্যে আপনার আলোকে আপনিই আলোকিত হইয়া পড়িয়া থাকে, কেহ তাহার খবর যাচিয়া দেখে না; কত অসংখ্য কুসুম কানন আলো করিয়া ফুটিয়া থাকে, কেহ তাহার ঘ্রাণ লয় না, শেষ অনাঘ্রাত অস্পৃষ্ট অবস্থাতেই ঝরিয়া পড়িয়া পড়িয়া যায়; কত নীরব কবির হৃদয়ে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত নূতন ভাবের উদয় হইয়া আবার পরক্ষণেই তাহা সেই হৃদয়ের বিলয় প্রাপ্ত হয়, কেহ তাহার একটী বর্ণও বুঝে না; কত হৃদয়ে কত হর্ষ কত শোক, কত কথা কত ব্যথা, কত তর্ক কত যুক্তি, কত ধ্যান, কত জ্ঞান, সে তাহা প্রকাশ করিতে পারে না বলিয়া কেহ তাহার সম্বাদ লয় না। জগতে যাহার কার্য্য নাই, সে জগতের কেহই নহে। কেহই তাহাকে জানিতে চাহে না, কেহই তাহার তত্ত্ব রাখে না। কেহই তাহার সম্বন্ধে একটীও কথা জিজ্ঞাসা করে না। সে মরিল তো, তাহার আর কোন চিহ্নই থাকিল না। সে যেন কেবল খাইতে শুইতেই আসিয়াছিল, খাইয়া শুইয়াই চলিয়া গেল। ইহাই সকলে বুঝিল। কিন্তু সে যে কত অচিন্তিতপূর্ব্ব অনুভূতপূর্ব্ব ভাব সকল হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিয়াছিল, উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইল না বলিয়া তাহা প্রকাশ করিতে পারিল না, হয়ত, তাহার প্রচার হইলে হলস্থূল বাঁধিয়া যাইত, ভাবরাজ্যে একটা যুগান্তর আসিয়া উপস্থিত হইত,—সে সব কথা আর কেহই বুঝিল না—বুঝিবার চেষ্টাও করিল না। তাহার মৃত্যুর সহিত সেই সার্দ্ধত্রিহস্তপরিমিত ভূমিখণ্ডোপরি জ্বলন্ত চিতায় তাহার সমস্ত ভাবের অন্ত্যেষ্টি হইল। তাহার যা কিছু সব ধুইয়া মুছিয়া গেল। অন্যে কিন্তু না বুঝুক, কবি-হৃদয় ইহা বুঝিয়াছিল, তাই সে হৃদয়ের তার বাজিয়া উঠিয়া গাহিয়াছিল—

"Some village Hampden, that, with dauntless breast,
The little tyrant of his field withstood;
Some mute inglorious Milton here may rest—
Some Cromwell, guiltless of his country's blood."

যে একটা ক্ষুদ্রস্থানের একটা ক্ষুদ্র সমাধি-ক্ষেত্র দেখিয়া এ কথা লিখিয়াছেন, আজ যদি তিনি গিরিনদীবিনির্ঝরিণী নগর উপনগর-শোভিত বিস্তীর্ণ ভারতে এই বিশাল শ্মশান-ভূমি দেখিতেন, না জানি তাঁহার হৃদয় তাহা হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কতই মনের বাথা জানাইত! ভারতের সমাধিস্থল অতি বিচিত্র। কেহ চলিয়া গিয়াছে, কেহ চলিয়া যাইতেছে, কেহ আছে কিন্তু না থাকা মাত্র! সকলের একই দশা! জগৎ কাহাকে চেনে না, কাহারও নাম কখন শোনে নাই, তাহারা এ বিপুল লোকসাগরে এক একটী জল-বুদ্বুদ মাত্র। ক্ষণেকের তরে উঠিয়াছে; ক্ষণেকের তরে তাহাদের খেলা ধূলা সাঙ্গ করিয়া জলমধ্যে নিলীন হইয়া যাইবে। কিন্তু, এরূপ অবস্থা ইহার চিরদিন ছিল না। ইতিহাস কাঁদিয়া কাঁদিয়া এখনও সে কথা ঘোষণা করিতেছে। মানুষ মানুষের কথা ভোলে, কিন্তু ইতিহাস তাহা ভোলে না। সে সেই সব কথা চিরদিন যতনে আপনার বুকের উপর লিখিয়া রাখিয়া দেয়। ইহার পূর্ব্বতন অবস্থা দেখিতে ইচ্ছা হয়, সেই ইতি-হাসের জীর্ণ পৃষ্ঠা উন্মোচন কর। প্রাচীন বৈদিক অধ্যায়ে যত কিছু পাও দেখ, তার পর রামায়ণে আইস, অনেক দৃষ্টান্ত মিলিবে; তাহার পর মহাভারতের কুরুক্ষেত্র ধূধূ করি-তেছে—সে প্রান্তরে দৃষ্টান্তের রাশি। তাহা ছাড়িয়া দিয়া আরও অগ্রসর হও, ঐ সম্মুখে কে এক বর্ম্মাবৃত পুরুষ অসি চর্ম্ম লইয়া মার মার শব্দে 'জগৎবিজয়ী' সেকেন্দার সাহকে দূরে খেদাইয়া লইয়া চলিয়াছে। ইচ্ছা হয়, আরও অনুসন্ধান কর, যবন-দলের পাপ-নিশ্বাসে যেখানে ইতিহাসের পৃষ্ঠা কালিমা ধারণ করিয়াছে, সেখানে চাহিয়া দেখ—কত শিবজি, কত প্রতাপ, কত গোবিন্দ সিংহ, কত টোডরমল্ল! কে বলিবে তাহার এ অবস্থা চিরকাল ধরিয়া ছিল? তবে এখন ভারতে এ ঘুণান্তর পরি-বর্ত্ত কেন? ভারত শ্মশান কেন? মানুষ সব কোথায় গেল? মনুষ্যত্ব কিসে লোপ পাইল? এখনও বুদ্ধিজীবী বলিয়া ভারত-বাসিদিগের যথেষ্ট খ্যাতি রহিয়াছে, এখনও ভারতবাসির বুদ্ধির নিকট অনেক জাতি হারি মানে, তবে এ বিপর্য্যয় কিসের জন্য? সেই অসামান্য বুদ্ধিবল-সম্পন্ন হইয়াও ভারত-বাসি মনুষ্যত্ব অর্জ্জনে কেন এত অক্ষম?

"সেই হিন্দুজাতি সেই বসুন্ধরা,
জ্ঞান বুদ্ধিজ্যোতিঃ তেমতি প্রখরা,
তবে কেন ভূমে পড়ি লুটায়?"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনুষ্যত্বের পূর্ণতা বুদ্ধি এবং কার্য্য। ভারতবাসির বুদ্ধি আছে, কিন্তু কার্য্য নাই। কার্য্য করিতে জানে না, জানিলেও কার্য্য করিতে পারে না। সুতরাং সে বুদ্ধি প্রস্ফুরিত হইতে না পারিয়া ক্রমেই জড়তাপন্ন হইয়া পড়িতেছে। অগ্নি ইন্ধন অভাবে মন্দ মন্দ নির্ব্বাপিত হইয়া আসিতেছে। কার্য্যহীনের এ দশা বিচিত্র নহে। যে জাতি যখন কার্য্যশূন্য হইয়া পড়িয়াছে তখনই তাহার এই দশা ঘটিয়াছে। যে ভারত একদিন সুরভোগ্য সম্পদের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণতায় বিলসিত হইত, সেই ভারতের উদরে আজ অন্ন জুটে না, অঙ্গে বস্ত্র উঠে না, নীচতার নিম্নতম স্তরে ডুবিয়া পড়িয়াছে—উঠিবার সামর্থ্য নাই, মস্তকো-ত্তলন পূর্ব্বক জগতের পানে চাহিয়া দেখিবার ক্ষমতা নাই,—কেন? যাহা এক দিন বৃক্ষের নাচনি, পত্রের দোলনি ও পক্ষীর কূজনিতে নন্দনকাননের সৌন্দর্য্যকেও অধঃকৃত করিত

তাহা আজ কেবল মরুভূমিময়, আর সেই মরুভূমে অহর্নিশি চৈত্ররৌদ্রের তপ্তবালুকাগ অনল বর্ষণ করিতেছে কেন? এ সকলই কার্য্যের বিরহ জন্য। পক্ষান্তরে যে জাতি অসভ্য বন্যদিগের অপেক্ষা কোনও অংশে শ্রেষ্ঠ ছিল না—বৃক্ষবল্কল বা চিত্রবস্ত্র যাহাদের লজ্জা নিবারণ করিত, সেই জাতি বুদ্ধি সহকারে আজ কার্য্যের সেবা করিয়া জাতি-সমিতির মধ্যে উচ্ছ্রিতশীর্ষ, তাহার বাণিজ্যের মত্তপ্রবাহিনী অযুত প্রবাহে ভাগীরথীর ন্যায় শতধারা বিস্তারপূর্বক দিক্‌দিগন্ত ছাইয়া ফেলিতেছে, সে আজ ভূপতির আসনে সমাসীন হইয়া জগতের নরপতিসমূহের নিকট স্পর্দ্ধাসহকারে প্রসারিত হস্তে কর চাহিতেছে; তাহার সাহিত্য, তাহার সভ্যতা, তাহার শাসনপ্রণালী আজ জাতি-সাধারণের শিক্ষার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। এ সমস্তই বুদ্ধি এবং কার্য্যের অমোঘ প্রসাদফল। ইহাই মনুষ্যত্ব। কিন্তু মনুষ্যত্বের এক উপাদান বুদ্ধি, অন্য উপাদান কার্য্য। ভারতের এক উপাদান আছে, অন্য উপাদান নাই। বুদ্ধি আছে, কার্য্য নাই। তাই সেই পৃথিবীর আভরণস্বরূপা ভারতভূমি আজ শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়া গৃধ্রশকুনির আবাসস্থান হইয়াছে। বৃহস্পতির সন্তানেরা আজও অসাধারণ বুদ্ধিজীবী বলিয়া প্রথিত রহিয়াছে, কিন্তু গুরুগোবিন্দের শিষ্যমণ্ডলী আজ নিশ্চেষ্ট, নিঃস্পন্দ ও নিষ্ক্রিয়, তাই ভারত পরপদতলে পড়িয়া পরের উপাসনায় দিন কাটাইতেছে।

ভারতে এখন কার্য্যের অবতারণা নিতান্তই আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু ভারত কার্য্য করিতে পারে না, কার্য্য করিবার অধিকার তাহার বড়ই সীমাবদ্ধ, ভারত পরাধীন। কিন্তু তাহা হইলেও পরাধীনতাই আমাদের কার্য্যহীনতার সম্যক্ কারণ নহে। ইচ্ছা করিলে আমরা অনেক কার্য্য করিতে পারি, কিন্তু তাহা আমরা করি না। আমরা কার্য্য ভুলিয়া গিয়াছি, কার্য্যের চেষ্টাও ভুলিয়া গিয়াছি। শৈশবে আমরা কার্য্যের চেষ্টা দেখি না, কার্য্য করিতে শিখি না, বয়সেও কাজেই কার্য্যের আর কোন ব্যাপারে থাকি না। আমরা বিদ্যালয়ে যাই, পাঠাভ্যাস করি, কত নিশীথ তৈলদাহনের পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, তাহার চরম উদ্দেশ্য কি?—হয় কেরাণীগিরি, নয়, বড় জোর, ডেপুটী-গিরি। অদৃষ্টে হইল তো সোণায় সোহাগা মিলিল। আর কি চাই? বাহ্বাস্ফোট কর, করতালি তাড়না কর, সংবাদপত্রে দীর্ঘ প্রস্থ ছন্দে আর্টিকেল লেখ, আমাদের কার্য্যের চূড়ান্ত হইল। কিন্তু কার্য্যটা কি, না, ঘটিকাযন্ত্রের কনিষ্ঠ-শলাকাটী নবম প্রকোষ্ঠের অন্বেষণ অতীত হইতে না হইতে জীবনযাত্রার অতি অসার অথচ অপরিহরণীয় যে বিষয় সেই আহারাদি যৎকথঞ্চিৎ সমাপন করিয়া ভগবান্ মরীচিমালীর অস্তাচলশিখরাবলম্বন পর্য্যন্ত পরের গোলামি, আর, অবশিষ্ট সময় টুকু তাস তামাক তাকিয়া তবলা প্রভৃতি তকারাদি বর্গের যদৃচ্ছিক সেবার পর প্রিয়তমাপার্শ্বে গভীর সুষুপ্তি। আমাদের কার্য্যের ক্ষেত্র, "কুঠিবাড়ী ঘর ও ঘর বাড়ী কুঠি" মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাহার বাহিরের কোনও সংবাদ আমরা জানিতে চাহি না, সুতরাং তাহার বাহিরের লোকেরাও আমাদিগের কোনও সংবাদ রাখে না। আমরা যে বুদ্ধিটুকু লইয়া ঘর করি, তাহা কার্য্যে লাগাইলে হয় ত অনেক ভাল ফল ফলা-

ইতে পারিতাম; কিন্তু তাহা কার্য্যক্ষেত্রের মুক্ত বায়ু সেবন করিতে না পাইয়া বদ্ধ কূপের ন্যায় ক্রমে এতই দূষিত হইয়া পড়ে যে তাহার দুর্গন্ধে ও অস্বাস্থ্যকারিতায় প্রতিবেশীমণ্ডলী পর্য্যন্ত জ্বালাতন হইয়া উঠে। "বলং বলং বুদ্ধিবলং" বলিয়া কেবল আস্ফালন করিও না; যদি বুদ্ধির দ্বারা প্রকৃতরূপ উপকৃত হইতে চাও তো তাহার লাগামগাছটি কার্য্যের হাতে তুলিয়া দিও। পণ্ডিত না বুঝিয়া সুঝিয়া লেখেন নাই—"কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ।"

তাই বলিতেছি, ভারতে এখন কার্য্যের বড়ই আবশ্যক হইয়াছে। সম্প্রতি দেখিতে পাই, আমাদের দেশে কার্য্যের উপকারিতা কতকটা উপলব্ধি হইয়াছে। দেখিয়া প্রথমতঃ আশ্বস্ত হইয়াছিল, কিন্তু উত্তরোত্তর উহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া বোধ হইতেছে, এ প্রকার না হইলেই ছিল ভাল। কার্য্যকে নিতান্ত হেলাফেলা ভাবিয়া তাহা লইয়া আমোদ করিলে কোন কালেই কাহারও ভদ্রস্থতা হয় না। কার্য্য কি তাহা আমরা বুঝি না, কেবল কার্য্যের ভাণ শিখিয়াছি মাত্র। কারা কোথায় তাহার প্রতি লক্ষ্যও করি না, কেবল ছায়ার পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া ছায়াখেলা করি মাত্র। কথায় কথায় আমাদের সভা, সমিতি আবেদন নিবেদন সমবেদন; ধনীর প্রাসাদে, নির্ধনের পর্ণকুটীরে, বিলাসীর নিকুঞ্জে, বিবেকীর ভজনাগৃহে সর্ব্বত্রই কার্য্যের অস্ফুট ধ্বনি, অথচ কার্য্য কোথায়, কার্য্য করে কে, তাহা জানি না, তাহা ভাবি না—কার্য্য যেন শব্দরাজ্যের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'বাবদূকতার' এত প্রশ্রয় দিলে কখনই কাহার সিদ্ধি নাই। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, এ প্রকার না হইলেই ছিল ভাল। প্রতিনিয়তঃ চতুর্দ্দিক হইতে সহস্র সহস্র রসনাকুলার বাতাস পাইলে কার্য্যলক্ষ্মীর যে সূক্ষ্ম রশ্মি-রেখাটুকু দেখা দিয়াছে তাহা শীঘ্রই চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে। কথা ছাড়িয়া, এখন কাজ চাই। ভারতে এখন প্রকৃত কার্য্যের অবতারণা আবশ্যক। আবশ্যক কেন না, ভারতের বুদ্ধি শস্ত্রও প্রশংসার সামগ্রী, কিন্তু কেবল কার্য্যের অভাবে সে আজ পরপদতলে পড়িয়া শম্পেষিত হইতেছে। আবশ্যক কেন না, তাহার বুদ্ধি এবং তাহার কার্য্য পরস্পর পরস্পরার্থে নিয়োজিত হইলে, অচিরাৎ সে আপনার অবস্থাকে উন্নীত করিতে সক্ষম হইবে, অচিরাৎ মনুষ্যজাতি মধ্যে তাহার নিজের মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠাপিত করিতে কৃতকার্য্য হইবে। আবশ্যক কেন না, মনুষ্যত্বের এক উপাদান বুদ্ধি, অন্য উপাদান কার্য্য, মাত্র বুদ্ধি থাকিলে মনুষ্যত্বের পূর্ণতা হয় না, মাত্র কার্য্য থাকিলে মনুষ্যত্বের পূর্ণতা হয় না; মনুষ্যত্বের পূর্ণতা বুদ্ধি এবং কার্য্য।

শিক্ষানবীসের কথা।

আমার জীবন কতকটা উপন্যাসের মতন,—আশ্চর্য্যজনক কি না, জানি না।

শৈশবের যতটুকু মনে পড়ে, মনে পড়ে—গীতবাদ্যানুরক্তি আমার শৈশবাবধি ছিল। পিতাঠাকুর একজন প্রকৃত আমুদে লোক ছিলেন। তাঁহার বৈঠকখানায় গান বাজনার পূর্ণ সারগ্রাম ছিল। সন্ধ্যা হইতে ১১।১২টা পর্য্যন্ত পাড়াপ্রতিবেশীরা আমাদেরই বাড়ীতে আড্ডা গাড়িয়া থাকিত, তামাকুর শ্রাদ্ধ করিত। তাঁহারও কেমন সখ্ ছিল, তাল তাল গাহিয়ে বাজিয়ে একত্র করিয়া মধ্যে মধ্যে মাইফেল দিতেন। পালপার্ব্বণে যাত্রা, থিয়েটার, পাঁচালী হইত। বাড়ীতে বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ ছিল। প্রায়ই তিনি আমোদ করিয়া ধুমধামে বন্ধুবান্ধবদিগকে ভোজ দিতেন। তিনি Famine Departmentএ কর্ম্ম করিতেন, উপার্জ্জন যথেষ্ট ছিল। তাঁহার বায়বাহুল্যেও আমাদের সংসারে কখন কৃচ্ছ্রাবস্থা ঘটে নাই। সংসারের মধ্যে বাবা, মা ও আমি—এই তিনজন মাত্র। তা ছাড়া, দুটী চাকর ও একটী ঝি।

মনে পড়ে—সন্ধ্যাবেলা সম্মুখে বই খুলিয়া বাবার কাছে বসিয়া থাকিতাম। পড়াশুনা খুবই হইত! গল্প বা গান থামিবার মুখে এক একবার গোঁ গোঁ করিতাম। ভীমপলশ্রীর গিট্‌কিরি, কানাড়ার গমক, ঝিঁঝিট খাম্বাজের মূর্চ্ছনা, টোরিতে ভৈরবীর, কেদারায় হাম্বীরের কোন্ পর্দ্দা লাগে না, বেহাগ কেন দিনে গাহিতে নাই, বাহার কেন রাত্রে গাহিলে জমে না, ইত্যাদি তর্ক-বিতর্ক; ত'নসেন, হরিদাস গোঁসাই, গোলাম আব্বাস, সরিমিয়া, নিধুবাবু, হিরে বুল্‌বুল্ প্রভৃতির মাহাত্ম্য 'বোধোদয় কথামালার' মাহাত্ম্য ও পণ্ডিতের গৌরাঙ্গ তুলাইয়া রাখিত। সকালবেলা যা একটু পড়িতাম। কাজেই এ জীবনে বিদ্যার দৌড় অধিক দূর হয় নাই। গ্রামস্থ গবর্ণমেণ্ট-সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের শেষ ধাপ পর্য্যন্ত।

২

আমাদের গ্রাম হাব্‌ড়া হইতে রেলে আড়াই ঘণ্টার পথ। বাবা daily passenger ছিলেন। আমার বিদ্যাকাশে ক্রমশঃ কাদম্বিনী দেখিয়া সভয়ে আমাকে তাঁহার আফিসে শিক্ষানবীসী পদে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। ৮টার সময়ে শ্রীদুর্গা স্মরণ করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হই, আর ৭।টার সময় শ্রীহরি স্মরণ করিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করি। সকালটা যেন উঠিতে উঠিতে, স্নানাদি করিতে করিতে, ভাতের ভাড়া দিতে দিতে কাটিয়া যাইত। কিন্তু, প্রথম রাত্রি কাটাইবার উপায় কি!

বাবার বৈঠকখানায় আর বসি না, এক সঙ্গে বসিতে লজ্জা করে। আমাদের বহির্ব্বাড়ীতে একখানি বৈ ঘর নাই। কাজেই পাড়ার সুবিধামত একটা আড্ডা কাড়া গেল। ক্রমে আড্ডা জমিয়া উঠিল। প্রথমে তাস, পাশা, গান বাজনা, ক্রমে থিয়েটারের আখ্‌ড়া ঘরে পরিণত হইল। আমি হইলাম দলের চাঁই।

আমার ইচ্ছা ছিল একটা অপেরা খুলি। কিন্তু দলের অনেকেই সঙ্গীতে অনভিজ্ঞ। শেষে অনেক পরামর্শে, বহুল গবেষণার পর স্থির হইল 'মেঘনাদবধ' অভিনয় করা। মেঘনাদ তখন বাঙ্গালায় হুলস্থুল বাঁধাইয়াছিল। আমি লইলাম মেঘনাদের part।

Rehearsal চলিতেছে, এমন সময় উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত! বাবাকে উড়িষ্যায় যাইবার হুকুম আসিল। আমার শাপে বর—ত্রিশ টাকা মাহিনার একটা চাকুরী জুটিল। আমাকেও বাবার সঙ্গে উড়িষ্যায় যাইতে হইবে। মা একা থাকেন কি করিয়া?

৩

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ। মৃত্যুর আজ পৈশাচিক নৃত্যে উড়িষ্যা দগ্ধ শ্মশান-ভূমি। ঘরে ঘরে অনাহার, বিসূচিকা। কে কাহার সাহায্য করে, কে কাহার তত্ত্ব লয়? স্ত্রী স্বামীর জন্য কাঁদিবে কি কোলে যে মুমূর্ষু শিশু! পুত্র মাতার কি তত্ত্ব লইবে নিজে সপ্তাহ উপবাসী! ভগ্নী ভ্রাতার কি তত্ত্ব লইবে স্বামী যে এক পক্ষ নিরুদ্দেশ! পতি পত্নীর তরে কাঁদিতেছে না, ভ্রাতা ভগ্নীর তরে কাঁদিতেছে না, সতী পতির তরে কাঁদিতেছে না!

হলহলায়মান গৃহ আজ নীরব, কলকলায়মান্ জনপদ আজ শূন্য! পথে পথে, ঘাটে ঘাটে মৃতদেহ শুকাইতেছে, খালে খালে, বিলে বিলে মৃতদেহ পচিতেছে! ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে নিরন্নের দীর্ঘশ্বাস শুনা যাইতেছে, আশ্বাস দিবার কেহ নাই!

আশ্বাস দিবে কে? ইতিহাসে দেখিবে উড়িষ্যা-দুর্ভিক্ষে গবর্ণমেণ্টের কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল। জানি না, গবর্ণমেণ্টের সে কোটি কোটির মধ্যে কত কোটি শূন্য উদরে, আর কত কোটি পূর্ণ উদরে প্রবেশ করিয়াছিল! যাহা হউক, ইতিহাসে লেখে উড়িষ্যা-দুর্ভিক্ষে অযুত লোকের মৃত্যু হইয়াছিল।

কি ভীষণ ব্যাপার! কত লক্ষ অসূর্য্যম্পশ্যা রমণী, কত লক্ষ নবনীতপুতলী শিশু, কত লক্ষ অভিমানী যুবক, কত লক্ষ চলৎ-শক্তিহীন বৃদ্ধ, কত লক্ষ যষ্টি-অবলম্বনেহা বৃদ্ধা পথে পথে, দ্বারে দ্বারে হা অন্ন হা অন্ন করিতেছে! আজ মানাপমান নাই। কেহ বনে বনে ঘাসের বীজ, বাঁশের কোঁড় খুঁজিতেছে, কেহ পথে পথে উচ্ছিষ্ট পাতা উল্টাইতেছে। পিতা পুত্রের হাত হইতে, স্ত্রী স্বামীর হাত হইতে উচ্ছিষ্ট পাতা কাড়িয়া লইতেছে! আজ কেহ কাহারো নয়। সোনা দানা, ঘর বাড়ী, স্ত্রী পুত্র যাহা চাও, লও, এক মুষ্টি অন্ন দাও—দাও!

গবর্ণমেণ্ট দিশাহারা। কাজের শেষ নাই।

৪

দেখিতে দেখিতে তিন মাস কাটিয়া গেল। কোম্পানীর বন্দোবস্ত দোরস্ত হইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে আমাদের চক্ষেও কতকটা সহিয়া আসিল।

এক দিন সন্ধ্যার সময় কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম, দুপুরবেলা একটা মাগী একটা মেয়েকে আজ দশ টাকায় মার কাছে বেচে গেছে।

"মা, এ কি?"

"বাবা, কিনি নি। মাগী কাঁদতে কাঁদতে ব'লে, গে ও তার বৃদ্ধ গোমাস্তা

আজ সাত দিন খেতে পায় নি। কোম্পানীর কাছে যাবে কি, তার সোয়ামী উঠতেই পাচ্ছে না, সে তাকে নিয়েই বিব্রত। মেয়েটী আমার দিদে গেল রাত্রে ওকে খাওয়াও দাওয়াও, নইলে ওরাও মারা যাবে। তার কান্না দেখে তাদের খাবার জন্য দশটা টাকা দিয়েছি। ব'লেছি দরকার হ'লে কিছু কিছু নিয়ে যেতে।"

"মা, তুমি জান না। কত লোক পরের ছেলে মেয়ে চুরী ক'রে, আজকাল দশ টাকায় কেন আট গণ্ডা পয়সায় বেচে যাচ্ছে। তুমি ভারি বিপদে ফেল্‌বে দেখ্‌চি

"না, বাবা, চোরাই মেয়ে নয়। মাগীর সঙ্গে মেয়েটির মুখের আদল আছে। মেয়েটাকে দেখ্‌লে বড় দুঃখু হয়। চমৎকার চেহারা. বামুনের মেয়ে।"

আমরা জাতিতে ব্রাহ্মণ।

৫

আহা. মেয়ে নয় যেন চাঁপা ফুল। মুখ খানি পান পানা, নাকটী বাঁশীর মত। চোখ দুটী ভাসা ভাসা, চাহনি স্থির। কালো মোটা ভ্রু। চুলের গোছা পায়ে লুটায়। রাঙা রাঙা ঠোঁট দুখানি হাসিতে মাখান। দেহ কাহিল। বয়স বারো। প্রথমে দেখিলে মনে হয় নয় দশ। মা নাম দিয়াছেন,—পার্ব্বতী।

পার্ব্বতী বাবাকে বাবা, আমাকে দাদা বলিয়া ডাকে। কিন্তু মার ন্যাওটো। মার পায়ে পায়ে ঘোরে। মা প্রত্যহ বৈকালে চুল বাঁধিয়া দেন, সকালে স্নান করাইয়া দেন। সর্ব্বদাই ভাল কাপড়-চোপড় পরাইয়া রাখেন। কয়েক খানি গহনাও দিয়াছেন। পার্ব্বতীকে সংসারের কোন কাজই করিতে হয় না। যা সকালে পান সাজা আর পিঁড়ি পেতে দেওয়া।

আমি রহস্য করিয়া মাকে বলি,—'পরের মেয়ে পেয়ে পেটের ছেলেকে তুমি ছাড়বে দেখ্‌চি।" মা হাসিমাখা রাগে গাল দেন।

আমি মকুকে পোষ্যপুত্রীর ছেলে।

৬

দিনের পর দিন যায়, দেখিতে দেখিতে উড়িষ্যায় আমাদের ছয় মাস কাটিয়া গেল। একদিন আচম্বিতে বিসূচিকা রোগে ঝির মৃত্যু হইল কাজ সমান জোরেই চলিতেছে। বিশ্রাম যা নাইতে খেতে, আর দু দণ্ড ঘুমাইতে।

এক দিন দুপুরবেলা বাবা আফিস্ হইতে চলিয়া আসিলেন, শরীর অসুস্থ বোধ করিতেছে, পেট কামড়াইতেছে। বিছানা লইলেন। এ জন্মে আর উঠিতে হইল না। দুই দিনের মধ্যে অতিসার দাঁড়াইল।

মা দিন রাত্রি বাবার কাছে বসিয়া আছেন, আহার নিদ্রা নাই। যে যাহা বলিতেছে, তাহারই ব্যবস্থা করিতেছেন। ডাক্তারি ঔষধ ত চলিতেছে, টোট্‌কা, শিকড়, ঝাড়, মাদুলি, কিছুরই সাহায্য লইতে বাকি রহিল না। রক্ষা পাওয়া দুষ্কর। শেষ উপসর্গ রক্তপ্রস্রাব দেখা দিয়াছে!

অনেক কাকুতি মিনতির পর সাহেবের নিকট এক সপ্তাহের ছুটি মঞ্জুর হইল। ডাক্তার ডাকিতে, ঔষধ আনিতে, লোকের কথার উত্তর দিতে, মাকে সাহস দিতে দিতে দিন কাটিয়া যায়। শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বসিয়া রাত্রি কাটিয়া যায়। আশা নাই!

ক্রমে অষ্টাহের ভীম রাত্রি দেখা দিল। নাক মুখ কাণ কাটিয়া রক্ত বহির্গত হইল। বল হরি, হরিবোল!

উড়িষ্যা।

৭

উড়িষ্যায় থাকিতে মা আর কোন রকমে চাহেন না। বোঝেন না, বোঝান যায় না। বুঝাব কি?

সাহেব আমাকে ছাড়িতে চাহে না, মা থাকিতে চাহেন না, শেষ কাজ ছাড়িয়া দেওয়া স্থির হইল। আমরা অনৌচান্তে দেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। জাহাজের একটী কামরা ভাড়া লইলাম। বাসার বাটির হইতে মা কাঁদিলেন, আমি কাঁদিলাম। পার্ব্বতী কাঁদিল না!

পাড়ার লোকে বলে, পার্ব্বতীর অদৃষ্ট-ফলে আমি পিতৃহীন হইয়াছি।

৮

বঙ্গোপসাগর। উপকূলে বালুভূমি মধ্যাহ্ন তপনকিরণে জ্বলিতেছে। তালতমাল-শ্যাম পরিখা-রেখা দূরে দেখা যাইতেছে। সফেন তরঙ্গভঙ্গ আপনার বন্ধন ভঙ্গ করিবার জন্য এক একবার হুহু হু—বিকটস্বরে কূলে আছাড়িয়া পড়িতেছে। আবার কুল্ কুল্ কুল্—ক্রন্দনস্বরে গড়াইতে গড়াইতে ফিরিয়া আসিতেছে। দূরে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকখচিত বীচিমালা, যেন কণ্টকিত কলেবর সমুদ্র, চমকিতেছে। কূলে উদাম, কোলাহল; দূরে শ্রান্তি, কম্পন। জল প্রথমে নীল, ক্রমে কালো, ক্রমে গাঢ় কালো।

ধূসর আকাশে দুই একখানি মেঘ ছুটাছুটি করিতেছে। হেথা হোথা দুই একটী বলাকাপংক্তি মেঘকোলে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সমুদ্র-বায়ু হুহু স্বরে উগ্র-মধুরতাপে বহিতেছে।

প্রতিধ্বনি সমুদ্রের গর্জ্জন লইয়া, বায়ুর তর্জ্জন লইয়া লোফালুফি করিতেছে। দূরে দূরে দুই একখানি তরী তরঙ্গপাখা বিস্তার করিয়া পরীর মত ভাসিতেছে। আমাদের জাহাজ তরঙ্গ তুলিয়া সগর্ব্বে চলিয়াছে। কিন্তু কাঁপিতেছে—

"যাদঃপতি রোধ যথা চন্দ্রোর্ম্মি আঘাতে।"

হৃদয় কাঁপিতেছে! কিন্তু সুখে নহে, শোকে নহে, ভয়ে নহে।

৯

চারিদিনের পর আমরা দেশে পৌঁছিলাম। বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময় মার হৃদয়ভেদী ক্রন্দনে দেশের সকলেই আমাদের বিপদ বুঝিতে পারিল। দলে দলে সকলে আসিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল। আমার উপর ভরসা বাঁধিতে অনুরোধ করিল।

ক্রমে পার্ব্বতীর কথা উঠিল। তাহার অদৃষ্টের কথাও উঠিল। শুনিতে শুনিতে আমাদের মনে কেমন একটা খট্‌কা জন্মিয়া রহিল।

পার্ব্বতী কাঁদে না, হাসে না। মার মুখ চাহিয়া থাকে। দুপুরবেলা ঘরে একা থাকিলে, প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, দক্ষিণের জানেলা খুলিয়া চাহিয়া আছে। কি যেন দেখিতে চেষ্টা করিতেছে। সকালে বা সন্ধ্যার সময় ছাদে উঠিয়া, গালে হাতটি দিয়া দক্ষিণ-পানে চাহিয়া আছে। কেন?

দিনে দিনে শোক মন্দীভূত হইয়া আসিল। নিষ্কর্ম্মাবস্থায় চুপ করিয়া থাকা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। আমার প্রকৃতি শৈশবাবধিই চঞ্চল। প্রথমে মলিন মুখে দু এক

যায়, ক্রমে ঘন ঘন আমার পুরাতন দলের সহিত মিশিতে লাগিলাম। মেঘনাদকে আবার চাগাইয়া তুলিলাম।

১০

আজ কলিকাতায় আমাদের অভিনয়। সকলেই ব্যস্ত সমস্ত, স্নানাহার নাই। বাঁশপোতা, ষ্টেজ সাজান চলিতেছে। আমরা দুই একজন কর্ত্তা মুরব্বিয়ানা করিতেছি। গৃহস্থ শশব্যস্ত। ছেলেরা সঙ্গ ছাড়ে না। খাতিরের ত্রুটি নাই।

সন্ধ্যা আসিল। দর্শক জমিতে আরম্ভ হইল। অভিনেতারা দলে পুরু হইতে লাগিলাম। কতকটা মাকে মাকে ছুটাছুটি, হাঁকাহাঁকি, ক'য়করমায়েস করিতে লাগিলাম। একটু ঝগড়ার মতনও হইল। শেষ দশটা বাজিল।

সময় উপস্থিত। যবনিকার পাশ দিয়ে সকলে দেখিয়া বুঝিলাম, মজলিস পুরা! যবনিকা উঠিল। অভিনয় আরম্ভ হইল।

ঐক্যতান তিনবার বাজিল। রাবণের সভা সাজান হইল। Drop scene-খানা আধখানা উঠিয়া উঠিল না। ঘন ঘন করতালি পড়িল। আমাদের মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল। Drop-scene আবার ফেলিয়া দেওয়া হইল। আমরা সসাজে সকলেই Drop scene-এর দড়ি লইয়া ব্যস্ত হইলাম। আবার দুইবার ঐক্যতান বাজিল। Drop scene উঠিল।

রাবণের সভা। ভয়দূত একটু তৈয়ারী অবস্থায় ছিল, গড় গড় করিয়া, লম্ফ ঝম্ফে বক্তৃতা আওড়াইল। "পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্র লেখাই" বলিয়া একবার পিঠ দেখাইল, একবার বুকে হাত দিল। কাঁদিল কি হাসিল, কেহ বুঝিতে পারিল না।

রাবণের অভিনয়, লক্ষ্মণের এবং হনুমানের অভিনয় বেশ হইয়াছিল। প্রমীলা বীরমদে বা শুধু মদে একটু বেশী চঞ্চল হইয়াছিল। আমার মেঘনাদের অভিনয় সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম হইয়াছিল। বিশেষতঃ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে। আমাদের চার পাঁচ জন অভিনেতাই একছুটে wingsএর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সীতা সরমার অংশ বাদ দিয়াছিলাম। দুই দিন পরে Statesman-এ আমাদের খুব সুখ্যাতি করিয়া para বাহির হইয়াছিল। সে কাগজ খানা আজও আমার আছে।

১১

রাত্রি আড়াইটার সময় থিয়েটার ভাঙ্গিল। দর্শক ভাঙ্গিল, দুই চারিজন অভিনেতাও কোথায় ভাঙ্গিল। রাত্রে ট্রেন নাই, অবশিষ্ট রাত্রি সেই খানেই কাটাইতে হইবে। অধিকাংশ অভিনেতা অবস্থা ক্রমে বেতরগোছ করিয়া তুলিয়াছে, যে যেখানে পাইল, জমি লইল।

আমাকে গৃহস্বামী ও তাঁহার পুত্রেরা খানিক আপ্যায়িত করণানন্তর অন্দরে প্রস্থান করিলেন। উপরের বৈঠকখানা আমার শয়ন জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। আমি মাদুরকম্বল স্পর্শ করি না।

রাত্রি শেষ প্রহর। গৃহ নির্জ্জন। প্রকাণ্ড প্রাসাদ নিস্তব্ধ। কোথাও টুঁ শব্দটী নাই। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন সম্মুখে অন্ধকারের মতন পড়িয়া আছে। একটা ছুটো আলো কোথাও মিট্ মিট্ করিতেছে। আমার ঘরে একটা নিদ্রালোলুখ লাবাদান জ্বলিতেছে। বাড়ের কলম, ছবির ফ্রেম এক একবার চিক্ চিক্ করিতেছে। রাত্রি জাগরণে, সারাদিনের পরিশ্রমে শরীর বড় ক্লান্ত,

অপরিচিত স্থান, ঘন ঘন স্বপ্নে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। কিন্তু তন্দ্রা আছে।

সহসা কাহার যেন হাত বুকে ঠেকিল। এ কি? স্ত্রীলোক!

"তোমার সেই গানটী একবার গা না।"

মেঘনাদ প্রমোদ উদ্যানে একটি গান গাহিয়াছিল।

১২

বিষম বিপদ্। প্রভাত হইয়াছে, সকলে জানিয়াছে। উপায় কি? প্রাণ শুকাইয়া গিয়াছে। রমণী একবার হাতে ধরে, একবার পায়ে পড়ে; উপায় কি! দ্বার বন্ধ কর।

দ্বারে ঘা পড়িল। বাড়ীর ভিতরে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে, ক্রমে সজোরে ঘন ঘন আঘাত। শুনিতেছি। উত্তর নাই।

পাশের ঘরে দরজা খুলিয়া একজন, ক্রমে দশ বারো জন প্রবেশ করিল। ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন, ভীম আক্রমণের উদ্যোগ হইল। আমার দল আমার হইয়া লড়িল। দুই চারি ঘা খাইলাম, পলাইলাম, ষ্টেজ ব্যাকেয়াপ্ত হইল।

১৩

এ মুখ লুকাই কোথা! দেশে রটিয়াছে, আমি ভদ্রলোকের অন্দরে বলে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আর মুখপানে আর চাহিতে পারি না, গ্রামের ভদ্রলোকদের সম্মুখে আর বাহির হইতে পারি না, দল চটিয়া গিয়াছে, ষ্টেজের খরচ আমার তহবিলে দিতে হইবে।

এ মুখ লুকাই কোথা। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল, কথা ছিল, এক বৎসর পরে কালাশৌচান্তে বিবাহ হইবে। সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। দেশ বিদেশে টি টি পড়িয়া গিয়াছে।

মা কাঁদেন, পুত্রবধূর মুখ এ জন্মে আর দেখিতে পাইবেন না! বর্ষীয়সীরা বলেন, কেমন পুণ্যবানের এমন কুলাঙ্গার পুত্রও জন্মে! সঙ্গীরা মেলে না, তাহাদের অভিভাবকেরা আমার সহিত মিশিলে তাহাদিগকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিবেন।

বর্ষীয়সীরা আমার কথা উঠিলে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, ভুঁয়ের ছেলে কোলে টানিয়া লয়। যৌ ঝিরা আমার কথা উঠিলে রঙ্গের তরঙ্গ তুলিয়া হাসে। পার্ব্বতী আর আমার সম্মুখে আসে না। কেহ বলিতেছে, গোড়া হইতেই আমার স্বভাব মন্দ।

১৪

মা। পার্ব্বতি, পারিতো তোমার এই মাসেই বে দিয়ে কাশীবাসী হইব। ছেলেটী গরিব লোক, বাপ মা থাক না থাক, স্বভাব চরিত্র ভাল দেখে দেবো। তোমার মুখ দেখে মর্ত্তে পারেও তবু সুখে মরবো। আমার বাড়ীখানা জামাইকে দেবো। আর গয়নাপত্র যা আছে তোমায় দিয়ে যাবো।

পার্ব্বতী। মা!

১৫

পার্ব্বতীর বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হইয়াছে। মা বিবাহের আয়োজন করিতেছেন। নিজের তন্ত্রীতাল্পা বাঁধিতেছেন। বিবাহের পরদিনই কাশী যাত্রা করিবেন। সঙ্গে আমিও যাইব।

বিবাহের আর এক সপ্তাহ বাকি। এমন সময়ে বাড়ীতে এক জন লোক আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে দুই তিনটা চাকর,

একটা দরওয়ান, চার পাঁচটা বড় তল্পী, সোনার হুঁকা, রূপার গাড়ু ইত্যাদি। পরিচয় দিলেন, তিনি কিশোরীর পিতা! কিশোরী পার্ব্বতীর পিতৃদত্ত নাম। সে আবার কি?

কিশোরীর পিতা উড়িষ্যার একজন বিখ্যাত ধনী। তিনি পঞ্জাবে চাকুরী করেন, ভারি চাকুরী। উড়িষ্যায় তাঁহার দুই পুরুষ বাস।

কিশোরী শৈশবে মাতৃহীন হয়। পিতা পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করেন। বিমাতার হস্তে শিশুকন্যার অযত্নের সম্ভব ভাবিয়া কিশোরীকে কিশোরীর মাতৃস্বসার নিকট রাখেন। মাতৃস্বসা বন্ধ্যা, দরিদ্র। পিতা বালিকার জন্য কিছু কিছু মাসহারা দিতেন। সেই খরচে তাহার মাতৃস্বসা, মাতৃস্বস্পতিরও চলিয়া যাইত। কিশোরীকে তাঁহারা প্রাণাধিক ভাল বাসিতেন। ক্রমে মাসহারা বন্ধ হইয়া দুই চারি মাস অন্তর কিছু কিছু দাঁড়াইল। শেষে কচিৎ। মাতৃস্বস্পতি কিছু জানাইতে পারে না। লজ্জা করে। যৎকিঞ্চিৎ নিজের দু দশ টাকায় সংসার চালান।

দুর্ভিক্ষে দু দশ টাকায় খাই পায় না। তাই বালিকার মাতৃস্বসা বুক বাঁধিয়া, বুদ্ধি খাটাইয়া, পার্ব্বতীকে আমাদের দিয়া গিয়াছিল। পার্ব্বতী তাঁহাকেই মা, মাতৃস্বস্পতিকে পিতা বলিয়া ডাকিত। জন্মদাতাকে দুই চারিবার দেখিয়াছিল মাত্র।

পার্ব্বতীর জন্মদাতা ছুটিতে দেশে পৌঁছিয়া, সমস্ত খবর অবগত হইয়া কন্যার সন্ধানে আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছেন।

আদর অভ্যর্থনার ত্রুটি হইল না। তিনিও কৃতজ্ঞতা জানাইতে কসুর করিলেন না।

১৬

বিবাহের কথা উঠিল সে সম্বন্ধে তাঁহার মত নাই। তিনি বলেন কিশোরীর সহিত আমার বিবাহ দিতে। মা বলেন, পার্ব্বতীর সহিত আমার বিবাহ হইতে পারে না। আমি পার্ব্বতীর অযোগ্য। পাড়ার দু চারি জন মুরুব্বি আসিলেন, আমার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিলেন। বলিলেন, এমন ছেলে হয় না। নিখুঁত ছেলে।

পার্ব্বতীর পিতার মতই দৃঢ় হইল। মা বিরক্ত, কিছুতেই রাজি নহেন। শেষে মাতব্বরেরা আমাকে মান্য মানিলেন। কি বলি!

পার্ব্বতি—পার্ব্বতি! এমন রূপ গ্রামে নাই, এমন গুণ কোথাও দেখি নাই। সমস্ত ভুলিব, সমস্ত ছাড়িব। জীবন নূতন করিয়া গঠিত করিব। পার্ব্বতী আমার হইবে, এ কথা পূর্ব্বে কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমার অদৃষ্ট কি এত সুপ্রসন্ন।

মুখে বলিলাম—'না,'—সেটা যেন 'মা রাজি নহেন বলিয়া বলিলাম। সেটা যেন লজ্জায় বলিলাম। কাহারো সে না'টা বুঝিতে বাকি রহিল না।

পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করা হইল। পার্ব্বতীও বলিল—'না।'

একি আমার মতন— না!

১৭

গভীর রাত্রি। আপনার ঘরে ঘুমাইতেছি। দারুণ গ্রীষ্ম। দক্ষিণের জানেলা দিয়া একএকবার ক্ষুর ফুর করিয়া বায়ু আসিতেছে, পরক্ষণে কিছুক্ষণের জন্য গুমট। ঘুম ছাড়া-ছাড়া।

"দাদা—দাদা!"

কে যেন আমার পায়ে হাত বুলাইতেছে। ডাকিতেছে, "দাদা—দাদা!"—পার্ব্বতী!

একি, এত রাত্রে পার্ব্বতী আমার ঘরে কেন? আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, —"কি পার্ব্বতি?"

পার্ব্বতী বলিল, "বাবা তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে চান, সে কি ক'রে হয়?"

"কেন হয় না?"

পা। আমি শুনেছি, তুমিও নাকি রাজি হ'য়েছ। ছি, লজ্জা করে না! মা কেন রাজি নন?

"মা বলেন—" পূর্ব্ব কথা মনে পড়িল, ঘর্ম্ম ছুটিল। কথা বদলাইয়া বলিলাম, "মা বলেন তোমার সঙ্গে আমার খাটে না।"

পা। তাইত, খাটে নাইত। ভাই বোনে বিয়ে! ছি!

এইবার আমার বক্তৃতার মুখ খুলিয়া গেল। বুঝাইলাম, তাহাতে আমাতে সম্পর্ক কি? শুধু পাতানো মাত্র। এ বিবাহ হইতে পারে। দশ বারোটা উদাহরণ দিলাম। তাহার পিতার যখন মত, তখন তাহার আপত্তি টিকিতে পারে না। পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা মহা পাপ। তিনি তাহাপেক্ষা পণ্ডিত, শাস্ত্র বোঝেন, পাঁচটা দেখেছেন শুনেছেন। আর, যাকে তুমি মা বলিয়া ডাক, তাই বা কি, বিবাহ হইয়া গেলেও মা বলিয়া ডাকিবে। শাশুড়ীকে ত বৌ মা বলিয়া ডাকে।

১৮

কল্য আয়ুর্ব্বেদের মান রাখা নাই, পার্ব্বতীর পিতা নিজ খরচে বিবাহ দিতেছেন। পড়শী বৌ-ঝিরা আসিয়া সমস্ত আয়োজন করিয়া দিতেছে।

হৃদয় প্রফুল্ল। কত কল্পনা করিতেছি, কত খেয়াল আঁটিতেছি। জগৎ আনন্দময়। যেন আমারই মুখ চাহিয়া চন্দ্র সূর্য্য উঠিতেছে, ডুবিতেছে। আমারি মুখ চাহিয়া বায়ু বহিতেছে, ফুল ফুটিতেছে, বিহঙ্গ ডাকিতেছে।

সংসার আরাম স্থান। কোন কোলাহল নাই। কেমন মধুর আলস্যে প্রভাত উঠিতেছে, স্ত্রীপুত্রের সুখের জন্য চিন্তা করিতেছি! দিবসে পরিশ্রম করিতেছি। সন্ধ্যা রাত্রির অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছি! রাত্রি কি সুখের! কত সুখ, কত কথা, কত প্রেম!

আহা সংসারী-জীবন যেন একটী শান্ত নদী! মৃদু মধুর প্রবাহে, মরু-পর্ব্বত-অরণ্য পূরিত পৃথিবীতেও তরুচ্ছায়ায় খেলিয়া খেলিয়া, দেবালয়ের ভগ্ন সোপান চুম্বিয়া চুম্বিয়া, প্রকাণ্ড পুরাতন প্রাসাদের মূলে লুটিয়া লুটিয়া, ধীরে ধীরে বহিয়া যায়!

সংসারী না হইলে মানুষের মতি স্থির থাকে না।

১৯

প্রভাত হইয়াছে। ক্রিয়া বাড়ী। প্রতিবেশী আত্মীয়-কুটুম্বেরা জুটিয়াছেন। ব্যস্ত সমস্ত, হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি করিয়া ঘনিষ্টতা দেখাইতেছেন। মেয়েরা আসিতেছে, যাইতেছে। আসিতে যাইতে দুই চারিবার কেহ অবাক নেত্রে, কেহ হাসিয়া, কেহ উঁকি মারিয়া আমাকে দেখিয়া যাইতেছে। পার্ব্বতী কোথা? বুঝি ঘাটে গিয়াছে।

নহবৎ বাজিল। বাড়ীতে যে একটা উৎসব আছে—এতক্ষণে বুঝা গেল। সকলে উৎফুল্ল, ব্যস্ত। পার্ব্বতী কোথা! মেয়েরা ব্যস্ত হইল, ঘাটে খুঁজিতে গেল। ঘাটে নাই। খোঁজ খোঁজ। পার্ব্বতি—পার্ব্বতি!

জেলে মাছ আনিয়াছে, উঠনাদার উঠনা আনিয়াছে। নাপিত, পুরোহিত উপস্থিত। এখনো কন্যা সাজান হয় নাই। লগ্ন বহিয়া যাইবে যে। পার্ব্বতীর পিতা ব্যস্ত হইলেন, কিশোরী-কিশোরী! পার্ব্বতী-পার্ব্বতী!

মেয়ে পুরুষ, চাকর বাকর, জেলে নাপিত সকলে খুঁজিতে লাগিল। গোল পড়িয়া গেল। পার্ব্বতীর পিতা যে দিকে ছোটেন, সকলে সেই দিকেই ছোটে।

পার্ব্বতীর পিতা ঘাটে ছুটিলেন। আষাঢ় মাস, পুষ্করণীর সিঁড়ি পিছল। বলিলেন, বুঝি পা পিছলাইয়া ডুবিয়া গিয়াছে।

ভয় হইল। একে একে অনেকে ডাকিল। সকলে ভাবিয়াছিলেন, পার্ব্বতী বুঝি লজ্জায় কোথাও লুকাইয়া আছে। জাল ফেলা হইল। এক ক্ষেপ, দুই ক্ষেপ, তিন ক্ষেপ।

সোণার প্রতিমা উঠিল। দুটি সুগোল বাহু বুকে শিথিলভাবে পড়িয়া আছে! চাচর কেশদাম বুকে, পিঠে, বাহুতে জড়াইয়া রহিয়াছে। কুন্তল দুটি রক্তিম কপোলে এখনো লুটাইতেছে। মুখখানি শান্ত, স্থির, কোরক আঁখি ঈষৎ নিমীলিত। প্রফুল্ল অধরে সে মধুর হাসিটি এখনো অলসভাবে ফুটিতেছে!

যে যে উপস্থিত ছিল, সকলে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। হায় হায়, পার্ব্বতীর কি অদৃষ্ট! জন্মিয়া মাকে খাইয়াছে, পিতৃস্নেহ, আত্মীয় স্বজনের মমতা এ জন্মে পাইল না! দয়াশীল প্রতিপালককে খাইয়াছে, আজ বিবাহের দিনে—সুখের দিনে অপহৃতা হইল!

একজন প্রতিবেশী ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল। Assistant Surgeon আসিল, Galvanic Battery লাগান হইল। পার্ব্বতীর দেহ দুই চারিবার কাঁপিয়া উঠিল, নাক কাণ গড়াইয়া শোণিত ধারা দেখা দিল। নাই!

২০

আর কি বলিব? পুলিস ঘুষ খাইল। শবদাহান্তে পার্ব্বতীর পিতা দেশে চলিয়া গেলেন। আমাদের বাড়ীতে আর আসিলেন না। আমি মাতাঠাকুরাণীর সহিত এখন কাশীতে বাস করিতেছি। বয়সে মাতাঠাকুরাণীর দেহ দুইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া দিন কাটাইতেছি। প্রত্যহ প্রাতঃকালে বরুণার স্নান ও সন্ধ্যাকালে পুণ্যাত্মা সাধুদিগের শ্রীচরণ দর্শনলাভ করিতেছি। ধূপপ্রসাদ পাইতেছি। সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে দুই চারি আনার গঞ্জিকা উপহার দি, আর জীবাত্মা পরমাত্মার প্রভেদ শিখি।

শ্রীকেদারনাথ।

ভারতে কেরাণীগিরি।

ভারতবর্ষে যে দিন হইতে পাশ্চাত্য সাধারণ শিক্ষার বিস্তার ও তদ্নিবন্ধন সামাজিক জাতিবন্ধন প্রথার শিথিলতা দেখা দিয়াছে, বলা বাহুল্য, সেই পুণ্যভূমি হিন্দুস্থানে পাপময় কেরাণীগিরির মূল স্থাপন সেই দিন হইতেই সুদৃঢ় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আদিম অবস্থায় যখন ভারত পরাধীন ছিল না ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের লোকই যখন ভারতের কেবল মাত্র অধিবাসী ছিলেন, অর্থাৎ যখন ম্লেচ্ছ যবন ভারতে পদার্পণ করে নাই, তখন কেরাণীগিরির সৃষ্টিও হয় নাই এবং কেরাণীগিরিই যে উত্তরকালীন ভারত সন্তানদিগের প্রধান উপজীবিকা হইবে বোধ হয় তাহা কেহ স্বপ্নেও অনুভব করেন নাই। বর্ণগত স্বতন্ত্র সামাজিক-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিলেও পুরাকালে লেখা পড়ার চর্চ্চা কেবল মাত্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই ছিল। গ্রন্থাদি প্রণয়ন, বক্তৃতা, বাদানুবাদ গবেষণাদি কার্য্য ব্রাহ্মণদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইত। তাহাতে অন্য কোন বর্ণের লোকের কিছুমাত্র সংস্রব থাকিত না। পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণদিগের সংস্রবে আসিতে তাহারা সাহসই করিত না, এবং দূরদর্শী ব্রাহ্মণ মহাশয়েরাও তাহাদিগকে সে প্রশ্রয় দিতেন না। যদিও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের লেখাপড়া চর্চ্চার বিষয় কতক কতক শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা বর্ণনীয় সময়ের পরবর্ত্তী ও সাময়িক মাত্র। কারণ, প্রধানতঃ তাহারা শান্তি সংরক্ষণ ও বাণিজ্যাদি কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিত। সামান্য মাত্র লেখা পড়া যাহা তাহাদের সময়ে সময়ে আবশ্যক হইত তাহা আপনারাই সম্পাদন করিয়া লইত। কিন্তু শূদ্রের এ বিষয়ে সামান্যমাত্রও সংস্রব ছিল না। শারীরিক পরিশ্রমই তাহাদিগের জীবনোপায় ছিল। লেখা পড়ার ধার কিছুই ধারিত না। বর্ণোত্তমগণের সেবায় রত থাকিয়া সামান্য সামান্য উহু কার্য্যেই তাহারা সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিত। সেই জন্য শূদ্র আদিকালে সমাজে নগণ্য অধম জাতি বলিয়া পরিগণিত ছিল।

ভারতের তখন স্বাধীন অবস্থা। ভারতবাসী তখন ভারতবাসীরই অধীন। যাহারা চাকরী করিত তাহারা ভারতবাসী, যাহাদের চাকরী করিত তাহারাও ভারতবাসী। উভয় সম্প্রদায়ই এক বংশোদ্ভূত। সুতরাং অত্যাচার ছিল না। এক পক্ষের দোষ থাকিলেও অপর পক্ষের চক্ষে লাগিত না। এক বৃত্তি ছাড়িয়া বৃত্তান্তর গ্রহণেও অল্প হইত। এইরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ তাদৃশ কষ্টকর ছিল না। নিজের দেশে নিজে উহু কার্য্য করিতেও লজ্জাবোধ করিত না, মান অভিমানও ছিল না। ভারতবাসী তখনও কেরাণীগিরির সৌখিনত্ব উপলব্ধি করে নাই। কেরাণীগিরি ভিন্ন অন্য বৃত্তি অবলম্বনে যে মানের লঘুতা হইয়া থাকে এ সর্ব্বনেশে জ্ঞানটী ভারতবাসীর তখনও জন্মায় নাই।

এই সময়ে বাঙ্গালার অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল। তথায় রাজা প্রজা সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল বটে কিন্তু প্রজাপুঞ্জ তাদৃশ উন্নত ও সুসভ্য হয় নাই এবং

নরপতিগণও তাদৃশ পরাক্রান্ত ছিলেন না। ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা কিছুই ঘটিত না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কালক্রমে বঙ্গাধিপ আদিশূর স্বরাজ্যে কান্যকুব্জ হইতে যজ্ঞার্থে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। সেই পঞ্চ কনৌজীর সঙ্গে পাঁচ জন কায়স্থ বাঙ্গালায় আইসেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে এই উভয় শ্রেণীর লোকই বাঙ্গালায় চিরস্থন অধিবাসী হইলেন। ব্রাহ্মণদিগের অনুচর হইলেও উক্ত পঞ্চ কায়স্থদিগের, আদিম অধিবাসী শূদ্রদিগের সহিত কোন সংস্রবই ছিল না। তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে আসিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ দিগের সংসর্গে থাকিয়া তাঁহাদের সেবা করিয়া পবিত্র আচারে ও বিদ্যাভ্যাসে নিয়তই কালযাপন করিতেন। সুতরাং তাঁহাদিগকেও, শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের তুল্য উচ্চশ্রেণীর বলিয়া মান সম্ভ্রম প্রদান করিত।

পরে বাঙ্গালা মুসলমান হস্তগত হইল। মুসলমান রাজত্ব প্রচলিত হইল। হিন্দুর হিন্দুয়ানি ক্রমে কমিতে লাগিল। বিজাতীয় আচার পদ্ধতি ক্রমে হিন্দুর পবিত্র ভাব কলঙ্কিত করিতে লাগিল। হিন্দুর সংসারে পাপ প্রবেশ করিল, তথায় দুঃখ ও কষ্ট ক্রমে দেখা দিল। দুঃখের দায়ে রুচির পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। মানসিক বৃত্তির বৈলক্ষণ্য ঘটিতে লাগিল। অবশেষে পেটের দায়ে পরাধীন হিন্দু ম্লেচ্ছের চাকরী স্বীকার করিল। কিন্তু তাহা হইলেও তখনও উপরিতন শ্রেণীরা স্ব স্ব অবলম্বিত বৃত্তি ত্যাগ করিল না। হিন্দু চাকরী স্বীকার করিল বটে কিন্তু ব্রাহ্মণ অধ্যাপনা ও যাজকত্ব ছাড়িল না। ক্ষত্রিয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের অধীশ্বর থাকায় পরাধীন হইয়াও এক প্রকার স্বাধীন রহিল। বৈশ্য স্বাধীন ভাবে বাণিজ্য করিতে বিরত হইল না। শূদ্র পূর্ব্বেও যে রূপ ছিল এখনও সেই রূপ রহিল। তবে কাহার সর্ব্বনাশ হইল? কে আপনাকে বিক্রয় করিল? যাহারা ব্রাহ্মণের অনুচর, যাহাদের লেখা পড়া ব্যতীত জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান উপায় অন্য কিছুই ছিল না—সেই কায়স্থ। বিদ্যানুশীলনকারী কায়স্থ অনায়াসে কারসী শিখিয়া রাজসরকারে সম্মানের সহিত মসিজীবির বৃত্তি অবলম্বন করিল। ভারতে কেরাণীগিরির সূত্রপাত হইল।

কিন্তু তাহা ইদানীন্তন কেরাণীগিরির মত নহে। মুসলমান হিন্দুর দুঃখে দুঃখ বোধ করিত, তাহাকে যথাযোগ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতে লাগিল। সুতরাং কায়স্থ কেরাণী হইয়া তখনও অত্যাচার স্রোতে প্রপীড়িত হয় নাই। দেখা যায় ইদানীন্তন যে সকল কায়স্থ বড়ঘরওয়ানা বলিয়া বিখ্যাত তাঁহাদের প্রায় সকলেই মুসলমান রাজত্বের কেরাণী। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান সরকারে দেওয়ান, নায়েব, পেস্কার ইত্যাদি পদে অভিষিক্ত ছিলেন। দেওয়ান রামচাঁদ, মুন্সী নবকৃষ্ণ ও নায়েব গোবিন্দরাম মিত্র তাহার দৃষ্টান্তস্থল। অন্য সাম্প্রদায়িক লোকে স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকায় কেবলমাত্র কায়স্থের কেরাণী হওনে কাহারও বড় একটা অনিষ্ট হয় নাই। হিন্দুর সংসারে এ রকম কষ্টও হয় নাই।

সময়ের পরিবর্ত্তন হইল। মুসলমান রাজত্ব ফুরাইল। ইংরাজ ভারতের অধীশ্বর হইলেন। বাণিজ্যই তখন ইংরাজের ধনোপার্জ্জনের প্রধান উপায়। রাজভাণ্ডারে অর্থাগম সামান্য মাত্র ছিল।

সুতরাং বণিক ইংরাজের কেরাণি, মুহুরি, সরকার ইত্যাদি লোকের যথেষ্ট প্রয়োজন হইল। অনন্যোপায় কায়স্থেরাই সে অভাব পূরণ করিতে লাগিল। ইংরাজ মুসলমান অপেক্ষা সুশিক্ষিত, সুতরাং কাজের কৌশলে তাঁহারা তাহাদের অপেক্ষা সুদক্ষ। দূর-দেশবাসী ইংরাজ রাজ্যস্থাপন সুদৃঢ় করিতে অগ্রে বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালীকে হস্তগত করিল। মুসলমানেরা তখন পর্য্যন্ত হীনবল ও ভারতবহির্ভূত হয় নাই। মুসলমান শাসন-প্রণালী তখনও পর্য্যন্ত ইংরাজের অধিকৃত রাজ্যে প্রচলিত ছিল। অধিকন্তু ভারতের অন্য অন্য প্রদেশের অধিবাসীরা নামে মাত্র পরাধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। ভারতের স্বাধীন অবস্থায় তাহারা যে রূপে দিন কাটাইত তখনও অবিকল সেইরূপ করিত। কৃষিবৃত্তি, গোমহিষাদি চারণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ তখনও তাহাদের পক্ষে সুখদায়ক বলিয়া বোধ হইত। সুতরাং দুর্ব্বল, বিলাসপ্রিয় ভারতসন্তানগণের মাতৃ-ভূমি বাঙ্গালাই যে কেরাণী সন্তানের আগার হইবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বলা বাহুল্য কেরাণীগিরি তখনও পর্য্যন্ত কেবলমাত্র কায়স্থদিগের মধ্যেই ছিল। কিন্তু এরূপ ভাব অধিক দিন রহিল না। এই সকল ম্লেচ্ছ রাজত্বে যে ক্রমে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব লোপ পাইতেছিল তাহার উল্লেখ এখানে অত্যুক্তি মাত্র। সুতরাং ব্রাহ্মণেরও যে ক্রমে ইংলণ্ডরাজমূর্ত্তি-অঙ্কিত শুভ্রবর্ণ উজ্জ্বল মুদ্রায় লালসা জন্মিবে তাহা বিচিত্র নহে। ব্রাহ্মণও চাকরী স্বীকার করিলেন। চাকরী—কেরাণীগিরি। এ দিকে ইংরাজের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার রাজ্যশাসন ও বাণিজ্যাদির সৌকার্য্যসাধক শান্তিরক্ষা, পূর্ত্তবিভাগ, ডাক, টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে প্রভৃতির অভাব বাড়িতে লাগিল। বুদ্ধি-কৌশলে ও অর্থবলে ইংরাজ সহজ সহজই সে সকল অভাব মোচন পূর্ব্বক নূতন নূতন কার্য্যালয় সংস্থাপন করিয়া কেরাণীর ভাতভিত্তির সংস্থান করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোত প্রবল বেগে বহিতে আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ কায়স্থ লেখাপড়ার চর্চ্চা করিত। কিন্তু এখন আর সে প্রথা রহিল না। শূদ্রের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি ও আচার পদ্ধতি অনুযায়ী যে যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্র-দায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারাও অবাধে লেখা পড়া শিখিতে লাগিল। ক্রমে জাতি-বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল। কামার কুমার, তাঁতী, কলু, চাষা, মালী, নাপিত, ধোবা ইত্যাদি শূদ্রেরা স্ব স্ব বৃত্তি পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক লেখা পড়া শিখিয়া ইংরাজের দপ্তরে চাকরী আরম্ভ করিল। শ্রীবৃদ্ধির সহিত ইংরাজের যেমন বিষয় কার্য্যাদির বৃদ্ধিসাধন ও তন্নিবন্ধন যেমন অল্প অর্থে সন্তুষ্ট লোকের অভাব হইতে লাগিল, ভারতের আদিম অধিবাসীর বংশোদ্ভূত এই সকল নব্য-শিক্ষিত লোকেরাও তেমনি সে অভাব গুলি মোচন করিতে লাগিল। কিন্তু দেশের যে কি ভয়ানক সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল তাহা একবারের তরেও কেহ ভাবিয়া দেখিল না।

এইরূপে দস্তুরমত কেরাণিগিরির সৃষ্টি হইয়া তাহার সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ইংরাজও আদর যত্ন দেখাইয়া বোকা বাঙ্গালীকে আরও ভুলাইতে লাগিল। আফিসে টানাপাখা খুলিল। মাদুরের

পরিবর্ত্তে বেত্রনির্ম্মিত চৌকি আসন হইল। কেরাণীর আর সুখের সীমা রহিল না। আফিসের চাকরী লোকের অষ্টপ্রহরের ধ্যান জ্ঞান ও চিন্তা হইয়া পড়িল।

কিন্তু, যদি এত অনুরাগ—এত আগ্রহ তবে আবার আজ কাল আফিসের বিরুদ্ধে এত কথা কেন? যে আফিসের চাকরীর এককালে এত মান, এত সম্ভ্রম ছিল তাহার প্রতি এত বিরক্তি ও তাহার বিরুদ্ধে এত আন্দোলন কিসের জন্য? লোকের বাড়ী গিয়া দুই দণ্ড বসিলে এ কথা ও কথা পাঁচ কথার পরই আফিসের কথা উঠে। তখন যে কয়জন বসিয়া থাকিবেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ, "বড় সাহেব বড় দুর্দ্দান্ত," কেহ "দুচ্ছুদ্দি বড় পক্ষপাতী", কেহ "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বড় দুষ্ট" ইত্যাদি নানা কথা কহিয়া থাকেন। দশটার সময় সদর রাস্তা দিয়া চলিলেই "চলিয়া চল আর একদিন লেট (Late) হইলেই মাহিনা কাটা যাইবে" "একটা ভুলে এক সপ্তাহের বেতন কাটিয়াছে" "পয়ের ভুলে ডিগ্রেড degrade) হইলাম," "এবার পূজায় বক্সিস দিলে না" "আমার পরে আসিয়া, প্রোমোসন (promotion) পাইল," "খাটিয়া খাটিয়া জান গেল" ইত্যাদি দুঃখের কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। মধ্যে মধ্যে আফিসের মধ্যেও ঝগড়া বিবাদ, এমন কি, হাতাহাতি পর্য্যন্তও ঘটিয়া থাকে। তা ছাড়া আবার বাঙ্গলা ইংরাজী সংবাদ পত্রের দীর্ঘ দীর্ঘ স্তম্ভও সময়ে সময়ে কেরাণীর দুঃখের কাহিনীতে পরিপূর্ণ থাকে! ইহার কারণ কি? একটু মাত্র ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, হয় কেরাণীরা কর্ত্তব্য কার্য্যে পরাঙ্মুখ তাই কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কাজ আদায়ের জন্য পীড়ন করিয়া থাকেন, নয় কেরাণীরা যথাসাধ্য খাটিয়াও অত্যাচারী মনিব মহাশয়দিগকে সন্তুষ্ট করিতে না পারায় তাঁহাদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া থাকে কিন্তু যখন দেখি কেরাণীরা স্বকর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া সকাল বেলা নাকে মুখে কতকগুলা অর্দ্ধসিদ্ধ অর্দ্ধপক্ক অন্ন ব্যঞ্জন গুঁজিয়া, রৌদ্র বৃষ্টি ঝড় তুফান না মানিয়া সরকারের কাজ জোগাইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়াছে তখন যে কেরাণীরা কর্ত্তব্য কার্য্যে বিমুখ তাহা কেমন করিয়া বলিব? যখন দেখি মুণ্ডিতমস্তক কেরাণী এক হস্তে ঘটী ও আর হস্তে ঔষধের শিশি লইয়া টলিয়া টলিয়া আফিসের দিকে চলিয়াছে তখন কেরাণী যে আফিসের কার্য্যে পরাঙ্মুখ তাহা কেমন করিয়া বলিব? যখন দেখি রবিবার নাই, গেজেটেড্ হলিডে (Gazetted holiday) নাই, কাজের দায়ে কেরাণী জল খাবার মাত্র খাইয়া আফিসে রাত্রি জাগরণ করিয়াও খাটিতেছে তখন তাহাকে কার্য্যকরণে অলস কেমন করিয়া বলিব? এমন কি, যখন দেখি বাড়ীতে মড়া পড়িয়া আছে কেরাণী তাহা ফেলিয়াও আফিসে ছুটিয়াছে তখনও আবার এ সম্বন্ধে আর কোন্ কথা কহিব? এই সকল জলন্ত জীবন্ত দৃষ্টান্তে আমরা দেখিতে পাই যে কেরাণী কেরাণীগিরিতে বিশেষ তৎপর। চাকরী তাহার পেশা ও আফিসের খাটুনিই তাহার ভাতভিত্তি। সুতরাং কেরাণী সে বিষয়ে কদাচ ঔদাস্য দেখাইতে পারে না। যদি কেহ কখন আফিসে গিয়া থাকেন দেখিবেন—আমি স্থূল বেতনভোগীদিগের কথা কহিতেছি না,—শীর্ণদেহে শুষ্কমুখে বেট মুণ্ডে

কেরাণী নিয়তই লিখিতেছে। বাক্যালাপ নাই, বিশ্রাম নাই, টিফিনও নাই—নিয়তই খাটিতেছে। বেতন অধিকাংশই ২৫।৩০ টাকা মাত্র। পেটের ভাত জোটাইতেই অস্থির তা আবার টিফিন! মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া কেরাণী ২৫।৩০ টাকা লইয়া আপনি খাইবে, পরিবারবর্গকে খাওয়াইবে এবং লোকলৌকিকতা রাখিবে। ইহার অভাবে উপবাস। তবে আর সে কর্ত্তব্য সাধনে ত্রুটী করিবে কি প্রকারে? অগত্যা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে কর্ত্তৃপক্ষেরাই উৎপীড়ক। তাঁহারা হতভাগা কেরাণীদিগের প্রতি অকারণ অযথা অত্যাচার করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের নেত্র ও কর্ণ হতভাগা কেরাণীদিগের দুঃখ-দৃশ্যে ও পীড়ন-ক্রন্দনে অন্ধ ও বধির। তাহারা দশটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটিয়া মরিতেছে তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। তাহাদিগের দুঃখোক্তিতে কর্ণপাতও নাই। কিন্তু কাজ চাই। তবে কি ইংরাজগবর্মেণ্টের প্রাণ এত কঠিন? ইংরাজ এত নির্দ্দয়? কলতঃ তাহা নহে। যে ইংরাজ-সরকারে ২৫ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে কেরাণীর পেন্‌সন (pension) ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, অসময়ে চাকরী যাইলে যেখানে ইংরাজ গ্র্যাচুইটি (gratuity) দিয়া থাকেন, সুবিধার জন্য যে ইংরাজ কেরাণীবর্গের জন্য casual leave, privilege leave, furlough ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন, সে ইংরাজকে আমরা তাদৃশ দোষ দিতে পারি না। তবে এ সকল কাহার দোষ? এ অত্যাচারী কে? কাহার হস্ত হইতে এ অত্যাচার-স্রোত বহিতে থাকে? নিশ্চয়ই বলিব ইংরাজ যাঁহার উপর আফিসের কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছেন এ দোষ তাঁহার। তিনিই engine of oppression,—তিনিই এই লক্ষ লক্ষ জীবের অভিসম্পাতের পাত্র।

এ জগতে প্রতিপত্তি-লাভে সকলেই ব্যস্ত। লোকের সর্ব্বনাশ হইয়া যাক, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, কিন্তু নিজের লাভ করিতে হইবে। এই স্বার্থ-পরতায় ভারত গিয়াছে। যে ভারত এক কালে পরের দুঃখে কাঁদিয়া তাহার মঙ্গলের জন্য আপনার সর্ব্বস্ব হারাইতেও কিছু মাত্র চিন্তা করিত না, সে এখন পরের সর্ব্বনাশ করিয়া আপনার মঙ্গল সাধিতে সামান্য মাত্র ক্ষুব্ধ হয় না। তাই তার আজি প্রতিক্ষণে অনিষ্ট ঘটিতেছে। আফিস মাষ্টার আফিসের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। ক্ষুদ্র আফিস-রাজ্যের তিনিই জার (Czar)। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার হস্তে আফিসের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন। বৎসর বৎসর কেবল মাত্র একটি Report লইয়াই শান্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু আফিসে একটা হত্যাকাণ্ড হইলেও তিনি তাহার খোঁজ খবর পান না। সকল ভার আফিস মাষ্টারের। আফিস মাষ্টার নিয়তই "কাজ কাজ" করিতেছেন। নির্দ্ধারিত লোকে সে কার্য্য সাধন সম্ভব কি না তাহা ভাবিয়া দেখিবেন না, কিন্তু কাজ চাই। অপারগ হইয়া কেহ তাঁহার কাছে আবেদন করিল, প্রতিফল,—হয়, মাহিনা কমিল, না হয় দু পাঁচটা গালা গালির উপর দিয়া আবেদনকারী অব্যাহতি পাইল। কেরাণী—তাহার অন্য উপায় নাই—পাখার নীচে কেদারার উপর বসিয়া নিজের মাথা নিজে খাইয়াছে, কলমই তাহার উপজীবিকা, সুতরাং গালি খাইয়াও মস্তক নীচু করিয়া আবার খাটিতে আরম্ভ

করিল। পরিশেষে হয় চক্ষু খোয়াইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল, না হয় একটা উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া পঞ্চত্ব পাইল। কিন্তু আফিস মাইবের মেজাজ ঠিক রহিল। যথেচ্ছাচারিতা সামান্য মাত্রও কমিল না। উৎরাজ পর, পর পরের ব্যথা না বুঝিতে পারে কিন্তু দুঃখের উপর আরও দুঃখ যে, যে সকল আফিসে দেশীয় লোকের আধিপত্য আছে, অর্থাৎ ভারত-বাসী যেখানে কর্ত্তা সেখানেও অত্যাচারের ত্রুটী দেখা যায় না। বরং সেখানে অত্যাচার ও পীড়নের স্রোত প্রবল বেগেই বহিয়া থাকে। এই সকল মহানুভব ব্যক্তিই প্রাক্তন ভিন্নহস্তাগত উৎপীড়নের মূলাধার। ঘরের শত্রু বিভীষণ না থাকিলে লঙ্কার কদাচ সর্ব্বনাশ হইত না। যাহা হউক, সে সকল স্থগিত বিষয়ের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা আমরা আবশ্যক বোধ করি না। উপসংহার কালে দেশীয় ভ্রাতৃবর্গকে দু চারিটী কথা কহিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধী নহি, যে যত পার, শিক্ষা কর। কিন্তু লেখা পড়া শিখিয়া কেবল কেরাণী হইবে কেন? কায়স্থ শূদ্র, তোমরা চীনাবাজারে দোকান করিয়া খাইও, সুখী হইবে। ব্রাহ্মণ, সন্দেশ মিঠাইয়ের দোকান কর, ম্লেচ্ছের পদাঘাত খাইতে হইবে না।

শ্রীশচন্দ্র মিত্র।

দিক্‌হারা।

পরাণ সমুদ্র সদা আছাড়িয়া খায়
বাসনার কটিকা-আঘাতে।
কূল নাই দিশা নাই—শুধু শন্ শাঁই শাঁই,
একা আমি আঁধারের রাতে।

সূচিভেদ্য অন্ধকার বেষ্টিয়াছে চারি ধার
দূরমার দুই পাড় তরঙ্গের ঘায়,
করাল কণ্ঠের ডাক অবিরত দেয় পাক
ভীষণ স্রোতের টানে সব ভেসে যায়।
দুরাশা-যামিনী ছোটে, প্রবৃত্তি-ঝরকা লোটে,
কাল মেঘ ডাকে কড় কড়,
হুহু হুহু বহে শুধু বাসনার ঝড়।

এ ভীম তুফান মাঝে না পাই ভাবিয়া
তরি মোর রাখিব কেমনে?
আশা তৃষা ভালবাসা ছিল যাহা রসিকতা
ছিঁড়িয়া নিয়াছে হায়, বুঝি বাদুসনে।

ছিঁড়েছে শান্তির হাল, ছিঁড়েছে সুখের পাল,
ভগ্ন তরি মগ্নপ্রায় জলে,
কোন খানে নাহি কেউ লাফায়ে উঠিছে ঢেউ
হায় হায় যাই রসাতলে।
ভয়ে চারিদিকে চাই কিছু না দেখিতে পাই,
আঁধার—আঁধার রাশি—আঁধার কেবল,
ভীষণ গর্জ্জনে ছোটে জল।
উন্মাদ প্রকৃতি আর কেহ কোথা নাই,
একা আমি দিক্‌হারা হাবুডুবু খাই।

এ দুস্তরে কারে বা ডাকিব আর
কে করিবে ত্রাণ!
এ দুরন্ত বাসনার হাত হ'তে
কে বাঁচাবে প্রাণ!
পারি না পারি না আর হেন নারাবলা,
সহিতে প্রাণের মাঝে বাসনার খেলা।

এ ঘোর তুফানে হায়, তরি মোর যায় যায়
বল নাথ, কি করি উপায়,
কোথা চাহি কোথা বাহি, কিছুই কিনারা নাহি
মরি মরি ঝটিকার ঘায়।
কাতরে ডাকিছে তাই, তোমা বিনে গতি নাই
রাখ রাখ দীনবন্ধু, তুমি দেব ধ্রুবতারা,
অকূলে দেখাও কূল একা আমি দিক্‌হারা।

বাঙ্গালার নবীন কবি ও কাব্য।

বাঙ্গালায় এখন ঘরে ঘরে কবি। কাব্য, খণ্ডকাব্য, গীতিকাব্য প্রভৃতির বড়ই ছড়াছড়ি। এ কবিতাপ্লাবিত যুগে কবি ও কাব্য সমালোচনা বোধ হয় অসাময়িক বলিয়া কাহারও বোধ হইবে না। বাঙ্গালায় আজ কাল সংখ্যাতীত কবি ও কাব্য হইলেও আমরা অপর সাধারণকে রাখিয়া অগ্রে তাঁহাদিগের শীর্ষস্থানীয়দিগের কথাই পাড়িব। সেই শীর্ষস্থানীয়দিগের মধ্যে, মাইকেলকে ছাড়িলে, হেমচন্দ্রই প্রধান। আমরা আজ সর্ব্বপ্রথমে সেই কবিশ্রেষ্ঠ হেমচন্দ্রেরই কাব্যের কথা আলোচনা করিতেছি। অন্যান্য কবিদিগের বিষয় যথাক্রমে পর পর বলিব।

যশস্বী হেমচন্দ্র আজি বাঙ্গালীর কাছে অপরিচিত নহেন। মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে তিনি যতটুকু পরিশ্রম করিয়াছেন, যতটুকু ভাবুকতা, চিন্তাশীলতা ও দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন সেই পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ বাঙ্গালী তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান প্রদান করিয়াছে ও কবির উচ্চ আসনে বসাইবার চেষ্টাও করিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বাঙ্গালা কবিতার কথা যেখানে সেখানে উপস্থিত হইক না কেন কবিবরদিগের মুকুটমণি বলিয়া হেমচন্দ্র অনুক্ষণ সুশোভিত হইয়া থাকেন। কাব্যজগতে হেমচন্দ্র নেপোলিয়নের তুল্য অদ্বিতীয় বিক্রমশালী, মিল্টনের ন্যায় ভাবনুগ ও প্রতিভাবিশিষ্ট ইত্যাদি নানা রূপ সমালোচকগণ অনেক সময়ে সাময়িক পত্রিকার অঙ্গশোভা সংবর্দ্ধন করিয়াছেন। এমন কি স্বদেশের কবি বঙ্কিমবাবু পর্য্যন্ত দাতাকর্ণের অর্থ বিতরণের ন্যায়, সমদর্শিতার সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক হেম চন্দ্রের গুণগরিমা গান করিয়াছেন ও কত কথা বলিয়াছেন—সেই সর্ব্ববাদিসম্মত বিখ্যাত হেমচন্দ্রের সম্বন্ধে ন্যায় ও প্রকৃত সমালোচনার অনুরোধে যদি কোন কোন স্থলে আমরা সাধারণমত-বিরোধী হইয়া পড়ি, তাহা হইলে বোধ হয়, পাঠকদিগের নিকট মার্জ্জনীয় হইব।

হেমচন্দ্রের কবিতা কুসুম-কোমল, আপাতরমণীয় ও ছন্দোবদ্ধ কিরণবর্ষী; স্তর নির্ম্মাণের কারুতায়, রং ফলাইবার দক্ষতায় কবি যথেষ্ট প্রশংসার্হ। ভাবের কুসুমের সহিত কানন কুসুমের পার্থক্য এই যে, বারংবার আঘ্রাণ লইলেও ভাবের কুসুম পরিমলবিহীন হয় না, কিন্তু কানন-কুসুমের প্রকৃতি সেরূপ নহে; উহা সামান্য পবন সংস্পর্শে, নিশ্বাসের ভরে ও আতপের যোগে একটু যেন কেমন কেমন ভাব ধারণ করে—গন্ধহীন ও মুদিত মৃণালীক নম্রশোভাহীন হইয়া পড়ে; যেন বাহ্যশোভার

সহিত হার্দ্দমাধুরীর তেমন প্রাণভরা মিলন হয় না, তাই বাহ্যশোভার তীব্র তেজ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া, আন্তর শোভার মাধুর্য্য ও পরিমল যেন পরাজ্যে গমন করিয়া থাকে।

হেমচন্দ্রের কবিতাকুসুম বেশ উৎফুল্ল, নয়নানন্দ ও বাহ্যশোভার আধার; কথার গাথুনিতে ও ছন্দের নাচুনিতে প্রাণ মোহিত করে ও অন্তঃকরণের বৃত্তিকে নাচাইয়া তোলে বটে, কিন্তু ভাব-মুগ্ধকারিণী শক্তি প্রভাতের প্রদীপ জ্যোতির ন্যায় ক্ষীণ। জ্যোৎস্না মাখিতে সাধ হইলে, পূর্ণচন্দ্রের জগৎপ্লাবনকারী কৌমুদীরাশির মধ্যে বসিয়াও যেমন সাধ পূর্ণ হয় না, আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, জ্যোৎস্না গায় মাখিতেছি অথচ যেন মাখা হইল না বলিয়া মনের ক্ষোভ যায় না, সেইরূপ হেমচন্দ্রের কবিতা পড়িতে পড়িতে পড়িবার ইচ্ছা হয়, ছন্দের নাচনিতে পাঠকের চিত্তবিহঙ্গ নানা ভঙ্গে নাচিতে চায়, কিন্তু তাহাতে কি হইল? ভাবের চিত্তস্তম্ভকারী স্রোতে সহৃদয় প্রমাত্মার মন মাতিল কি না তাহাতে কেহই বুঝিল না। তাই বলিতেছি যে হেমচন্দ্রের কবিতা সমূহে মনমাতান ভাবের ঠাস্‌নি বিরল হইলেও উহা আহার্য্য শোভায় অতি মনোহারিণী।

জগৎ সৌন্দর্য্যময়, উহাতে সৌন্দর্য্যের সীমা নাই। সৌন্দর্য্যবৃক্ষের কেন্দ্রভাগে দণ্ডায়মান হইয়া, কবি আপন মনে মহা-তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকেন। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম হইতে সৌন্দর্য্যের লীলালহরী ছুটিয়া ছুটিয়া যেন অগ্রসর হইতেছে, এক একটি হিল্লোলে এক একটি অদ্ভুত চিন্তা কবির মন হইতে বাহির হইয়া ভাসিয়া যাইতেছে, যেন প্রত্যেক লীলা-লহরীর সহিত মলয় সমীরণ খেলা করিতে করিতে চারিদিকে ধাবিত হইতেছে, কবি তাহাতে বিভোর হইয়া কখন হাসিতেছেন কখন বা কাঁদিতেছেন—বিশ্ব সৌন্দর্য্যের এই আশ্চর্য্য শক্তি কবি যেমন দেখিতে পান অন্যে সেরূপ দেখিতে পায় না।

এই বিশ্ব সৌন্দর্য্যময় হইলেও সৌন্দর্য্যই বিশ্বের সৃষ্টিকারক। এমারসনও এ কথা বলিয়াছেন—"God has not made some beautiful things, but Beauty is the Creator of the universe." মাধুরী-পরিপূরিত এক একটি চিন্তার অণু অবিরত কবিতা-জগৎ নির্ম্মাণ করিতেছে। কালিদাস ভবভূতিই বল, আর সেক্ষপিয়র মেলিই বল, এক এক মহাত্মার অনন্ত কোটি সুচিন্তা-পরমাণুর সাহায্যেও কবিতা-জগৎ পূর্ণ হয় নাই। মানুষ ত সে দিনের সৃষ্ট পদার্থ; জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই কবিতা-জগৎ নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে—সুবিস্তৃত আকাশপটের অভ্যন্তরে, বায়ুর উৎপত্তিমধ্যে, তেজের বিকাশে, জলরাশির কল্লোলে, খণ্ডিতের অঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে কবিতা-জগৎ নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে—এ যে কবিতার কথা বলা হইতেছে ইহা অপকীকৃত জগতের কবিতা, ইহা ভাষাময়ী নহে, কেবল ভাবময়ী, জড় জগতের অনুধাবন্য। তার পর যখন পঞ্চীকৃত ভূত-কর্ত্তৃক জড় জগতের বিকাশ হইল, তখন ভাষাদ্বারা কবিতা ব্যঞ্জনার প্রয়োজন হইয়া উঠিল। তাই দেবাবতার কবিগণ ভাষাময়ী কবিতার সৃষ্টি করিলেন। কিসে জগতে সৌন্দর্য্যের সূক্ষ্ম ভাবসকল প্রকাশিত হইবে, তাহার পথ পরিষ্কৃত করিতে সুরু করিলেন।

আমাদিগের সমালোচ্য হেমচন্দ্র এই ভাবাময়ী কবিতার একজন সহৃদয় স্রষ্টা হইলেও প্রাণভরা ভাব জ্যোতির স্রষ্টা বলিয়া তাঁহাকে আমরা স্বীকার করিতে পারিলাম না। এই মহাত্মার কবিতা কীটাণুবিদ্ধ রত্নের ন্যায় আপাতমনোহারিণী হইলেও সহৃদয় প্রমাতার তত হৃদয়হারিণী নহে।

কবিতাসুন্দরীর অতি সামান্য দোষ যদিও সামান্য লোকে দেখিতে পায় না ও ঐ কবিতার প্রতি কিছু আদরের ত্রুটি করে না, কিন্তু রসিক পণ্ডিতদিগের মত স্বতন্ত্র। তাঁহারা অতি অল্পমাত্র শিত্ররোগদূষিত হইলে, তিলোত্তমার ন্যায় সুন্দরীকে যেমন অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন না, অল্পমাত্র ভাবদোষ কি রসদোষে দূষিত হইলেও কবিতাকে সেইরূপে তাঁহারা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে দণ্ডী বলিয়াছেন যথা—

'তদল্পমপি নোপেক্ষ্যং কাব্যে দৃষ্টং কথঞ্চন।
স্যাদ্বপুঃসুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগং॥'

আমরা এত কথা বলিলাম বলিয়া পাঠক যেন এরূপ মনে করিবেন না যে হেমচন্দ্রের সমগ্র কবিতাই সূক্ষ্ম ভাবজ্যোতি বিহীন; এই মহাত্মার কাব্যের স্থলবিশেষে স্বর্গীয় জ্যোতি আছে তাহা আমরা ক্রমে ক্রমে দেখাইয়া দিতেছি।

সৌন্দর্য্য দর্শনের দৃষ্টি স্বতই বিভেদকারিণী। প্রতিভার অনন্ত জ্যোতি দ্বারা যাঁহার দৃষ্টি পূরিত তাঁহার দৃষ্টি ব্যতীত অন্য দৃষ্টি জগৎ মাধুরীর রসানুভব করিতে সমর্থ নহে। এই সুনীল অনন্ত আকাশ—কল্পনার লৌহবর্ত্মে আরোহণপূর্ব্বক অনন্তকাল চলিলেও যাহার শেষ করিতে পারা যায় না—যাহার অন্ত দেখিবার নিমিত্ত উগ্রমূর্ত্তি তেজস্বী তপন, হাসির উৎস রোহিণীমোহন সুধাংশু, শতসহস্র নক্ষত্র, নিখিলজিহ্বা উল্কা, বিধুন্তুদ রাহু ও অর্দ্ধভ্রমরকৃষ্ণা ধূমকেতু নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে—সেই অধ্যেয় পদার্থের সৌন্দর্য্য-ধ্যান কবি ভিন্ন অন্য কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

মানুষ ক্রমে উন্নত হইতেছে, সংসারের ভাব-কুসুম ক্রমে ফুটিয়া আসিতেছে একথা যদি সত্য হয়, বিজ্ঞান এ কথা যদি প্রমাণ করিয়া তোলে, তাহা হইলে এমন একদিন আসিবে যেদিন মানুষ ভাবময় হইয়া ভাবে লীন হইয়া যাইবে। নিজ শরীর আর স্থূল শরীর ধারণ করিবে না, সমস্তই ভাবময় হইয়া যাইবে, যত সৌন্দর্য্য মহা সৌন্দর্য্যে লয়প্রাপ্ত হইবে।

সঙ্গীতের অন্তর্নিবিষ্ট সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য স্বাভাবিক; সঙ্গীতের অজানিত মধুরিমায় চকিত শিশু উৎকর্ণ হয়, তৃণগ্রাসী কুরঙ্গবধূ আত্মবিস্মৃত হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান হয়, রমণী কেশ বিন্যাসের সময়ে বেণীর কুচ্ছ ধারণ করিয়া অবাক্ হইয়া মুদ্রিত নয়নে বসিয়া থাকে, স্বভাব-হিংস্র সর্প আপনার জিঘাংসাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া মস্তক দুলাইতে থাকে, তাহাতেই বোধ হয় যে, রাগের স্বয়ম্ভব স্বাভাবিক। কিন্তু কবিতায় মোহন কণ্ঠের শব্দ নাই, অথবা যে শব্দ আছে তাহা এত মৃদু যে বধির অন্তর তাহার আশ্চর্য্য মাধুরী অনুভব করিতে অক্ষম। যেমন বধিরকে কোন কথা বলিতে হইলে উচ্চ গলা করিয়া বলিতে হয়, বধির অন্তরকেও তদ্রূপ কবিতার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া দিবার নিমিত্ত এক প্রকার চীৎকারের আবশ্যক। সেই চীৎকারের নামই মোটা কবিতা।

'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'

ভারতীয় আলঙ্কারিকদিগের এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে রসাত্মক বাক্যের নামই কাব্য। উত্তম কথা। যিনি এ কথা অস্বীকার করিবেন, তাঁহার অবশ্য মহাপাতক হইবে। এখন বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং—সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের এই সূত্রানুসারে প্রণয়িনীর বিয়োগে প্রণয়ী কোকিলকে গালি দিতেছেন ইহাও কাব্য—আর একটা বারবনিতার বিরহে যা মুখে আসিতেছে কামুক নায়ক তাহার উদ্দেশে তাই বলিতেছেন সেগুলিও কি কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে? যে কবি নিজে নূতন দেখিলেন না, নূতন দেখাইলেন না, হৃদয়ের ভাব আঁকিয়া দেখাইতে সমর্থ হইলেন না, কেবল কতকগুলা কথায় ভ্রান্ত করিয়া ও ছন্দের লঘুগুরু দেখিয়া কাব্য লিখিলেন, তাঁহাকে হৃদয়ের কবি কিরূপে বলিব? এ বিষয়ে Emerson বলেন—"the poet has a new thought: he has a whole new experience to unfold" সমালোচক হেজলিট তাঁহার সমালোচনের মধ্যে কোন ব্যক্তির জীবনঘটিত বেশ একটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—একজন বড় মানুষের ছেলের পড়িবার সাধ হইয়াছিল, সেই জন্য একজন শিক্ষক রাখিয়াছিলেন, একদিন ঐ ধনবানের পুত্র অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করিলেন—'পদ্যে ও গদ্যে প্রভেদ কি?' শিক্ষক কথায় কথায় বলিলেন "যে ভাষায় আমরা সর্ব্বদা কথা বার্ত্তা কহি তাহাই গদ্য।" অমীরজাদের পুত্র আশ্চর্য্য হইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'মহাশয় মহাশয়! তবে কি আমি এতদিন গদ্যে কথাবার্ত্তা কহিয়া আসিতেছি?' 'ছন্দোবদ্ধ বাক্যের নাম কবিতা' এ কথা বলিয়া দিলে, আমাদিগের বাঙ্গালা দেশে ঐ ধনবানের পুত্রের ন্যায় সহস্র সহস্র লোকে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিবেন—'তবে ত আমরাও কবি!'—It is not metres, but a metre-making argument that makes a poem, a thought so passionate and alive, that, like the spirit of a plant or an animal, it has an architecture of its own, and adorns nature with a new thing.

পূর্ণাবয়বে প্রকৃতি সাঙ্কেতিক বর্ণের সমষ্টি; এখন সেই সকল বর্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে গেলেই প্রকৃতির অংশাংশি ভাবগুলি একে একে সহৃদয় সামাজিকের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রকৃতির এই ব্যষ্টিগত একটি একটি বর্ণ সহৃদয় ভাবুকের নিকটে এক একখানি কাব্য। ভাবের প্রাণ প্রতিষ্ঠার ন্যায় কঠিন কার্য্য আর দুটী নাই। গুণের ন্যায় ভাব আধেয়, ভাষা ইহার আধার; সুতরাং আধেয়ের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে আধার জন্মগ্রহণ করিয়া বসে, তা না হইলে ভাবের দাঁড়াইবার স্থান হয় না। এইখানে একজন কবির কথা বলিতে হইল:—

"For, of the soul, the body form doth take
For soul is form, and doth the body make."

প্রকৃতির তিন সন্তান। তিনই এক সময়ে জন্মিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাবুক ইহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন মাত্র। কেহ বা কার্য্য, কারণ, ফল; কেহ বা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর; আবার কেহ বা পিতা,

পুত্র, পৌত্র আত্মা. এই তিন নামে ইহাদিগকে অভিহিত করিয়াছেন। আমরা ইহাদিগকে বেত্তা, দ্রষ্টা ও বক্তা এই তিন সংজ্ঞা প্রদান করিব। চলিত কথায় বলিতে হইলে, প্রথমটি সত্যসহিৎসা, দ্বিতীয়টী শিবচিকীর্ষা ও তৃতীয়টী সৌন্দর্য্যতৃষ্ণিকা (Love of beauty)। যিনি যখন যে ভাবে গ্রহণ করিবেন এই তিনকেই এক বলিয়া প্রতীত হইবে। ইহাদিগের প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন অবিমিশ্র সত্ত্বাস্বরূপ। সুতরাং ইহাদিগের একের উপাদি অন্য দুটীর শক্তি থাকিলেও সে শক্তিকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, আত্মশক্তি প্রকাশে তৎপর। কবি যথার্থ বক্তা, সুতরাং কবিই সৌন্দর্য্যের স্বরূপ। কবি কাব্যজগতের এক মহান্ সম্রাট, সতত আত্ম কেন্দ্রে অবস্থিত। জগৎকে কাহারো রঞ্জিত করিতে হয় নাই, কারণ জগৎ স্বভাব-সুন্দর। কবির হৃদয়জাত ঐশ্বরিক জ্যোতিঃ সৌন্দর্য্যের উৎস স্বরূপ। ফলতঃ ভাবুক কবি যে কি পদার্থ তাহা কথায় বলিয়া শেষ করা যায় না। ভাবুকের হৃদয়ই তাহা অনুভব করিতে পারে।

যে কবি ভাবেতে বিভোর তিনি আত্মকৃত কবিতা মূর্খ, পণ্ডিত কি কোন অরসিকের নিকটে ব্যাখ্যা করাকে ভয়ানক মহাপাতক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। মহাকবি ভবভূতি এই ভাবটি ব্যক্ত করিবার জন্য ঈশ্বরকে আহ্বান করিয়া, এইরূপ বলিয়াছেন :—

"ইতর পাণ্ডিত্যানি যথেচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু কবিত্ব নিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।"

রসভাবময়ী যথার্থ কবিতা কবির হৃদয়-ভাণ্ডারের যে কিরূপ অমূল্য ধন তাহা রসজ্ঞ কবি ভিন্ন কাহারও বুঝিবার শক্তি নাই। রসই কবিতার হৃদয়, কিন্তু রস স্বয়ং একটি কোন পদার্থ বিশেষ নহে। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারি ভাব দ্বারা রসনামক অপূর্ব্ব পদার্থের উৎপত্তি হয়। ধ্বনিকার মহাত্মা অভিনব গুপ্ত পদাচার্য্য এ বিষয়ে এইরূপ বলিয়াছেন যথা :—

'বিভাবানুভাব ব্যভিচারি যোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ।'

অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারি ভাবের সংযোগে কবিতার মধ্যে অপূর্ব্ব বস্তু রসের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এই রস সহৃদয় প্রমতা ভিন্ন অন্যের অনুভবযোগ্য নহে। [ক্রমশঃ।

শ্রীজয়গোপাল গোস্বামী।

দুই বন্ধু।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পর দিন বৈকালে সেই পূর্ব্ব বর্ণিত উদ্যানে সমরের সহিত অমরের সাক্ষাৎ হইল। অমরের মুখ বড়ই বিষণ্ণ, কারণ পূর্ব্ব দিনে অমর তাহার হৃদয়ে বড়ই আঘাত পাইয়াছিল। দূর হইতে অমরকে দেখিয়া সমর আপনার নিকটে ডাকিল। অমর কোন কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে সমরের নিকট আসিল। সমরও নীরবে অমরের হাত ধরিয়া লইয়া সেই পুষ্করিণীর সোপানোপরি গিয়া বসিল। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব, কাহারও মুখে একটিও কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল না। উভয়েই বিষণ্ণ-

মনে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। তাহার পর অমর প্রথমে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল—"ভাই সমর, আজ তুমি আমার সহিত কথা কহিতেছ না কেন?"

সম। কি কথা কহিব খুঁজিয়া পাইতেছি না। তুমি কথা কহ না, ভাই।

অম। সমর, পূর্ব্বে আমাদের কথা করিয়া শেষ হইত না, আর আজ ভাই, তুমি কথা খুঁজিয়া পাইতেছ না!

এই কথা কয়েকটি বলিতে অমরের হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইল। আর তাহার সেই সকরুণ স্বর সমরের হৃদয়েও কতক আঘাত করিয়াছিল। সমর তখন সে কথা চাপা দিয়া বলিল—"আজ সমস্ত দিন তোমায় দেখি নাই কেন, অমর?"

অম। আমায় না দেখিলে কি এখন তোমার মনে কষ্ট হয়, সমর?

সমর অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল, তাহার পর যেন পূর্ব্বাপেক্ষা বিষণ্ণ ভাবে বলিল—"অমর, কালিকার ঘটনায় তোমার মনে বড়ই ব্যথা দিয়াছি।"

অম। কালিকার কথা থাক, আজ তোমায় একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব, তাহার যথার্থ উত্তর দিবে কি?

সম। কি কথা অমর?

অম। পূর্ব্বের কথা একবার স্মরণ করিয়া বল দেখি ভাই সমর, তুমি আমায় এখন পূর্ব্বের ন্যায় ভালবাস কি না?

পুনরায় অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া সমর বলিল—"না।"

অমর বিস্মিতনেত্রে সমরের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার পর এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"সমর, এক দিন এই উদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে কি বলিয়াছিলে একবার মনে করিয়া দেখ দেখি। ইহারই মধ্যে আমাদের সেই অকৃত্রিম বন্ধুত্বের কি পরিণাম হইল, এখন বুঝিতে পারিয়াছ কি? এখন বল দেখি সমর, ভুল কাহার?"

সম। ভুল আমারই। আমি তোমার নিকট কোন কথা গোপন করিতে পারিব না। আমি পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর তোমায় ভালবাসি না, অনেক চেষ্টাও করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু কোন ক্রমেই তাহা পারি না। শৈল এখন আমার সমস্ত হৃদয়ই অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। হৃদয়ের যে অংশ তোমায় বিক্রয় করিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি শৈল তাহা চুরি করিয়া লইয়াছে। আমার হৃদয়ের যে এরূপ পরিবর্ত্তন হইতে পারে, তাহা স্বপ্নেও আমি কখন ভাবি নাই।

সমর আবার কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু এই সময় হঠাৎ একবার অমরের মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিয়া সমর শিহরিয়া উঠিল, সমরের মুখে আর কথা বাহির হইল না। সমর দেখিল হঠাৎ অমরের মুখ এরূপ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, যে অমরকে আর চেনা যায় না। সমর আগ্রহের সহিত বলিল—"অমর, তোমার মুখ হঠাৎ এমন হইল কেন?"

অমর আর কথা কহিল না, কেবল সতৃষ্ণ নয়নে একবার সমরের মুখের প্রতি চাহিল। কিন্তু সমর সে চাহনির অর্থ বুঝিতে পারিল না। অমরের এখন ইহাই অধিকতর কষ্টের কারণ।

সমর বলিল—"অমর, চুপ করিয়া রহিলে যে!"

অমর। ভাই, তোমায় আর কি উত্তর

দিব? তুমি কি এখন আর আমা বুঝিতে পারিবে?

সমর তখন নীরব হইয়া রহিল। অমর কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"এখন আমি চলিলাম, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি সুখী হও

অমর। আবার কবে দেখা হইবে?

এতক্ষণ পরে এই বার অমরের চক্ষে অশ্রুজল দেখা গেল। ধীরে ধীরে সে অশ্রু জল মুছিয়া অমর বলিল—"যখন তুমি আমায় না দেখিলে কষ্ট বোধ করিবে।"

অমর আর দাঁড়াইল না, দ্রুতবেগে সেখান হইতে চলিয়া গেল। সমর অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অমর উদ্যান হইতে বাহির হইয়া গৃহের দিকে চলিল, কিন্তু গৃহের নিকটবর্ত্তী হইয়াই আর গৃহে যাইতে তাহার পা উঠিল না। অমর অন্য দিকে ফিরিল। অমর হৃদয়ের মধ্যে যে কি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল, তাহা বর্ণনা করা আমাদের সাধ্য নহে। অমর যে কোথায় চলিয়াছে, অমরও তাহা জানে না, কি জানি কেন লোকালয়ে থাকিতে অমরের এখন আর ইচ্ছা নাই। দেখিতে দেখিতে অমর গ্রাম পার হইয়া এক বিস্তৃত মাঠে আসিয়া পৌঁছিল। তখন অমরের একবার চৈতন্য হইল, অমর সে স্থান নির্জ্জন দেখিয়া সেই খানেই বসিল। বসিয়া এক মনে নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু অধিকক্ষণ অমর স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না।

অমর আজ আর স্থির নহে। তাহার হৃদয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। অমর সেই মাঠের মধ্যে চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু চলিয়াও তাহার হৃদয়ের যন্ত্রণা দূর হয় না। অমর দৌড়িতে আরম্ভ করিল, কিন্তু দৌড়িয়াও সে যন্ত্রণা কমে না। তখন অমর পুনরায় এক স্থানে স্থির হইয়া বসিল। এইবার বসিলেই অমরের চক্ষে জল দেখা গেল, অমর অনেকক্ষণ ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিল। সে কান্নাও আর থামে না, অমরেরও কাঁদিয়া আশা মেটে না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া অমরের হৃদয় অনেকটা স্থির হইল—যেন হৃদয়ের উপরের একটা ভারি বোঝা এখন অনেকটা নামিয়া গেল এদিকে সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া অমর ধীরে ধীরে বিষণ্ণ মনে গৃহে ফিরিল।

গৃহে আসিয়া অমরের যন্ত্রণা আবার বৃদ্ধি হইল। অমর যে দিকে চাহিয়া দেখে যেন সেই দিকেই সমরকে দেখিতে পায়। গৃহের মধ্যে বাল্যকালের দুই একটা খেলনা দেখিয়া অমরের বাল্যস্মৃতি জাগিয়া উঠিতে লাগিল। ঐ সমরের ফটোগ্রাফ সম্মুখে খুলিতেছে, এখন তাহা দেখিয়া অমরের হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। ঐ পুস্তকখানি সমর তাহাকে উপহার দিয়াছে, ঐ সমরের হস্তাক্ষরে অমরের নাম লেখা রহিয়াছে—অমর গৃহের যে দিকে চায়, যেন মূর্ত্তিমান সমরকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে পায়, কিন্তু সে সমরকে দেখিয়া আজ তাহার হৃদয়ে আনন্দের পরিবর্ত্তে বিষাদের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। অমর তাড়াতাড়ি গৃহের আলো নিবাইয়া দিয়া শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। কিন্তু আজ তাহার শয্যা যেন কণ্টকময়, অমর অনেকক্ষণ সেই শয্যায় পড়িয়া ছট্-

ফুট্ করিল। তাহার পর কি মনে করিয়া অমর শয্যাত্যাগ করিয়া পুনরায় আলো জ্বালিল। আলো জ্বালিয়া অমর সেই বাল্যকালের খেলনা চূর্ণ করিয়া দূরে ফেলিয়া দিল। সমরের ফটো এবং উপহার পুস্তকাদি সমস্তই অগ্নিতে ভস্মীভূত করিল, সমরের কোনরূপ চিহ্নমাত্রও সে গৃহে রাখিল না।

অমর পুনরায় শয্যায় আসিয়া শয়ন করিল, কিন্তু তাহাতেও তাহার সে যন্ত্রণার হ্রাস হইল না। অমর কি ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ শয্যাত্যাগ করিল, তাহার পর অনেকক্ষণ সেই গৃহের মধ্যে দাঁড়াইয়া অমর কাঁদিল। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই কাঁদিতে কাঁদিতে অমর সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল। গত বৎসর অমরের পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল, সুতরাং এক সমর ভিন্ন অমরের বিশেষ অনুসন্ধান আর কেহ লইল না, কিন্তু সমরও অমরের কোন সন্ধান করিতে পারিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চারি দিকে অনন্তশ্রেণী হিমালয় পর্ব্বতের শাখাপ্রশাখা বেষ্টিত একটি সুন্দর উপত্যকা ভূমি। সে পর্ব্বত-শ্রেণী বিস্তৃতিতে যেন অনন্ত, যেন তাহার শেষ নাই, সীমা নাই, অন্ত নাই। আকার দীর্ঘ। পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত, তাহার উপর পর্ব্বত, এইরূপে অনন্ত পর্ব্বত; সেই অনন্ত আকাশ ভেদ করিয়া গম্ভীর মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে দৃশ্য দেখিলে গাম্ভীর্য্যে হৃদয় পূরিয়া যায়। এবং কোথা হইতে এক মহান ভাব হৃদয়ের মধ্যে উত্থিত হইয়া সঙ্কীর্ণ মনকে উন্নত করিয়া দেয়। এই দৃশ্য স্বচক্ষে না দেখিলে সে মহান ভাব কল্পনায় টানিয়া আনা যায় না। পর্ব্বতের শিখরগুলি নিষ্কলঙ্ক শুভ্রবর্ণে রঞ্জিত, দূর হইতে দেখিলেই বোধ হয়, যেন শুভ্র মেঘপুঞ্জ আকাশপটে স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। পর্ব্বতের নিম্নদেশে নানাজাতীয় বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ইত্যাদি শোভা পাইতেছে। কোথাও বড় বড় বৃক্ষ সকল ফলভরে অবনত, কোথাও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ সকল নানাবর্ণের নানা আকৃতির ফুলে সুশোভিত। কোন স্থানে কুলু কুলু স্বরে ঝরণা আসিয়া উপত্যকায় পড়িতেছে, কোন স্থানে পক্ষিগণের সুমধুর কণ্ঠস্বর চারি দিকে যেন সুধা বর্ষণ করিতেছে। প্রকৃতির এই মনোমোহিনী ছবি যিনি না দেখিয়াছেন, তাঁহার জন্মই বৃথা। নন্দনকাননসদৃশ এই উপত্যকার এক স্থানে জটাজুটধারী এক যোগী ধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন, নিকটেই এক জন যুবা বসিয়া বসিয়া তাঁহার সেই ধ্যানস্তিমিত চক্ষু এবং প্রশান্ত মুখকান্তির প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে।

অনেকক্ষণ পরে যোগীর ধ্যান ভঙ্গ হইল, যোগী যুবকের প্রতি এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করিলেন। যুবক শিহরিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব তাহার পর যোগী গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"বৎস, আজ ছয় মাস তোমার পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, যে আজও তোমার চিত্ত স্থির হয় নাই, তুমি এ দুঃসাধ্য যোগব্রতে ব্রতী হইতে পারিবে না। তোমার মন অন্য বিষয়াসক্ত। তুমি কি কোন রমণীর প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছ?

যুবক। না গুরুদেব, আমি কোন রমণীর প্রণয়ে আবদ্ধ নই।

যোগী। তবে তোমার চিত্ত এখনও

স্থির হইল না কেন? কোন্ আত্মীয়ের জন্য তোমার মন এতদূর চঞ্চল হইয়াছে, বৎস?

যুবক অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার পর একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"গুরুদেব, জীবনের একমাত্র অবলম্বন আমার এক শৈশবের বন্ধুর কথা শত চেষ্টা করিয়াও ভুলিতে পারিতেছি না; তাহাকে ভুলিবার জন্য গৃহ ত্যাগ করিয়াছি, স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছি, অন্যান্য আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করিয়াছি, সমাক ত্যাগ করিয়াছি তাহার পর কত দেশ, কত নগর, কত নদ নদী অতিক্রম করিয়া হিমালয়ের এই রমণীয় উপত্যকায় আপনার ন্যায় গুরুর শরণাগত হইয়াছি, তথাপি—তথাপি গুরো! আমার সেই বাল্য সুহৃদকে বিস্মৃত হইতে পারিলাম না। তাহার সেই পূর্ব্ব-স্মৃতি—যে স্মৃতি পূর্ব্বে আমার আনন্দের কারণ ছিল—এখন আমায় অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। এ জন্মে তাহাকে ভুলিতেও পারিব না, পরজন্মের কথা জানি না কিন্তু পরজন্মেও যে তাহাকে ভুলিতে পারিব এ বিশ্বাসও এখন আমার মনে স্থান পাইতেছে না।"

ধীরে ধীরে যুবক আপনার জীবনের সমস্ত ঘটনা যোগীর চরণে নিবেদন করিয়া নীরব হইল। তখন ক্রমে ক্রমে তাহার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। যুবক অন্য কেহ নহে, আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত অমর।

অমর যতক্ষণ এই সকল কথা বলিতেছিল, যোগী ততক্ষণ আশ্চর্য্য নেত্রে অমরের দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সেই গম্ভীর প্রকৃতি মুহূর্ত্ত মধ্যে পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। যোগী প্রফুল্ল অন্তঃকরণে বলিলেন—"বৎস, আমি জানিতাম, রমণী ভিন্ন সংসারী পুরুষের মন আর কিছুতেই এতদূর প্রণয়াবদ্ধ হইতে পারে না; কিন্তু আজ তোমার নিকট যে অদ্ভুত কাহিনী শুনিলাম, তাহাতে বিস্মিত হইয়াছি! মনুষ্য হৃদয়ের এই গূঢ়তত্ত্ব আমি এত দিন জানিতাম না। যাও বৎস, তুমি পুনরায় সংসারে ফিরিয়া যাও, প্রণয়ের এরূপ নূতন চিত্র সংসারে দুর্লভ। তোমার এইরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে সংসারের মানুষ অনেক শিক্ষা করিতে পারিবে।"

অমর যোগীর চরণ জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"গুরুদেব, অনুমতি করুন, আমি এখনি স্বদেশে চলিয়া যাই। আর আমি সেই বন্ধুর বিরহ সহ্য করিতে পারিতেছি না। একবার তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া আমার এই চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিব। তাহার পর পুনরায় আপনার চরণে শরণাগত হইব।"

হঠাৎ যোগী যেন অন্যমনস্ক হইলেন, তাঁহার সেই প্রফুল্ল মূর্ত্তি পুনরায় গম্ভীর হইল। যোগী কি ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ অমরকে বিদায় দিলেন।

যোগীর নিকট হইতে বিদায় হইয়াই অমরের মন যেন একটু প্রফুল্ল বোধ হইল। অমর দ্রুতবেগে সমরের উদ্দেশে চলিল। কিন্তু সমর কোথায়?—সমর বহু-যোজন দূরে। যদি অমর তখন অনায়াসে সমরকে পাইত, তবে কি হইত জানি না। এখন কিন্তু সমরকে না পাইয়া অমরের জীবন-নাটকের শেষ অঙ্ক বড়ই শোচনীয় হইল। অমর ক্রমে ক্রমে উন্মাদ হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আজ সমর ও শৈলবালা বিষণ্ণ মনে এক কক্ষ মধ্যে বসিয়া রহিয়াছে। স্ত্রীপুরুষের এরূপ ভাবে বসিয়া থাকাটা শুভ লক্ষণ নহে। অনেকক্ষণের পর শৈলবালা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"তা আমি কি জানি, সেই সামান্য ঘটনা হইতে এতদূর হইবে, তা আমি কেমন করিয়া জানিব?"

সমর শৈলবালাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল—"তোমার দোষ কি? সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ।"

শৈল। এখন তুমি যাও, একবার তাঁহাকে দেখিয়া আইস। শুনিলাম, জ্ঞান-শূন্য বটে, কিন্তু এখনও তোমার নাম শুনিলে উদাসভাবে চারিদিকে চাহিয়া দেখেন।

সমর। অমর এতদিন পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে, এ কথা শুনিয়াও তাহাকে দেখিতে যাইতে আমার পা উঠিতেছে না। এখন কোন্ মুখে আমি অমরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইব? কে অমরকে পাগল করিয়াছে? কাহার জন্য অমর জীবনের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল? কাহার জন্য তাহার জীবনের এইরূপ শোকাবহ পরিণাম হইল? শৈল, এই সকল কথা যখন আমার মনে হয়, তখন আত্মঘাতী হইতে আমার ইচ্ছা হয়। আমি কোন্ মুখে অমরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইব?

সমরের কথা শুনিয়া শৈলবালার চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। মুখখানি যেন প্রখর সূর্য্যকিরণে সন্তপ্ত কমলিনীর ন্যায় ম্লান হইল। সমর তাহা দেখিয়া ব্যগ্র হইয়া বলিল—"শৈল, তোমার কি দোষ?"

শৈল বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুজল মুছিয়া বলিল—"আমারই সব দোষ।"

সমর বলিল—"না।"

শৈল বলিল—"হাঁ।"

তাহার পর উভয়েই অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। শেষে পুনরায় শৈলবালা বলিল—"যাও, আমার মাথার দিব্য, তুমি এখনি যাও। যদি না বুঝিয়া কোন দোষ করিয়া থাক, তবে কি তাহার প্রতিকার করিবে না?"

শৈলবালার এই কথা শুনিয়া সমর কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল, তাহার পর তাহার সেই সরু সরু ঠোঁট দুইখানি আপনার ওষ্ঠ দ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিল—"তোমার এত গুণ না থাকিলে আমি অমরকে ভুলিয়া তোমায় এতদূর ভালবাসিব কেন?"

তাহার পর বিষণ্ণ মনে ধীরে ধীরে সমর অমরকে দেখিতে গেল।

* * *

আর আমরা পারি না। এই আখ্যায়িকার শেষ অঙ্ক আর দেখাইতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু যখন আরম্ভ করিয়াছি, তখন শেষ করিতেই হইবে। তাহা না করিলে পাঠক পাঠিকাগণ ছাড়িয়া দিবেন কেন? সুতরাং বাধ্য হইয়া আমরা এই আখ্যায়িকার শেষ অঙ্ক লিখিতে বসিলাম।

সমর যখন অমরকে দেখিতে আসিল, তখন অমর আপন মনে কি বকিতেছিল, নিকটে তাহার অনেক আত্মীয় বসিয়াছিল। তাহার সকল কথা শুনা যাইতে ছিল না। সমর নীরবে অমরের সম্মুখে আসিয়া

হইল। সে দৃশ্য দেখিয়া তাহার প্রাণ আজ আকুল হইল, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। অনেক কষ্টে সমর শুনিল, অমর বলিতেছে —'ভুল,—ভুল,—ভুল,—অমরের সকলি ভুল।"

তাহার পর অমর একটা বিকট হাস্য করিয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ সে হাসি আবার থামিয়া গেল, অমর গান ধরিল—"মনে করি, ভুলে থাকি, ভোলা নাই যায় সখি।"

আবার সে গান থামিয়া গেল, অমর কাঁদিল, সে কান্নাও থামিয়া গেল। অমর পুনরায় গান ধরিল—"তাই তোমারে দেখ্‌তে আসি, দেখা দিতে আসিনে।"

এই গানের এইটুকু শেষ করিয়াই অমর পুনরায় উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। এই সময় অমরের খুল্লতাত বলিলেন—"অমর তোমার সমর আসিয়াছে।"

অমর বিকট হাস্য করিয়া বলিল—"সমর! সমর! সমর আমার কে?"

সমর দাঁড়াইয়াছিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িল।

খুল্লতাত বলিলেন—"তোমার বন্ধু সমর তোমায় দেখ্‌তে এসেছেন।"

অমর এইবার যেন রাগিল, তাহার সেই শীর্ণদেহ রাগে ফুলিয়া উঠিল। অমর বলিল—

"সমরে আর নাহি ডরি আমি,
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়, শত ধিক তারে।"

সমর আর থাকিতে পারিল না, রুদ্ধ-কণ্ঠে সমর বলিল—"ভাই অমর, আমায় চিনিতে পারিলে না?"

সমরের কণ্ঠস্বর অমরের কর্ণে প্রবেশ করিল। অমর বসিয়াছিল উঠিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ একটা তাড়িতপ্রবাহ যেন ভীষণ-বেগে তাহার দেহের মধ্যে প্রবেশ করিল। অমর চারি দিক একবার স্থির নেত্রে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর "সমর! সমর! সমর!" এই কথা বলিতে বলিতে সমরের কোলে লুটাইয়া পড়িল। তখন সমর ও অন্যান্য সকলেও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সমর অমরকে আপন ক্রোড়ে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। সকলের সে কান্না কিছুক্ষণ পরে থামিল। তখন সকলে বিস্মিত নেত্রে দেখিল—অমরের দেহ শক্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আর প্রাণ নাই!!

কিন্তু আমরা জানি,—অমর মরে নাই, অমর স্বর্গে চলিয়া গিয়াছিল, আর সমর এ পৃথিবীতেই পড়িয়া রহিল।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সম্পূর্ণ।

দারগা।

দারগা-শ্রেণীর অধিকাংশই অশিক্ষিত, কচিৎ অর্দ্ধ-শিক্ষিত। তা, পুলিসেই বা কি, আর সাহিত্যেই বা কি! দুই দলই কোন কোড়ের কোন ধারা এ জন্মে চক্ষে না দেখিয়াও সরফরাজি করিয়া কাজ হাসিল করিয়া বেড়ায়। কোপাও যদি ধরা পড়ে, এক দল বলিয়া বসে, "কোম্পানির হুকুম।" অন্য দল বলে, "বোধ হয়।" এ কথা দুটোর উত্তর দিবে কে? কোম্পানির হুকুম কে খারিজ করিতে পারে? বোধ-হয়কে কে বোধ দিতে পারে?

পুলিস-দারগার জুলুম চলে চাপরাসের জোরে, আর সাহিত্য-দারগার জুলুম চলে, স্ব-প্রকাশিত সংবাদ পত্রের জোরে। উভয় শ্রেণীই আপনাকে এক একটী দণ্ড-মুণ্ডের হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা মনে করেন। একদল মনে করেন, তাঁহাদের কোপে পড়িলে কাহারও আর ইহলোকে নিস্তার নাই; অন্য দল মনে করেন, তাঁহাদের কোপে পড়িলে কাহারও আর কোন লোকে নিস্তার নাই। এই জন্য, একদল উঠিতে বসিতে, আসিতে যাইতে সেলাম চায়; অন্য দল হাসিতে কাঁদিতে, থামিতে সেলামী চায়।

পুলিস-দারগা মহাশয় যখন চক্ষু বুজিয়া রোঁদে বাহির হন, পথে যদি কলা চুরি বা শশা চুরির মোকর্দ্দমা পান, বা কেহ সাজাইয়া তুলিয়া দেয় তো আনন্দের আর সীমা থাকে না, আপনার নামটা জাহির করিবার একটা বেশ সুবিধা ঠাওরাইয়া তৎক্ষণাৎ হাঁক-ডাকে গগন ফাটাইয়া তোলেন। পাছে লোকে ভাবে একটা সামান্য বিষয়, সেই জন্য নানা ফন্দি বাহির করিয়া কেস্‌টাকে সঙ্গিন করিয়া খাড়া করেন। তখন দিনকতক সুরতহালের চোটে গ্রাম-টাকে সশঙ্কিত করিয়া তোলেন। মোকর্দ্দমাটা আদত ভুয়ো কি না, গোড়ায় গলদ আছে কি না সে সব দেখা নাই, সাক্ষা-সাবুদের অপেক্ষা নাই—নাম জাহির করিতে হইবে, কাজেই খুনে-আসামীরও অধিক করিয়া তখন সেই অভাগা আসামীর উপর জেরা-অবরদস্তির ধুম পড়িয়া যায়! সেসন সোপরর্দ্দ করা দূরে থাক্, ম্যাজিষ্ট্রেট বা সেসন-জজের রায় পর্য্যন্ত দিবারও যে তাঁহার ক্ষমতা আছে, সেইটা দেখাইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। দোহাই তোমাদের! স্বীকার কর, আমার মতন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী আর দেখ নাই।

সাহিত্য-দারগারও তাই। সিধুবাবু বা নিধুবাবু এই লিখিয়াছে, বা এই বলিয়াছে; নিধুবাবু বা সিধুবাবুকে মারিতে হইবে; অথবা নিধুবাবু বা সিধুবাবুকে না মারিলে আমার কোন বন্ধুর বিশেষ ক্ষতি হইতেছে; তাহাকে না মারিলেই নয়, সুতরাং সাজা-ইতে হইবে—নিধুবাবু বা সিধুবাবু সুধু নিধু সিধু বাবু নহেন—যে সে লোকটা নহে। যে সে লোককে মারিলে মহত্ত্ব কোথায়? নিধু-সিধু বাবুকে আগে খুব বাড়াইয়া, ঘাড়ে তুলিয়া, মাথায় উঠাইতে হইবে। যেন লোকে মনে না করে একটা মাছি মারিয়াছি। মাথায় উঠাইতে পারিলে আছাড়টা সজোরে হয়। আরও বিশেষ—অর্জ্জুনের বীরত্ব

কর্ণকে ধরিয়া ত? রামের মহত্ত্ব রাবণকে মারিয়া ত? আচ্ছা, আমাকে বাড়াইবার জন্য বেদব্যাস বাল্মীকি না জন্মিয়াছেন নাই নাই, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমিই একাধারে বেদব্যাস ও অর্জ্জুন আমিই একাধারে রাম ও বাল্মীকি। আমিই আমার শতের দশ মুণ্ড, বিংশতি হস্ত দিব, দেখাইব, সে ধরা লণ্ডভণ্ড করিতেছে, সৃষ্টি আর রক্ষা পায় না। ধরিত্রী ব্রহ্মাকে সঙ্গে লইয়া, বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। দুই জনেই কাঁদিতেছেন, স্তব করিতেছেন। "ভো ভয়ত্রাতা, ভারহর্ত্তা, আমার ভার মোচন কর।" "বরং বৃণু" মা ভৈ, ভাণ্ডার-চিহ্নিত চীন-ব্রহ্মদেশ হইতে আমি যে অসংখ্য ব্রহ্মাস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলাম, ছাড়িয়া দিলাম। মা ভৈ, এই লক্ষ্যভেদী বাণে বাসায় গিয়া নিধু-সিধু বাবু মরিয়া থাকিবেন। তোমরা বল, জয় দারগা!

বাস্তবিক দুই দারগারই প্রভুত্ব চলে নিধু-সিধুবাবু এবং রামধন হারাধন পোদেদের উপর। গ্রামের জমিদারের বাড়ি যদি কোন ক্রিয়াকাণ্ড উপস্থিত হয়, দারগাসাহেবকে অমনি দেউড়ীর খবরদারিতে দেখিতে পাইবে! যেন একটী নিরীহ, নিষ্ক্রিয় বৌদ্ধ ভিক্ষু, অহিংসা পরমোধর্ম্ম সার করিয়া বসিয়া আছেন। বাবু কোন হুকুম করিতে গেলে, তাঁহার হুকুমের আগে দৌড়াইতেছে। ধরিতে বলিলে বাঁধিতেছে, বলিতে বলিলে শুইতেছে।

আবার এ দিকে দেখ। গোবর্দ্ধনবাবু আমাদের কাগজের এক জন গ্রাহক। প্রতি সপ্তাহে কাগজ খানির নামটী হইতে মুদ্রাকরের নামটী পর্য্যন্ত আগাগোড়া আগ্রহের সহিত পড়েন। তাঁহার "সুবাসিত নারিকেল তৈলের" একটি লম্বা বিজ্ঞাপনও আমাদের কাগজে দেন। তিনি যদি এক কৌটা "দন্ত-মঞ্জন" করেন, বল দেখি, কৃতজ্ঞতা, ভক্তি প্রভৃতি কি অতল জলে নিমজ্জন করিয়া, দুর্জ্জনের ন্যায় তাঁহাকে দংশন করা উচিত? বরং, গোবর্দ্ধন-বাবুর জন্য—ঢোল কোং বা তবলা ব্রাণ্ডারের সহিত অকারণে আড়ে হাতে লাগিতে পারি।

দুই দারগাই ভীরুতার মহাখনি, আলস্যের চূড়ামণি। পুলিসের পার্শ্বেও যদি একটা বড় গোছের ডাকাতি হয়, নিদ্রা-সিংহের খাসকামরার ভিতর হইতে তখনও "আয় লো আলি" থামে না। যাই হাঙ্গামা ঢুকিয়া গেল, অমনি দাড়ি চুমরাইয়া গোঁফ মুচড়াইয়া বড়চুড়া পরিহিত বীরভদ্র দেখা দিলেন। বীরদাপে মালঝাঁপে মহাচটক লাগাইয়া, সঙ্গে অসংখ্য কটক চলিল। ডাকে হাঁকে আকাশ ফাটাইয়া হিঁচকে চোর ধরিতে আরম্ভ করিলেন। আর, সাহিত্য দারগা মহাশয়ের আল্‌মারীতে, কামস্কটকার বিজ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া কিজি দ্বীপের কবিতা পর্য্যন্ত মহা আড়ম্বরে সাজান রহিয়াছে। নিদ্রা-সিংহ সটকা হস্তে, অর্দ্ধমুকুলিত নেত্রে দিবারাত্র আলমারীর পানে চাহিয়া আছেন মাত্র। বঙ্কিমবাবু হেম বাবু করিয়া গেলেন;—আর না। এই বার সট্‌কা ফেলিলেন। "বিধবার দাঁতে মিশি'র পালা। চোট দেখে কে! ব্রিটিস্ মিউজিয়ামের কেটেলাগ্ আওড়াইতে আরম্ভ করিলেন। পার্শ্বচরদিগের মধ্যে করতালির একটা তুমুল রব পড়িয়া গেল।

দুই দারগাই ঘুঘু প্রকৃতির লোক।

এই দেখ, পুলিস-দারগা আসামীকে জোবানবন্দি শিক্ষা দিয়া তাহার ঘাড় ভাঙ্গিতেছে; ফরিয়াদীর কারকরমায়েস খাটিয়া বকসিসের জোগাড় করিয়া রাখিতেছে; সাক্ষীকে সওয়াল জবাব শিখাইয়া তাহার বারবর্দ্দারীতে ভাগ বসাইতেছে। ওই দেখ, জজের হুকুম তামিল করিতে সেই আসামীর হাতে হাত-কড়ি কসিতেছে, ফরিয়াদিকে ধমক দিতেছে, সাক্ষীকে ধাক্কা দিতেছে। কেহই বুঝিল না, দারগা মহাশয় কাহার নিমক খাইয়াছেন!

এ দিকে সাহিত্য দারগাকে দেখ। দারগা মহাশয়—দর্শন বিজ্ঞান, ইতিহাস ভূগোল, জ্যামিতি পরিমিতি, কাব্য নাটক যাহা কিছু দেখিতেছেন, তাহাতেই ঠোক্কর দিতেছেন। এই দেখ, কমট কাটিতেছেন মিলে, মিল কাটিতেছেন স্পেন্সারে, স্পেন্সার কাটিতেছেন নিজের মাথায়। ওই দেখ, আরগাইল কাটিতেছেন হাক্সলে, হাক্সলি কাটিতেছেন টিণ্ডেলে, টিণ্ডেল কাটিতেছেন গণ্ডগোলে। আবার দেখ, সেক্ষপীয়রের উপর গেটেকে চড়াইতেছেন, গেটের উপর কালিদাসকে চড়াইতেছেন, তার উপর আপনি চড়িতেছেন। ইত্যাদি। কেহই বুঝিতেছে না, দারগা মহাশয় কিসে রাখিয়া যাইবেন!

দারগা-শ্রেণী শাঁখারীর করাতের ন্যায়। আসিতে যাইতে কাটিতেছে। তা হউক। শকুনি সুশ্রী নয়, বায়স সুকণ্ঠ নয়, তাহাতে আপত্তি কি? শকুনির শকুনত্ব, বায়সের বায়সত্ব অনেক কাজে লাগে। বালকের হাতের ঠোঙ্গাটা বা আমাবৃত অন্নের থালিটা নষ্ট হয় বলিয়া [দুঃখিত হইও না।] [দেখ, শকুনি বায়সই এ] অজ পাড়াগাঁয়ের মিউনিসিপেলিটী।

পৃথিবীতে যদি সুখ-সম্পদ চাও, দারগা-দ্বয়ের শরণাপন্ন হও। এক জন শত্রুঘ্ন রূপে জাল মোকর্দ্দমা সাজাইয়া তোমার শত্রুকে নাকে দড়ি দিয়া সাত-সমুদ্র তের নদীর জল খাওয়াইবেন; অন্য জন তোমাকে রাম মূর্ত্তিতে এক রাত্রে পৃথিবীর আদর্শ মহাপুরুষ গড়িয়া তুলিবেন। এক জন সহায় থাকিলে দেশটা পায়ে পড়িয়া থাকে। অন্য জন সহায় থাকিলে দেশটার মাথার উপর সচ্ছন্দে চড়িয়া থাকা যায়।

তবে, বল ভাই, তোমরা সবাই মিলে বদন ভ'রে এক বার বল—"জয় দারগা!"

পলাশীর যুদ্ধ।

বঙ্গের ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ চিরপ্রসিদ্ধ; এই চিরপ্রসিদ্ধ যুদ্ধের পরেই বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যায় ইংরেজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজের শাসনগুণে বঙ্গের যে এত উন্নতি হইতেছে, পলাশীর যুদ্ধের পরই তাহার সূত্রপাত হইতে থাকে। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধ ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ হইলেও উহা ইতিহাসের সম্মানিত হল্‌দিঘাট, নওসেরা প্রভৃতি মহাযুদ্ধের সম্মানিত নামে পরিচিত হইতে পারে না। অকৃত-

ভার এই যুদ্ধের উৎপত্তি, বিশ্বাসঘাতকতার এই যুদ্ধের স্থিতি এবং আশ্রয়দাতা প্রাণদাতার প্রাণনাশের সহিত অকৃতজ্ঞ আশ্রিতের লোভের পরিতর্পণ এই যুদ্ধের পরিণাম। হতভাগা সিরাজউদ্দৌলার অকৃতজ্ঞ কর্ম্মচারিগণ বিশ্বাসঘাতক না হইলে বোধ হয় এই যুদ্ধের উৎপত্তি হইত না। এবং লর্ড ক্লাইবও সহসা বোধ হয়, বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনদণ্ড ব্রিটিশ কোম্পানির আয়ত্ত করিতে পারিতেন না। এস্থলে এই চিরপ্রসিদ্ধ যুদ্ধের বিবরণ বর্ণিত হইতেছে।

১৭৫৭ অব্দের ২২এ জুন রাত্রিতে ক্লাইব আপনার সৈন্য দল লইয়া পলাশীর আম্রকাননে শিবির সন্নিবেশ করেন। এই আম্রকানন ভাগীরথীর নিকটে অবস্থিত; ইহার দৈর্ঘ্য ১,৬৮০ হাত এবং বিস্তার ৬০০ হাত। বৃক্ষগুলি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সজ্জিত। বৃক্ষ শ্রেণী একটি নাতিপ্রাচীর ও পরিখায় (পগারে) পরিবেষ্টিত ছিল। কথিত আছে, এই স্থানে এক লক্ষ আম্র বৃক্ষ ছিল। এজন্য উহা "লক্ষাবাগ" নামে প্রসিদ্ধ হয়। ক্লাইব এই আম্রকাননে আপনার পরিশ্রান্ত সৈন্যদিগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে অদূরে সমর-সঙ্গীত শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল। সেই সামরিক গীতি তাঁহার হৃদয়ে বিস্ময় ও আতঙ্কের সঞ্চার করিল। তিনি সেই সঙ্গীত শুনিয়াই আপনাদের সন্নিবেশভূমি সুব্যবস্থিত করিতে যত্নশীল হইলেন।

নবাব আপনার সৈন্যদল লইয়া মুর্শিদাবাদ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। ঐ দিন তিনি শুনিতে পাইলেন যে ইংরেজ সৈন্য কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়াছে। নবাব ক্লাইবের প্রকৃতি জানিতেন, সুতরাং তিনি বুঝিতে পারিলেন যে ইংরেজ অবিলম্বে ভাগীরথী পার হইয়া পলাশীর অভিমুখে অগ্রসর হইবে। এজন্য তিনি সহসা পলাশীর দিকে না যাইয়া কাশীমবাজারের ৬ মাইল দূরে একটি পল্লীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মীরজাফর ক্লাইবকে যথা সময়ে এই সংবাদ জানাইতে ত্রুটি করেন নাই। যাহা হউক, ২১এ জুন নবাব যখন শুনিতে পাইলেন যে, ইংরেজেরা তখনও কাটোয়ায় অবস্থিতি করিতেছেন, তখন তিনি পূর্ব্ব সঙ্কল্প অনুসারে পলাশীতে যাইতে উদ্যত হন, এবং অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া আম্রকাননের এক মাইল উত্তরে সৈন্য স্থাপন করেন। ইংরাজদিগের উপস্থিতির বার ঘণ্টা পূর্ব্বে নবাব পলাশীতে আসিয়া সৈন্য সন্নিবেশ করিয়াছিলেন।

নবাবের সৈন্য সংখ্যা অধিক ছিল। ৩৫ হাজার পদাতিক যুদ্ধ বেশে সজ্জিত হইয়া নবাবের পক্ষ সমর্থন করিতেছিল। কিন্তু এই পদাতিক সৈন্য তাদৃশ সুশিক্ষিত ছিল না, এবং ইহাদের অস্ত্রশস্ত্রও তাদৃশ উৎকৃষ্ট ছিল না। নবাবের অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা ১৫ হাজার ছিল। ইহারা সুশিক্ষিত, বলসম্পন্ন ও তেজস্বী অশ্বে অধিষ্ঠিত ছিল। ইহাদের প্রধান অস্ত্র তরবারি ও বড়শা। কামানসজ্জা ও কামান পরিচালকগণ অশ্বারোহী সৈন্য অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ছিল। নবাব ৫৩টি কামান আনিয়াছিলেন। ৪০।৫০ জন ফরাসী একজন ফরাসী সেনাপতির অধীনে ঐ সকল কামান পরিচালনা করিতেছিল।

নবাবের সৈন্য যেমন অধিক-সংখ্যক ও অধিকতর বলসম্পন্ন, তেমনি তাহারা অধিকতর উৎকৃষ্ট ও সুরাবস্থিত স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। নবাব যে স্থানে সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা পরিখায় পরিব্যাপ্ত ছিল। ভাগীরথী এই স্থানে অর্দ্ধবৃত্তাকারে উত্তর পূর্ব্ব দিকে আসিয়া দক্ষিণাভিমুখী হইয়াছে। সুতরাং ভাগীরথীপ্রবাহের এই উত্তর পূর্ব্ব দিক কোণাকৃতি হইয়া উঠিয়াছে। কোণাকৃতি স্থলের নিকটে একটি ছোট গড়ে কামান সকল সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। উহার ৬০০ হাত পূর্ব্বে পরিখার সম্মুখভাগে একটি পাহাড়ি জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল। ঐ গড়ের ১,৬০০ হাত দক্ষিণে, ইংরাজ-সৈন্য যে আম্রকাননে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল, তাহারই নিকটে একটি পুষ্করিণী এবং ঐ পুষ্করিণীর ২০০ হাত অন্তরে আর একটী বড় পুষ্করিণী ছিল। উভয় সৈন্যের গতি-বিধি বুঝিতে হইলে এই বর্ণিত স্থানের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

২৩ এ জুন প্রাতঃকালে নবাবের সৈন্য আপনাদের-পরিখা পরিবেষ্টিত সন্নিবেশস্থল হইতে যাত্রা করিল। ফরাসীরা চারিটি কামান লইয়া ইংরাজদিগের অতি নিকটে পূর্ব্বোক্ত বড় পুষ্করিণীর পার্শ্বে আসিল। ভাগীরথী ও ফরাসীদিগের মধ্যভাগে আর দুইটি কামান একজন ভারতবর্ষীয় সৈনিক পুরুষের অধীনে রক্ষিত হইল। কামান-পরিচালক ফরাসীদিগের পশ্চাতে নবাবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৈন্য—পাঁচ হাজার অশ্বারোহী, সাত হাজার পদাতিক, পরম বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরমদনের অধীনে অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাঁহারই পার্শ্বে সেনা-পতি মোহনলাল ইংরাজের সম্মুখে আপনার বীরত্বগৌরবের পরিচয় দিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহাদের পার্শ্বভাগে নবাবের ৩৮ হাজার সৈন্য অর্দ্ধ-চক্রাকারে ইংরাজদিগের সম্মুখে রহিল। নবাবের বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি রাজা রায়দুর্লভ, জাফরালিফ খাঁ ও মীরজাফরের অধীনে ঐ সকল সৈন্য রক্ষিত হইয়াছিল। রায়দুর্লভ দক্ষিণ ভাগে, জাফরালিফ, মধ্যভাগে এবং মীরজাফর ইংরাজদিগের অতি নিকটে বামভাগে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, নবাব সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত স্থানে সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ক্লাইব যে পথে অগ্রসর হইয়া, নবাবের শিবির আক্রমণ করিবেন, সেই পথ কামান-পরিচালক ফরাসীগণ এবং সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি মীরমদন ও মোহনলাল অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অধিকন্তু ক্লাইবের এক দিকে ভাগীরথী প্রখরবেগে তরঙ্গবাহু আস্ফালন করিতে করিতে প্রবাহিত হই-তেছিল, আর দিকে নবাবের বিপুল সৈন্য চক্রাকারে তাঁহার পথ অবরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইংরাজেরা এইরূপে শত্রু সৈন্যে প্রায় পরিবেষ্টিত ছিলেন। এই সুদৃঢ় বিপুল ব্যূহ ভেদ করিতে পারেন, তাঁহাদের সেরূপ সৈনিকবল বা ক্ষমতা ছিল না। যদি হতভাগ্য সিরাজের সেনাপতিগণ বিশ্বাসঘাতক না হইতেন, দুর্নিবার ভোগলালসা ও আত্মসুখকামনা যদি এ সময়ে তাহাদিগকে পবিত্র কর্ত্তব্য-পথ হইতে বিচলিত না করিত, তাহা হইলে ইংরাজসৈন্য পলাশীর ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহ নির্ম্মূল হইয়া যাইত।

আম্রকাননের বহির্ভাগে—ভাগীরথীর তটদেশে নবাবের একটি শিকারমঞ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। ক্লাইব যখন আম্রকাননে উপস্থিত হইয়া অদূরে সমরসঙ্গীত শুনেন, তখন তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া ঐ শিকারমঞ্চ অধিকার করিতে কয়েকজন সৈনিক পুরুষ পাঠাইয়া দেন। মঞ্চ অধিকৃত হয়। ক্লাইব এখন শিকার করিবার মঞ্চ হইতে নবাবের সৈন্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন, দেখিয়া, বিস্ময় ও আশঙ্কার তরঙ্গে মুহুর্মুহু আন্দোলিত হইয়া উঠিলেন। নবাবের বল-বহুলতা, সৈন্য-সন্নিবেশের পারিপাট্য, মীরমদন ও মোহন লালের সেই অদম্য তেজ ও উৎসাহ, সমস্তই ক্লাইবের হৃদয়ে দুশ্চিন্তার তুমুল ঝটিকার সূত্রপাত করিল। ক্লাইব একবার গভীর আশায় বুক বাঁধিয়া মীরজাফরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, আবার আশঙ্কার সহিত আপনার ক্ষুদ্র দলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, বিস্ময় ও বিরাগে অভিভূত হইতে লাগিলেন। নবাবের সৈন্য যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল, তখন ক্লাইব আর কাল বিলম্ব না করিয়া, আপনার ক্ষুদ্র সৈন্যদলকে আম্রকানন হইতে বাহির হইতে আদেশ দিলেন। সেনাপতির আদেশে সৈন্যগণ আম্রকানন হইতে বহির্গত হইল। ক্লাইব তাহাদিগকে আম্রবনের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ করিলেন। সৈন্য-শ্রেণীর মধ্যভাগে ইউরোপীয়গণ এবং উভয় পার্শ্বে সিপাহিগণ স্থাপিত হইল। ইউরোপীয় সৈন্যের উভয় পার্শ্বে শত্রুব্যূহ ভেদের জন্য কামান সকল প্রস্তুত রহিল।

ইঙ্গরেজের ইতিহাসের এই চিরস্মরণীয় দিনে বেলা পূর্ব্বাহ্ণ আট ঘটিকার সময়ে উভয় পক্ষ, উভয় পক্ষের আক্রমণে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। ফরাসীরা আপনাদের সুদক্ষ সেনাপতি সেন্টফ্রে কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া প্রথমে একটি কামান হইতে গোলা চালাইতে লাগিল। ইঙ্গরেজপক্ষ হইতেও গোলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। ইঙ্গরেজের গোলা যদিও অব্যর্থ সন্ধানে শত্রুদলে আসিয়া পড়িতে লাগিল, তথাপি তাহাদের কোন সুবিধা দেখা গেল না। নবাবের সৈন্য সংখ্যায় অধিক ছিল, সুতরাং তাহারা আপনাদের নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে অণুমাত্রও বিচলিত হইল না। এদিকে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ক্লাইবের এরূপ ক্ষতি হইল যে, ক্লাইব পশ্চাৎ হটিয়া আসিয়া সৈন্যদিগকে আম্রকাননে আশ্রয় দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সঙ্কল্প অনুসারে কার্য্য হইল। ক্লাইব শৃঙ্খলার সহিত পশ্চাৎ গমন করিয়া আম্রকাননে সৈন্য স্থাপন করিলেন। ইহাতে নবাবের সৈন্য এত উৎসাহযুক্ত হইয়া উঠিল যে, তাহারা কামান সকল শত্রুদিগের আরও নিকটে লইয়া গিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সত্বরতার সহিত গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন ফল হইল না। যে হেতু, গোলা সকল উর্দ্ধে আসিয়া পড়াতে আম্র বনেরই ক্ষতি হইতে লাগিল, বৃক্ষের নিম্নদেশে যে সকল সৈন্য ছিল তাহাদের তাদৃশ ক্ষতি হইল না। এদিকে ইঙ্গরাজেরা আম্রকাননের অন্তর্ভাগ হইতে গোলা চালাইতে লাগিলেন। ইহাতেও নবাবের সৈন্য পশ্চাৎপদ হইল না। তিন ঘণ্টা কাল এই রূপে গোলায় গোলায় যুদ্ধ হইল; কিন্তু ইঙ্গরেজদিগের কোন সুবিধা দেখা গেল না। নবাবের সৈন্য পূর্ব্বের ন্যায়

গোলা চালাইতে লাগিল। তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে রেখামাত্রও বিচলিত হইল না। এ সময়েও ক্লাইবের সহিত মীরজাফরের সম্মিলনের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। মীরমদন যে স্থান অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন, সে স্থান অধিকার করিতে ক্লাইব সাহসী হইলেন না, সুতরাং ক্লাইব উদ্বিগ্ন হইলেন। আত্মপক্ষের কোন সুবিধা না দেখিয়া তিনি বেলা এগারটার সময় আপনার প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষদিগকে নিকটে আহ্বান করিলেন. ইহাদের সহিত পরামর্শের পর স্থির হইল যে রাত্রি পর্য্যন্ত আম্রকাননে অবস্থিতি করিয়া, নিশীথে শত্রু-শিবির আক্রমণ করিতে হইবে।

এইরূপ স্থির হইলে ইংরেজ সৈন্য পূর্ব্বের ন্যায় সেই সুবিস্তৃত আম্রকাননেই অবস্থিতি করিতে লাগিল। ইহার মধ্যে একটি প্রাকৃতিক ঘটনা ইংরেজ পক্ষের বিশেষ অনুকূল হইয়া উঠিল। বর্ষাকালে সর্ব্বদা যেরূপ হইয়া থাকে হটাৎ এক ঘণ্টাকাল প্রবল বেগে সেই রূপ বৃষ্টি হইল। ইংরাজেরা আপনাদের বারুদ প্রভৃতি ঢাকিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের বিশেষ ক্ষতি হইল না। কিন্তু নবাবের সৈন্য এরূপ সাবধান না হওয়াতে তাহাদের সমস্ত বারুদ ভিজিয়া গেল। ইহাতে তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় গোলা চালাইতে পারিল না। সমরানলের তেজ ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল। ইংরেজদিগের বারুদও এই ভাবে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া, সেনাপতি মীরমদন এক দল অশ্বারোহী লইয়া প্রবল বেগে আম্রকাননের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ইংরেজ সৈন্য ইহাদের উপর গুলি বৃষ্টি করিতে লাগিল। গুলির বেগে আক্রমণকারিগণ হটিয়া গেল। সেনাপতি মীরমদন সাংঘাতিক রূপে আহত হইলেন।

এই ঘটনাতেই সিরাজের কপাল এক বারে ভাঙ্গিয়া গেল। ২৩এ জুনের এ ঘটনাই অনেকাংশে ইংরেজের বিজয়-গৌরবের প্রচারে সুবিধা করিয়া দিল। যদি মীরমদন জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলেও সিরাজের আশা ভরসার স্থল থাকিত। সিরাজউদ্দৌলা বিশ্বাসঘাতকগণে পরিবৃত ছিলেন বটে, কিন্তু ঐ সাহসী প্রভু-ভক্ত সেনাপতি, মোহনলালের সাহায্যে তাঁহাকে কোন রূপে রক্ষা করিতে পারিতেন। এরূপ সেনাপতির মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল, কোনও রূপে আর সে ক্ষতির পূরণ হইল না। হতভাগ্য অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক আপনার সুদক্ষ ও বিশ্বস্ত সেনাপতির মৃত্যুতে অধীর হইলেন, অধীর ভাবে মীরজাফরকে ডাকিয়া আনিলেন। মীরজাফর উদাসীন ভাবে নবাবের সমক্ষে উপনীত হইলেন। নবাব আপনার উষ্ণীষ তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া কাতরতার সহিত বাষ্পনিরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন "আমি যাহা করিয়াছি তাহার জন্য এখন আমার অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু তোমার সহিত আমার ও স্বর্গীয় মাতামহ আলিবর্দ্দী খাঁর দুশ্ছেদ্য বন্ধন আছে। আমি এখন তোমাকে সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষের প্রতিনিধি বলিয়া চাহিয়া দেখিতেছি। আমার আশা আছে, তুমি আমার পূর্ব্বকৃত অপরাধ ভুলিয়া যাইবে, এবং প্রকৃত সৈয়দের ন্যায়, পবিত্র পারিবারিক বন্ধনে আবদ্ধ আত্মীয় স্বজনের ন্যায়, আমার বংশের কৃত মহদুপকার কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। আমি

তোমার দিকে চাহিয়া, আমার জীবন ও আমার সম্মান রক্ষার ভার তোমার প্রতি সমর্পণ করিলাম।" ইহার পর নবাব ভূমি-স্থাপিত স্বীয় উষ্ণীষ লক্ষ্য করিয়া, সজল নয়নে কহিলেন "জাফর! পাগড়ী অবশ্য তুমি রক্ষা করিবে।" আপনার অনুগত প্রজা ও প্রতিপালিত কর্ম্মচারীর নিকটে রাজাধিপতির এরূপ কাতরতা, এরূপ হৃদয়স্পর্শী সানুনয় প্রার্থনা আর সম্ভবে না। অষ্টাদশ বর্ষীয় তরলমতি যুবক আজ প্রাণের দায়ে উদ্ভ্রান্ত হইয়া, বিশ্বাস-ঘাতক প্রতিপালিতের সমক্ষে এই রূপ গভীর মর্ম্মবেদনা জানাইলেন।

কিন্তু এইরূপ কাতরতায় কঠোরপ্রকৃতি বিশ্বাসঘাতকের কঠোরতা দূর হইল না; প্রতিপালক রাজাধিপতির এইরূপ বিনয় অনুনয়েও তাঁহার কিছুমাত্র সমবেদনা জন্মিল না। মীরজাফর যেরূপ উদাসীনভাবে নবাবের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ উদাসীন ভাবে, কিন্তু বাহিরে সম্মান ও আনুগত্যের নিদর্শন দেখাইয়া, কহিলেন, "বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এখন আক্রমণের আর সময় নাই। যে সকল সৈন্য অগ্রসর হইয়াছে এবং যাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদের সকলকেই ফিরিয়া আসিতে আদেশ করুন। ঈশ্বরের প্রসাদে আমি আগামী কল্য সমস্ত সৈন্য লইয়া বিপক্ষ পক্ষ আক্রমণ করিব।" সিরাজ আবার কাতরতার সহিত কহিলেন, "রাত্রিতে বিপক্ষগণ আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে।" মীরজাফর পূর্ব্বের ন্যায় উদাসীন ভাবে তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে, বিপক্ষগণ রাত্রিকালে কখনও আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না।

সেনাপতি মোহনলাল মীরমদনের সহিত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে বিপক্ষদিগকে যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন; তাঁহার কামানের গোলা এই সময়ে বিশেষ কার্য্যকর হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাঁহার পদাতিক সৈন্য অবিশ্রান্ত গুলি বৃষ্টি করিয়া, ইঙ্গরেজ সৈন্যের ক্ষমতা প্রায় পর্য্যুদস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এই সময়ে যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার আদেশে মোহনলাল বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "এখন যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া ফিরিয়া যাওয়ার সময় নয়, উপস্থিত যুদ্ধে যাহা ঘটিতে পারে, এখনই তাহার সংঘটন প্রার্থনীয়। আমি ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, সমস্ত সৈন্য সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে।" সিরাজউদ্দৌলা মোহনলালের এই কথা মীরজাফরকে জানাইলেন, মীরজাফর কিছু বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন, "আমি যে পরামর্শ দিয়াছিলাম, তাহাই আমার মতে অধিকতর সঙ্গত বোধ হইয়াছিল। এখন আপনি যাহা উচিত বোধ করেন, তাহাই করিতে পারেন।" ভয়াতুর হতভাগ্য যুবক বিশ্বাস-ঘাতক সেনাপতির কথায় আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। তিনি মীরজাফরের কথাতেই সম্মতি দিয়া আপনার দুরদৃষ্টকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হইলেন।

এদিকে দুরাশয় মীরজাফর নবাবের নিকটে বিদায় লইয়া আশ্বারোহণে বিদ্যুৎবেগে আপনার সৈন্যদলে উপস্থিত হইলেন। এইখানে আসিয়াই, তিনি ক্লাইবকে সমস্ত কথা লিখিয়া পাঠাইলেন। ঐ পত্রে ক্লাইবকে এরূপও অনুরোধ করা হইল, যে, তিনি যেন আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাঁহার সৈন্যদল সহ

অগ্রসর হইতে থাকেন। এদিকে মীর-জাফরের উদাসীনভাবে সিরাজউদ্দৌলা অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বস্ত সেনাপতির মৃত্যু হইয়াছিল, বারুদ সকল ভিজিয়া গিয়াছিল, সুতরাং তিনি গভীর আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া, কাতরভাবে রায় দুর্লভের নিকটে আসিলেন। এই সেনাপতিও বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের দলভুক্ত ছিলেন। সুতরাং সিরাজ ইহার নিকটেও সমুচিত সান্ত্বনা পাইলেন না। রায় দুর্লভও সৈন্যদিগকে পরিখা বেষ্টিত স্থানে হটিয়া আসিতে আদেশ দিতে নবাবকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সমরক্ষেত্রে মীরমদনের পতন হইয়াছিল; মোহনলাল বিশেষ পরাক্রমের সহিত বিপক্ষদিগকে নির্জ্জিত করিতেছিলেন; অবশিষ্ট তিনজন সেনাপতি রায় দুর্লভ, জাহলতিক ও মীরজাফর ইংরাজ পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন। সুতরাং ইহাদের কাহারও নিকটে সদ্ব্যবহারের প্রত্যাশা ছিল না। হতভাগ্য যুবক এখন নিরুপায় হইয়া মীরজাফর প্রভৃতিকে সন্তুষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ইহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলে ইহারা সকলেই আগামী কল্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। নবাব এই বিশ্বাসে যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকিতে মোহনলালকে পুনঃ পুনঃ আদেশ দিতে লাগিলেন। এই আদেশ দিয়াই তিনি উটে চড়িয়া দুই হাজার অশ্বারোহীর সহিত ভগ্নব্যাকুলচিত্তে মুর্শিদাবাদের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

নবাবের পুনঃ পুনঃ আদেশে বিরক্ত হইয়া মোহনলাল অবশেষে ঐ আদেশ পালন করিলেন। তিনি সহসা যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া আপনার স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। সেনাপতিকে সহসা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে হটিয়া আসিতে দেখিয়া সৈন্যগণও হটিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা রহিল না, তাহারা সন্ত্রস্তভাবে পশ্চাৎদিকে যাইতে লাগিল। তিন জন বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি এখন আপনাদের নির্দ্দিষ্ট স্থলে প্রভুত্ব করিবার সুযোগ পাইলেন। ফরাসী সেনাপতি সেন্টফ্রে ইহাতে বিচলিত হইলেন না। তিনি শেষ সময় পর্য্যন্ত প্রাণপণে নবাবের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। মীরমদনের সৈন্যগণের সাহায্যে এই বিদেশী বিশ্বস্ত সৈন্যাধ্যক্ষ আপনাদের অধিষ্ঠিত স্থান রক্ষায় যত্নশীল হইলেন। কিন্তু মীরমদনের মৃত্যুতে ও মোহনলালের প্রত্যাবর্ত্তনে ঐ সকল সৈন্যও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ফরাসী সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রায় নিঃসহায় ও নিরবলম্ব হইলেন। ইহার পর কি হইল, তাহা জানিতে হইলে, ইংরাজসৈন্যের সন্নিবেশ-ভূমি সেই আম্রকাননের দিকে পুনর্ব্বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত।

নবাবের সেনাপতি মীরমদন যখন বিপুল বিক্রমে আপনার সাহসী সৈন্যগণের সহিত আম্রকাননের অভিমুখে অগ্রসর হন, তখন ক্লাইব স্বীয় শিক্ষিত সৈনিকদলের সাহায্যে সেই আক্রমণে বাধা দিতে ব্যাপৃত ছিলেন। এই স্থানে ক্লাইবকে পরিত্যাগ করা হইয়াছে। ক্লাইব সাহসে ভর করিয়া, যে আক্রমণের গতি নিরোধে উদ্যত হইয়াছিলেন তাহাতে নবাবের সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পদে অধিষ্ঠিত সেনাপতির পতন হয়, আক্রমণকারী সৈন্যগণও ভগ্নোৎসাহ হইয়া হটিয়া আইসে নবা-

রের এক জন সেনাপতির পতন ও এক দল সৈন্যের প্রতিনিবর্ত্তনের পরিণাম কি ঘটিবে, তাহা ক্লাইব তখন ভাবিয়া দেখেন নাই। ইহাতে যে নবাবের বিচিত্র ব্যূহ ভেদ হইবে এবং নবাব যে ভয়ব্যাকুল চিত্তে মুর্শিদাবাদে পলায়ন করিবেন তাহা মুহূর্ত্ত মাত্রও তখন ক্লাইবের কল্পনায় সঙ্কুচিত হয় নাই। ক্লাইব সে সময়ে রাত্রি সমাগম পর্য্যন্ত আপনাদের সন্নিবেশ-ক্ষেত্র আম্রকানন রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে তিনি ইহার পর মীরজাফর ও অন্যান্য বন্ধুগণের উপর নির্ভর করিয়া নবাবের ব্যূহভেদে অগ্রসর হইবেন। ক্লাইব এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া শ্রান্তিবিনোদনের জন্য শিবির-মধ্যে প্রবেশ করেন। যদি ইহার মধ্যে বিপক্ষগণ আপনাদের সন্নিবেশ স্থান পরিবর্ত্তন করে তাহা হইলে তাঁহাকে জাগাইতে হইবে বলিয়া তিনি যাইবার সময়ে আপনার সেনানায়কদিগকে আদেশ দেন। ক্লাইব শিবির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অবিলম্বে নিদ্রা আসিয়া তাঁহার সমস্ত উদ্বেগ দূর করিল। ইহার মধ্যে ইংরেজ সেনানায়ক মেজর কিল্‌পাট্রিক বিপক্ষদিগকে পূর্ব্বতন স্থান পরিত্যাগ করিতে দেখিলেন। বলা বাহুল্য যে মীরমাকরের বিশ্বাসঘাতকতায় মোহনলাল যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হওয়াতে ক্লাইবের শিবির মধ্যে প্রবেশ করার অব্যবহিত পরেই এই রূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। কিন্তু মেজর কিল্‌পাট্রিক এই কারণ অবগত ছিলেন না, সম্ভবতঃ তিনি উহা জানিতেও উৎসুক হন নাই। কেবল নবাবের সৈন্যগণকে ফরাসীদিগকে ছাড়িয়া যাইতে দেখিলেন। এই সুন্দর সুযোগ তাঁহার হৃদয়ে গভীর আশা উদ্দীপ্ত করিয়া দিল। মেজর কিল্‌পাট্রিক এই সুযোগে পুষ্করিণীর সমীপবর্ত্তী ভূমি অধিকার করিয়া ঐ স্থান হইতে পশ্চাদ্‌গামী বিপক্ষ দলের উপর গোলা চালাইতে ইচ্ছা করিলেন। ইচ্ছামাত্র তিনি আড়াই শত ইউরোপীয় সৈন্য ও দুইটি কামান লইয়া আম্রকানন হইতে বহির্গত হইয়া পুষ্করিণীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং ক্লাইবকে এই বিষয় জানাইবার জন্য শিবির মধ্যে এক জন সেনানায়ক পাঠাইয়া দিলেন। সেনানায়ক ক্লাইবকে নিদ্রিত দেখিতে পাইলেন। ক্লাইব জাগরিত হইয়া, যখন সমস্ত শুনিলেন, তখন তাঁহার ক্রোধের সঞ্চার হইল। তাঁহার বিনা অনুমতিতে এরূপ একটি গুরুতর কার্য্য অনুষ্ঠিত হওয়াতে তিনি সৈনিক-নিবাসে যাইয়া, কিল্‌পাট্রিককে যথোচিত ভৎর্সনা করিলেন। কিন্তু যখন সমস্ত বিষয় তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল, তখন তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিলে যাহা করিতেন, কিল্‌পাট্রিক তাহাই করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইল। সুতরাং ক্লাইব কাল বিলম্ব না করিয়া কিল্‌পাট্রিককে অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া আসিতে কহিলেন, এবং কিলপাট্রিক যে কার্য্য-প্রণালীর অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহাই সম্পন্ন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন।

এদিকে সেণ্টেক্রে, নবাবের সৈন্য পশ্চাদ্‌গামী হইতে দেখিয়া, চিন্তিত হইলেন। নিজের অল্পমাত্র সৈন্য লইয়া সমস্ত ইংরেজ সৈন্যের গতিরোধ করিতে পারেন, তাঁহার এমন ক্ষমতা ছিল না। কয়েক মিনিটের মধ্যে ফরাসী সেনাপতি দেখিলেন

যে, ইঙ্গরেজ সৈন্য আম্রকানন হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহারই অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং তিনি পরিখাবেষ্টিত স্থানের কোণে যে সৈন্য সন্নিবেশস্থল ছিল, সেই খানে বিশেষ শৃঙ্খলার সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেণ্টফ্রে এই স্থানে বিপক্ষের গতিনিরোধ জন্য আপনার কামান সকল সজ্জিত করিয়া রাখিলেন।

ইহার মধ্যে নবাবের দুই তিন দল সৈন্য পরিখাবেষ্টিত স্থানে ফিরিয়া আসিল। মীরজাফর তৃতীয় দলের অধ্যক্ষ ছিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে এই দল আম্রবনের অতি নিকটে সন্নিবেশিত ছিল। উপস্থিত সময়ে উক্ত দলের সমস্ত সৈন্য আম্রবনের উত্তর প্রান্তে যাইতে লাগিল। উহারা যে, তাঁহার সহযোগী মীরজাফরের সৈন্য, তাহা ক্লাইব জানিতেন না। তিনি ভাবিলেন যে, বিপক্ষেরা তাঁহাদের দ্রব্যাদি অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে ঐদিকে যাইতেছে। সুতরাং ক্লাইব অবিলম্বে একদল ইউরোপীয় সৈন্য উহাদের গতিরোধের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। ইউরোপীয়গণ এরূপ তীব্রতার সহিত কামানের গোলা চালাইতে লাগিল যে, মীরজাফরের সৈনিকদল আর অগ্রসর হইতে পারিল না। কিন্তু উহারা নবাবের অপরাপর সৈন্য হইতে পৃথক্ হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল।

ইহার মধ্যে ক্লাইব সেণ্টফ্রের পরিত্যক্ত পুষ্করিণীর তটে উপনীত হইয়া শত্রু পক্ষের উপর গোলা চালাইতে লাগিলেন। পরিখা-পরিবেষ্টিত স্থানে নবাবের যে সকল সৈন্য ছিল তাহারা এখন নিরস্ত থাকিল না। অশ্বারোহী, পদাতিক, কামানরক্ষক, সকলেই ইঙ্গরেজ সৈন্য লক্ষ্য করিয়া গুলিবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ক্লাইব আপনার পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া নবাবের সৈন্যের সন্নিবেশক্ষেত্র পূর্ব্বোক্ত পরিখাবেষ্টিত ভূমির অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইলেন। অনন্তর তিনি অর্দ্ধেক পদাতিক ও অর্দ্ধেক কামানরক্ষক সৈন্য ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর পাহাড়ির উপর রাখিলেন, অবশিষ্ট সৈন্যের অধিকাংশ উহার দুইশত গজ বামে একটি উন্নত ভূমিতে সন্নিবেশিত করিলেন এবং ৯৬০ জন বাছা বাছা এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষকে পরিখাবেষ্টিত স্থানের নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীর পশ্চাতে থাকিতে আদেশ দিলেন। ক্লাইব এইরূপে সৈন্য সন্নিবেশ করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান হইতে কামানের গোলা এবং তৃতীয় স্থান হইতে বন্দুক চালাইতে লাগিলেন। ফরাসী সেনাপতি সেণ্টফ্রে আপনার স্থান হইতে বৃথা কামানের গোলা ছাড়িতে লাগিলেন, বৃথা বন্দুকের গুলি বৃষ্টি করিয়া বিপক্ষদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন, বৃথা অস্ত্র শস্ত্র সজ্জিত করিয়া বিপক্ষব্যূহ ভেদ করিতে উদ্যত হইলেন। অধিনায়কের অভাবে নবাবের সমস্ত সৈন্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা আর শৃঙ্খলার সহিত সঙ্ঘীভূত হইল না। তাহাদের সাহস ছিল, বীরত্ব ছিল, তেজস্বিতা ছিল, কিন্তু সেই সাহস যথাসময়ে প্রকাশ করিবার, সেই বীরত্ব যথাস্থলে প্রদর্শন করিবার এবং সেই তেজস্বিতার যথানিয়মে পরিচয় দিবার তাহাদের মধ্যে কোন বিচক্ষণ উপদেষ্টা ছিল না। মীরমদন নিহত হইয়াছিলেন, মীরজাফরের কুমন্ত্রণায় মোহনলাল যুদ্ধে অবসর লইয়াছিলেন, এখন সমরসাগরে নবাবের সৈন্য কর্ণধারবিহীন নৌকার

ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। ফরাসী সেনাপতি বহু চেষ্টা করিয়াও এই উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যের শৃঙ্খলা বিধানে সমর্থ হইলেন না। অনিয়মে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ক্লাইব এই সময়ে দেখিলেন, যে সৈনিকদলকে তিনি তাঁহাদের দ্রব্যাদির অপহরণে উদ্যত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন সেই সৈনিক দল তখন পর্য্যন্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া আপনাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। তিনি ইহা দেখিয়াই, উহাদিগকে মীরজাফরের সৈন্য বলিয়া মনে করিলেন। এখন ক্লাইবের আশা অধিকতর বর্দ্ধিত হইল, উৎসাহ অধিকতর বিকাশ পাইল, সাহস অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল। ক্লাইব এখন ফরাসী সেনাপতির অধিকৃত সৈন্য-সন্নিবেশভূমি ও তাহার পূর্ব্বদিকের পাহাড়ি অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। পাহাড়ি অধিকৃত হইল। এদিকে উচ্ছৃঙ্খল সৈন্য দল কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়াতে ফরাসী সেনাপতিও নিঃসহায় ও নিরবলম্ব হইয়া আপনার স্থান পরিত্যাগ করিলেন। বেলা পাঁচটার সময়ে ক্লাইব পরিখা-বেষ্টিত সমগ্র সৈন্য-সন্নিবেশভূমি অধিকার করিলেন। পলাশীর ক্ষেত্রে ইংরাজের বিজয়পতাকা উড়িতে লাগিল।

এইরূপে ইংরাজ বর্ণিত বিখ্যাত পলাশী মহাসংগ্রামের অবসান হইল। যে যুদ্ধ ইংরাজকে বণিক বেশ ছাড়াইয়া, বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার রাজসিংহাসনে বসাইয়াছে, ক্রয় বিক্রয়ে অতি লাভ গণনা পরিত্যাগ করাইয়া, সন্ধি বিগ্রহ ঘটিত মন্ত্রণায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, ইংরাজ ইতিহাস-লেখকগণ শত মুখে যে যুদ্ধের গৌরবের কথা ঘোষণা করিয়াছেন, এইরূপে তাহা শেষ হইয়া গেল। কিন্তু প্রবন্ধের সূচনাতেই বলা হইয়াছে যে, পলাশীর যুদ্ধ মহাযুদ্ধের সম্মানিত নামের যোগ্য নহে। পলাশীর যুদ্ধ ঘোর নীচাশয় বিশ্বাসঘাতকের চাতুরী মাত্র। এই চাতুরীতেই হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলার অধঃপতন হয়, এবং এই চাতুরীতেই বঙ্গে ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠে।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

শঙ্কা।

আপনি আপনা ঢাকি
মরমে লুকায়ে রাখি,
সদা করি প্রকাশের ভয়;
সে পাছে বিজন ব্যথা
সে পাছে গভীর কথা
শুনে হেসে হয় নিরদয়।

সলিলের চিত্র হেন
এত অস্থায়ী কেন
ভালবাসা তাহার হৃদয়ে;
করুণার কল-তানে,
কেন ব্যথা লাগে প্রাণে,
তাই ভাবি চমকি বিস্ময়ে।

কাছেতে মিলন নাই,
দূরে ছুটে আসি তাই,
দূরে এসে জ্বলে জ্বলে মরি ;
ঘেঁসাঘেঁসি মিশামিশি
মুখ চেয়ে সারা নিশি
প্রণয়ের আরাধনা করি।

দুটি প্রাণ তবু, হায়,
হয় না অনন্যকায়
না বুঝিনু প্রাণের মিলন ;
এ তপস্যা, এ সাধনা,
সুগভীর এ কামনা
রহে গেল যেন কুস্বপন।

কান পেতে মধু বুলি
শুনে পড়ি ঢুলি ঢুলি,
জ্ঞানহারা অধর চুম্বনে ;
আলিঙ্গনে মনোরথে
ধাইতে মিলন পথে
বাধা দেয় অপূর্ণ মদনে।

বিষয়ের দেশে আসি
শ্মশানে বৈরাগ্য ভাসি,
আবার প্রতিজ্ঞা করে ছুটি ;
দুটি পা যেতে না যেতে
রূপে প্রাণ উঠে মেতে,
মদন চরণ ধরে লুটি।

বসন্তে সে শশধর
আমি রাহু ভয়ঙ্কর
অসম্ভব মিল তার সনে ;
হাসি তার করে পান
ভেঙে দিয়ে তার প্রাণ,
ছিঁড়ে ফেলি প্রণয় বন্ধনে।

কেন তবে এ রোদন
এ সন্তাপ অকারণ
দৈত্যে কেন স্বর্গের বাসনা;
না হলে সাধনী ধীর
ভালবাসা সুগভীর,
শুধু মাত্র অসৎ কল্পনা।

শ্রীবেণোওয়ারিলাল গোস্বামী।

হাওয়া খাই না পোকা খাই।

কথাটা শুনিয়া তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত হাসিয়া উঠিবে ; কিন্তু বাস্তবিক্ কথাটা নিতান্ত হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে। তুমি আমি হাসিলে হাসিতে পারি—সেটা বড় বিচিত্র ব্যাপার নহে ; কিন্তু যাঁহারা বিজ্ঞানবিদ্—সারা জীবনটা বিজ্ঞানের কূটতত্ত্ব সকল আলোচনা করিয়া যাঁহারা কাটাইতেছেন, তাঁহারা ইহাতে হাসিবেন না। কথাটার ভাবিবার, বুঝিবার, শিখিবার অনেক জিনিস আছে।

'বঙ্গদর্শনে' * একদিন অনেকেই পড়িয়া থাকিবেন, যে ধূলার সঙ্গে রাশি রাশি কীটাণু সকল অবিরত মিশ্রিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে আমরা সাধারণ চক্ষে দেখিতে পাই না—ধূলার সহিত ধূলা ভিন্ন আর কিছুরই সত্তা উপলব্ধি করিতে পারি না ; অথচ সেই ধূলা যখন আমাদের নাকে মুখে

* যাঁহারা "বঙ্গদর্শনে" না পড়িয়াছেন, তাঁহারা বঙ্কিমবাবু কৃত "বিজ্ঞান রহস্যে" 'ধূলা' নামক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

প্রবিষ্ট হইতেছে তখনই আমরা অজ্ঞাতসারে রাশি রাশি কীট পতঙ্গ নিধন করিতেছি। কিন্তু সে তো সামান্য কথা। ইচ্ছা করিলে অল্পাধিক পরিমাণে ধূলা না খাইয়াও অনেকে দিন কাটাইতে পারেন। শৈল-শৃঙ্গে, গিরিগুহায়, ভূগর্ভস্থ গৃহে বাস করিয়াও অনেকে জীবন যাপন করেন, তাঁহাদিগকে ধূলার বড় একটা সম্পর্ক রাখিতেই হয় না। তা ছাড়া, 'ধারা শ্রাবণের' দিনে পৃথিবী যখন অবিশ্রান্ত বরষায় প্লাবিত হইয়া যায়, সে দিন তুমি আমি সবাই ধূলার হস্ত হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাই, অন্ততপক্ষে বরষার সে কয়টা দিন আর কাহাকেও ধূলা খাইতে হয় না। ধূলা না খাইলে কাজেই কীটও খাইতে হয় না। কিন্তু তাই কি?

শুনিয়াছি, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ যেখানে যাইতেন, আগে পথটী বেশ করিয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া পরিষ্কৃত করিয়া—পাছে হাত দিয়া ঝাড়িলে হস্তের কঠিন স্পর্শে কোনও কোমলপ্রাণ কীটাণু মরিয়া যায় সে জন্য অতি সাবধানে ফুৎকারের পর ফুৎকার দিয়া—সে স্থানটী কীটশূন্য করিয়া তবে তাহার উপর পদক্ষেপণ করিতেন। নাকি বৌদ্ধগণ এত করিয়া তাঁহাদের সেই প্রাণাদপি প্রিয়তর "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" মতটীর প্রতিপালন করিতেন। মত সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতেছি না—সে তো পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আজও প্রশংসার তারস্বরে পরিকীর্ত্তিত হইতেছে—কিন্তু অগাধসত্ত্ব বোধিসত্ত্বের শিষ্যগণ যে তাহা প্রতিপালনের জন্য এত কঠোর সাধনা করিতেন তাহাতেও কি বাস্তবিক ঠিক জানতঃ বা অজ্ঞানতঃ কোনও প্রাণির বিনাশসাধন না করিয়া তাঁহারা অক্ষুণ্ণভাবে তাহা প্রতিপালন করিতে পারিয়াছিলেন?

পারিয়াছিলেন কি না তাহা বুঝা যায়, যদি আমরা এই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটী একবার ভাল করিয়া বুঝি। তাই বলিতেছিলাম, প্রবন্ধের নাম পড়িয়াই হাসিয়া উঠিও না। কথাটা নিতান্ত উপেক্ষার নহে। মানুষ সহস্র চেষ্টা করুক, সহস্র সাবধানতা অবলম্বন করুক, কীট না খাইয়া সে থাকিতে পারে না। কীট তাহাকে খাইতেই হইবে। সূতিকা-গৃহের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হইয়া যে দিন সে প্রথম নিশ্বাস গ্রহণ করিয়াছে সেই দিন হইতেই সে কীটভুক্ হইয়া আসিয়াছে। নিশ্বাস টানিতে না পারিলে মানুষ এক দণ্ডও বাঁচে না। যেখানে যে দণ্ডে এই নিশ্বাসের পূর্ণ বিরাম সেইখানে সেই দণ্ডেই 'দৃষ্টিহীন, নাড়ী ক্ষীণ, হিম কলেবর।' নিশ্বাসের দ্বারা আমরা করি কি? আমরা বায়ু গ্রহণ করি মাত্র। বায়ু গ্রহণ না করিলে আমরা এক মুহূর্ত্তও বাঁচি না। বাহিরের বায়ু না পাইলে প্রাণবায়ু হাঁফাইয়া মরিয়া যায়। তাই মানুষের আদিপুরুষ বায়ুকে জগৎপ্রাণ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। কিন্তু এই বায়ুর স্তরে স্তরে পটলে পটলে অবিরত রাশি রাশি কীট ভাসিয়া বেড়াইতেছে—তাহাদিগকে আমরা দেখিতে পাই না, তাহাদের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি না, সে সকল কীটাণু সূক্ষ্ম হইতেও এত সূক্ষ্মতর যে সহসা তাহারা মানবের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হয় না—সেই সকল কীট যখনই আমরা শ্বাস দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিতেছি তখনই আমাদের নাসারন্ধ্র পথ দিয়া—মুখবিবর প্রবিষ্ট হইয়া আমাদিগের উদর-

সাং হইতেছে। তাই বলিতেছিলাম, ধুলা তো সামান্য কথা, বায়ু গ্রহণ না করিয়া যখন মানুষ এক দণ্ডের জন্যও বাঁচে না, তখন কাজেই, বৌদ্ধই বল, হিন্দুই বল, মুসলমানই বল, আর খ্রীষ্টানই বল, কীট ভক্ষণ না করিয়া কেহই কখন থাকিতে পারে না।

কিন্তু, কথা হইতেছে, বায়ুতে যে কীট আছে—কীট থাকে—তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ আছে। আমরা সহজ চক্ষে যাহা দেখিতে না পাই, বিজ্ঞানের চক্ষে তাহা আমাদের লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হয়। এক দিনেও এ প্রমাণ হয় নাই। বহু বৈজ্ঞানিক বহু আলোচনায় এই অভ্রান্ত মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন। কয়েকজন মহামনস্বী প্রতিভাবশা বিজ্ঞানবিদ্ আলোচনার পর আলোচনা করিয়া এ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আজ আমরা একে একে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

পাষ্ট্যুর সাহেব সর্ব্ব প্রথমে এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। বেশি দিন নয়, ত্রিশ বৎসরের কথা, এই মত লইয়া বৈজ্ঞানিক মহলে বিস্তর বাদানুবাদ, তর্ক বিতর্ক ও লাঠালাঠি গিয়াছে। Pasteur সাহেবকে প্রথমে তো অনেকে হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিল। কোনও একটা মত বিশেষের যখনই কোনরূপ নূতন প্রবর্ত্তনা উপস্থিত হয়, তখন প্রায় সকল দেশে সকল সমাজেই এইরূপ ঠাট্টা বিদ্রূপ ও উপহাসের ছটা পড়িয়া যায়। গ্যালিলিওকে তো পাগল বলিয়াই অনেকে তাহার গায়ে ধুলি প্রক্ষেপ করিত। ফলতঃ পুরাতনের বাজারে নূতন চালান বড়ই কঠিন ব্যাপার। আবার সকল অপেক্ষা মনুষ্যের বহুদিনের বিশ্বাসকে পরিবর্ত্তিত করা আরও কঠিনতর। তবে পূর্ব্বের সে কাল এখন গিয়াছে, বিজ্ঞান দেখিয়া শুনিয়া ঠেকিয়া আজ অনেক শিখিয়াছে। তখনকার ন্যায় এখন আর একজনের বহুচিন্তিত বহু-আলোচিত একটা বৈজ্ঞানিক মতের প্রতি হঠাৎ কেহ উপেক্ষা প্রদর্শন করে না। কিন্তু তবুও উনবিংশ শতাব্দীর এই বিজ্ঞানসর্ব্বস্ব দিনেও পাষ্ট্যুরের মত অনেকে উপেক্ষা করিল। সবাই জানিত, দুগ্ধ, শোণিত এবং সূপ প্রভৃতি পদার্থে যে সমস্ত কীট জন্মে তাহারা স্বতঃজাত,—এই সমস্ত বিকৃতি-শীল পদার্থের সহিত বায়ুর সংস্পর্শ সূত্রেই ঐ সকল কীটাণুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু প্যাষ্ট্যুর সাহেব বলিলেন, এ মত ভ্রান্ত, এ সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত বৈ আর কিছুই নয়। প্রতিনিয়ত বায়ুর সঙ্গে অসংখ্য কীটাণু ভাসিয়া বেড়াইতেছে তাহারাই দুগ্ধাদি বিকৃতি-ধর্ম্মাক্রান্ত পদার্থে বায়ুর সহিত মিশিয়া তাহাকে কীটবিশিষ্ট করে। পোকা আপনি জন্মায় না। বায়ুর সঙ্গে যে পোকা ভাসিয়া বেড়াইতেছে, ইহা তাহাই। কথাটা অবশ্যই প্রথম মনে না লাগিবার কথা। কিন্তু পাষ্ট্যুর সাহেব যখন পরীক্ষার দ্বারা ইহা স্পষ্ট রূপে বুঝাইয়া দিলেন, তখন আর বড় একটা সন্দেহ রহিল না। অন্যান্য পরীক্ষার পর তিনি বোতলের ভিতর কতকটা পরিষ্কার মাংসের ঝোল পুরিয়া তাহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখিয়া তাহার ফলাফল দেখাইয়া তাঁহার কথার সপ্রমাণতা দেখাইয়া দিলেন। আর্ব্বাইসের (Arbois) প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্রে ঐরূপ সূপপূর্ণ ২০টী বোতলের মধ্যে আটটী কীটযুক্ত হয়; জুরা পর্ব্বতের নিম্ন প্রদেশে

ঐরূপ বিশটী বোতল স্থাপন করিলে পাঁচটীতে পোকা জন্মে; কিন্তু ঐ পর্ব্বতের উচ্চতম শিখরে—প্রায় ছয় হাজার ফিট উচ্চে—যখন আবার ঐরূপ ২০টী বোতল রাখিয়া দেওয়া হয় তখন মাত্র একটী কীটযুক্ত হয়। ইহা দ্বারা বেশ প্রমাণিত হয় যে উচ্চতা যত বেশী হইবে এবং মনুষ্যাবাস হইতে দূরত্বও যত অধিক হইবে, বায়ু ততই পরিষ্কার, ততই নির্ম্মল, ততই কীটশূন্য হইবে। বিজ্ঞানকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়াও কিছু শক্ত কথা। বিজ্ঞান শুধু কোনও বিষয় বলিয়াই ক্ষান্ত হয় না, তাহার পরীক্ষা করিয়া নানা মতে হাতে নাতে প্রমাণ দেখাইয়া দেয়। সুতরাং প্রমাণের নিকট আর তুমি কত আস্ফালন চালাইবে? কাজেই তোমাকে নতমস্তকে সেই মত মানিয়া লইতে হইবে। অবশেষে প্রমাণাদি দেখিয়া পাষ্টুরের মত অনেকেই মানিতে আরম্ভ করিল।

শুধুই যে মানিতে আরম্ভ করিল তাহা নহে, যাঁহারা বিজ্ঞানগত প্রাণ তাঁহাদের মধ্যে আবার অনেকে এই মতটী লইয়া আপনা আপনি আলোচনা করিয়া সেই সূক্ষ্ম হইতে আরও কোন সূক্ষ্মতর তত্ত্বের উদ্ভাবন করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। এই সকল কীটাণুশূন্য বায়ুতে যে একেবারে থাকিতেই পারে না তাহা অধ্যাপক টিণ্ডেল (Tyndall) প্রকাশ করেন। বিজ্ঞানবিদ্ মিকেল (Miquel) আবার দেখাইয়া দেন যে এই সকল কীটাণু তাহাদের আশ পাশ অবস্থার উপর অনেকটা নির্ভর করে। গ্রীষ্মকালেই ইহারা বেশি পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহার প্রমাণের জন্য ৭০ ফীট উচ্চ স্থান হইতে দুই গ্যালন পরিমাণ বায়ু একটা পাত্রে ধরিয়া নিম্নে নামাইয়া মাসে মাসে কীটের সংখ্যা পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। তাহাতে দেখা যায়—

জানুয়ারি মাসে	৪	আগষ্টমাসে	১০৫
মার্চ্চ	২৬	সেপ্টেম্বর	৪৩
মে ...	৩১	অক্টোবর	৩৫
জুন	৫৪	নভেম্বর	২০
জুলাই	৬৩	ডিসেম্বর	১৩

সুতরাং পরীক্ষায় দেখা গেল, আগষ্ট মাসে—অর্থাৎ গ্রীষ্মের তমোট যখন বড়ই বেশি—যাহাকে আমরা 'পচা ভাদ্র' বলি—সেই সময়েই কীটের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে।

সম্প্রতি এই সকল তত্ত্ব লইয়া বৈজ্ঞানিক মহলে বড়ই নাড়াচাড়া আরম্ভ হইয়াছে। মিকেল যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাই ধরিয়া জনৈক বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ফ্যারাডে ফ্রাঙ্কলাণ্ড (Farday Frankland) সাহেব সে দিন Nineteenth Century পত্রিকায় নিজের পরীক্ষা ফল প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, লণ্ডন সহরের বায়ু অপেক্ষা পল্লীগ্রামের বায়ুতে কীট অনেক কম দেখা যায়। যেখানে লোকের বেশী বসতি, বাড়ী ঘর যেখানে অনেক, সর্ব্বদাই যেখানে জনতা ও কোলাহল তাহা অপেক্ষা নির্জ্জন শান্ত খোলা জায়গায় হাওয়ায় পোকা কম থাকে। একবার তিনি দুই গ্যালন বায়ু নরউইচ সহরের একটী বাগানের মধ্যে রাখিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন তাহাতে ৩১টী পোকা জন্মে, কিন্তু সেই রূপ দুই গ্যালন বায়ু আবার ঐ সহরের বাহিরে একটী মন্থদানে রাখিলে দেখা যায় যে কেবল পাঁচটী কি সাতটী দেখা দিয়াছে মাত্র।

সরে (Surrey) সায়রের Chalkdowns নামক স্থানে ১৮৮৬ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে যখন মাঠ ঘাট সমস্ত তুষারে আচ্ছন্ন ছিল তখন তিনি পরীক্ষা করিয়া দুটী মাত্র দেখিতে পান, কিন্তু ঐ সালে মে মাসের শেষে সেই স্থানেই পরীক্ষা করিয়া ১৩টী পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, কেবল যে স্থান-বিশেষেই বায়ুতে কীটের সংখ্যার তারতম্য ঘটে, তাহা নয়, কালভেদেও সংখ্যার ভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। ক্রাঙ্কলাণ্ড সাহেব এক্কা লণ্ডন সহরেরই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে সব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন তাহাও লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, ৭০ফিট উচ্চ স্থানে যে পরীক্ষা করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা বড় বড় পার্ক প্রভৃতি খোলা স্থানে পরীক্ষা করিলে যদিও কম দেখা যায় বটে, কিন্তু দূর পল্লীগ্রাম হইতে অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। কিন্তু ষ্ট্রীট ও গলির পরীক্ষা দেখিলে একেবারে অবাক্ হইয়া পড়িতে হয়। যে সময়ে উপনিবেশ এবং ভারত শিল্পপ্রদর্শনী (Colonial and Indian Exhibition) সাধারণের জন্য খোলা হয়, সেই সময় যখন লণ্ডনের Exhibition Road দলে দলে লোকের পর লোকে পুরিয়া যায়, সেই জনতার ভীম তুফানের সময় একবার ঐ রাস্তায় সেই রূপ দুই গ্যালন বায়ু লইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল। শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে, তাহাতে ৫৫৪টী কীট দেখা গিয়াছিল!

ইহা ছাড়া, সমুদ্রের বায়ু পরীক্ষা করিয়া আবার অনেকে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য তত্ত্ব বাহির করিয়াছেন। জর্ম্মাণ নৌসৈনিকের অনেক চিকিৎসক ডাক্তার ফিসার (Dr. Fischer) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, সমুদ্রের উপর ৭০ হইতে ১২০ মাইল পর্য্যন্ত লোকালয় হইতে দূরবর্ত্তী স্থলে এই সকল কীট দেখা গিয়া থাকে, কিন্তু তার পর আর ইহাদিগের অস্তিত্ব দেখা যায় না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, সমুদ্র স্থলেও যে সকল কীটাণু ভাসিয়া বেড়াইতে দেখা যায় তাহারাও তীরভূমির নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে বেশী দূরে বড় একটা থাকে না। যখন বায়ু প্রচণ্ড রূপে বহিতে থাকে, উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া সমুদ্র যখন বায়ুর আঘাতে আছাড়ি পিছাড়ি পড়িতে থাকে, বায়ুর এত প্রবলতায়ও সে স্থানে সে কীট আদৌ লক্ষিত হয় না।

পাষ্টুর যেরূপ স্থানের উচ্চতা ভেদে কীটের সংখ্যাভেদের কথা বলিয়াছেন, আমরা পূর্ব্বে ক্রাঙ্কলাণ্ড সাহেবের যে নাম করিয়াছি, তিনিও সেই রূপ লিখিয়াছেন। তিনি দুই গ্যালন বায়ু লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ৩০০ ফিট উচ্চে সাতটী, ১৮০ ফিট উচ্চে নয়টী, আর জমির উপর ১৮টী কীট পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে আরও অনেক বৈজ্ঞানিক অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন; কিন্তু সে সকল কথা এখানে আর উল্লেখ না করিয়া উক্ত মহাত্মা তুনতা এবং তৎকর্ত্তৃক বায়ুর উষ্ণতা ও অস্থিরতার অল্পাধিক মাত্রায় এই সকল কীটের সংখ্যার-ও যেরূপ অল্পাধিক মাত্রা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে তদ্বিষয়ে বিশেষ পরীক্ষার পর যাহা লিখিয়াছেন তাহাই এস্থলে বলিতেছি। এই পরীক্ষা গত বৎসর (Burlington House) বর্লিংটন হাউসে রয়াল সোসাইটীর একটী অধিবেশন অবকাশে গ্রহণ করা হয়। সন্ধ্যার সময় যখন আর অল্পমাত্র সভ্য

উপস্থিত ছিলেন এবং বায়ুর উষ্ণতা যখন ৬৭ডিগ্রি মাত্র ছিল, তখন দুই গ্যালন বায়ুতে ৩১৬টী কীট দেখা যায়; কিন্তু তার পর, যখন সভাগৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং বায়ুর উষ্ণতার মাত্রাও যখন ৭২ ডিগ্রি পর্য্যন্ত চড়িয়া উঠিল, তখন সেই দুই গ্যালন পরিমিত বায়ুতে কীটের সংখ্যা ৪৩২টী পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু পর দিন প্রভাতে, যখন ঐ গৃহ নিস্তব্ধ ও লোকশূন্য ছিল তখন তাহাতে ১০০টী মাত্র দেখা গিয়াছিল। কিন্তু তখনও বোধহয় সে গৃহের বায়ু সম্পূর্ণরূপে স্থিরতা লাভ করে নাই, কারণ অন্য এক সময়ে সেইখানেই ৪০ হইতে ৬০টীর উপর আর দেখা যায় নাই। আবার ক্রমওয়েল রোডের ধারে Natural History Museum নামক বাটীর প্রবেশদ্বারে সামান্যতঃ ৫০ হইতে ৭০টী পর্য্যন্ত দেখা যায়, কিন্তু Whit Monday দিনে যখন অসংখ্য দর্শকে ঐ প্রদর্শনী পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তখন তাহাতেই ১৮০ পর্য্যন্ত কীটের সংখ্যা দেখা গিয়া থাকে তা ছাড়া, আবার বৈজ্ঞানিক ডরর ক্রাঙ্ক ল্যাণ্ড সাহেব South Kensington Museum নামক প্রদর্শনীতেও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। সচরাচর যখন মূল্য দিয়া প্রবেশ করিতে হয় সে সময় ১৮টীর বেশি প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু শনিবারে যখন যে সে ইচ্ছা করিলেই সকলে বিনামূল্যে প্রবেশ করিতে পায়, তখন সেই সংখ্যার চতুর্গুণ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে।

ইহা ত গেল এক প্রকার পরীক্ষা, ইহা ছাড়া আর এক রকম পরীক্ষার দেখা গিয়াছে, এক মিনিটে এক স্কোয়ার ফুট স্থানে কতগুলি কীট পড়ে। নরউইচ হইতে লণ্ডনে যাইতে পথের মধ্যে রেলগাড়ীতে একবার ইহার পরীক্ষা লওয়া হয়। পরীক্ষা গ্রহণের সময় সে গাড়ীতে ৪জন আরোহী ছিল, একটী জানালা খোলা ও আর একটী বন্ধ ছিল; এবং ঐ খোলা জানালার ধারেই এই পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই অবস্থায় এক মিনিটে এক স্কোয়ার ফুট পরিমিত স্থানে ৩৯৫টী কীটের পতন দেখা যায়। কিন্তু গাড়ী যখন কেম্ব্রিজ সহরে গিয়া পৌঁছিল তখন আবার একবার ঐ রূপ পরীক্ষা গৃহীত হয়। সে সময়ে আরোহীতে গাড়ী পরিপূর্ণ ছিল, একটী জানালা একেবারে বন্ধ ছিল, আর অন্যটী মাথার দিকে চারি ইঞ্চি মাত্র খোলা ছিল, বন্ধ জানেলাটীর ধারেই বায়ু পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। কি ভয়ানক ব্যাপার! এক মিনিটে এক স্কোয়ার ফুট পরিমিত স্থানে ৩১২০টী কীট পড়িতে দেখা যায়। ইহা অপেক্ষা ভয়ানক হইতে আরও ভয়ানক আছে। ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড সাহেব একবার একটী খামারে যখন ধান কাড়া হইতেছিল সেই সময় তথাকার বায়ু পরীক্ষা করিয়া দেখেন। চারিদিকে ধুলায় পুরিয়া রহিয়াছে, তাহার উপর ধানের কণিকা সকল উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে, ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড সাহেব তাহারই মধ্যে একধারে দাঁড়াইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। সে পরীক্ষায় প্রতি মিনিটে প্রতি বর্গফুটে ৮০০০ কীট পতন লক্ষিত হইল। ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড সাহেব নিজেই বলিয়াছেন "It would probably be difficult to find a place in which the number of suspended

microbes was greater than this." বস্তুতঃ ইহা অপেক্ষা আর অধিক হওয়া নিতান্তই অসম্ভব।

বায়ুতে যে কীট সর্ব্বদাই ভাসিয়া বেড়াইতেছে তাহা এক রূপ বোঝা গেল। কিন্তু এই সকল কীট যে সবই একজাতীয় তাহা নহে। পরীক্ষা দ্বারা তাহাদিগের নানা জাতিত্বও প্রমাণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলির দ্বারা আমাদিগের স্বাস্থ্যের বিস্তর আশঙ্কা আছে। যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহাদিগের হইতে কোনও পীড়ার উৎপত্তি হয় না, কিন্তু পরোক্ষতঃ তাহাদের হইতে অনেক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। হাম বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক পীড়ার সময় রোগীর গাত্র হইতে বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া উড়িয়া আসিয়া অপরের গাত্রে বসিয়া ইহারা অনেক সময়ে তাহাকে সেই রোগগ্রস্ত করিয়া ফেলে। অনেক সময়ে আমরা বুঝিতে পারি না, রোগী হইতে সম্যক্ পৃথক ও বহু দূরে থাকিলেও কেন আমরা কখন কখন সেই রোগে আক্রান্ত হই। এই সকল কীটই যে তাহার প্রধান কারণ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ইহারাই অধিক সময়ে গৃহ হইতে গৃহান্তরে, পল্লী হইতে পল্লীতে এবং গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে সংক্রামক ব্যাধি সকলের বিস্তার করিয়া দেয়। এই জন্যই অধ্যাপক সাণ্ডার্সন (Professor Burdon Sanderson) বলিয়াছেন, 'একটা কুকুর খোপলে অন্যান্য সব কুকুর গুলার প্রতি যেমন সাবধান হওয়া উচিত, তেমনি একবার একস্থানে সংক্রামক ব্যাধি হইলে সে দেশের সকলেরই আপনার আপনার জন্য বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। তবে বলিবে, যে সকল কীটাণুদিগের অস্তিত্ব পর্য্যন্তই উপলব্ধি করা যায় না তাহাদিগের হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিবার উপায় কি? কথাটা সত্য বটে, কিন্তু তাহার জন্য এই সকল কীটদিগের প্রকৃতি-বিজ্ঞান অবগত হওয়া বিশেষ আবশ্যক, না হইলে মানুষের সম্পূর্ণ নীরোগতার সম্ভাবনা নাই।' তাঁহার কথার শেষভাগ এই :—

"It behoves every one to be as careful as possible to maintain the air as free as possible from these minute organisms, not because they are all dangerous, but because we do not know where the danger lurks. And hence the importance of acquiring a complete scientific knowledge of everything relating to their natural history."

এখন আবার জিজ্ঞাসা করি, আমাদের এ প্রবন্ধ পড়িয়া হাসিবার কিছু আছে কি? বিজ্ঞানের কারখানাটা তো দেখিলে, দেখিয়া শুনিয়া এখন একবার বল দেখি, আমরা পোকা না খাইয়া এক দণ্ড বাঁচিতে পারি কি না। রুধিরবর্ণধারী শাক্তই বল, আর অহিংসা-ব্রতাবলম্বী বৌদ্ধই বল, কীট ভক্ষণ না করিয়া কাহারও বাঁচিবার উপায় নাই। তুমি সহরের বাবু, দিবারাত্রি গায়ে সাবান ঘসিতেছ, কেশ বিন্যাস করিতেছ, তুষারধবল শয্যায় শয়ন করিয়া কাটাইতেছ, আর পরাণ সর্দ্দার না হয় পাড়াগাঁয়ের চাষা, দিনরাত্রি ধূলা ঘাঁটিতেছে, ঘাম আছড়াইতেছে, চেটাই শুইয়া রাত্রি কাটাইতেছে; কিন্তু সেও যেমন কীট না খাইয়া বাঁচিতেছে না তুমিও তেমনি পোকা না গিলিয়া বাঁচিতে পার না। তবে মাত্রার কম বেশী বায়ু মাত্র ঘর প্রধান কক্ষ,

সুতরাং কীটও মানুষের অবশ্য ভক্ষ্য। তা, প্রধান না হউক, অপরিহার্য্য বটে। বিজ্ঞান এ সকল তত্ত্ব বহু পরীক্ষার পর বিশেষ রূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।

বিজ্ঞানের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র; কিন্তু তাহা ছাড়িয়া মোটা কথায়ও ইহা এতক বুঝান যায়। সকলেই দেখিয়া থাকিবেন জানেলার ফাক বহিয়া সূর্য্যরশ্মি গৃহে প্রবেশ করিলে সেই রৌদ্র যেন ঝিক্ ঝিক্ করিয়া নড়িতে দেখা যায়, তাহা কি? বস্তুতঃ সূর্য্যরশ্মি নড়িয়া বেড়ায় না, সেই-খানকার বায়ুর উপর যে সকল কীট ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, তাহারাই রৌদ্র পাইয়া অমনি করিয়া ছুট্‌ছুটি করিতে থাকে। গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্ন রৌদ্রে গৃহের বাহির হইলেই দেখা যায়, চারিদিকে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, রোদ যেন রঙ্গভরে মাতিয়া নৃত্য করিতেছে. রৌদ্রের সেই কম্পনমূর্ত্তি অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকি-বেন। কিন্তু বাস্তবিকই কি রোদ কাঁপে না নাচে? বিজ্ঞান বলিয়া দিয়াছে, গ্রীষ্ম-কালেই এই সকল কীটের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই বর্দ্ধিতসংখ্য কীট রৌদ্রের তাপে দগ্ধ হইয়া বায়ুর উপর চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়ায়—কিন্তু আমরা সে কীটদিগকে দেখিতে পাই না, তাহা-দের অস্তিত্বের কথাই অবগত নহি, সুতরাং আমরা মনে করি, রৌদ্রই ভীমরঙ্গে নৃত্য করিতেছে।

কিন্তু এ সব যুক্তির কথা। ইহাতে মতামত চলিতে পারে। কিন্তু পরীক্ষার উপর তোমার আমার মত খাটাইবার তো কোন উপায় নাই। ১+১=২, এ কথা যদি অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে বিজ্ঞানের বহুপরীক্ষিত যে সত্য তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। পাষ্টুরের (Pasteur) সময় প্রসব যে মত-বিরোধ উত্থাপিত হইয়াছিল, এমন আর তাহা নাই কেন? সবাই প্রমাণের বশীভূত। প্রমাণ সেই সকল বিরুদ্ধবাদীদিগের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ এখন ঐ সকল কীটাণুদিগের অস্তিত্ব নির্ণয় করিয়াই কেবল ক্ষান্ত নহেন, তাঁহারা আবার ইহাদিগের প্রকৃতিতত্ত্ব স্থির করিতে বদ্ধপর হইয়াছেন। আর, আমরা আজও এ সকল কথা মুহূর্ত্ত মাত্র আলোচনা না করিয়াই হাসিয়া উড়াইয়া দিবার অবসর খুঁজিতেছি! হায়, কবে আমরা এ সব বুঝিতে চেষ্টা করিব? কবে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের প্রকৃত চর্চ্চা আরম্ভ হইবে?

পৌত্তলিকের পত্র।

তুমি পাগল, তাই তুমি মনে করিয়াছ যে আমাকে 'পৌত্তলিক' বলিয়া বকিয়াছ বলিয়া আমি বিরক্ত হইব। চিরদিন তুমি আমাকে এমনি করিয়া বকিও, আমি সুখী হইব। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ আমি পৌত্তলিক কেন, ঈশ্বরকে "সীমাবদ্ধ" করিয়া পূজা করি কেন? "পৌত্তলিক" যদি এ দেশে কেহ কখন থাকিত, তবে সে

কথাটী আমাদের ভাষায় থাকিত। এই শব্দটী কেবল হিন্দু ধর্ম্মের গভীর মর্ম্মানভিজ্ঞ খৃষ্টান পাদরি ও ব্রাহ্ম-বিসপদিগের সৃষ্টি। আমরা পুতুলকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করি না, কেবল ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির মধ্যে এক একটী শক্তির রূপ কল্পনা করিয়া তাঁহারই পূজা করিয়া থাকি। তুমি বলিবে এরূপ রূপ কল্পনার প্রয়োজন কি? কথাটী পত্রের দ্বারা বুঝান শক্ত।

আর, বুঝাইলেও কি তুমি বুঝিবে? একটী গল্প বলিব। এক সময়ে এক বৃদ্ধা একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া ঘরামিদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। বৃদ্ধা কিঞ্চিৎ দই সংগ্রহ করিয়াছে। আর আর সকলে তাহা খাইল, কিন্তু একটী লোক খাইল না। সে গেঁয়েল। বৃদ্ধা জিদ করিলে, সে বলিল "মলো বেটী আমি ১৪ বৎসর গাঁজা খাইয়া যাহা সঞ্চয় করিয়াছি তোর একটুক টকো দই খাইয়া তাহা উড়াইয়া দিব!" টক খাইলে নেশা নষ্ট হয়, আর তাহার বিশ্বাস যে দই মাত্রই টক্। তুমি যখন আজীবন ব্রাহ্ম-সমাজে মহা মহা পণ্ডিতের দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া আমাদিগকে মূর্খ পৌত্তলিক স্থির করিয়াছ, তখন আমার ন্যায় মূর্খের "টকো-দইয়েতে" যদি সে ভ্রম ঘুচেও তাহা তুমি খাইবে কি? কিন্তু ওই যা। এরূপ একটা অপকৃষ্ট উপমা দিয়া আমি বোধ হয় ইংরেজি "এটিকেটের" কোনও অজ্ঞাত নিয়ম ভঙ্গ করিলাম। এবার আমার ক্ষমা চাহিবার পালা। কিন্তু বলিতে কি, সত্য সত্যই হিন্দু-ধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্রাহ্মদিগের ঘোরতর ভ্রমাবলিকে আমি নেশা মনে করি। আমার মত মহা-মূর্খের কথায় এরূপ একটী নেশা ছুটিবে না বলিয়া কেশব বাবুর Life হইতে Analytical Worship প্রবন্ধটী তোমাকে পড়িতে অনুরোধ করিয়াছিলাম।

তবে মোটামুটি একটী কথা বলিব। তুমি, নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিতে পাও, God vision তোমার হইয়াছে, জ্ঞানচক্ষে জানিতে পার, এবং সর্ব্ব-ব্যাপিকে, কেবল হিন্দুদিগের দেব দেবীর মূর্ত্তিতে ছাড়া সর্ব্বত্রে ব্যাপ্ত বলিয়া বিশ্বাস কর, আমার তাহাতে আপত্তি নাই কিন্তু আমার মত লক্ষ লক্ষ মহা-মূর্খ তাহা ত পারে না। তবে তাহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব কি রূপে স্ফূর্ত্তি হইবে? তুমি বলিবে, খৃষ্টান মুসলমানদের হৃদয়ে কিরূপে হইতেছে? তুমি নীচ শ্রেণীর খৃষ্টান ও মুসলমানদের সঙ্গে নীচ শ্রেণীর হিন্দুদিগের তুলনা করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে। আর খৃষ্টান ও মুসলমানদের অধিক সংখ্যক লোকেই খৃষ্ট কি মহম্মদকে কি ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে না? খৃষ্ট ঈশ্বরের কুমারীপ্রসূত পুত্র, মহম্মদ দূত,—অথচ আমরাই পৌত্তলিক! তার পর আমি যদি এরূপে ঈশ্বরের উপাসনা করি—"তুমি সর্ব্বব্যাপী, দশ হস্তে দশদিক ব্যাপিয়া রহিয়াছ। তুমি সর্ব্বজ্ঞ, ত্রিনেত্রে ত্রিকাল দেখিতেছ। তোমার অনন্ত নীতি তোমার অস্ত্র, তাহার দ্বারা তুমি শিষ্টের পালন, এবং দুষ্টের দমন করিতেছ। তুমি পশুবল চরণতলে দলিত করিয়া ধর্ম্ম বলের মাহাত্ম্য রক্ষা করিতেছ।" তুমি কি ইহা পাপ মনে করিবে? তাহা যদি না কর, তবে মনের সম্মুখে যে রূপ কল্পনা করিয়া তাঁহার পূজা করিলাম, চক্ষের সম্মুখে সে রূপ কল্পনা রাখিয়া পূজা করিলে আমি পাপী হইব কেন? স্বয়ং

কেশব বাবু বলিয়াছেন যে আদ্য আর অন্য ব্রাহ্মেরা যে metaphysical ideaকে God বলিয়া পূজা করেন, তাহা অসম্ভব। তাহা Popular religion হইতে পারে না। অতএব, তিনি কালী দুর্গা রূপ মানসিক কল্পনার দ্বারা ঈশ্বরের একমাত্র সম্ভব পূজা বলিয়াছেন! কিন্তু ওই যে নিরক্ষর কৃষক,—মনুষ্যসমাজে তাহার সংখ্যাই অধিক—সে ত সেরূপ মানসিক কল্পনাও করিতে পারে না। অতএব তাহাদের হিতের জন্যে বাহ্যিক রূপ কল্পনা নিতান্ত প্রয়োজন। একটী মহামূর্খ হিন্দুকেও জিজ্ঞাসা কর, সে বলিবে—

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"

আমাদের ধর্ম্মশিক্ষকেরা কেবল আপনার মত জ্ঞানীদের জন্যে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন না। তাঁহাদের ধর্ম্মের ভিত্তি "সর্ব্বভূত-হিত।" তাঁহারা জানিতেন যে কোন বিদ্যাই শিক্ষা করিতে যাও, তাহার অক্ষর হইতে শিখিতে হইবে। ঈশ্বরতত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ তত্ত্ব। কেবল চক্ষু বুজিয়া অযোগ্য শিশু যদি 'হে নিরাকার নির্ব্বিকার" বলিয়া চেঁচায়, তাহার ঈশ্বর-জ্ঞান কি ধর্ম্ম-জ্ঞান কিছুই হয় না। এই জ্ঞান শিক্ষার জন্যেও অক্ষর চাই, ইহাও ক্রমে ক্রমে শিক্ষা করিতে হইবে। ঈশ্বরের শক্তির এক একটী প্রতিমা—প্রতিমা কথাটা একবার লক্ষ্য করিও—ঈশ্বর জ্ঞান লাভের ভাষার অক্ষর। ইহা বালকেরা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে। এই অক্ষর শিক্ষা হইলে ঈশ্বরের শক্তির এক একটী প্রতিমার দ্বারা মূর্খের এবং বালকের মনে ভক্তি সঞ্চারিত হইলে সে পাপ হইতে নিবৃত্ত এবং পুণ্যে প্রবৃত্ত হইতে শিক্ষা করিলে ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হইল। তাহার মোটামুটি শিক্ষা হইল। তাহার পর তাহার শক্তি থাকে, প্রবৃত্তি হয়, সে অগ্রসর হউক, খৃষ্টান ও ব্রাহ্মদের একেশ্বরবাদ দেখিতে পাইবে। আরো অগ্রসর হইতে পারে, দেখিতে পাইবে মনুষ্যবুদ্ধির দ্বারা যতদূর নিরাকার জ্ঞানাতীত ঈশ্বর জ্ঞান লাভ সম্ভব তাহা "গীতা" এবং উপনিষদ্ সমূহে নিহিত রহিয়াছে। এই অক্ষর হইতে উপনিষদ পর্য্যন্ত লইয়া হিন্দু-ধর্ম্ম। বল, এমন পূর্ণ এবং সর্ব্ব-লোক-সম্ভব ধর্ম্মশাস্ত্র আর কোথায় আছে?

পত্রখানি বড় দীর্ঘ হইল। আর একটী মাত্র কথা বলিয়া শেষ করিব। ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করিয়া পূজা করা পাপ কেন, তাহা তুমি বলিতে পার কি? আমি ব্যাসদেবের মহাভারত-খানির পূজা করিয়া তাঁহার পূজা করিলে তাঁহার অপমান করা হইল কি? আমি তোমার পত্র গুলি অতি আদরে রাখিয়া দিই। এমন কি, তুমি শুনিয়া হাসিবে, সে কবিতাটী তুমি নকল করিয়া পাঠাইয়াছ বলিয়া তোমার লেখাটী পাঠাইতে আমার ইচ্ছা হইল না। তাহার আর একটী নকল পাঠাইলাম। ইহাতে তুমি অপমানিত হইতেছ কি? তুমি যে সকল রেখাঙ্কিত কাগজে তোমার স্বর্গীয় পিতার জন্যে শোক করিয়া পত্র লিখিতেছ, তাহাতে কি তাঁহার শোকের অবমাননা হইতেছে? শোক ত নিরাকার। তবে আমি নিরাকার ঈশ্বর-রচিত উপকরণের দ্বারা একটী সুন্দর প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার প্রতি ভক্তি দেখাইতেছি বলিয়া পাপী হইতেছি কেন? আমার বড় ইচ্ছা যে তুমি সীতা

সাবিত্রীর মত হিন্দু ধর্ম্ম-পরায়ণা একটী হিন্দু রমণী হইয়া এখনকার শিক্ষিতা রমণি-দিগের মতি গতি সেই আদীয় পথে লইয়া যাও। তুমি যদি "পৌত্তলিকের' লেখা মাত্র "টকো দই" বলিয়া ত্যাগ না করিয়া আমাদের প্রধান প্রধান মাসিক পত্রিকা গুলি মনোনিবেশ পূর্ব্বক পড়, তবে এই পৌত্তলিকতার গভীর তত্ত্ব অনেক বুঝিতে পারিবে।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

চিন্তা। *

To speak much of a thing is to distroy its beauty.

কাব্য-সরিতে মধ্যে মধ্যে একপ স্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে যে সম্ভবপ-অক্ষম ব্যক্তিরাও সেই স্রোতে গা ভাসান দিয়া নদী বক্ষে বহুদূর সঞ্চারিত হইয়া থাকেন। অধঃপতিত ও উদ্ভাসিত হইয়া, তীর-স্থিত প্রকৃতির মনোমুগ্ধকরী মূর্ত্তি, উপরিস্থিত অনন্ত-প্রসারিত আকাশের অসীম অনন্ত সুষমার সৌন্দর্য্য, চতুঃপার্শ্বস্থ কলরাবী জল-রাশির অনির্ব্বচনীয় লহরী-লীলা তাঁহারা মুগ্ধ ও অদৃষ্টস্থ চক্ষে দেখিতে দেখিতে ভাসিয়া যান। যামিনীর সীমন্ত-রত্ন উজ্জ্বল চন্দ্রমা, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও চক্ষে সুন্দর, কাহারও চক্ষে বা কলঙ্কী; উষা-সময়ে প্রকৃতির অতুল সৌন্দর্য্য কাহারও চক্ষে নিখিল সুষমাময়, কাহারও বা প্রাণ-বিনাশকর; সান্ধ্য গগনের বিচিত্রিত মেঘ মালা কাহারও চক্ষে প্রীতিকর, কাহারও বা বিষাদময়; লতাপল্লব-পরিবেষ্টিত কুসুম-সুশোভিত উদ্যান কাহারও চক্ষে মনোমুগ্ধকর, কাহারও বা হা হুতাশ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিব্যাপ্তক। এই রূপ ভিন্ন চক্ষে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিফলিত হইতে থাকে। দ্রুতগামী স্রোতে তাঁহারা এইরূপ কত লীলায় নিমগ্ন হইয়া, কত স্বপনে অভিভূত হইয়া কল্পনা রাজ্যে বিচরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এ স্রোত চিরস্থায়ী নহে—এ স্রোত চির-একাভিমুখী নহে। এ জোয়ারের স্রোত। চারি ঘণ্টা গতি, চারি ঘণ্টা স্ফীতি, চারি ঘণ্টা স্থিতি। তার পর—এ স্রোত আর নাই। পরিবর্ত্তনশীল কাল এ স্রোত ফিরাইয়া দেয়। কাব্য-সরিতে ভাটার স্রোত আরম্ভ হয়। কিছুকাল পূর্ব্বে যে স্রোত প্রধাবিত হইয়াছিল—সে জোয়ারের স্রোত আর নাই—সে গতি আর নাই, সে স্ফীতি আর নাই, সে স্থিতিও আর নাই, সকলই বিপরীত। যে গতিতে জোয়ার ছুটিয়াছিল, তাহার দ্বিগুণাধিক গতিতে ভাটার স্রোত, পশ্চাতে ছুটিয়াছে। পূর্ব্বে যাঁহাদিগকে সুবিস্তৃত জল রাশির মধ্যে স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় নাই, এক্ষণে তাহাদিগকে ভাটার জল নিঃসরণে স্বল্পকায়া তটিনী বক্ষে সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। তাঁহারা কূটা কাটা জঞ্জাল মাত্র, তরণী নহে। ঐ সকল ভাস-

---

* শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

মান সামগ্রীর মধ্যে কোনটা হইতে পূতি-গন্ধ ছুটিয়াছে, কোনটা হইতে কিছু যেন সন্ধান বহিতেছে, কোনটায় সুগন্ধ দুর্গন্ধ কিছুই নাই। কিন্তু কেহই স্থির নহে। কেহই অগ্রগামী নহে। সকলেই পশ্চাতে ছুটিয়াছে। ভ্রান্তি-সাগর গর্ভে মিলাইবার ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে। কি পরিতাপ! সকলেরই কি এই দশা? না, ঐ যে স্রোত ফিরিয়াছে। তবুও ত কএকখানি সুন্দর তরণী স্রোতের বিপরীতে চলিয়াছে! কর্ণ-ধারেরা পাল তুলিয়া দিয়াছেন! কল্পনার বায়ু তাহাতে লাগিয়াছে। ভাবের হাল তাঁড়ের কার্য্য করিতেছে। তরণী মৃদু মন্দ গতিতে চলিয়াছে। বাধা মানিতেছে না দেখিয়া, স্রোত আপনি বিনত মস্তকে তরণীর দুই পার্শ্ব দিয়া কুটী কাটী জঞ্জাল লইয়া চলিয়া যাইতেছে কুসুমের মালায় তরণী মণ্ডিত, স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে তরণী ভূষিত। কি মধুর গান তরণীর মধ্য হইতে বাহির হইতেছে। গানের স্বর্গীয় ভাষা, স্বর্গীয় ভাব ও স্বর্গীয় সুরে তটিনীর দুই পার্শ্বের লোক পাগল হইয়া হাসিতেছে, খাঁসিতেছে ও কাঁদিতেছে। কোন কোন ক্ষুদ্র তরিও সেই সুরে বিমুগ্ধ হইয়া, জগৎকে হাসাইবার তরে, কাঁদাইবার তরে বৃথা অনুকরণ করিতেছে। কিন্তু তরণী-শ্রেণী আপন মনে মিলনের, বিরহের, ক্রন্দনের ও বৈরাগ্যের গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। কি মাধুরি!

ঈশান বাবুর "চিন্তা" সেই একখানি তরণী। যে স্রোতে অনেকে ফিরিল, অনেকে হাসিল, এ চিন্তা তরি সে স্রোত মানিল না, কল্পনার বায়ুতে প্রচালিত হইয়া, দুই পার্শ্বের লোককে নাচাইয়া কাঁদাইয়া স্বর্গীয় সামগ্রী স্বর্গাভিমুখী হইয়াছে।

"চিন্তায়" কবি চিন্তাশক্তি ও ভাবুকতা-শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ইহাতে এই উভয়বিধ শক্তির বিস্তৃতি যেরূপ অসীম, গভীরতাও তাদৃশ অমেয় ও অতল। ইহার অধিকাংশ কবিতায় আত্ম-বিস্মৃতি ও জগৎ-বিভ্রান্তি মর্ম্মে মর্ম্মে নিহিত। বিশেষতঃ কবি "চিন্তায়" যেখানে প্রকৃতিকে সম্ভাষণ করিয়াছেন সেই-খানেই আত্ম হারাইয়া ফেলিয়াছেন। কি বৃন্ত-চ্যুত সামান্য একটী ফুল, কি তরুলতা-মণ্ডিত সুবিস্তীর্ণ তপোবন, কি ক্ষীণকায়া নির্ঝরিণী, কি সুবিশাল মহীধর যাহা কবির হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে তাহাতেই কবি আত্ম হারাইয়া কাঁদিয়াছেন, ও জগৎকে কাঁদাইয়াছেন।

"কি মৃদু! কি নিরমল! কত প্রাণে ঢল ঢল
কি বিপুল আপনা-প্রদান!
কি আশা কি ভালবাসা কোথা আদি কো
কি অকূল, কি অতল প্রাণ!

এত রূপে এত প্রাণ, এত প্রেমে এত দান,
এত ভরা প্রেমের বিকাশ।

এত খোলা এত ভোলা, এত পবিত্রতা ঢালা
উল্লাসের এতই উচ্ছ্বাস।

নবীনে পুরস্ত হেন, প্রশান্ত বিজলী যেন
দেখে নাই কখন এ আঁখি!

সাধ যায় শশি, তোরে—এখনি এ বুক চিরে,
প্রাণেতে জড়ায়ে ধ'রে রাখি।"

—তপোবনে চন্দ্রোদয় দেখিয়া কবি এই কবিতাগুলি লিখিয়াছেন। কবি-হৃদয়ের এরূপ উচ্ছ্বাস ও এতাদৃশ বিহ্বলতা কাব্য-সংসারে অতিশয় বিরল। এ উচ্ছ্বাস উন্ম-

স্তব্ধতা হইতে উঠিয়াছে ও উন্মত্ততা ফুটাইতেছে। ইহাইত কবিত্ব।

এ "চিন্তায়" শ্রান্তি নাই। সঞ্জীবনী শক্তি কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে সঞ্চারিত রহিয়াছে। ইহা জ্ঞান ও পূর্ণ-শান্তির ক্ষেত্র। স্নেহ, আশা, ভালবাসা, প্রেম, ভক্তি, বৈরাগ্য ইহাকে আশে পাশে জড়াইয়া রহিয়াছে। অথবা, "চিন্তার" নিজের কথায়ই "চিন্তাকে" বলিতে পারা যায়:—

"আশাময়—তৃষ্ণাময়—সুখময়—বিষময়—
দুঃখময়—হর্ষময়—স্বপ্নময়—মোহময়—
হৃদয়ের সৃষ্টি—দৃষ্টি নয়নের—
কল্পনার মূলমন্ত্র—ভাবনার ধৃতি—"

"চিন্তা" প্রেমিকের প্রাণ কাঁদাইয়া দেয়। কিন্তু কাঁদাইয়াও তাহাকে শান্তি প্রদান করে। যাহা দেখিয়া কাঁদে, যাহা শুনিয়া কাঁদে, কবি তাহার মধ্যেও এমন একটু সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রজাল পাতিয়া রাখিয়াছেন ও তাহার আশে পাশে এমন সুন্দর আশা মরীচিকা আঁকিয়া রাখিয়াছেন যে তাহা মানবের মনকে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলে। বিরহে প্রাণ কাঁদিতেছে, জ্যোৎস্না দেখিয়া, —মেঘ গর্জ্জন শুনিয়া বিরহীর যাতনা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিতেছে, তথাপি কবির অসাধারণ বর্ণনা-বৈচিত্র্যে তাহারও যেন সে দগ্ধ প্রাণে অমৃত ছড়াইতেছে:—

"কল্পনে!
বুকের পাষাণ সম, এ জ্যোৎস্নায় একবার,
দেও সরাইয়া—
প্রকৃতির প্রীতি-মাখা, মধুর হৃদয়ে আমি
যাই মিশাইয়া।
* * *
জীবন্ত স্বপন যেন, অনন্ত গগন বক্ষে
পড়েছে ছড়ায়ে!
স্বার্থের জগত ভীত, সকলি মোহেতে যেন
নয়ন মেলায়ে!
আশার মধুর স্মৃতি, যেন আজ বিশ্বখানি
আবেশে অচল।
বিধির প্রথম সৃষ্টি, মধুর আলোকে যেন
ভুবন উজ্জ্বল।
নে! বারেক আজ, বুকের পাষাণ খানি
দেও সরাইয়া,
শূন্য পথ ভাসাইয়া অনন্তেরে মিশাইয়া
এই জ্যোৎস্নার সনে যাই মিলাইয়া।"

আবার, জলধর গর্জ্জনে—

"মথিয়া অনন্ত শূন্য—মর্ম্মভেদী স্বরে, কারে
ডাক জলধর?
সাধনার ধন যাহা দিলে কি কাঁদিলে তাহা
যুগ যুগান্তর?
প্রাণের আঁধারে জলে প্রাণের আঁধারে নেবে
প্রাণে যাঁর স্থান।
প্রাণের বাহিরে তাঁরে কাঁদিয়া ডাকিলে তবু
মিলে না সন্ধান॥
* * * *
আশা জীবনের ভ্রান্তি, কল্পনার প্রসবিনী
যন্ত্রণার মূল।
বিকৃত প্রবৃত্তি আশা জীবের পার্থিব মায়া
কলুষ বিপুল।
সেই আশা হৃদে ধরি হৃদয়ের ধন তুমি
ডাক জলধর।
আশা না ভুলিলে কভু মিলে কি আশার ধন
অবোধ অন্তর?"

"চিন্তা" গীতিকাব্য। কিন্তু কবির কেবল কতকগুলি গান মানবের সহিত ও মানবীয় বিষয় লইয়া। তাঁহার প্রাণ বিমুগ্ধকর গান প্রকৃতির সহিত ও প্রকৃতির উদ্দেশে। প্রকৃতির প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া গাহিয়াছেন বলিয়া, কবির গান এত সুমধুর,

উন্মাদকর ও হৃদয়গ্রাহী। শশধর দেখিয়া :—

"পার নাকি শশধর, ঢালিতে কিরণ
এই দগ্ধ ধরাণে ?
অনন্ত আকাশতল—অনন্ত এ ভূমণ্ডল
কর নিত্য আলোকিত কিরণ প্রদানে।
পার নাকি এক বিন্দু ঢালিতে এ প্রাণে ?

* * * *

পাতিয়া দিয়াছি বক্ষ কিরণে তোমার
চিত্তে ঢাল একবার
ছড়ায়ে জ্যোৎস্না রাশি কর আলোকিত আসি
আঁধার আঁধারময় জীবন আমার.
ভাঙা ঘরে চাঁদ আলো দেখি একবার।"

আবার তপোবন দেখিয়া :—

"তপোবন, বুকে তব ফুটিয়া প'ড়েছে শান্তি
আশা যেন হয়েছে নির্ব্বাণ।
ছায়া যেন নাহি আর, জীবনের পিপাসার
তৃপ্তিতে পড়িছে গলি প্রাণ।
গাহিছে অলকনন্দা, আনন্দ ঝঙ্কার তুলি
ঝঙ্কারে উথলি পড়ে হাসি
এ মহা অচল পুরি, প্রেমের উচ্ছ্বাসে যেন
গলে' গলে' পড়িছে বিকাশি।"

আর একস্থলে শূন্য দেখিয়া :—

"নীল আকাশে, ভাসিয়া ভাসিয়া
যাইলে কোথায় যাই।
আদি কিবা অন্ত, মিলিলে উহার
দেখি সে কেমন ঠাঁই।"

কবি সৌন্দর্য্যে পাগল। বুঝি সৌন্দর্য্যও কবির জন্য পাগল। সৌন্দর্য্য ভাষা ও ভাবের সহিত মিলিয়া কবির "চিন্তাকে" আগাগোড়া মুড়িয়া রাখিয়াছে। "চিন্তার" কবি সৌন্দর্য্যের কবি। সেই সৌন্দর্য্য দর্শনে কবির কত ভাবুকতা, কত মুগ্ধতা, তাহার বর্ণনায়ই বা তাঁহার কত নিপুণতা তাহা পাঠ করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়।

হিমাচল শৃঙ্গে তপোবনে বসিয়া হেমন্ত পূর্ণিমার প্রথম চন্দ্রোদয়দর্শনে কবি লিখিতেছেন—

কি আলো ফুটিছে ওই শিখরের অন্তরালে
খুলিছে কি স্বর্গের দুয়ার।
দিক্ হ'তে দিগন্তরে গলিয়া পড়িছে যেন
অন্তরের হাসিটি কাহার।
জগতের ফুলরাশি মিশাইয়া হাসি যেন
ধীরে ধীরে খুলিতেছে প্রাণ।
কল্পনার বুকে যেন উথলি উঠিছে ধীরে
প্রণয়ের প্রথম তুফান।

কবিতা উদ্ধৃত করিয়া ঈশান বাবুর কবিত্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক বিবেচনা করি না। ঈশান বাবু বাঙ্গালা-সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত। উপসংহারে কেবল মাত্র বিষয়-বৈরাগ্য-পীড়িত প্রাণের নিরাশা-বিমিশ্রিত বৈরাগ্যের একটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া আমরা প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

"বিধাতঃ ! আমায় কেন, এ নিষ্ঠুর সংসারের
মানব গঠিলে।
মানব করিলে যদি, এত প্রাণ কেন বিধি,
এ হৃদে ঢালিলে।
দিবে দেখার কায়, কে আছে হে এ ধরায়,
বুঝে কোন জন ?
শুধু যে কঠিন করি, নিখিল সংসার খানি
করিলে সৃজন !

* * *

তা হতে যে নিদারুণ গঠিলে সংসার বিধি
তাহ'তে পাষাণ—
নর নারী হৃদিতলে, স্থাপিলে মরণোপম
কৃতঘ্ন পরাণ !

এ সকল কবিতা বাস্তবিকই হৃদয়ের আদরের সামগ্রী। ঈশান বাবুর "চিন্তা" ভবিষ্যৎ বাঙ্গালা সাহিত্যে নিশ্চয়ই এক অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র।

হেমচন্দ্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সেই অপরাহ্নে হেমচন্দ্র যখন পথে দাঁড়াইয়া একবার সেই অজ্ঞাত-হস্ত-লিখিত পত্রখানি পড়িতেছিলেন, আর তাহার রহস্য উদ্ভিন্ন করিতে না পারিয়া কেবল দুঃখে ও ক্ষোভে অভিভূত হইতেছিলেন ঠিক সেই সময়ে সেই গ্রাম হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে মায়াপুরের হাটের উপর বড়ই একটা গোলমাল হইতেছিল। প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, হাট তখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অতি ক্ষুদ্র হাট—চাটুরিয়া বড় সামান্য আইসে,—তাহারা মোট বাঁধিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছে—এমন সময়ে একখানি অশ্বরথ ধীরে ধীরে হেলিতে দুলিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন, যে যাহার মোট ফেলিয়া তাহা দেখিতে ছুটিল, খরিদ্দারেরা যে যাহা কিনিয়াছিল সে তাহা লইয়াই দৌড়িল। হাটের এক ধারে একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ, তাহার তলায় আসিয়া গাড়ী থামিল। গাড়ীর ভিতর কি আছে দেখিবার জন্য দুই একজন উঁকিঝুঁকি মারিল, কিছুই লক্ষিত হইল না। তখন অনেকেই এক বাক্যে বলিল, "খিলেন গাড়ী।" কিন্তু মিষ্টান্ন পাইলে যেমন মাছির পাল কিছুতেই তাহাকে ছাড়িতে চাহে না, যেখানে স্থানান্তরিত কর, সেইখানেই তাহার সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া যায়, তেমনি গাড়ী দেখিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে যে সব ছেলের পাল, কেহ বা পিছনে চড়িয়া কেহ বা ঝুলিয়া, কেহবা কেবল দৌড়াইয়া, তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা বলিল, না, ইহা খিলেন গাড়ী নয়, ইহার ভিতর একজন মস্ত লোক ছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই জেলার হাকিম। গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছুই বলিল না, কেবল একবার গম্ভীরে মুখ মুচকিয়া হাসিল। তাহার আরোহীকে যে ইহারা জেলার হাকিম ঠাওরিয়াছে, ইহাতে সে আপনাকেও একটা মস্ত লোক দেখাইতে চেষ্টা করিল। গাড়োয়ান ওজনে চলিল। ইতিপূর্ব্বে একটা ছেলে গাড়ীর ভিতর একবার চড়িবার জন্য তার বাপকে বড়ই জ্বালাতন করিতেছিল, বাপও গাড়োয়ানকে বলিয়া কহিয়া ছেলের আব্দার পালন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন শুনিলেন স্বয়ং জেলার হাকিম ইহার আরোহী, তখন কাজেই আর সে ইচ্ছাটুকু ফুটিয়া বলিবার সাহস হইল না। ছেলেটা বড়ই কান্না আরম্ভ করিল। গাড়োয়ান তখন তেমনি ওজনেই গাড়ী হইতে ঘোড়া দুটি খুলিয়া দিয়া আপনি সেই অশ্বত্থের শিকড়ের উপর গিয়া বসিলেন। অনেকেরই ইচ্ছা, হাকিমকে দেখিয়া চক্ষু দুটা একবার পবিত্র করিয়া যায়, সেইজন্য কেহই না নড়িয়া তাঁহার প্রত্যাশা করিতে লাগিল। বৃদ্ধেরা এই অবকাশে গাড়োয়ান কি জাতি, তাহার বাড়ী কোথায়, তার কটী ছেলে, সে কেমন রোজগার করে—ইত্যাদি বিবিধ প্রশ্ন করিয়া তাহাকে অপ্যায়িত করিতে লাগিলেন, আর ছেলেগুলো কিছু বুঝুক না বুঝুক হা করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া

তাহাই শুনিতে লাগিল। তা, কান যে দিকেই থাক, তাদের মন কিন্তু ঘোড়াগুলা কি করিল পা ছুঁড়িতেছে, কি করিয়া লেজ নাড়িতেছে, কি করিয়া নাক ফুঁড়িতেছে, সেই দিকেই সন্নিবিষ্ট ছিল; কেবলমাত্র গাড়োয়ানের দুই একটা শুষ্ক রসিকতায় বুড়ারা যখন উচ্চহাস্য করিতেছিল তখনই এক একবার সবাই মিলিয়া হি হি করিয়া হাসিতেছিল। দেখিতে দেখিতে ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তখনও হাকিম ফিরিলেন না। ভগ্নমনে তখন একে একে কাজেই অনেকে গৃহে ফিরিতে লাগিল।

এই অবসরে গাড়ী, গাড়োয়ান ও আরোহী সম্বন্ধে আমরা প্রকৃত যাহা জানি তাহা বলিতেছি। এ তিনটীই আমাদের পরিচিতপূর্ব্ব, তিনটীরই সহিত অল্পক্ষণ হইল আমাদিগের সেই দোকানের সম্মুখে দেখা হইয়াছে ইহা সেই গাড়ি, ইনি সেই গাড়োয়ান, আর ইনি সেই আরোহী। তবে, এ তিনটীর মধ্যে দেবটীর সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার আছে বটে। যে রহস্য বুঝিতে না পারিয়া হেম অস্থির হইতেছিল, এতক্ষণে আমরা তাহা আগা গোড়া খুলিয়া দিতেছি। হেম যাহা ভোলাপাড়া করিতেছিল, প্রকৃত পক্ষে তাহাই বটে। আরোহী মহানায়কই ভ্রাতা সেই শশীবাবু। কিন্তু শশীবাবুর নামে এরূপ পত্র কেন? কেন, তাহা বুঝিতে হইলে একবার পূর্ব্ববর্ণিত দুই একটী ঘটনার কথা স্মরণ করা আবশ্যক। আনন্দ গ্রামের রাধাঠাকুরের তলায় একবার সকলে যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহা মনে করুন। শিশিরসিক্তা পদ্মিনীতুল্য সেই সদ্যস্নাতা আর্দ্রকেশা বালিকা ধীরে ধীরে রাধাঠাকুরের মাথায় জল ঢালিয়া দিতেছে, আর সেই বটবৃক্ষের মূল ধৌত করিয়া কলনাদিনী ভাগীরথী বহিয়া যাইতেছে. বটবৃক্ষের একটী শিকড়ে একখানি ক্ষুদ্র ভাউলে বাঁধা, সেই ভাউলের ভিতর একটী সুপরিচ্ছদধারী বাবু; তিনি একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া বালিকার সেই অলৌকিক রূপ লাবণ্য, সেই স্বর্গীয় মধুর ভাব অবলোকন করিতেছেন। তার পর বালিকা বাড়ী চলিয়া গেল, বাবু বড়ই অস্থির হইলেন, সহসা ব্রহ্মঠাকরুণ আসিয়া জুটিলেন। তখন তাঁহাদিগের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইল, এবং ব্রহ্মঠাকরুণ ও বালিকার মার নিকট যে দৌত্যকার্য্য করিল তাহা সমস্তই বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মঠাকরুণ ফিরিয়া গিয়া বাবুকে আশ্বাস দিলেন। আশ্বস্ত হইয়া বাবু ইতিকর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। সে বাবু আমাদের শশিভূষণ।

শশিভূষণ তখন কাছারি হইতে ছাড়া খাইয়া পলাইয়া অজ্ঞাত বাসে ছিলেন। কোথায় যান, কি করেন, তাহার কিছুই একটা নির্দ্দিষ্ট ছিল না। ইচ্ছা, একটা স্থান পাইলে সেই খানেই দিনকতক কটাইয়া যান। ব্রহ্মঠাকরুণের দ্বারা সে কাজটা হাসিল করিবার মতলবে পাকে প্রকারে কথাটা উত্থাপন করিলেন। ব্রহ্মঠাকরুণের একখানি ঘর, সে একা। কিন্তু সে বৃদ্ধা বিশেষ আপত্তি করিল না। আপত্তি না করিবার কারণ আরও ছিল, প্রস্তাবটা যৎকিঞ্চিৎ রজতমূল্যে সমর্থিত হইয়া উত্থাপিত হইয়াছিল। শশী এ সব কাজে বড় চতুর। কাছারির তহবিল ভাঙ্গা টাকাও কিছু তখন তাহার হাতে ছিল।

দুই দিন সেইখানে কাটিয়া গেল। দুই রাত্রি বৃদ্ধা দাওয়ায় শুইয়া কাটাইল। এ দুইদিন শশীবাবুর নিকট বৃদ্ধা অনেক লোভ পাইয়াছে, দুইদিন বসুমতীদের বাড়ীতে আনাগোনা করিতে তাহার পায় নলি ছিঁড়িয়া গিয়াছে। বৃদ্ধা যখনই গিয়া বিবাহের কথা পড়েন, তখনই বালিকা হাসে, মা কাঁদেন, বিশেষ মতামত কিছুই জানিতে পারে না। তা, না থাকুক, বুড়ী কিন্তু এ সব কাজে খুব মজবুত। সহসা আশা ছাড়িল না। বাবুকে আরও দিন কতক অপেক্ষা করিতে বলিল। কিন্তু, ঘটনার গতিকে আর অপেক্ষা করা শশীর পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। শশী কোনও সূত্রে শুনিল, বাড়ীতে তাহার বড়ই খোঁজ পড়িয়াছে, তাহার দিদি তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু ভয় তো দিদিকেই। সেই দিদি যখন সাপক্ষ তখন আর কালবিলম্ব করা অবিধেয়। তবে, এ মেয়েটা! এ এখন টোপ ফেলা থাকিল, পরে আসিয়া গাঁথিয়া তুলিলেই হইবে। ইত্যাকার নানা চিন্তা করিয়া শশী সেই দিনই ব্রহ্মঠাকুরুণের নিকট বিদায় লইয়া দেশে ফিরিলেন।

তার পর, বাড়ী আসিয়া যাহা যাহা ঘটিল, পাঠকবর্গ সকলই অবগত আছেন। শশীর দোষের কথা কেহই তুলে না, অথচ যত্ন আরও দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। হারা ধন ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া মাতা ও ভগ্নীর আদরের সীমা নাই। দিন কতক শশীবাবু 'আদরে গোবরে' খাইয়া খেলিয়া তার পর হঠাৎ একদিন অন্তর্ধান হইলেন। মাকে বলিলেন, 'একবার ঘরটা দোরটা দেখিয়া আসি।' শশী যে এতদিনের পর আপনার ঘরটা দোরটার কথা মনে করিয়াছে ইহাতে মার আনন্দের সীমা নাই। মা মেয়েকে বলিলেন। মহামায়া কিছু খরচ দিলেন। ভোর রাত্রে উঠিয়া শশী প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু বাবু গেলেন কোথা? ঘর দোর যেখানকার সেখানেই পড়িয়া রহিল, শশী বাবু একেবারে ব্রহ্মঠাকুরুণের দাওয়ার উপর গিয়া উপস্থিত। ব্রহ্মঠাকুরুণ তখন ছিলেন ফিরিয়া মাথার উপর চূড়াকারে চুল বাঁধিয়া ডালে কাঠি দিতেছিলেন। একেবারে শশী সেইখানে গিয়া বলিলেন "অতিথি!" ব্রহ্মঠাকুরুণ পশ্চাৎ ফিরিয়া একটু জিভ কাটিয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া বলিলেন, "আসুন।" তখন ঘরের ভিতর গিয়া উভয়ের অনেক পরামর্শ হইল। ব্রহ্মঠাকুরুণ প্রথমে গররাজি, তারপর নিমরাজি, ক্রমে পূর্ণরাজি হইলেন। তার পর শশী বলিলেন "ভাত বাড়ুন।" ব্রহ্মঠাকুরুণের তখন ডালের কথা মনে পড়িল। কিন্তু অই যা! কথার কথায় ডাল যে আঁকিয়া গিয়াছে! বৃদ্ধা কিছু অপ্রতিভ হইল। তা, সে আবার ডাল চড়াইতে যাইতেছিল, কিন্তু শশী বারম্বার নিষেধ করিল। অত দেরি কি আজ আর সয়? সেই আঁকা ডাল দিয়াই সে পেট ভরিয়া ভাত খাইল। মুখে দিতে নাকে ভাজিল কি না তাহাও সে বুঝিল না। তার পর সে তাড়াতাড়ি গিয়া একখানি চল্‌তি পাল্কী ভাড়া করিয়া, ভাগীরথীর যে দিকে লোক জন বড় একটা চলে না, এমন একটা ঐঁদো ঘাটে গিয়া বসিয়া রহিল।

দুপুর বেলা বসুমতী কৈবর্ত্তদের ছেলেকে দেখিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছিল, পথে ব্রহ্মঠাকুরুণ গিয়া বলিল, "আহা, তা, এই

যে মাতুনি, দেখা হয়েছে বেশ হ'য়েছে, আমি বুড়ো মানুষ—আমি একা কি পারি গা?" বসুমতী আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "কি, দিদি, কি গা?" ব্রহ্ম-ঠাকুরুণ আবার বলিল "কিন্তু সে কষ্ট দেখ্‌লে কি আর ফিরে আসা যায়? আহা কার বাছা না জানি এই বিদেশে বেতাকুতে কষ্ট পাইতেছে।" তখন বালিকার আগ্রহ আরও বর্দ্ধিত হইল। ব্রহ্মঠাকুরুণ ঠিক কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। সে বালিকার স্বভাব বিশেষ জানিত। যে ভক্ত সে ভক্তিতেই বাঁধা পড়ে যে সরল সে সরলতা-তেই মারা যায়। বসুমতী বলিল, "কে দিদি, কোথায় দিদি?" বৃদ্ধা তখন একটু উল্লাসে বলিল "তা, যাবে দিদি?" বালিকা বলিল "যাব।" বৃদ্ধা দেখিল, তাহার মুখ শুষ্ক। হাজার হউক, স্ত্রীলোক, বলিল "তুমি কি এখনও খাওনি, তা খেয়ে এস।" বালিকা বলিল "না দিদি, আসিয়া খাইব।" পাছে পরে আবার কোন ব্যাঘাত ঘটে সে আশঙ্কায় বৃদ্ধা অন্য কথা আর পাড়িল না। স্বার্থের কাছে আপনার হৃদয়কে বলি দিতে মানুষ খুব অভ্যস্ত। বলিল 'তবে চল।" পথে যাইতে যাইতে বালিকা দুই একবার জিজ্ঞাসা করিল "হাঁ দিদি, তাঁর কি বড় কষ্ট।" বৃদ্ধা বলিল "বড় কষ্ট বোন্ বড় কষ্ট!"

যেখানে শশী নৌকা করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, বসুমতীকে লইয়া বৃদ্ধা সেইখানে আসিল। দুইজনে নৌকায় উঠিল। বাস্তবিক্ নৌকার ভিতর চাদর মুড়ি দিয়া কে একজন পড়িয়া যন্ত্রণায় আঃ উঃ করিতেছে। সে শশী। শশী ভাণ করিয়া সেইভাবে পড়িয়াছিল। ব্রহ্মঠাকুরুণ গিয়া একবার গায়ে হাত বুলাইল। বালিকা বলিল "তা দিদি চল না কেন ইহাকে আমাদের বাড়ী লইয়া যাই।" ব্রহ্মঠাকুরাণী বলিলেন "তাহা ত আগেই ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু ইনি যে উঠিতে পারেন না।" বালিকা ভাবিল "তাই ত!" এই সময়ে "বাণ ডাকুছে" বলিয়া হঠাৎ মাঝিরা হল্লা করিয়া উঠিল। তাহাদিগকে পূর্ব্বেই এইরূপ শিখান ছিল। ফলতঃ বাণ ডাকিবার কোন লক্ষণই সে সময়ে ছিল না। মাঝিরা মুহূর্ত্ত মধ্যে পান্সী মাঝ গঙ্গায় লইয়া গিয়া ফেলিল। তখন চাদর ফেলিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে শশী উঠিয়া বসিল। ভয়ে বালিকার অন্তরাত্মা শুকাইল। বালিকা কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু সে কান্না কে শুনে? জোরে মাঝিরা বাহিয়া চলিল।

রাত্রি যখন দশটা, তখন নৌকা আসিয়া একটা ঘাটে লাগিল। সেই ঘাট হইতে উঠিয়া শশী এক খানি গাড়ী করিল। তখন মাঝিদিগকে বিদায় করিয়া ব্রহ্ম-ঠাকুরুণ ও বসুমতীকে গাড়িতে তুলিয়া শশী আপনি উঠিল। গাড়ীতে উঠিয়াও বালিকা অনেক কাঁদিল। কিন্তু গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দে সে কান্না মিলাইয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রহ্মঠাকুরুণের কোলের উপর মাথা রাখিয়া বালিকা ঘুমাইয়া পড়িল। পর দিন প্রাতে যখন বালিকার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন চাহিয়া দেখে যে সে এক খানি খড়ো ঘরে একেলা শুইয়া রহিয়াছে। বালিকার ভয় হইল। চক্ষু বুজিয়া, মুখ গুঁজিয়া মুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিল, সেই ভাবে পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিল।

যে গ্রামে এই ঘর, তাহার নাম মায়াপুর। সেই মায়াপুরের কথাই আজ

আমরা বলিতেছি। মারাপুর শ্যামসুন্দর বাবুর জমিদারী. এ ঘর খানি কাছারি ঘর। শশীর পূর্ব আদেশমত গোমস্তা শ্রীকেবলকৃষ্ণ ঘোষ, আজ দুই দিন কাছারি ছাড়িয়া আপনার বাড়ীতে সেরাস্তা পাতিয়াছে। গোমস্তার বাড়ী ঐ গ্রামেই। সে সম্প্রতি বাবুর বাড়ী গিয়া শশীর আদর দেখিয়া আসিয়াছিল, প্রথম দেখিয়াই সে শশীকে তাহার বাবু ঠাহরাইয়াছিল। সে তাহাকে বড়ই ভয় ও ভক্তি করিত। সুতরাং শশী আর কোনও স্থান না পাইয়া তাহারই ঘাড়ে চাপিয়াছিলেন। প্রথম দিন কাটিয়া গেল। বালিকা কেবল কাঁদিল, জল বিন্দু গালে দিল না। দ্বিতীয় দিন সেই একই প্রকার, তবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া গলাটা বড়ই শুখাইয়া গিয়াছিল, বালিকা এক ঘটী জল খাইল। আর কিছুই স্পর্শ করিল না। তৃতীয় দিন শশী আর থাকিতে পারে না। বিশেষ কথা, খরচের টানাটানি। তখন ব্রহ্মঠাকুরাণীর উপর সব ভার দিয়া দুই দিনের জন্য শশী গমন করিলেন।

এবার বাড়ী আসিয়া শশী দেখেন যে সব বিপরীত। দিদি তাঁহার বাড়ী যাইতে উদ্যত। কিন্তু তিনি বেশ জানিতেন দিদি যেখানেই যান দিদিই তাঁহার ভার লইবেন। সুতরাং কোনও অমত না করিয়া সকলকে লইয়া গৃহে গেলেন। বাড়ী গিয়া এটা ওটা করিতে কিছু বিলম্ব হইতে লাগিল। ব্রহ্মঠাকুরণকে দুই দিনের কথা বলিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু ছয় দিন হইয়া গেল। তবে এক কথা, তিনি ঠিকানা লিখিয়া দিয়া আসিয়াছিলেন। যেমন তেমন হইলে অবশ্যই পত্র আসিবে। সকাল বেলা বাহিরে গাড়ু হাতে করিয়া বসিয়া শশী এই রূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে শ্যামসুন্দর বাবুর এক জন পুরাতন ভৃত্য দুই খানি পত্র লইয়া শশী বাবুর হাতে আসিয়া প্রদান করিল। তাহার এক খানি মহামায়ার, আর এক খানি শশীবাবুর নিজের। আপনার পত্র খানি খুলিয়া শশিভূষণ পাঠ করিলেন। কি সর্ব্বনাশ! হেমচন্দ্র যে পত্র কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন ইহা সেই পত্র।

ব্যস্ত হইয়া শশী বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। মহামায়ার হাতে তাঁহার পত্র খানি দিলেন। মহামায়া পড়িতে জানিতেন। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—"শুভানুধ্যায়ী শ্রীরামলোচন দেবশর্ম্মণঃ আপনকার মঙ্গল শ্রীশ্রীঈশ্বর সমীপে নিয়ত প্রার্থনা করিতেছি, তাহাতে অত্রানন্দ হয় পরং। সম্প্রতি, আপনার সহিত আমার একটা বিশেষ গোপনীয় কথা আছে, পত্রে তাহা লিখিতে পারিলাম না। দুই চারি দিনের ভিতর ওখানে যাইয়া সাক্ষাতে সমস্ত বলিব। বিষয়টী বড় জরুরি। সিদ্ধ হইলে আপনি রাজরাণী হইবেন। ইতি।" রামলোচন শ্যামসুন্দরের প্রতিবেশী, সম্বন্ধে খুলাতাত; ফলতঃ হিতৈষী বটে। কিন্তু "বিষয়টী বড় জরুরি, সিদ্ধ হইলে আপনি রাজরাণী হইবেন।" ইহার ভাবার্থ কি? মহামায়া বড়ই উৎকণ্ঠিতা হইলেন। শশীকে সেই দিনই তাঁহার কাছে যাইতে বলিলেন। শশীও তাই চায়। এখন আবার কি ছুতা করিয়া বাটীর বাহির হইবে তাহাই ভাবিয়া এতক্ষণ আকুল হইতেছিল, দিদির কথা শুনিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইল। বলিল, "কেন গা, দিদি?" দিদি বলিলেন "তা

কি জানি, এই পত্র দেখ!" পত্র পড়িয়া শশী বলিল "তাই ত! বিষয়টা কি?" মহামায়া বলিলেন "তাই যদি জানবো তবে আর তোকে পাঠাচ্চি কেন?" শশী দেখিল, তার একাদশে বৃহস্পতি, বড়ই কপাল জোর। এও একটা মন্দ সুযোগ নয়। এই ভাবিয়া বলিল, "তা সে বিষয়টা এখন এমনি অকরি, আর আমিই যখন যাচ্চি, তা যদি খরচ টরচের অভাবে সিদ্ধি না হয়, তাই বলি, কিছু নিয়ে গেলে হ'তো না!" মহামায়া একটু ভাবিলেন। কথাটা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। তখনই বাক্স খুলিয়া ২০টাকার একখানি নোট বাহির করিয়া দিলেন। 'দুর্গা' বলিয়া আহারান্তেই শশী বাজারে গিয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া মায়াপুরে গমন করিল। এই যাত্রায়ই পথিমধ্যে হেমের সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল; এবং শশী আপনার স্থানে চলিয়া গেলে তাহারই গাড়ী হাটের ধারে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ভাড়া যাওয়া আসার ছিল।

স্ত্রী।

"গা'র সাধ খুলি হৃদি তার,
মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার।"

কি মধুর! কি শ্রুতি-বিনোদন শব্দ! এ নাম কোথায় ছিল, কে আনিল রে? দুঃখ-তাপ-পরিপূর্ণ এই পৃথিবীতলে যদি কোন স্বর্গীয় অপার্থিব পদার্থ থাকে ত তাহা ঐ সুমধুর, গালভরা, মোহন নাম—স্ত্রী। অভাগা মানবের একমাত্র জুড়াইবার স্থল,—শান্তির নিকেতন,—প্রীতির ভাণ্ডার—প্রেমের উৎস—স্নেহের পারাবার—ঐ স্ত্রী। এ জীবন মরুভূমে একমাত্র ওয়েসিস্ (oasis) ঐ স্ত্রী। হে স্ত্রি! এ জগতে যদি তুমি না থাকিতে তবে একদিন ইহা মহা-শ্মশানে পরিণত হইত। সৃষ্টি রসাতলে যাইত। এ রম্য কানন—এ মনোহর সহর—এ জাঁকজমকের অট্টালিকা—এ সাধের পুরী—ঘোর আঁধারে পরিপূরিত হইত। বিধাতার সৃষ্টি লয় পাইত। তুমি আছ বলিয়া এ সংসার—এ জগত চলিতেছে। তোমার কটাক্ষে—তোমার ভ্রূভঙ্গিতে এ পৃথিবী ঘুরিতেছে—ফিরিতেছে। যাহার ঘরে তুমি নাই, সে অভাগা—সে নরাধম—নরাকারে সে একটা মাটীর পুতুল মাত্র। সে শ্রীমান্ হইয়াও বিশ্রী। সে সুপুরুষ হইয়াও কদাকার। তার জীবন বিড়ম্বনাময়। রাজা বল, উজির বল, কোটাল বল, ভৃত্য বল—সকলেই তোমাকে আশ্রয় করিয়া আছে। কবি তোমার বর্ণনা করিয়া, তোমার মহিমা গাহিয়া, তোমার স্তুতিবাদ করিয়া কাব্য লিখিতেছেন—তাই তাঁর এত আদর—এত সম্মান। বেদ বল, বাইবেল বল, কোরাণ বল, সকল শাস্ত্রের ভিত্তি তুমি। সকল সৌন্দর্য্যের মূল তুমি। তুমি আছ বলিয়া চাঁদের এত আদর, পুষ্পের এত গৌরব—কোকিলের এত মান, বসন্তের এত প্রতিপত্তি। তুমি না থাকিলে

কাব্যের সৃষ্টি হইত না, কবির উৎপত্তি হইত না, ভাবুক জন্মিত না।

বিজ্ঞান বল, সাহিত্য বল, নীতি শাস্ত্র বল, সকল শাস্ত্রের মূলভিত্তি তুমি। যদি কিছু সুখ থাকে—যদি কিছু ইপ্সিত থাকে—যদি কিছু প্রার্থনীয় থাকে তবে ঐ তুমি স্ত্রী। এ জগতে যত কিছু মূল্যবান্ দ্রব্য আছে, তার মধ্যে চির-অমূল্য ঐ তুমি স্ত্রী। তাই কবি তোমায় আহ্বান করিয়া, মানস-পটে তোমার মোহিনী মূর্ত্তি আঁকিয়া, প্রাণের অন্তরতম প্রদেশ হইতে বলিয়াছেন:—"Of all the earthly blessings the best is a good wife."

কবি মনের আবেগে উদ্ভ্রান্ত ভাবে যাহা বলিয়াছেন তাহা অভ্রান্ত সত্য। তুমি বিহনে মানুষ পূর্ণ নয়। তাই তোমায় অর্দ্ধাঙ্গী বলে। শাস্ত্রিক অনেক ভাবিয়া অবিশ্রান্ত মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া এই সারময় নাম তোমায় দিয়াছেন। তুমি না থাকিলে অর্দ্ধ অঙ্গের কোন শোভাই নাই। এ ভব সাগরে তুমি এক মাত্র তরী। এ জীবন পোতের তুমি একমাত্র কাণ্ডারী। তোমার মায়ায় মত্ত হয় নাই—তোমার কটাক্ষে জর্জ্জরিত হয় নাই—তোমার অপ্রসাদে লুপ্তবুদ্ধি হয় নাই এমন কে আছে?

তুমি বিপদে বন্ধু, সম্পদে সহচর, রোগে চিকিৎসক—নিরাশায় আশা। শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের তুমি একমাত্র মহৌষধ। জীবনের এ ঘোর সংসার-সংগ্রামে তুমি একমাত্র সেনাপতি। তোমার পরামর্শ—তোমার যুক্তি—তোমার আজ্ঞা—তোমার হুকুম মান্য করে না, এমন কেহই নাই। সকল কাজে লোকের বিরক্তি আছে—সকল কথায় বেবার আছে, কিন্তু তুমি যাহা বল না কেন কিছুতেই বিমুক্তি নাই। তুমিই সর্ব্বময় কর্ত্রী। তাই তোমায় ভক্ত তোমায় নাম দিয়াছে গৃহিণী। তুমি না থাকিলে সে গৃহে সোণা ফলিলেও তাহা "যথারণ্যং তথা গৃহং।" বেশী কি বলিব? আমি কি জানি? এক-জন মহামান্য কবি কি বলিয়াছেন তাহাই বলিতেছি, শোন!—

"A wife is half the man—his true friend,
* * * a faithful wife
Is his best aid in seeking heavenly bliss,
A saint by speaking, wife is a companion
In solitude, father in advice,
A mother in all seasons of distress,
A rest in passing through life's wilderness."

সারা দিন ভূতগত মেহন্নত করিয়া, গায়ের রক্ত জল করিয়া, বিধুমুখ শুষ্ক করিয়া ঐ যে কেরাণী ভায়া ছুটাছুটি গৃহে আসিতে-ছেন ও কেবল তোমারই শ্রীমুখপঙ্কজ দেখিবার জন্য—একবার তোমার দুইটী সুধামাখা কথা শুনিবার জন্য—তোমার স্নিগ্ধকরী প্রেম কাহিনী শুনিবার জন্য। ক্লিষ্ট দেহে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছেন, কেবল তোমার ভরসায়—তোমার মোহিনী কান্তি—তোমার শ্রীবাভঙ্গী দেখিলে সব জ্বালা সব যন্ত্রণা—সমস্ত দিনের হাড় ভাঙ্গা খাটুনি—বড় সাহেবের যথেচ্ছ লাঞ্ছনা—সকলই ভুলিয়া যাইবেন। তোমার মোহিনী মূর্ত্তিতে, তোমার ভ্রূ ভঙ্গিতে, তোমার ইষৎ চাহনিতে কি যেন এক অনু-ভবনীয় অনমুমেয় সঞ্জীবনী শক্তি আছে। তোমার নয়নের কি যেন এক Electric force আছে। মানুষ সব ভুলিয়া যায়,—আবার সে নব জীবনে অনুপ্রাণিত হয়। হৃদয়ে প্রফুল্লতা বিরাজ করে। তাই বলি

তোমার মত জিনিস এ পৃথিবীতে আর নাই।

আবার, এই পৃথিবীতে যত কিছু অনিষ্টের মূল তাহাও তো তুমি। রাজ্যের পর রাজ্য, যুগের পর যুগে যত যুদ্ধ বিগ্রহ, ঘটিয়াছে সকলই তো তোমার জন্য। সকলের গোড়ায় তুমি আছ। প্রেমিক-রাজ ইংলণ্ডাধিপতি ৪র্থ হেন্রি কথায় কথায় বলিতেন 'Woman at the bottom'। বাস্তবিক সকল অনিষ্টের বা অনুষ্ঠানের মূলে স্ত্রী। তোমারই জন্য সেই চির স্নেহবদ্ধ ভ্রাতৃযুগল সুন্দ উপ-সুন্দ মরিল, তোমারই জন্য ট্রয় ছারখারে গেল। আবার তাও বলি, তুমি না থাকিলে রামচন্দ্রের মহা সত্য পালন হইত না। দুর্জ্জয় রাবণ সংহার হইত না। তুমি ছিলে বলিয়াই রামচন্দ্র পূর্ণ-ব্রহ্ম। ত্রেতাযুগে এত লীলা খেলা হইল। সত্যযুগে কোন বিশেষ লীলা-খেলা নাই, সে কেবল তোমা বিহনে। তুমি না থাকিলে—তোমার আবির্ভাব না হইলে দেবতাদের কোন ক্ষমতাই থাকে না। কোন ঐশিক শক্তি প্রকাশিত হয় না। তোমায় বাদ দিলে রামায়ণ হয় না। তোমায় বাদ দিলে মহাভারত হয় না। সকলই তোমার জন্য। যা কিছু ঘটিয়াছে বা ঘটিবে সকলেরই নিমিত্ত তুমি। সৃষ্টি হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত সকল যুগেই তোমার সর্ব্বময় প্রভুত্ব। মানুষ তোমা বিহনে তিলেক তিষ্ঠিতে পারে না। তুমি স্বর্গ, তুমি ধর্ম্ম, তুমি অর্থ, তুমি কাম, তুমি মোক্ষ, তুমি সব। অন্য কথা কি বলিব, তোমা বিহনে মানুষ এত অপূর্ণ যে তাহার ধর্ম্ম-কর্ম্মেও অধিকার হয় না। রামচন্দ্রকে সীতার অভাবে সোণার সীতা গড়াইয়া যজ্ঞ করিতে হইয়াছিল।

আর কত বলিব? একবার দেবাদি-দেব শূলপাণির প্রতি চাহিয়া দেখ! মরি মরি তোমা বিহনে তাঁর কি দুর্গতি।—

"সদাশিব সদানন্দ—
সতী বিনা নিরানন্দ
শ্মশানে ভ্রমেণ ভোলা কেপা দিগম্বর।—"

নিজ অস্তিত্ব ভুলিয়া—সব সংসার ভুলিয়া—সর্ব্বত্যাগ করিয়া কোল শ্মশানে শ্মশানে "রে সতি! রে সতি!" করিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন। আ মরি মরি কি বিপুল প্রেম! কি বিপুল আপনা-প্রদান!

তা, কাহাকেই বা বলিব? আবার তোমারই জন্য স্বয়ং গোলকনাথ শ্রীকৃষ্ণ কখন বিষেশিনী সাজিতেছেন, কখন রাধা রাধা বোলে বংশধ্বনি করিতে করিতে অজস্রধারে কাঁদিতেছেন, কখন বা নয়ন-জলে ভাসিয়া 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' করিতেছেন। সর্ব্বদেবাধিপতি ইন্দ্র শচীর দ্বারে বাঁধা আছেন। তা, যখন দেবতা-দেরই রক্ষা নাই তখন মানুষে আর কা কথা।

মানুষ ভাই বন্ধু, পিতা, মাতা, পরিজন সকল ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তোমা ছাড়া এক মুহূর্ত্ত টিকিতে পারে না। সব মমতা কাটাইতে পারে—সব মায়াজাল ছিন্ন করিতে পারে, কিন্তু তোমায় প্রাণ থাকিতে এক দণ্ডের তরেও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। এ সংসার তোমার, এ পৃথিবী তোমার, তুমি ইহার অধি-পতি। তোমার উপর কলম চালায় এমন কেহ নাই। পিতা পুত্রকে

পালন করিবেন। কিন্তু কত দিনের জন্য? যত দিন না পুত্রের উদ্বাহ-ক্রিয়া সমাধা হয়। তার পর পুত্র আর পিতার নয়। তাই কবি বলিয়াছেন—'A son is a son until he gets a wife'। সেই দাস-খতে সহি করিবার পর দুই চক্ষে চাহনি হইবার পর আর কাহারই নয়,—কেবল তোমারই। তুমি মারিলে মারিতে পার। রাখিলে রাখিতে পার। তাই বলি, তুমি বাজার রাণা, বাদশার বাদশা, সাহ আলমের সহ আলম। এক-দিন সূর্য্য উদয় না হইলে চলে, এক রাত্রে চন্দ্র দেখা না দিলে চলে, কিন্তু মানুষের হৃদয় রাজ্যে তুমি একদিন দেখা না দিলে সে মহা বিপদে আর উপায়ান্তর নাই।

তুমিই এক মাত্র মানুষের মরণকাঠি জীবনকাঠি। তুমি না থাকিলে মানুষের বুদ্ধি যোগায় না। মানুষের পূর্ণত্ব হয় না। কেবল একা তুমি মানবের পূর্ণত্ব সংপাদন কর। তুমি না থাকিলে, মানুষের দশা যে কি হইত তাহা সর্ব্বজ্ঞানী অন্তর্যামী ঈশ্বরই বলিতে পারেন। তাই বোধ হয়, সৃষ্টির আদি দিনে তিনি একা পুরুষকে না গঠিয়া তাহার পার্শ্বে প্রকৃতিকে গঠিয়াছিলেন। তাই বোধ হয়, মর্ত্তে একা আদমকে না পাঠাইয়া তাহার সঙ্গে ইভকেও পাঠাইয়াছিলেন। তুমি না থাকিলে মানুষ মানুষই হইতে পারে না। তাই অশেষ প্রতিভাশালী প্রকৃতির প্রিয়তম শিশু সেক্সপিয়র অনেক দেখিয়া মানবতত্ত্ব ভালরূপ বুঝিয়া প্রাণের কথা টানিয়া বলিয়াছেন—"Oh woman—lovely woman! Nature made thee to temper man." একথা যে হৃদয় হইতে বাহির হইয়াছে, হে স্ত্রি! তোমার তত্ত্ব-গাহিয়া, তোমার মোহিনী প্রতিমা আঁকিয়া আজ তিনি সভ্য জগতের উপাস্য দেবতা ও পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিরূপে পূজিত হইতে-ছেন। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর আমি তোমার মহিমা কি গাহিব? জলে স্থলে মরুতে ব্যোমে তোমার অনন্ত জয় ঘোষিত হউক। তুমি অজেয়, তুমি অমেয়, তুমি অমূল্য, তুমি অতুল্য 'তোমারি তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে।'

শ্রীবিধুভূষণ মিত্র।

নানা প্রসঙ্গ।

জাতীয় সমিতি। অনেক দিন হইতে নব্য ভারতের অন্তরের ভাব আমরা বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম। সে যে আর বেশী দিন নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবে না—থাকিতে পারে না—তাহাও আমরা কতকটা বুঝিয়াছিলাম। আমাদের সে অনুমান যে নিতান্ত বৃথাই হয় নাই তাহার প্রমাণ ভারতে জাতীয় সমিতির অভ্যুদয়। যে ভারতবর্ষে বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন জাতির বাস, এক জাতির ভাষা অন্য জাতি বুঝে না, এক জাতির আচার অন্য জাতির সহিত মিলে না, এক জাতির পরিচ্ছদ অন্য জাতির পরিচ্ছদ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সেই ভারতে যে এইরূপ সার্ব্বজাতিক মহামিলন কখনও লক্ষিত হইবে সে শুভ-মুহূর্ত্তের স্বপ্নও অনেকে অসম্ভব মনে

কহিত। নানা প্রকারে বহুদিন হইতে প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে, ভারতের অনৈক্যই ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ। সভ্যতাই বৃদ্ধি হউক, শিক্ষারই বিস্তার হউক, একতা না হইলে ভারতের উপায়ান্তর নাই। কিন্তু জানি না, এতদিনের হা হুতাশের পর ইহার মধ্যে কোন্ ধ্রুবলগ্নে কোন্ সদয় বিধাতা স্বপ্নপথে আসিয়া ইহার কানের সেই একতার মহামন্ত্র দীক্ষা দিয়া গেলেন! হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পঠানী, পার্শি, মাদ্রাজি, আসামী, উড়িয়া—আজ সবাই আপন আপন জাতিগত বিদ্বেষ ভুলিয়া এক সঙ্গে মিলিয়া একাসনে বসিয়া আপনাদিগের সুখ দুঃখের কথা আলোচনা করিতেছে। কি শুভসম্মিলন! দেখিতে দেখিতে প্রথম বোম্বাই, তার পর কলিকাতা, তার পর মাদ্রাজে আজ ইহার তৃতীয় অধিবেশন বসিল। আবার, আগামী বর্ষে প্রয়াগভূমে ইহার চতুর্থ অধিবেশন হইবে। তোমরা অদ্যই ইহার একটা কোন বিশেষ ফল দেখিলে না বলিয়া হতাশ হইও না। কবি বলিয়াছেন "কালে বীজমুপ্তমঙ্কুরায়েব ফলং দর্শয়িষ্যতি।" অতি সুসময়ে এ বীজ উপ্ত হইয়াছে, কালে অবশ্যই ইহা হইতে ফল উৎপন্ন হইবে। যখন এতদিনের পর এই কল্পনাতীত মহামিলনের অমৃতকিরণ দেখা দিয়াছে, তখন কে অস্বীকার করিবে যে, কালে এই সকল নিস্তেজ হতগৌরব জাতিসমূহের ভগ্নাংশসমষ্টি লইয়া এক তেজঃকায় মহাগৌরবান্বিত মহাজাতি অভ্যুত্থিত হইয়া তাহার মহাকণ্ঠ হইতে একতার গম্ভীর গান উদ্গীত হইতে থাকিবে?

* * *

মাইকেল-স্মৃতিচিহ্ন। অনেক দিন হইল বঙ্গভূমি "মধুহীন" হইয়াছে। সেই অবধি মধুলোভী গৌড়জনগণের জন্য সেরূপ মধুচক্র একখানিও রচিত হয় নাই। এ আক্ষেপ সবাই করিতেছেন। প্রবন্ধকার প্রবন্ধ লিখিতেছেন, কবি কবিতা রচনা করিতেছেন, গায়ক গানে বিলাপ করিতেছেন। কিন্তু সেই মহাকবি মধুসূদনের স্মরণের জন্য বাঙ্গালায় কার্য্যতঃ আরও কিছুই হইয়া উঠে নাই। এই অকৃতজ্ঞ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার সেই বর্ত্তমান কবিগুরুর শেষ সময় কি অবস্থায় অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা আর তুলিতে চাহি না। সম্প্রতি কোনও বিশেষ কারণে মাইকেলের সমাধিক্ষেত্রের উপর একটী স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। ম্যানেজার মিরর-সম্পাদক ইহার জন্য চাঁদা সংগ্রহের ভার লইয়াছেন। কি কলঙ্কের কথা, আজও ইহার জন্য উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইয়া উঠিতেছে না! তা ত না হইবারই কথা। আজ যদি ইহা কোন এতদ্দেশের প্রপিতামহ-অপ-পৌত্রের জন্য হইত তাহা হইলে বাঙ্গালী এতদিনে কতলক্ষ সারিতে পারিত; কিন্তু তা যখন নহে, তখন এ অপব্যয় করিবে কেন? বড় সুখের কথা, সবাই এ প্রকৃতির নহেন। সম্প্রতি কয়েকজন প্রকৃত গুণী আপনাদিগের বদান্যতার যথার্থ পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও যে টাকা উঠিয়াছে তাহাতে ভাল রকমের একটী স্মৃতিচিহ্ন হইতে পারে না। ভাল করিতে গেলে সুতরাং আরও টাকার দরকার। কিন্তু, সে টাকা উঠে কোথা হইতে? বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত বর্ত্তমান বঙ্গীয় কবিদিগকে তাহার জন্য একটু বিশেষ মনোযোগী হইতে বলিয়াছেন।

অবশ্যই সাধারণ অপেক্ষা কবিগণই তাঁহা হইতে বেশী পরিমাণে উপকৃত। প্রস্তাবটী সুসঙ্গত বটে। তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা আর একটী কথা বলিতে চাহি। আমরা জানি, বেঙ্গল থিয়েটার কোম্পানি মৃত মহাত্মার নিকট নানা বিষয়ে ঋণী; সেই জন্য এই বিশেষ সময়ে আমরা উক্ত কোম্পানির অধ্যক্ষগণকে অনুরোধ করি, তাঁহারা একদিন মৃত কবির অমরকীর্ত্তি 'মেঘনাদ বধ' অভিনয় করিয়া সেই টাকাটী সমস্ত এই কার্য্যে অর্পণ করুন। তাঁহারা তাঁহাদিগের বিজ্ঞাপনপত্রে যেন স্পষ্ট করিয়া "মাইকেলের স্মৃতিচিহ্নের সাহায্য-রজনী" এই কথাটী লিখিয়া সাধারণকে বিশেষ করিয়া আহ্বান করেন। বঙ্গের কৃতজ্ঞ সন্তান মাত্রেই সামান্য কয়েক আনা পয়সার জন্য অবশ্যই সেই আদর্শকবির প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইতে পশ্চাৎপদ হইবে না। ইহাতে আর এক সুবিধা এই দেখিতে পাই, যাঁহারা কিছু দিতে ইচ্ছুক, অথচ তেমন সঙ্গতি নাই, এবং সামান্য দানেও কুণ্ঠা বোধ করেন, তাঁহারা অক্লেশে এ রকমে দান করিতে পারেন, এবং সেই সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান স্বতন্ত্র ভাবে সংগৃহীত হইলে যে সমস্ত অসুবিধা তাহা আর না হইয়া সমস্ত একত্রে আদায় হইয়া সংগ্রহকারের হস্তে যাইতে পারিবে। আশা করি, বঙ্গ রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ আমাদের প্রস্তাবটী একটু বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

* * *

ভারত ও রুষ। মস্কাউ গেজেট রুষের সর্ব্বপ্রধান সংবাদপত্র। ইহার অধিপতি সম্পাদক (M. Katkoff) কাট কাফের সময়ে ইহা দ্বারাই রুষের রাজতন্ত্র একপ্রকার পরিচালিত হইত। সেই গেজেটে সম্প্রতি লিখিত হইয়াছে, ইংলণ্ড অনর্থক রুষ হইতে ভারতের জন্য আশঙ্কা করিতেছেন। রুষ ভারতের জন্য একদিনও লালায়িত নহে; অধিক কি, ইংলণ্ডের যাহাতে হানি হয়, এরূপ স্থানেও সে তাহার রাজ্য বিস্তার করিতে ইচ্ছুক নহে। ইংলণ্ড না বুঝিয়া এ অমূলক রুষভীতি পোষণ করিতেছেন। বরঞ্চ অর্দ্ধরাশি হইতে তাহার ভয়ের কারণ থাকিলে থাকিতে পারে বটে। কথাটা কি? এত দিন ধরিয়া তবে কি আমরা মাণিকপীরের পালা মনে করিয়া রামায়ণ গান শুনিয়া বৃথায় কাঁদিয়া মরিলাম?

* * *

বিলাতে খিচুড়ীভোগ। ভূতপূর্ব্ব ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বিলাত হইতে টি, এন্, মুখার্জ্জি হইয়া আসিয়াছেন। বিলাতের গরিবদিগের কষ্ট দেখিয়া তিনি বড়ই ব্যথিত, তাই তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন, তোমরা সবাই মিলে ভারত হইতে সেই সকল দুঃখীদের জন্য চাল ডাল পাঠাইয়া দাও, তাহারা খাইয়া বাঁচুক। কথাটা লইয়া চারিদিকে একটা হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছে। ভারত পরকে না দিয়া আপনি খায় না, ভারত দানশীলতার চির-প্রসিদ্ধ ইত্যাকার অনেকগুলা আদর গুল্‌জার কথাও বলা হইয়াছে। কিন্তু কাজ কি বাপু, 'যার ঘরে নাইক অষ্টরম্ভা' তার 'লোকের কাছে কোঁচা লম্বা' কেন? তবে মুখুয্যের পোর মনের গূঢ় মতলবটা কতক বুঝা যায় বটে। কিন্তু, পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া কেন?

বীণা রঙ্গভূমি। কবিবর রামকৃষ্ণ রায়ের উদ্যম, একাগ্রতা ও অধ্যবসায় সর্ব্ব প্রশংসিত। তাঁহার সেই সর্ব্বপ্রশংসিত অক্লান্ত উদ্যম, একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের অনাতম ফল, এই রঙ্গ ভূমি। তাঁহার নামের সহিত ইহার নাম সংমিশ্রিত করিবার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তিনি তাহার কিছুই ত্রুটী করেন নাই। কি দৃশ্যপট, কি সাজসজ্জা, কি আসবাব সবগুলিই অতি সুন্দর হইয়াছে। সুন্দর হইতে আরও সুন্দর দেখিলাম ইহার অভিনয় কার্য্য। নটী লইয়া ইহার অভিনয় হয় না, স্ত্রীলোকের অংশগুলি পুরুষের দ্বারাই অভিনীত হইয়া থাকে। ইহাই ইহার বিশেষত্ব, ইহাই ইহার চমৎকারিত্ব, এবং ইহাই ইহার সাধারণ চিত্তাকর্ষকত্ব। কে বলিল পুরুষের দ্বারা স্ত্রীলোকের অংশ অভিনীত হইতে পারে না? যে বলে আমরা একবার তাহাকে আসিয়া এই রঙ্গ-ভূমির অভিনয় দেখিতে অনুরোধ করি। ইহার প্রতিষ্ঠা অবধি দুইখানি নাটক ইহাতে অভিনীত হইয়াছে। দুইখানিই রামকৃষ্ণ বাবুর স্বরচিত। একখানি প্রহ্লাদচরিত্র, আর একখানি চন্দ্রহাস। প্রহ্লাদ চরিত্র সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব না। বেশি বলিবারও আর ইহাতে কিছু নাই। তবে সম্প্রতি গ্রন্থকর্ত্তা ইহাতে যে কয়খানি নূতন দৃশ্যের যোজনা করিয়াছেন, তাহা আমাদের বড়ই ভাল লাগিল। বিশেষ, অরণ্যের দৃশ্য অতি পরিপাটী, অতি চিত্তভ্রমকর। বলিতে কি, প্রহ্লাদ চরিত্রের দেশ বিখ্যাতি হইলেও আমরা তাহাকে একঘেয়ে বলিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। কিন্তু এই সকল নূতন দৃশ্যের অবতারণায় তাহার সে এক-ঘেয়েত্ব দোষ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থ-কারের দৃশ্যযোজনা কৌশল দেখিয়া আমরা যার পর নাই প্রীত হইয়াছি। আর অভিনয়? কাহাকে রাখিয়া কাহার কথা বলিব? মোট কথা, প্রহ্লাদ চরিত্র বই হইয়া অবধি এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় আমরা আর দেখি নাই। অপর গ্রন্থখানির নাম বলিয়াছি, চন্দ্রহাস। ইহার গল্পাংশ বৈমিনি ভারত হইতে গৃহীত। চন্দ্রহাসের প্রথমভাগে আমরা তত পরিতৃপ্ত হইতে পারি নাই, প্রথমভাগে নাটকত্ব ও কিছুই নাই। কিন্তু তার পর, যখনই ইহার নাটকত্ব আরম্ভ হইল, তখনই জমিয়া গেল। আমরা যে এতক্ষণ পার্শ্বস্থ বন্ধুদিগের সহিত নাকে মাঝে কথাবার্ত্তা কহিতে ছিলাম তাহা আর পারিলাম না। এক মনে এক দৃষ্টে অভিনয় দেখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দেখিলাম, কি চন্দ্রহাস, কি দুষ্টবুদ্ধি, কি মদন, কি কুলিন্দ, কি মেধাবতী—সকলেই এক এক জন সুদক্ষ অভি-নেতা বটে। বালক চন্দ্রহাসের অভিনয় অতি স্বাভাবিক, সুতরাং অতি হৃদয়-গ্রাহী। তবে, দুষ্টবুদ্ধির অভিনয়ে কিছু আমরা অতিরিক্ততা দোষ দেখিলাম। ঘন ঘন প্রয়োজন অপ্রয়োজনে হরি-সঙ্কীর্ত্তনের ছটা আমাদের ভাল লাগিল না। একটা অশ্বরক্ষককে ধরিয়া অত বড় একটা লম্বা বক্তৃতাও আমাদের কানে ভাল শুনাইল না। হরিমন্দিরের দৃশ্যটী বাদ দিলে বোধ হয় কোন ক্ষতি ছিল না। প্রস্তাবনাটী আর একটু ছোট হইলে ভাল হইত। তা ছাড়া, স্থানে স্থানে বড়ই বাগ-ছাড়া লাগে। রামকৃষ্ণ বাবু প্রহ্লাদ চরিত্রের উপর আর একবার তুলি বুলাইয়া তাহাকে

যেমন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছেন, তেমনি চন্দ্রহাস খানিতেও আর একবার হাত দিয়া তাহাকে আরও হৃদয়-গ্রাহী করিয়া তুলেন ইহা আমাদের বিশেষ অনুরোধ। চন্দ্রহাসে রাজমাতার দুখা, ও বালকদিগের সহিত হাত ধরাধরি করিয়া চন্দ্রহাসের হরিনাম গান আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না। রাজকৃষ্ণ বাবু এই দুইটী দৃশ্যে তাঁহার কবি-হৃদয়ের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ভরসা করি, নিকলঙ্ক আলোর আগামী হিন্দু-ধর্ম্মের প্রকৃত ভক্তগণ এই হিন্দু-ধর্ম্মময় নিষ্কলঙ্ক আলোকের প্রকৃত স্থান বীণারঙ্গভূমির প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রদান করিবেন। আমরা রাজকৃষ্ণ বাবুর চির বন্ধু, প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তাঁহার উন্নতির পথে সহায় হউন।

সমালোচনা।

হোমিওপ্যাথিক গৃহচিকিৎসা।— শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বাগাণ্ডুর কৃত। ক্ষেত্রনাথ বাবু 'কল্পনার' পাঠক-দিগের নিকট অপরিচিত নহেন। চৌট্‌কা প্রভৃতি তাঁহার লিখিত কয়েকটী বিষয় ইতিপূর্ব্বে এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ক্ষেত্রবাবু চিকিৎসা-ব্যবসায়ী নহেন। কিন্তু, তাহা না হইলেও; তিনি বহুদিনের বহু পরিশ্রমের অধ্যয়নে এবং বহু পরীক্ষার প্রত্যক্ষ ফলে এ শাস্ত্রে যে সম্যক্ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বাঙ্গালায় আজ কাল হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা-পুস্তকের অসদ্ভাব না থাকিলেও আমরা ইহা স্পষ্টতঃ বলিতে পারি, এ পর্য্যন্ত এ প্রকার পুস্তক এক খানিও প্রকাশিত হয় নাই। ইহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা হোমিওপ্যাথি মতে লিখিত হইলেও ইহাকে কেবলমাত্র হোমিও-প্যাথির গণ্ডির মধ্যে না পুরিয়া রোগ-বিশেষের কবিরাজি, হাকিমি, আরথৌতিক, টোট্‌কা, মুষ্টিযোগ প্রভৃতি সকল প্রকার দেশজ ঔষধের ব্যবস্থাও লিখিত হইয়াছে। তা ছাড়া, আর এক বিশেষত্ব এই যে, সামান্য সর্দ্দি কাশি ও জ্বর জাড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া বহুমূত্র, কুষ্ঠ প্রভৃতি দুরা-রোগ্য রোগ সকলের ব্যবস্থাও আছে; আবার, এক দিকে যেমন বোলতা মৌমাছি কামড়ানর ঔষধ পাইবে তেমনি অস্ত্রচিকিৎসা, বিষচিকিৎসা সম্বন্ধেও যথেষ্ট ব্যবস্থা দৃষ্ট হইবে। সাধারণ স্ত্রীরোগ, সূতিকালীন পীড়া ও শিশুদিগের পীড়ার বিষয়ও যথা-যথ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। কলতঃ মনুষ্য শরীর সচরাচর যত প্রকার ব্যাধি-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে পারে, তাহার ছোটটী হইতে বড়টী পর্য্যন্ত, ক্ষেত্রবাবু একটীও বিষয় পরিত্যাগ করেন নাই; এমন কি অধ্যায়ান্তরে সাধারণের জন্য পথ্য রন্ধন-প্রণালীর বিষয়ও লিখিয়া দিয়াছেন। বাস্তবিক, বলিয়াছি তো, হোমিওপ্যাথিক পুস্তক অনেক হইয়াছে, কিন্তু একখানির ভিতর এতগুলি রোগের এত চিকিৎসা-প্রকরণ আর কোনও খানিতে আছে কি? চারি শত পৃষ্ঠার পুস্তক, অতি সুন্দর বাঁধাই, দাম দুই টাকা মাত্র। চিকিৎসা পুস্তকের

কথা দূরে থাক, নাটক নভেলও এরূপ হইলে এ দামে বিকায় না। এই অল্প মূল্যের জন্য আমরা গ্রন্থকর্ত্তাকে যার পর নাই ধন্যবাদ প্রদান করি। আশা করি, গৃহী মাত্রেই ইহার এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া আপনাদের ঘরে রাখিয়া দিবেন। স্মরণ রাখিবেন, ডাক্তারের একটা ভিজিটের দাম ২ টাকার কম নহে। সেই একটী ভিজিটের দামে এই বহি খানি এক বার কিনিয়া রাখিলে অনেক ভিজিটের হস্ত হইতে এড়াইতে পারিবেন। পুস্তক খানি আগা গোড়া, অতি সরল চলতি ভাষায় লেখা। সামান্য বর্ণজ্ঞান-শিক্ষিতেরাও ইহা পড়িয়া বেশ বুঝিয়া আপনার পরিবার মধ্যে অনেক রোগের শান্তি করিতে পারিবেন।

মীমাংসা সূত্র, গৌরচাঁদ গোসাই, প্রকৃতি। এই তিনখানিই 'সাধনা গ্রন্থাবলী'র এক একখানি মাসিক গ্রন্থ। 'সাধনা'র প্রকাশকগণ যে সাধনা হৃদয়ে ধারণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন, আমাদের সন্দেহ হইতেছে, এরূপ ভাবে সাধনা করিলে তাঁহারা সিদ্ধ হইতে পারিবেন কি না। তিনখানি পুস্তকের মধ্যে অবশ্য মীমাংসা-সূত্রেই লোকের বেশি চিন্তা, বেশি মনন ও বেশি সাধনার আবশ্যক হইয়াছে। এবং এ খানিতে তিনি তাহা দেখাইতেও অকৃতকার্য্য হন নাই। ইহার অনেক স্থান পড়িয়া আমরা বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। তবে, ভাষা আরও প্রাঞ্জল ও বিশদ হইলে ভাল হইত। বিষয়টী গুরুতর বটে, কিন্তু যদি সহজ কথায়ই না বুঝাইতে পারিলাম তবে আর তাহা লিখিবার প্রয়োজন কি? অধিকাংশস্থলে সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য বলিয়া বোধ হইল। দ্বিতীয় পুস্তকখানির নাম গৌরচাঁদ গোঁসাই। ইহা একটী গল্প। গল্পটী মন্দ নহে। লিখিবার তেমন চাতুর্য্য থাকিলে আরও ভাল লাগিত। তৃতীয় খানি কবিতা পুস্তক, নাম প্রকৃতি। কোন একটা বিশেষ প্রশংসার কবিতা ইহাতে দেখিলাম না।

প্রতিভা। শ্রীবরদাকান্ত সেন প্রণীত। ছোট্‌টো মেয়েটীর ছোট্‌টো গল্প—বেশ পরিষ্কার, সুন্দর ও মধুর। লেখকের সংক্ষেপে চরিত্র-বর্ণনার বেশ ক্ষমতা আছে। তাঁহার 'সোণার পুতুল' প্রতিভাকে তিনি যে ভাবে আঁকিয়াছেন তাহা বাস্তবিক বড় সুন্দর হইয়াছে সে বালিকাটীকে প্রথম যখন তাহার মাতার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে দেখিলাম, তখন হইতে সেই যে তাহার স্বভাবে আমরা মুগ্ধ হইয়াপড়িলাম, শেষ যতক্ষণ না তাহার ক্ষুদ্র জীবনের শেষ অঙ্কের অভিনয় দেখিয়া চক্ষের জল ফেলিলাম ততক্ষণ পর্য্যন্ত আর আমাদের সে মুগ্ধতা ঘুচিল না। এ ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আমরা সকলকে পড়িতে অনুরোধ করি।

চাঁদের বিয়ে। এখানিও বরদা বাবুর লেখা। ইহার রচনায় তেমন বিশেষ কারিগরি দেখিলাম না। তবে সাধারণতঃ লেখাটী মন্দ নহে।

পাশ্চাত্য-শিল্প-বিজ্ঞান। শ্রীরামচন্দ্র মল্লিক প্রণীত। মূল্য এক টাকা।

ইহা এক খানি নিত্য আবশ্যকীয় পুস্তক। ইহাতে বরফ, বিস্কুট, সোডা, লেমনেড হইতে আরম্ভ করিয়া অলহুবি, দিয়াসলাই, জুতার কালি, সাবান, পাউডার পর্য্যন্ত, মায় লেভেণ্ডার, পমেটম, প্যাটেণ্ট ঔষধ, সোণা রূপা গিল্টিকরণ প্রভৃতি শতাধিক সামগ্রী প্রস্তুত করিবার সহজ উপায় সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। রাম বাবুর নির্দ্দেশানুসারে আমরা দুই তিনটী সামগ্রী পরীক্ষা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছি। বাস্তবিক এই ধরণের একখানি পুস্তক কাছে রাখিলে অল্প পয়সায় বেশ বাবুয়ানা করা যায়, নূতন ব্যবসাও চালান যাইতে পারে। অতি "সামান্য সামান্য সামগ্রীর" জন্য "পরমুখাপেক্ষী হইয়া" থাকিতে হয় না, "কষ্টের ধন রাশি রাশি পরিমাণে" বিদেশে চলানিও হয় না। এরূপ পুস্তক শুষ্ক কথার আদরে না ঘুরিয়া, কঠোর সংসার-যাত্রায় ব্যবহৃত হইবার সামগ্রী।

রৈবতক ও ভারতী।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আজ বড়ই চর্দ্দিন। শ্রদ্ধাস্পদ সাধারণী-সম্পাদক যথার্থই বলিয়াছেন যে ১০ বৎসর হইল বাঙ্গালা সাহিত্যের মৃত্যু হইয়াছে। কথাটী এক প্রকার ঠিক। বঙ্গদর্শনের অপমৃত্যুর সঙ্গে বঙ্গ সাহিত্যেরও অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। কীর্ত্তিবাস প্রভৃত, কাশীদাস লালিত, ভারতচন্দ্র পালিত, বঙ্গ সাহিত্য বালিকাটীকে যখন প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়, অক্ষয় কুমার এবং মধুসূদন নানা ভূষণে ভূষিত করিয়া রঙ্গভূমিতে উপস্থিত করিলেন তখনই বাঙ্গালার সাধারণ সম্পত্তি ছাই ভস্মে উহা চাপা পড়িয়া মরিবার উপক্রম হইল। সুকুমারী বালিকা "ত্রাহি ত্রাহি" করিতেছিল। এমন সময়ে "মা ভৈ! মা ভৈ!" রবে রঙ্গভূমি পূর্ণ হইল; বঙ্গদর্শন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার দুই হস্তে বীণা ও পুস্তক। কবিত্ব বীণার ঝঙ্কারে, কাব্য পুস্তকের সাক্ষভৌমিক ভাবে ও উচ্চ উদ্দীপনায় বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিল। তাঁহার অপর দুই হস্তে বেত্র ও পুষ্পমালা। এক দিকে অভ্রংলিহ বেত্রাঘাতে সাহিত্য-কুলাঙ্গারেরা পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া গা চাকা দিতে লাগিল; অন্য দিকে বঙ্গ সাহিত্যভূষণেরা পুষ্পমালায় ভূষিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যকে রত্নরাশিতে ভূষিত করিতে লাগিলেন। বালিকা তখন মেঘমুক্ত শশাঙ্কের ন্যায় সেই ভস্মরাশি হইতে নির্গত হইয়া এবং বিবিধ রত্নাভরণে সজ্জিত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে যৌবনে পদার্পণ করিল। এই নৃত্য বঙ্গবাসী ভুলিবে না; বুঝি আর শীঘ্র দেখিবে না।

সকল দেশেই অন্তঃসারশূন্য সাহিত্যের বহুল প্রচার। কিন্তু কি সংখ্যায় কি অসারত্বে বঙ্গসাহিত্যের তুলনা নাই, কারণ বঙ্গদেশের তুল্য বোধ হয় অন্তঃসারশূন্য লেখক কি পাঠক কোনও দেশে নাই। কাজে কাজেই চারি বৎসর কালের বেত্রাঘাতে বহুসংখ্যক "সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের" পৃষ্ঠ ক্ষত হইল। খাদ্য বস্তুর মধ্যে বেতটা সম্বন্ধে একটুক স্বতন্ত্র নিয়ম। তাহাতে বাঙ্গালা গ্রন্থকারগণ পেটে খাইতে পারিলে তথাপি পিঠে সহিতে পারিত। তখন পর্য্যন্ত "বঙ্গদর্শন" সম্পাদক বঙ্গে নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন নাই। বঙ্গ গ্রন্থকারগণ নিষ্কাম ভাবে এত বেত্রাঘাত সহ্য করিতে পারিল না। চারি দিকে প্রতিহিংসা-বহ্নি দাবানলবৎ ধক ধক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এই প্রতিহিংসা এবং বাঙ্গালীর চিরপ্রসিদ্ধ অনুকরণ-প্রবৃত্তি, রাশি রাশি মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, ত্রৈমাসিক, পারত্রিক, বৈত্রিক পত্র ও পত্রিকা, রাশি রাশি 'বলদ মহিমা,' 'ডেপুটী-বিভূতি-যোগ' প্রভৃতি কাব্য ও নাটক প্রসব করিতে লাগিল। প্রসববেদনায় বঙ্গদেশ অস্থির হইয়া পড়িল। "বঙ্গ দর্শনের" ধন্য চর্ব্ব্য চোষ্য, লেহ্য পেয়, নানাবিধ খাদ্যের ব্যবস্থা হইতে লাগিল। বঙ্গদর্শন সম্পাদক নিজেও বুঝি তখন নিষ্কাম ধর্ম্ম শিক্ষা করেন নাই। তিনি শরীর ক্ষয় করিয়া এরূপ

অনুপায়ের উপকার লইতে অসম্মত হইলেন। অভিমানে, অনবসরে, এবং অসুস্থতায় উৎপীড়িত হইয়া তিনি 'বঙ্গ দর্শনের' সহিত নবযৌবনসম্পন্না বঙ্গ সাহিত্য-সুন্দরীকে গলা টিপিয়া মারিলেন। তখন দেখিতে দেখিতে আর সকল 'দর্শন' অদর্শন হইতে লাগিলেন, কুলাঙ্গারেরা দ্বিগুণ উৎসাহে বঙ্গ সাহিত্যের সংকারের আয়োজন করিতে লাগিল।

শোক সন্তাপে অধীর হইয়া বঙ্গ দর্শনের কয়েক জন প্রিয়-শিষ্য তাহাকে পুনর্জীবিত করিতে চেষ্টা করিলেন। সে চেষ্টা বিফল হইল তখন তাঁহারা বঙ্গ-সাহিত্য-শবে 'নব জীবন' সঞ্চার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে অবধি অনুকরণের স্রোত এরূপ খর বেগে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, যে ইহাঁদের প্রাণ রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। কাজে কাজে —"জগদম্বা! আপনি বাঁচিলে বাপের নাম"—ইহাই তাঁহাদের মূল মন্ত্র হইয়াছে। কিন্তু ইহাঁদের কাছে বঙ্গদর্শনের সেই নির্ভীকতা নাই, বুঝি সে প্রতিষ্ঠাও নাই। ইহারা দেখিয়াছেন 'বঙ্গ-দর্শন' সমালোচনার দ্বারা বড় অপ্রীতি-ভাজন হইয়াছিলেন। সমালোচনার দ্বারা নিঃস্বার্থ সত্যতা ও ঘটেই, সময়ে সময়ে ঘোরতর বন্ধুত্বও বিচ্ছেদ হয়। অতএব ইঁহারা সমালোচনা করিবেন না বলিয়া ধর্ম্মঘট করিয়াছেন। ইহাদের হস্তে সে বেত্র নাই, সে পুষ্পমালাও নাই। কাজে কাজে এক দিকে সাহিত্য-কুলাঙ্গারদের ঘোরতর প্রাদুর্ভাব, অন্য দিকে প্রতিষ্ঠা-ভাজন লেখকদিগের ঘোরতর নিগ্রহ। কাজে কাজে তাঁহাদের হস্তে সে বীণাও নাই, সে পুস্তক ও নাই। উৎসাহ অভাবে শীর্ষস্থানীয় কবি কি লেখকগণ যেন বড় একটা তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিতেছেন না এখন একখানি ভাল পুস্তক বাহির হইলে তাহা জানিবার যো পর্য্যন্ত নাই। এখন পুস্তকের দোষ গুণ বিচারের ভার সাপ্তাহিক প্রভুদের সমালোচনার ও বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করিতেছে। এই উভয় কার্য্য যে কিরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে তাহা আজ বঙ্গদেশে আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। যদি সপ্তাহিকের সপ্ত পুরুষের মধ্যে কাহারও সঙ্গে গ্রন্থকার পরিচিত থাকেন, কিম্বা সম্প্রতি কি ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হন, তবে তাঁহার পুস্তকের প্রশংসা আর ধরে না। কিন্তু যদি তিনি দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন জলপিণ্ডসংস্রবের কি তস্য বন্ধু বান্ধবের মধ্যে কাহারো বিরাগ-ভাজন হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার আর রক্ষা নাই। আর যদি তিনি এ দুয়ের কেহ নহেন, কিন্তু সাপ্তাহিক মহাশয়ের কোনও রূপে প্রীতিভাজন হইতে না পারিয়া থাকেন, তবে দুই চারিটী বুদ্ধিমানী কথা শুনিবেন—"পুস্তক খানির ছাপা ভাল, স্থানে স্থানে মন্দ নয়। লেখক ভাল লিখিতে শিখিলে ভাল লিখিতে পারিবেন।" বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটী আরো শোচনীয়! প্রথমতঃ বিনামূল্যে কি বিনামূল্যে নিলর্জ্জের মত, রাশি রাশি আত্মপ্রশংসাপূর্ণ মিথ্যা কথা আপনার পয়সা খরচ করিয়া দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ছাপিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে দুই চারিখানি সুপারিস পত্রের কোড়ণ দিতে পারিলে আরো ভাল। তাহাতেও

যদি না কাটে তবে ২৫ টাকা মূল্যের ৫০খানি 'সুপ্রসিদ্ধ' গ্রন্থ ২৫ পয়সায় বিক্রয় করিতে প্রস্তুত। তাহাতেও না কাটে, তবে তাহার উপর আরো কিছু উপহার দিতে হইবে। এই উপহারের শেষ সীমা কোথায় তাহা জানি না, কারণ ইতিমধ্যেই আত্মীয়াদিগের নামেরা বাহবা আরম্ভ হইয়াছে। তোমার পুস্তক কি পত্রিকা যদি স্বনামে কাটিতেছে না দেখ, তবে তাহা বঙ্গমোহিনী কোনও আত্মীয়ার নামে চালাইয়া দেও। কোনও প্রতিষ্ঠাপন্ন গ্রন্থকারকে মাটি করিবার যদি উপায়ান্তর না থাকে, তবে তাহার সঙ্গে কোনও আত্মীয়ার নামে কলঙ্ক রটাইয়া মাসিক পত্রিকার স্তম্ভ পূর্ণ কর, সে মাটি হউক না হউক, অন্ততঃ পত্রিকাখানিও বেশ কাটিবে। হীরালাল 'রজনীর' প্রণয় লাভে বঞ্চিত হইয়া তাহার নামে 'আটিকেল' লিখিবে বলিয়া যে শাসাইয়াছিল, তাহা কেবল উপন্যাস-লেখকের কল্পনা মাত্র নহে। এখন হীরালাল কেবল 'আর্টিকেল লিখিয়া' ক্ষান্ত হয় না, রজনীর সঙ্গে দেশ শুদ্ধ ভদ্রলোককে গালি দিয়া উপন্যাস লেখে, এবং তাহা খুব কাটে। এমন্সির ঘৃণিত কর্ম্ম ও জুয়াচুরি নিন্দা কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন আবার জুয়াচুরি কথাটা ক্রমে সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে, এবং 'চুরির' কথাটাও শুনা যাইতেছে। বলি, কোনও দেশের সাহিত্যের কি এমন দুর্গতি কখনও হইয়াছিল? 'বঙ্গদর্শনের' জনৈক কবি অল্প কথায় বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থার একটি উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়াছেন—

"ভারতী! কি হলো তব দর্শন,
বঙ্কিম দিল ছেড়ে
"হায়! কি হলো দেশটা যেন
সাপ্তাহিকে মুড়ে।
"হায়! কি হলো ভূদেব
ছেড়ে গুরুগিরি।
"হায়! কি হলো হেম নবীনের
নাইক জারিজুরি।"

তা, জারিজুরি নাইই থাকুক, তাহাতে ক্ষতি নাই। বেজারিদের যে এক দিকে চুপ করিয়া থাকিবারও যো নাই। 'বঙ্গদর্শনের' মৃত্যুর পর হইতে যাঁহারা সাহিত্য সংসারে ঠাকুরালী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে মধুসূদন নিস্তার পাইতে পারেন নাই। দার্শনিক বেকন বলেন, ঈর্ষা দুই প্রকার। এক প্রকার ঈর্ষার দ্বারা পরিচালিত হইয়া মানুষ আপনাকে উন্নীত করিয়া প্রতিষ্ঠাভাজন ব্যক্তিদের সমকক্ষ করিতে চেষ্টা করে, এবং অন্য প্রকারের ঈর্ষা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া মানুষ প্রতিষ্ঠাভাজন ব্যক্তিদিগকে টানিয়া নীচ করিয়া আপনার সমকক্ষ করিতে চেষ্টা পায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্গদেশে শেষ প্রকারের ঈর্ষারই আধিপত্য। মধুসূদনের প্রতি ইহাদের বিরাগের এখনও যেন শান্তি হয় নাই, কারণ এই গুণগ্রাহী সমাজে চকপণ লক্ষপতি হইলেও তাঁহার সমাধির জন্যে এক কপর্দ্দকও দেন নাই। "বাবের উদ্ভব রবি," হেমবাবু নিজ-কলিকাতাবাসী, এবং এক সাহিত্য-বিগ্‌গজ বন্ধুমণ্ডলীর দ্বারা পরিবৃত, যে তাঁহাকে লইয়া টানাটানি করা বড় শক্ত কথা। অতএব এইশ্রেণীর সমালোচকদের কাছে নবীন বাবুই

"আত্মোন্নয় সরকার" হইয়াছেন। ইনি বঙ্গের পুরাতন প্রান্তবাদী, কার্য্যগতিকে অজ্ঞাতবাদী, এবং স্বভাবতে পৃষ্ঠপোষক শূন্য। সুতরাং ইহাঁর অনেক কথাটী কহিবার কেহ নাই। তাহাকে নিগ্যাতন করিবার জন্যে সময়ে সময়ে হেমবাবুকে বাড়ান হইয়া থাকে। শুনিয়াছি অতি স্থণিত উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া অনেক এই শ্রেণীর সমালোচক একখানি আর্য্য পত্রিকার বৎসর বাঁধিয়া এরূপ প্রবন্ধ লেখেন। উক্ত পত্রিকা খানি, স্মরণ হয়, কিছু দিন পূর্ব্বে, লিখিয়াছিলেন যে 'এলেকজাণ্ডার' যেরূপ 'হোমার' খানি সর্ব্বদা তাঁহার উপাধানের নীচে রাখিতেন, নবীন বাবুর 'পলাশীর যুদ্ধ' খানিও প্রত্যেক বাঙ্গালীর উপাধানের নীচে রাখা উচিত। সে মাসিক পত্রিকাখানি আবার অম্লান মুখে সমাক গ্রন্থের মধ্যে সিরাজের বিলাস বর্ণনা হইতে

"নাচিতেছে বিবসনা শতেক সুন্দরী।"

এই লাইনটী মাত্র উদ্ধৃত করিয়া 'ভারতীর' প্রশংসিত 'পলাশীর যুদ্ধ' খানি যে কিরূপ নিকৃষ্ট গ্রন্থ এবং নবীন বাবু নিজেও কিরূপ নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোক, তাহার পরিচয় দিয়াছিলেন। সে দিন 'ভারতীতে' নবীন বাবুর রৈবতকের সমালোচনা পড়িয়া আমাদের উপরোক্ত সমালোচনার কথাটী মনে পড়িল। ১৪০ বৎসর পরে 'রৈবতকের' ১৪০ পৃষ্ঠা সমালোচনা বাহির হইয়াছে। এবং ৩৮০ পৃষ্ঠার মধ্যে খানি হইতে ১০।১২টী কবিতা ঐরূপভাবে উদ্ধৃত করিয়া জনসমাজে পুস্তক খানির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা 'রৈবতক' পড়িয়াছেন তাঁহাদিগকে সমালোচনাটী একবার পড়িতে অনুরোধ করি, এবং যাহারা সমালোচনা মাত্র পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগকেও 'রৈবতক' একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

আমরা এ সম্বন্ধে নিজে বড় একটা কিছু বলিব না, সমালোচনাটা কিরূপ হইয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য 'ভারতী ও বালক' যাহা বলিয়াছেন, এবং এক বৎসর পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে 'নব্যভারত ও সাধারণী' যাহা বলিয়াছেন, আমরা উভয়ের মত একে একে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

ভারতী।

(১)

১। "বলিতে কষ্ট হইতেছে গ্রন্থকার পলাশীর যুদ্ধ প্রণয়ন করিয়া যে যশ উপার্জ্জন করিয়াছেন সমালোচ্য পুস্তকখানি তাহা রক্ষা করিতে পারে নাই।"

সাধারণী।

(১)

"নবীনের ললিত কণ্ঠ—কোমল আওয়াজ; বাঁধা বীণার জমাট সুর। এ আওয়াজ—এ সুর, আর এ সুরে ওস্তাদি আলাপ—বড় মধুর, বড় মর্ম্মস্পর্শী, বড়ই মদিরাময়। কাণের ভিতর দিয়া নবীনের আওয়াজ প্রাণে পঁহুছে। কবির, শিল্পীর, বীণা-বাদকের একি কম সৌভাগ্য! কম সুখ!

ভারতী।

(২)

"কিন্তু উপস্থিত কাব্যে তাহার (ঐতিহাসিক মূল চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিক) নিতান্তই ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়।"

সাধারণী।

(২)

"কুরুক্ষেত্রে ভারতীয় রাজশক্তি পরীক্ষিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সে শক্তি পূর্ণ অবয়বে কোন কোন স্রোতে কোন মুখে কোন দিকে প্রবাহিত হইতেছিল তাহার অবয়বগ্রাহী চিত্র 'রৈবতকের' কবি আমাদিগকে দিয়াছেন। এ কবির ঐতিহাসিক ইঙ্গিত মূলহীন নহে।*** কিন্তু কথা হইতেছে এই যে মহাভারতের ঐতিহাসিক অংশের একটা বুদ্ধি-গম্য ব্যাখ্যা করিতে হইলে ইয়োরোপীয় আলোকের সহায়তা ভিন্ন আপাততঃ উপায়ান্তরও বড় একটা দেখি না।"

ভারতী।

(৩)

"আমরা কৃষ্ণে যাহা দেখিয়াছি নবীন বাবুর কৃষ্ণে তাহার কিছুই দেখিতে পাইলাম না, এমন কি, রৈবতকের শ্রীকৃষ্ণে সাধারণতঃ যে একটু গাম্ভীর্য্য—তাহাও নাই। নবীন বাবুর কৃষ্ণ নিতান্তই নবীন।"

সাধারণী।

(৩)

"রৈবতক কাব্যে প্রধান-চরিত্র কৃষ্ণার্জ্জুন। কিন্তু এতদুভয়ই অসম্পূর্ণ—অসম্পূর্ণ থাকিবারই কথা। উভয় চরিত্রের যতটা 'চিত্র' রৈবতকে আছে, তাহা অংশ বিশেষের আলেখ্য মাত্র। কবি যে চিত্রের যতটুকু দেখাইয়াছেন বা দেখাইবার সুবিধা পাইয়াছেন তাহাই কেবল আমরা দেখিব মাত্র।*** নবীন বাবুর বর্ণিত কৃষ্ণ পূর্ণ মাত্রায় প্রচারক ও সংস্কারক, অর্দ্ধ মাত্রায় কিম্বা তাহা অপেক্ষা ঈষদধিক পরিমাণে—অবতার।

মহাপুরুষ।"

ভারতী।

(৪)

"আর একটী নমুনা দিতেছি" এটী সিন্ধুতীর হইতে প্রভাতসূর্য্যের বর্ণনা।

"এক লম্ফে রবি
উঠিলেন নীলাকাশে কনকি নয়ন।"

কাব্য ত দেখিতেছি মহাভারত লইয়া—কিন্তু ইহাতে কথায় কথায় রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের উপযোগী এত 'লম্ফ' কেন? ইহা নিতান্তই রুচিবিরুদ্ধ, এরূপ ভাষাও কাব্যের ভাষা নহে।"

সাধারণী।

(৪)

"রৈবতকের আরম্ভ—সর্ব্ব প্রথম দৃশ্য হইতেই শান্তিরস অবতারণার সম্যক উপযোগিতা গ্রন্থ মধ্যে দৃষ্ট হয়। আরম্ভে 'পট-উত্তোলন' বা কাব্যের পত্র উন্মাটন কবিতা মাত্রই কি দৃশ্য নয়নপথে পতিত হয়!*** প্রকৃতির প্রশান্ত গম্ভীর অথচ প্রফুল্ল দৃশ্যপট, মহাভাব উদ্দীপনার সম্যক উপযোগী তাহাতে সন্দেহ কি?

ভারতী।

(৫)

"যিনি ভৃগুপদ চিহ্ন হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন সেই শ্রীকৃষ্ণের মুখে (দুর্ব্বাসার মত অভিশাপ ব্যবসায়ী) ব্রাহ্মণের প্রতি এরূপ তাচ্ছিল্য ভাব ও পরুষ উক্তি কি নিতান্তই বিকৃত কল্পনা নয়!"

(৫)

(এই "ঐতিহাসিক"

রূপ ঘটাইতে 'সাধারণীর' সাধ্যায়ত্ত বুদ্ধিতে উপর হয় নাই। ইহার উত্তর স্থানান্তরে সাধারণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন আর একটী ক্ষুদ্র ব্যক্তি দিয়াছেন।

"শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় ব্রাহ্মণকে যথাযোগ্য সম্মান করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে কোথাও ব্রাহ্মণের গৌরব প্রচারের জন্যে বিশেষ ব্যস্ত দেখি না। বরং অনেক স্থানে তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে দেখি। যদি বনপর্ব্বে দুর্ব্বাসার আতিথ্য বৃত্তান্তটা মৌলিক মহাভারতের অন্তর্গত বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তিনি রকম সকম করিয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুরদিগকে পাণ্ডবদিগের আশ্রম হইতে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করিয়াছিলেন। গীতোক্ত ধর্ম্ম যদি কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম হয় তবে তাঁহার মতে ব্রাহ্মণে, গরুতে, হাতিতে, কুকুরে ও চণ্ডালে সমান দেখিতে হইবে।"

(কৃষ্ণচরিত)।

ভারতী।

(৬)

"ঋষিগণ সূর্য্যবন্দনা করিতেন বলিয়া কখনই 'জড়োপাসক' ছিলেন না, নবীনবাবুর কৃষ্ণ এ সিদ্ধান্ত কোথায় পাইলেন?"

(৬)

(উত্তর,—আদি বিধান, মধ্য বিধান, নব বিধান এবং মজুমদার মহাশয়ের টাট্‌কা বিধান, ব্রাহ্ম-সমাজের কাছে, ভট্ট মোক্ষমূলারের কাছে, রমেশচন্দ্র দত্তের কাছে, এবং সর্ব্বশেষে "ভগবদ্গীতার কৃষ্ণের" কাছে। ধর্ম্মে জড়ত্ব উপস্থিত না হইলে "অধর্ম্মের অভ্যুত্থান" হয় না। তাহা না হইলে কৃষ্ণ কলমগ্রহণ করেন না।)

ভারতী।

(৭)

"জরৎকারুর প্রশস্ত হৃদয় ও বিশ্বপ্লাবিত প্রেমের আমরা যাহা পরিচয় পাইয়াছি তাহা না পাইলে ভাল হইত।"

সাধারণী।

(৭)

"জরৎকারুর যত রূপ এবং যাদৃশ প্রেম, তাহাতে তিনি সত্যভামার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণ-প্রেমের এক আধ কলিকার অধিকারিণী হইবার অনুপযুক্তা নহেন।* * * জরৎকারু —তেল তুলিতে আঁকা খুব জমকাল চিত্র।*** জরৎকারু নিয়তির নিষ্ঠুর পেষণে নিপীড়িত চূর্ণ বিচূর্ণ। * * * জরৎকারু অপ্রেমিকা অরসিকা কোন রকমেই হইতে পারেন না, তাহা হয়েনও নাই। হাঁ, জরৎকারু 'ডুবিবেন'—অতল প্রেমে ডুবিবেন, পাপে নহে। * * তিনি অসামান্যা, নারীকুল অগ্রগণ্যা রমণী

ভারতী।

(৮)

"কেবল রুক্মিণী দেবীই স্বভাবে আছেন।"

সাধারণী।

(৮)

"রৈবতকের নারী-চিত্রগুলি বড় হৃদয়গ্রাহী। এমনতর অন্তরগ্রাহী, আট পিঠ উজ্জ্বল চিত্র আধুনিক কবির কাব্যে অনেক দিন যেন দেখি নাই। কাব্যের

অতি অল্প ঘটনাই চিত্রকর আমাদিগকে দেখাইতে অবসর পাইয়াছেন।"

ভারতী।

(৯)

"সমস্ত পুস্তক খানিতে এইরূপ ছবিলামী।"

সাধারণী।

(৯)

'রৈবতক' এ রসের sublimity (বা শান্তিরসের) আলম্বন ও উদ্দীপন কারণ, অথবা যাহাকে আলঙ্কারিকের কথায় 'বিভাব' বলে, তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে।* * * অর্জ্জুনের রৈবতকে অবস্থিতি অবসরে এই সকল মহৎ ব্যাপার ঘটিত মূল মহানীতি অল্পাধিক পরিমাণে আলোচিত হয়, অর্জ্জুন অচ্যুত কর্ত্তৃক সেই সর্ব্বমঙ্গল-প্রসবিনী নীতিতে দীক্ষিত হয়েন। অর্জ্জুনের এই "দীক্ষার" মনোমোহিনী বর্ণনা, কৃষ্ণের সেই মহা নীতির প্রকৃষ্ট প্রগাঢ় চিত্রপট রৈবতক কাব্যে আছে। ঘটনায় কল্পনায় যেমালুম মিলিয়া এক উজ্জ্বল উপাদেয় কাব্য হইয়াছে। নবীন বাবুর এক গ্রন্থ ঘটনায় কল্পনায় মিলিয়া কাব্য হইয়াছে বলিলাম; কিন্তু কল্পনা ঘটনাকে কৃত্রিম বা কলুষিত করে নাই; প্রত্যুত সমবেশ-যোগী উজ্জ্বল আলোকে ঐতিহাসিক সত্য প্রত্যক্ষ দেদীপ্যমান করিয়াছে।*** প্রশান্তে গম্ভীরে, 'উজ্জ্বলে মধুরে' রৈবতক পরিপূর্ণ।"

উপরে 'ভারতীর সমালোচনার সম্যক অংশ, এবং সাধারণীর সমালোচনার কিয়দংশ মাত্র উদ্ধৃত হইল। ভারতীর সম্পাদিকা স্বনামধন্যা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। 'সাধারণীর' সম্পাদক অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন সমালোচকচূড়ামণি শ্রীযুক্ত অক্ষয় চন্দ্র সরকার। অতএব এ যে বিষম সমস্যা! আমরা কাহার সাক্ষ্য বিশ্বাস করিব! স্বর্ণ-কুমারী বলেন রৈবতক ছবিলামী, অক্ষয়চন্দ্র বলেন sublime—অত্যন্ত ভাবাত্মক! ৩৮০ পৃষ্ঠা ছবিলামী, বড় সহজ কথা নহে। নবীন বাবুর এ সম্বন্ধে অসাধারণ ক্ষমতা বলিতে হইবে! ভারতী ব্রাহ্মিকা, সাধারণী হিন্দু। হিন্দু সাধারণী বলেন, নবীন বাবুর চক্ষু "সর্ব্বদা অসাধারণ মহৎপুরুষ," ব্রাহ্মিকা 'ভারতী' বলেন তিনি নিতান্তই গাম্ভীর্য্য শূন্য "নবীন"। হিন্দু বিবাহ ইত্যাদি কুরুচিপূর্ণ সামাজিক কুসংস্কারের পক্ষ-পাতিনী দরিদ্র কায়স্থবধূ সাধারণীর মনে জরৎকারুর 'ভিক্ষু' দেখিয়া কোনও পাপের ভাব উদয় হইল না, বিশাল কুলসম্ভবা সমাজ-সংস্কারিকা ভারতীর মনে একটা দূষিত পাপের ভাব উদয় হইল! যাহা পড়িয়া গাম্ভীর্য্য-শূন্যা 'সাধারণীর' হৃদয় "শারিরসে" ও "মহাভারতের উদ্দীপনায়" পূর্ণ হইল, তাহাতে গম্ভীরা 'ভারতীর' মনে পড়িল "কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড!" কিন্তু এরূপ ব্যক্তিগত শ্লেষে, "বিষপ্লাবিত শ্লেষের" প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে এবং "কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে" এ শ্রেণীর রসিকতায় কি 'ভারতীর' সুরুচি ও গাম্ভীর্য্য রক্ষিত হইয়াছে! "লক্ষ কথাটীর প্রতি লক্ষ কি আমরা জানি না, তবে ভারতী বলিয়াছেন যে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডই ইহার সুরুচি সম্পন্ন প্রতিবাক্য। জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে রৈবতক খানি লইয়া এরূপ লক্ষ লক্ষ—শ্রীবিষ্ণু "কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড"—

কি 'ভারতীর' উপযোগী হইয়াছে? সে যাহা হউক, পণ্ডিতায় পণ্ডিতায়, কিম্বা পণ্ডিতে পণ্ডিতায় এরূপ বিপরীত মত-ভেদে সিদ্ধান্তটী অনিবার্য্য হইয়াছে যে এক পক্ষে না এক পক্ষে সত্যের সম্পূর্ণ অপলাপ ঘটিয়াছে। অভিযোগটী বড় গুরুতর। ইহার মীমাংসা বৈষ্ণবকের পাঠকগণ করিবেন। আমরা এই মাত্র বলিব যে 'সাধারণী' ৭টী দীর্ঘ প্রবন্ধে বৈষ্ণবকের সমালোচনা করিয়াছেন, কাব্য খানির উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়াছেন, ও তদন্তর্গত চরিত্রাবলীর এক একটী ছবি তুলিয়া দেখাইয়াছেন, এবং রাশি রাশি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া সমস্তের সার্থকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। আর ভারতী? সত্যভামার শয়নকক্ষের, এবং তাহার স্বামীর সহিত অন্তরঙ্গতার ঠাট্টা তামাসার ২৪টী কবিতা মাত্র উদ্ধৃত করিয়া কৃষ্ণের, সত্য ভামার, সুলোচনার, ও তৎকালের চরিত্রের পরিচয় দিয়া ১৪০ পৃষ্ঠা ঠাকুরী বাঙ্গালায় সমালোচনা শেষ করিয়াছেন। শুদ্ধ তাহা নহে। হিন্দুদিগের বড় বিপদ উপস্থিত। তাহা হয় বিবাহে নির্ব্বাচনী প্রথা নাই বলিয়া ব্রাহ্মদের কাছে কত গালি খাইতেছে! তৎকালে ঠাকুরাণীকে তাঁহার ভ্রাতা যে হিন্দু নিয়মে বিবাহ দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বড় নারাজ, তিনি নির্ব্বাচনী প্রথার পক্ষপাতিনী। তথাপি ব্রাহ্মিকা 'ভারতী' বলেন সে ভ্রষ্টা! আবার হিন্দুরা জড়-উপাসক পৌত্তলিক বলিয়া দেশে ৩।৪ টা ব্রাহ্মসমাজ হইল, হিন্দুরা কত গালি খাইল। এখন শুনি মিছা কথা, হিন্দুরা জড়-উপাসক পৌত্তলিক নহে! 'বৈষ্ণবক' ব্রাহ্মজগতে যদি এই মতবিপ্লব ঘটাইতে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে, তবে ইহার পক্ষে তাহা কম বাহাদুরির কথা নহে। আবার কৃষ্ণ যে ভগবদ্গীতা কুরুক্ষেত্রে প্রচার করিয়াছিলেন, 'ভারতী' বলেন তাহার চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে সুভদ্রার বিবাহের সময়ে তাঁহার সেই গীতা আবৃত্তি করা উচিত ছিল। তাহাও আবার কোন ক্ষেত্রে? সত্যভামার শয়ন-কক্ষে!!

একটা গল্প মনে পড়িল। একজন ব্রাহ্ম ভ্রাতা কিছু পরিণত বয়সে পাপ তাপ নিবারণ জন্য ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, অর্দ্ধপক্ক দীর্ঘ শ্মশ্রুরাশিতে বদনচন্দ্র ভূষিত করিয়া, বহু বৎসর পরে ভার্য্যার শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলেন। ভার্য্যার কাছে শয়ন করিতে গিয়া গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিতে লাগিলেন—"তুমি ঈশ্বরের কন্যা, আমি ঈশ্বরের পুত্র। আমরা উভয়ে তাঁহার সন্তান। আমরা ভ্রাতা ভগিনী।" পরিণত-বয়স্কা গৃহিণী এই ভ্রাতৃ ভাবের বিপরীত অর্থ করিয়া ক্ষেপিয়া বলিল—"ডেকরা! এই তোর বিদ্যি ধর্ম্ম! আমি এখনই তোর 'বিদ্যি ঘুচিয়ে' ছাড়ায়।" দ্রুতবেগে সম্মার্জ্জনীটী হাতে উঠিল। প্রথম ঘা,—ব্রাহ্ম হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিলেন "শান্তিঃ।" আর এক ঘা—"শান্তিঃ!" আরো এক ঘা—"শান্তিঃ।" গৃহিণী তাহার পর ক্ষান্ত হইলে, বলিলেন—"হরি ওঁ।" কৃষ্ণও যদি সত্যভামা ঠাকুরাণীর কাছে শয়ন কক্ষে গিয়া ভগবদ্গীতা আবৃত্তি করিতেন তাহা হইলে ঠাকুরাণীটী যে সুলোচনার অন্ন-খানার ভণব না দিতেন এমন বোধ হয় না।

তবে আমরা স্বীকার করি 'সাধারণীর'

সমালোচনায় কিঞ্চিৎ "ঠাকুর ঠকব" ভাব ছিল। তাহার দাম যদি 'ভারতী' নবীন বাবুর উপর তুলিয়া থাকেন তবে বড় অসদ্ব্যবহার কার্য্য করিয়াছেন বলিতে হইবে। তাহা হইলে সমালোচনাটী কেবল যে অসত্য তাহা নহে; উহা অসত্য ও অসরল!

আমরা আরো একটী গল্প শুনিয়াছি। সত্য কি মিথ্যা জানি না, বন্ধিমের ত কথাই নাই, সমালোচিত না হইয়া এরূপ গালাগালির স্থলে ভর্ৎসিত হইতে হয় বলিয়া "হেম নবীন" ও না কি প্রায়ই সমালোচনার জন্য তাঁহাদের পুস্তক সকল সম্পাদককে উপহার দেন না। কোনও সাপ্তাহিকের সমালোচকের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া নবীন বাবুর কোনও বন্ধু একখানি রৈবতক উক্ত পত্রিকাকে উপহার দিতে লিখেন। এবং সেই সঙ্গে লিখেন যে 'ভারতীর' প্রধান লেখকের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি নবীন বাবুর উপর বড় চটা, সাবধান! নবীন বাবু 'ভারতীকে' রৈবতক উপহার দিলে নিশ্চয় গালি খাইবেন।' নবীন বাবু প্রতি-উত্তরে লিখিলেন, আমি ব্রাহ্ম মহলে যে এরূপ অখাদ্য দ্রব্যের ব্যবসা আছে তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন না। তিনি 'ভারতীকে' কখনও তাঁহার পুস্তক উপহার দেন নাই, এবার তাঁর 'রৈবতক' নিশ্চয় দিবেন, কারণ তাঁহার বন্ধুর কথা সত্য হইলে তিনি 'ভারতীর' মুখে রৈবতকের প্রকৃত দোষ গুণ শুনিতে পাইবেন। তাঁহারা যে বড় খানির অসরল ভাবে সমালোচনা করিবেন, তাহা তিনি বিশ্বাস করেন না। আর নিতান্ত যদি সেরূপ সমালোচনা করেন তবে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম কি বুঝিতে পারিবেন।

গল্পটী যদি সত্য হয়, বলা যায় যে নবীন বাবুর উদ্দেশ্যটী বড় নষ্টবুদ্ধি-মূলক ছিল। তিনি 'ভারতীর' সমালোচনা পড়িয়া কি করিয়াছিলেন জানি না, অন্যথা হইলে একটী উক্ত হাসি হাসিতাম। যাহা হউক ১৪০ বৎসর পরে কেবল 'ভারতীকে' রৈবতকের ১৪০ পৃষ্ঠা সমালোচনা বাহির হয় নাই, পূর্ব্বে বঙ্গেও সঙ্গে সঙ্গে ইহার একটা প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে। ঘটনাটী কি আকস্মিক? পূর্ব্ব বঙ্গে এখনো যেন গুটি একটী স্বনামখ্যাত রামমাণিক্য আছে। রাম মাণিক্য এখন ব্রাহ্ম নহে, "গোড়ার দোকানের বিসকাট্ বক্ষণ" করে না— অতএব সে রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানে না। সে তাহার মনের কথা প্রাণ খুলিয়া বলিয়া ফেলিয়াছে। সে বলিয়াছে যে 'সাধারণী' সম্পাদক তাঁহার বন্ধু বলিয়া তাঁহাকে নবীন বাবু রৈবতক উপহার দিয়াছেন, এবং সেই কারণে তাঁহার দ্বারা প্রশংসিত হইয়াছেন। এই কয়টী কথাই অসত্য। শুনিয়াছি, সাধারণী-সম্পাদকের সঙ্গে নবীন বাবুর ২।১ দিনের আলাপ মাত্র। 'সাধারণীকে' রৈবতক উপহার দেওয়া হয় নাই। বিশেষতঃ তিনি 'রৈবতকের' কেবল প্রশংসা মাত্র করেন নাই। আমাদের বোধ হয় তিনি উহার কয়েকটী এরূপ দোষ দেখাইয়া দিয়াছেন যে 'রৈবতকের' দ্বিতীয় সংস্করণ সময়ে নবীন বাবুর তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। রামমাণিক্য কেবল উপরোক্ত সমাচারের কার্য্য করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবার লোক নহে।

সে যদে পালাপালি এড়াইবার জন্য নবীন বাবু তাহাকে রৈবতক উপহার দেন নাই, কিন্তু তাহা বলিয়া সে তাঁহাকে ছাড়িবে কেন? 'ভারতী' তবুও বড়ই ব্যঙ্গপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন, সে বহি খানির ধারেও না যাইয়া একস্তম্ভ জ্ঞানগর্ভ সমালোচনা প্রসব করিয়া ফেলিয়াছে। যেরূপ সম্ভব নবীন বাবুকে "দ্যাপে পাঁলে প্যাটে পারা দিয়া জীবন্ত টানিয়া বাহির করা"ও অসম্ভব ছিল না। তাহার আরো রাগের কারণ এই যে, সমালোচনার জন্য তাহার শ্রেণীর সম্পাদকগণকে উপহার পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই, "বিনাইয়া নানা ছাঁদে" 'স্তম্ভব্যাপী বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নাই, টাকা হইতে সিকাটা পর্য্যন্ত মূল্য কমান হয় নাই, উপহার দেওয়া হয় নাই, তথাপি নবীন বাবুর 'রৈবতক' তাঁহার নামের জোরে কাটিতেছে। অতএব সে সরল হৃদয়ে অনুরোধ করিয়াছে যে নবীন বাবু যেন 'রৈবতক' খানির বিক্রি নিজে বন্ধ করেন। আমরাও তাহাকে একটী অনুরোধ করিব। নবীনবাবু তাহার "দ্যাপের" লোক সে তাঁহার জন্য ডাক যোগে বা "বাক্যপত্রে" যত ইচ্ছা বাক্যামৃত বিতরণ করুক। কিন্তু বার তার কাছে যেন যত যেসে না; কারণ অনেকেই "দশা টিপ্যা ধর্য্যা পৃষ্ঠে যত মারন চড় মারেন।"

যাহা হউক, রামমাণিক্য-শ্রেণীর সমালোচকদের উদ্দেশ্য কি বুঝা গেল। তাই বলিয়াছি, বাঙ্গালা সাহিত্যের বড় দুর্দ্দিন উপস্থিত। প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা সম্পাদকগণ, প্রথম শ্রেণীর সমালোচকগণ কি এখনও নীরব থাকিবেন। এরূপ একটী নীরবতার ধর্ম্ম-ঘট করিয়া তাঁহারা কি তাঁহাদের প্রাণপ্রতিম প্রিয় সাহিত্যের অশেষ ক্ষতি করিতেছেন না? তাঁহারা 'বঙ্গদর্শনের' বেত্র গ্রহণ করুন, বাঙ্গালার মুদ্রাযন্ত্র যে প্রতিদিন রাশি রাশি ছাই ভস্ম উদ্গীরণ করিতেছে, তাহার সমালোচনা না করুন, বৎসরের মধ্যে যে দুই চারি খানি ভাল গ্রন্থ বাহির হয়, তাহার সমালোচনা করিলে কি ক্ষতি আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। "কিঞ্চিৎ কাওী" রকমের রসিকতা না করিয়া—'দক্ষ' বলি নাই—সরল ভাবে সহৃদয়তার সহিত দোষ দেখাইয়া দিলেও এই শ্রেণীর গ্রন্থকারদের মধ্যে এমন শতও বোধ হয় কেহ নাই, যে তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ না হইয়া বীতশ্রদ্ধ হইবে।

শ্রীসত্যানন্দ শর্ম্মা।

আশা ও স্মৃতি।

আশা স্মৃতি দুটী বোন একসাথে খেলে চির দিন,
ভুলিয়া না হয় সঙ্গহীন;
আশার অভাবে স্মৃতি শুখাইয়া বিষাদে মলিন,
স্মৃতির অভাবে আশা ক্ষীণ।

আশা ও স্মৃতি।

স্মৃতি চায় ভূতপানে, ভবিষ্যতে আশা করে টান,
এত ভাবে এত ব্যবধান।
এ ভাবের নিত্য খেলা, কিন্তু বুঝি হই অবসান
মাঝখানে আমি-বর্ত্তমান।

কারে চাহি কারে রাখি নাহি জানি কারে করি ভর
উভয়েই বড় পরস্পর।
চাহিতে একের পানে অন্যে আসি হয় অগোচর—
সে সময় বড়ই ফাঁপর।

আঁধারের ছায়াতলে মগ্ন রবে বর্ত্তমান সবি
আশায় ফুটায় রাঙ্গ-রবি;
মুহূর্ত্তেকে পালে স্মৃতি ধরে আনি অতীতের ছবি—
নীরবে নিশ্বাস ফেলে কবি।

জীবনের দুইধারে প্রাতঃসন্ধ্যা স্মৃতি আর আশা
মধ্যাহ্নের দুটীই ভরসা।
কে বাঁচিত প্রতিপলে এই দুয়ে না বাঁধিলে বাসা
হৃদে লয়ে অতৃপ্ত পিপাসা।

অতীতের কত গান স্মৃতি তার বহে আনে সুর,
ভুলাইয়া করে ভরপুর;
কত শাখী কত পাখী নদীকূলে বায়ু ঝুর ঝুর,
মনে হয় সে ত নহে দূর।

কোথা থেকে আসে আশা স্বপ্নসাথে কিবা তার মূল,
সে রাজ্যের কি শোভা অতুল!
সাঝের বাসন্তী রাতে কত চাঁদ কত তারা—ফুল,
নিমেষে আপনা হয় ভুল!

কবি চায় দুজনায় কাব্য তার দুয়ের মিলনী,
নহে সে যে কথার গাঁথনি।
এস স্মৃতি এস আশা, কত দুই ছড়াক পরাণি—
বর্ত্তমানে দাও আবরণী।

আলুর চাস।

আলু আমাদের দেশে একটী সর্ব্বপ্রধান খাদ্যসামগ্রী। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সকল সময়েই ইহা আমাদের ব্যঞ্জনের শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকে। আলুকে এই জন্য অনেকে 'বারোমেসে' তরকারি বলিয়া থাকেন। কিন্তু যাহা আমাদের এত নিত্য ব্যবহারের সামগ্রী তাহা আমাদের দেশজ পদার্থ নহে। আগে ইহার চাস আবাদ এখানে ছিল না। দক্ষিণ আমেরিকার অরণ্যময় স্থানে ইহা স্বভাবতঃ জন্মিত, তার পর অনধিক দুই শত বৎসর আবিষ্কৃত হইয়া এখন সকল দেশময় হইয়াছে। সর্ব্বদেশের মধ্যে আয়র্লণ্ড আলুর জন্য বিশেষ বিখ্যাত, আইরিষগণ আলু খাইয়াই বেশীর ভাগ জীবন ধারণ করে। শুনা যায়, এই আয়র্লণ্ড হইতেই ইহার বীজ আমাদের দেশে রপ্তানি হইয়াছে। এই জন্যই আজও বোধ হয় তাই সকলে ইহাকে বিলাতী আলু বলিয়া থাকে।

আলু খাওয়ার গুণাগুণ সম্বন্ধে এ প্রস্তাবে কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। সকলেই জানেন, হাইলাণ্ডারিদিগের ন্যায় বলশালী পুরুষ অতি কম আছে; কিন্তু সেই হাইলাণ্ডারগণের জীবিকা নির্ব্বাহ আলুর উপরই বেশী পরিমাণে নির্ভর করে। তা, সে যাহা হউক, আলু এখন আমাদের দেশে খুব চলিয়াছে, ইহার প্রয়োজনও খুব বাড়িয়াছে। কিন্তু যেরূপ প্রয়োজন হইয়াছে সেরূপ উৎপন্ন হইতেছে না। গত বৎসরের কৃষি বিভাগের রিপোর্ট দেখা যায়, প্রতি একরে—

ম্যাগনম বোনম (বিলাতি)	৫৩১০	পৌণ্ড
দেশীয়	২৭৬০	"
দার্জ্জিলিং পাহাড়ি	৪৪৪০	
নৈনিতাল পাহাড়ি	৪০২০	

অবধি জন্মিয়াছিল, ইহার উপর আর হয় নাই। অথচ ইহার উৎকর্ষ সাধন জন্য বর্দ্ধমান প্রভৃতি নানা স্থানের কৃষিক্ষেত্রে বিস্তর আয়াস ও চেষ্টা করা হইয়াছিল। জানি না চেষ্টাটা কি পরিমাণে হইয়াছিল, কিন্তু রিপোর্টের ফল দেখিয়া তাহা বড় ভাল বলিয়া বোধ হয় না।

তবে, গভর্ণমেণ্টের কথা স্বতন্ত্র, আমাদের দেশের সাধারণ কৃষকদিগের চাসের ফল শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বেশী আশ্চর্য্য এই যে অনেকে আলুর চাস কিরূপ তাহা আদৌ অবগত নহে। অথচ ইহার চাস বেশ লাভজনক। দেখিতে পাই আজকাল অনেকেই আখের চাসে মন দিয়াছে। মন্দের ভাল বটে। আখে লাভ আছে। কিন্তু আখের চেয়ে আলুর চাসে লাভ আরও বেশী। আখে অনেক পাট, অনেক পরিশ্রম। ফসল হইলেও তার পর আবার কাটাই মাড়াই আছে। তার জন্য কল দরকার। আলুর সে সব কিছুরই প্রয়োজন নাই। ক্ষেত হইতে তুলিয়াই বিক্রয় কর, অথচ দুই এক মাস ফেলিয়া রাখিলেও তাহার লোকসান নাই। অনেক স্থলে কৃষকেরা আজও ইহার তত্ত্ব বুঝিতে পারে নাই বলিয়াই তাহাদের তেমন বড় চেষ্টা দেখা যায় না। অনেকে পরামর্শ দিলেও তাহারা বড় একটা রাজি হয় না।

তাহাদের বিশ্বাস, আলু আমাদের দেশী মাটিতে ভাল হয় না। যে চাসে এত লাভ তার উপর এ রকম বিশ্বাস থাকা ভাল নয়। বাঙ্গালার মাটিতে সোণা ফলে, আলু না ফলিবে কেন? যত্নপূর্ব্বক প্রণালীমত চাস করিলেই আশানুরূপ ফল অবশ্যই ফলিবে। সেই চাসের প্রণালী কি আমরা নিম্নে তাহা সংক্ষেপতঃ কিছু কিছু লিখিতেছি।

১ ক্ষেত্র। আলুর চাসে পলি মাটীই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। তবে পলিমাটী সকল স্থানে পাওয়া যায় না, সে সব জায়গায় বাছিয়া বাছিয়া দোয়াশ মাটীই ব্যবহার করা প্রশস্ত। ফল কথা, আলুর ক্ষেতের মাটী অতিশয় পরিষ্কৃত ও সচ্ছিদ্র হওয়া আবশ্যক। যে ক্ষেত্রে পলি না পড়ে সথায় অন্য স্থান হইতে পলি তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। পলিমাটী আলুর পক্ষে এত উপকারী যে, যেখানে প্রায় তিন ইঞ্চি পরিমাণে পলি পড়ে সেখানে আর কোন সারের বড় একটা আবশ্যক করে না। আলুর ক্ষেত বারমেসে রাখা আবশ্যক। জমি বারমেসে করিতে হইলে প্রতি মাসে দুই তিনবার চাস দিয়া মাটী আল্‌গা করিয়া ঘাস জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। ডেরাডুনের চাসীরা এক ক্ষেত্রে বৎসরে দুইবার আলু ফলায়,—এক কার্ত্তিক মাসে, আর একবার ফাল্গুন মাসে।

২ সার। আলুর ক্ষেতে সার ব্যবহার করিবার অনেক প্রকার প্রণালী আছে, তন্মধ্যে শ্রাবণ মাসের শেষে প্রতি বিঘায় একমণ করিয়া চুণ ছড়াইয়া মাটীর সহিত তাহা মিশিয়া গেলে, বিঘা প্রতি ৩০মণ গোবর, ২০মণ খইল ও ৮মণ ভস্ম দেওয়ার পদ্ধতিই বিশেষ প্রশস্ত বলিয়া বোধ হয়। আলুর ক্ষেত সেঁচ সেঁতে হওয়া ভাল নয়। তাহাতে গাছ বাড়ে খুব বটে, কিন্তু শীঘ্রই ছড়িয়া পড়ে। বড় একটা ফল ধরে না। যাহা কিছু হয় তাহাতেও পোকা ধরে। এই জন্যই ভস্ম দেওয়ার ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। সম্প্রতি কৃষি বিবরণীতে আলুর চাসে নানা প্রকার সারের বিষয় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাও আমরা এ স্থলে দেখাইতেছি। একই জমীতে আলু নানা প্রকার সার দিয়া প্রতি একরে কি পরিমাণে ফল উৎপন্ন হইয়াছে, এবং খরচাই বা কিরূপ পড়িয়াছে তাহা দেখিলে অনেকে সুবিধা ও ইচ্ছামত সেই প্রকার সার ব্যবহার করিতে পারিবেন। গভর্ণমেণ্ট পরীক্ষিত সারের যে সংক্ষিপ্ত তালিকাটী এইঃ—

সার	পরিমাণ	খরচা	ফল
খইল	৯৬০পৌণ্ড	১৫৲	৪২৬০পৌণ্ড
অস্থিচূর্ণ	৪৮০		
খইল	২৬০		
অস্থিচূর্ণ	৯৬০	২৪৲	৭২০০
খইল	১৯২০	৩০৲	৫৪৪০

আরও অনেক রকম সারের কথা বলিয়া গভর্ণমেণ্ট আলুর চাসে অস্থিচূর্ণ ব্যবহার করিবার জন্যই বিশেষ অনুমোদন করিয়াছেন, কিন্তু সাধারণ হিন্দু কৃষকের পক্ষে সে ব্যবস্থা গ্রহণীয় হইবে কি না সে বিষয়ে আমরা সন্দেহ করি।

৩। বীজ। নানা জাতীয় বীজ আছে। অনেকের মতে আমাদের দেশে নাইনিতালের বীজই উত্তম কিন্তু, সম্প্রতি বর্দ্ধমানের গভর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্রে যে পরীক্ষা হইয়াছে, তাহাতে প্রমাণীত হইয়াছে যে দেশী বীজ অপেক্ষা বিলাতী বীজেই ফসল

বেশি পরিমাণে হইয়া থাকে। ১৮৮৬-৮৭ সালের রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে—

"Experiments have proved that by the use of English potato-seed, a crop heavier in quantity and better in quality can be obtained than is possible with the ordinary country seed." কিন্তু দেশীয় হউক আর বিলাতীই হউক সব আলুই বীজের উপযোগী নহে। যে সকল আলু দেখিতে দীর্ঘাকৃতি তাহাই ভাল। কেহ কেহ অখণ্ড আলু বীজ রূপে ব্যবহার করিতে বলেন, কেহ বা খণ্ড খণ্ড ভাবে রোপন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, অখণ্ড অপেক্ষা খণ্ডীকৃত বীজে ফসল কম হয়। তার কারণ এই বুঝা যায় যে, আদত আলু অপেক্ষা খণ্ড আলুতে চোখ কম থাকে, কিন্তু চোখ যত বেশী থাকিবে ততই অঙ্কুর বেশী হইবে, কাজেই খণ্ড আলুর অঙ্কুর কম হয়। আলু তত ডাগর হয় না। খুব পাকা আলু বা খুব কাঁচা আলু বীজের অনুপযোগী। মাঝারিই প্রশস্ত। দুই তিন বৎসরের পর বীজ বদলাইতে হয়, অর্থাৎ সেই ক্ষেতের বীজ না বুনিয়া ভিন্ন দেশীয় বীজ বুনা বিধেয়। ভাল বীজ এক বিঘায় ২৷৷০ মণের অধিক লাগে না।

৪। বপন। ক্ষেতের মাটী চাসের দ্বারা অন্যূন আড় হাত পরিমাণে খনন করিয়া বেশ চূর্ণ করিয়া দিবে। চারি ধারের আলি বাহিরের দিকে রাখিয়া চারিদিকে ঘুরাইয়া প্রায় এক হাত পরিসর আল রাখিয়া দিবে এই জুলির জন্য আর স্বতন্ত্র মাটী খুঁড়িতে হয় না, ধারের মাটী ক্ষেতের দিকে তুলিয়া দিলেই জুলি পড়িয়া যায়। সেই জুলি হইতে চারি হাত ব্যবধানে উত্তর দক্ষিণ ভাবে লম্বালম্বি সমস্ত ক্ষেতে নালা করিতে হয়। এ নালাও ঐরূপ স্বতন্ত্র মাটী না খুঁড়িয়া দুই ধারের মাটী দুই দিকের ক্ষেতের উপর তুলিয়া দিলেই মাঝখানটী নালা হইয়া পড়িবে। নালা রাখিবার কারণ, জল ছিটাইয়া না দিয়া নালার ভিতর জল সেচিয়া দিলে অনেক ক্ষণ সে জল থাকে এবং তাহার উভয় পার্শ্বস্থ ক্ষেত্রের মাটী ভালরূপ ভিজিতে পারে। উভয় নালার মধ্যবর্ত্তী জায়গায় প্রায় দেড়হাত ব্যবধানে পূর্ব্ব পশ্চিমে সারি করিয়া আধ-হাত অন্তর বীজ বপন করিবে। কেহ কেহ এক হাত অন্তর সারি করেন, কিন্তু তাহা ভাল নহে, পরে আর মাটী তুলিয়া দেওয়া যায় না। পূর্ব্ব পশ্চিমে সারি করা প্রশস্ত এই জন্য যে তাহা হইলে তাপ কিছু কম লাগে। বীজের যে দিকে চোখ দেখা যায় সেই দিক উপরে রাখিয়া বুনিতে হয়।

৫। পালন। বীজ বোনা হইলে যতদিন না অঙ্কুর বাহির হয়, ততদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ বৈকালে ঐ সকল সারির উপর জল ছিটাইয়া দিতে হয়। জল একেবারে বেশী দেওয়া ভাল নয়, তাহাতে বীজ পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা। গাছ একটু বড় হইলে সারির মাটী তুলিয়া গাছের গোড়ায় দিতে হয়, আর নিস্তেজ গাছগুলি তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। তার পর একবার নালাগুলিতে বেশ করিয়া জল সেচিয়া দিয়া আবার ২।৩ দিন পরে পুনরায় গাছের গোড়ায় মাটী দিতে হয়। জল মাটী

একবার দেওয়া হইলে আবার ১০।১২ দিন পরে ঐরূপ করিতে হয়। এই প্রকারে দিনকতক পুনঃ পুনঃ জল মাটী দিতে হইবে। দেখিতে দেখিতে শীঘ্রই গাছগুলি স্তেজ হইয়া বাড়িয়া উঠিবে। মাঝে একবার আলু তুলিয়া লওয়া হইলে পুনরায় আলি বাঁধিয়া দিতে হয়, এবং গাছের গোড়ায় আগে কিছু ভস্ম দিয়া মাটী দিলে ভাল হয়। তার পর আবার জল সেচিয়া দিতে হয়। গাছগুলি যদি বেশী বড় হইয়া পড়ে, আগাগুলি একটু করিয়া মুছড়াইয়া দিলে আর ছড়িয়া পড়ে না।

৬। ফল-সংগ্রহ। বীজ আগে বোনা থাকিলে অগ্রহায়ণ মাসের শেষাশেষি কতক আলু খাইবার উপযুক্ত হয়। বাছিয়া বাছিয়া তাহা তুলিতে হয়। তুলিবার সময় একটু সাবধানে আলি ভাঙ্গা আবশ্যক। অস্ত্রাদি ব্যবহার করিলে গাছের শিকড় আদি কাটিয়া যাইবার আশঙ্কা, সুতরাং হাত দিয়া বা বাঁশের চটি দিয়া ভাঙ্গাই সুবিধা। তার পর আর এক বার মাঘ মাসের শেষে কি ফাল্গুন মাসের প্রথমে তোলাই ব্যবস্থা। গাছ একবার মরিয়া গেলে আলু তুলিতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। তাহাতে বীজ ভাল হয় না। যাহাদের আলু বেশী বড় করিবার ইচ্ছা, তাহাদিগকে অগ্রহায়ণ মাসের মাঝা মাঝি আলি ভাঙ্গিয়া এক গাছে চার পাঁচটী মাত্র ফল রাখিয়া ছোট ছোট গুলি তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হয়, এবং তখনই গাছের আগাগুলি মুচড়াইয়া দিতে হয়। তার পর প্রতি-মাসেই একবার করিয়া গোড়া খুঁড়িয়া ছোট আলুগুলি ফেলিয়া দিলে, আর ভাল রূপে পালন করিতে পারিলে, একসের সওয়া সের পর্য্যন্ত ওজনের এক একটী আলু হইয়া থাকে। আগা গোড়া পালন ভাল হইলে প্রতি বিঘায় ৮০ হইতে ১০০মণ পর্য্যন্ত আলু জন্মিতে পারে।

আলুর চাস যে বিশেষ একটা শক্ত ব্যাপার তাহা নহে, অথচ ইহাতে লাভ বেশ আছে। এক বিঘার যদি ৮০ মণও ফলে, গড় পড়তা ১৫০ হিসাবে মণ করিলে তবু ১২০ টাকা হয়। খরচ খরচা বাদ অর্দ্ধেকের উপর লাভ থাকে। ইহা বড় সামান্য কথা নহে। আশ্চর্য্য আমাদের দেশের কৃষকেরা আজও ইহার প্রকৃত স্বাদ বুঝিতে পারিল না। Mr. Knight বলেন, 'আলুর ন্যায় লাভজনক চাস আর নাই; খুব সাবধানে ভাল রকমে সার দিয়া ক্ষেত তৈয়ার করিয়া ভাল বীজ বুনিয়া ভাল রকমে পালন করিতে পারিলে বিঘা প্রতি ২৫০মণ পর্য্যন্ত আলু জন্মাইতে পারা যায়, ভাবিয়া দেখ লাভ কত টাকা!' আমরা ঠিক অত পরিমাণে ফসল উৎপন্ন করিতে পারি বা না পারি, কিন্তু কথাটা সকলের ভাবিয়া দেখা উচিত। সাহিত্য দর্শনের পাতাই ঘাঁট, আর নাটের কচ্‌-কচি করিয়াই কাল কাটাও, উদর নামক রাক্ষসটার পূজা আগে চাই। নহিলে সে সকল যজ্ঞেই বড় বিঘ্ন ঘটায়। সুতরাং সেই পূজার যাহা প্রধান উপকরণ তাহার প্রতি একটু মনোযোগ করিলে অনেক মঙ্গলের সম্ভাবনা।

জীবচক্ষু ও কিরণমালা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আলোকের প্রতিফলন গুণে অনেক কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। এই গুণটী ও ইহার কার্য্য-কলাপ বিবৃত করিবার পূর্ব্বে আলোক, দর্পণ ও চক্ষের সম্বন্ধ পরম্পরা ও তৎসহযোগে উৎপন্ন কার্য্য প্রণালী বিবৃত করা গেল।

দর্পণ দুই প্রকার বক্র ও সরল দর্পণ নির্ম্মাণকৌশল আবিষ্কারের পূর্ব্বে স্বচ্ছ জলই যে প্রথমে দর্পণ কার্য্য সমাধা করিত এবং স্বচ্ছ জলই যে দর্পণাদর্শ হইয়া ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সরল দর্পণ, ভাষা কথায় যাহাকে "আরসী" বলে তাহা সকল ঘরেই আছে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাহাতে মুখ দেখেন। কিন্তু দর্শক বাম হস্ত তুলিলে দর্পণ-অভ্যন্তরবাসী প্রতিবিম্ব দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করে তাহার কারণ কি? জিজ্ঞাসা করিলে অনেকেই উত্তর দিবেন আরসীর ভিতর ছবি উল্টা দেখায় তাই। কিন্তু আমরা যদি তাঁহাদের মত কাটিয়া দিয়া বলি যে মানুষে মানুষে দেখা হইলেও পরস্পরের বিপরীত বলা লক্ষ হয়। তাহা হইলে কি পাঠক অনুধাবন করিবেন যে জগৎ তাঁহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও বিপরীত। বস্তুত জগৎ তাই। জগৎ তোমাকে চায় না। তুমি যতক্ষণ তাহার মনের মতন হইয়া চলিতে পারিবে জগৎ ততক্ষণ তোমাকে স্থান দিবে, ততক্ষণ জগৎ তোমার। এ জগতে আরসীর ভিতর ছবি দেখা আর আত্মনিধনচ্ছবি দেখা একই কথা।

আরসীর ছবি ও বহির্জগৎ মানব নয়নে যদি এক হয় তবে উহা মানব প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও বিপরীত। কিন্তু বিভিন্ন ও বিপরীত হইলেও মানব উহা ত্যাগ করিতে পারিবে না, বহির্জগতের সহিত এক হইয়া তাহাকে কার্য্য সাধন করিতেই হয়। এই একত্ব সাধন না করিতে পারিলে সে মনুষ্যত্বের কিছুই করিতে পারে না।

এক কথায় উপরি-উক্ত প্রশ্নের জবাব "একত্ব সাধন"। বিজ্ঞান মতে ইহার সরল ব্যাখ্যা "সরল দর্পণে স্খলিত ছবি সরল, এক ও ক্ষণস্থায়ী।" যাহা বিপরীত, সরল দর্পণে তাহা সোজা ও এক।

সরল দর্পণস্খলিত প্রতিবিম্বের ব্যাখ্যা বুঝাইতে হইলে প্রথমে একটী বিন্দু দর্পণ ভিতরে কি প্রকারে অবস্থান করে তাহা দেখ। বিন্দুটী উৎপত্তিস্থলে যেরূপ ও যে ভাবে আছে মানবের চক্ষে ঠিক সেইরূপ ও সেই ভাবে পড়িল, কিন্তু মানব দর্পণ ভিতরে দেখিল বিপরীত। সবাই দেখিয়াছেন একখানি চাদর কুঁচাইয়া দুই ভাঁজে ধরিলে, চাদরের যেখানটী মুচাড়িয়া থাকে সে স্থানটী চাদরের উভয় প্রান্ত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন লক্ষিত হয়। কিরণশলাকাও ঠিক এই ভাবেই দর্পণ ভিতরে পতিত হয়। মানবের অক্ষি-তারকায় পদার্থ ঠিক আইসে, কিন্তু দর্পণে উহা বিভিন্ন ও বিপরীত দৃষ্ট হয়।

বক্র দর্পণে যে প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় তাহা স্বতন্ত্র। সম্মুখস্থ দর্শক দর্পণ ভিতরে আত্ম-প্রতিকৃতি ঊর্দ্ধ পদ হেট মুণ্ড সমাধি-আশ্রিত যোগীর ন্যায় দর্শন করেন। এবার তাঁহার দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন কালে দর্পণ-বাসী প্রতিকৃতিও দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করে; কিন্তু বিপরীত ভাবে। সাবধানে পরীক্ষা করিলে দৃষ্ট হইবে যে প্রতিকৃতিটীর হ্রাস বৃদ্ধি দর্শকের স্থিতির অবস্থার সহিত অনুপাত হয়।

বক্র দর্পণে দৃষ্ট প্রতিকৃতি বিপর্য্যস্ত অথচ স্থায়ী। ইহা আধারে অঙ্কিত করিলে দর্শকের স্থায়ী প্রতিকৃতি প্রদান করে। যাহারা ফটোগ্রাফ তুলে তাহারা বক্র দর্পণের এই গুণের নিকট বিশেষ ঋণী।

উল্লিখিত হইয়াছে যে প্রথমে জলই দর্পণের আদর্শ ও কার্য্য সমাধা করিত। স্বচ্ছ জলে একটী কাচশলাকা নিমগ্ন করিলে দেখা যায় যে শলাকাটী ভগ্নাকারে অবস্থান করিতেছে। শলাকার যে অংশটী জলের উপর আছে তাহা ঠিক একস্থানই অধিকার করিয়া আছে। জল-নিমগ্ন অংশটী ঈষৎ উত্তোলিত হইয়াছে মাত্র। পল্লিগ্রামে যাহারা কোচের দ্বারা মৎস্য সংগ্রহ করে তাহারা জলমগ্ন মৎস্যের অবস্থান ঈষৎ নিম্নে স্থির করিয়া লয়, আবার জল-পূর্ণ পাত্রতল মানব নয়নে ঈষৎ ঊর্দ্ধে দৃষ্ট হয়। এ সকলের কারণ কি? আলোকের প্রতিফলন গুণে এই সকল ঘটনা সংসাধিত হয়। মানব নয়নকে প্রতারণা করাই ইহাদের কার্য্য। ইহারা পদার্থ সকলের যথার্থ স্থান ভ্রষ্ট করিয়া দেয়।

পাঠক, প্রাতঃস্নান কর দেখিতে পাইবে অরুণ মূর্ত্তি উদয়ের কিছু পূর্ব্বে তোমার নয়ন গোচর হইতেছে, আবার সায়ংকালে ভগবান মরীচিমালী অস্তাচল চূড়া অবলম্বন করিলেই রক্ত তপনের ভাস্বর মূর্ত্তি তোমার নয়নে প্রতিঘাত করিতেছে। এটীও প্রতিফলনের গুণে। এই ঘটনাটীর বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিতে গেলে মনে করিতে হইবে যে, এই বায়ু রাশি যাহা পৃথিবীর চতুর্দ্দিক আবরণ করিয়া রহিয়াছে, তাহা যেন ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিভক্ত। স্তর-গুলি এই পৃথ্বী-তলের সহিত যেন সমান্তরাল সরল রেখা। ঊর্দ্ধ স্তর গুলির ভার নিম্নস্থ গুলির অপেক্ষা অধিক পরিমাণে গাঢ়। গাঢ় স্তর বিরল স্তর হইতে অধিক পরিমাণে প্রতি-ফালিক। সূর্য্যকিরণ সেই স্তর হইতে স্তরান্তরে ক্রমে ক্রমে বায়ু রাশি ভেদ করিতে করিতে বক্র হইয়া দর্শকের অক্ষিকে প্রতারণা করিয়া অযথার্থ স্থানে সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টির মিসর আক্রমণ কালে বিজ্ঞানবিৎ মঞ্জী মিসর যাত্রা করেন। মৃগতৃষ্ণা বা মারীচিকা অতি পূর্ব্বেও সকলের বিদিত ছিল, কিন্তু এই ঘটনা কেন যে ঘটে একথার যথার্থ তথ্য এতদিন পরে মঞ্জী এই সময়ে কোনও প্রত্যক্ষ ঘটনা উপলক্ষে মীমাংসা করিয়াছিলেন।

মঞ্জীর মতে এই আলোকধার্দ্ধার বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিতে ঔৎসুক্য জন্মে। তিনি বলেন ইহা একটি প্রতিফালিক ঘটনা। বায়ুস্তরের গাঢ়তা ভেদে এই ঘটনা উৎপন্ন হয়। সৌর কিরণতপ্ত বায়ুকারাশি এই সকল স্তর ভেদের কারণ। সর্ব্বপ্রধান

বিরল স্তর সর্ব্বনিম্নে থাকে। উক্ত পদার্থের দীপ্তি-শলাকা অল্প অল্প প্রতিসারিক স্তরগুলি অতিক্রম করে। গাঢ়তানুসারে প্রতিসারিক ক্ষমতারও হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এক স্তর হইতে স্তরান্তরে দীপ্তিশলাকা প্রবেশ কালে ক্রমে বক্রতা প্রাপ্ত হয়। অবশেষে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া পড়ে। পরে বিপরীত দিকে ক্রমে ক্রমে সেই সেই ক্রমান্বয় স্তর গুলি গাঢ় হইয়া স্বচ্ছ মানস-সরোবরের ন্যায় উক্ত পদার্থের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করে।

আলোকের বেগ অতি প্রবল। পৃথিবীস্থ পদার্থে তাহার নিদর্শন পাওয়া কঠিন। ফিনামার জ্যোতির্বিদ রোমারের মতে এই প্রবল বেগের অনুধাবন কল্পনা করিতে গেলে এই প্রকার করিতে হইবে যে পৃথিবী হইতে একটী কামান গোলা সূর্য্যলোকে চালিত হইলে উহার উক্ত লোক প্রাপ্ত হইতে ১৭ বৎসরের অধিক লাগে কিন্তু আলোক দ্যুলোক হইতে ভূলোকে ৮' ১৮" মধ্যে আইসে।

চক্ষের সহিত চশমার সম্বন্ধ অতি নিকট। তজ্জন্য অক্ষিগঠন ও পরকলার ভেদাভেদ জ্ঞান থাকা প্রয়োজনীয়। পরকলার স্থাপন ও গঠন ভেদে অনুবীক্ষণ দূরবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে বিশেষ অধিক কিছু আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। যাহাই হউক, মহাত্মা নিউটন প্রথমে পীত কিরণকে পরকলায় বিচ্ছিন্ন করেন এবং বিশ্লেষিত কিরণকেই আবার পীত কিরণে পরিবর্ত্তিত করেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পীত কিরণ অমিশ্র নহে। পূর্ব্বোক্ত সাত প্রকার বিমিশ্র কিরণে একত্রিত হইয়া ঐ মিশ্র কিরণ উৎপন্ন হয়।

হিন্দু দার্শনিকগণ মীমাংসা করিয়াছিলেন যে, সূর্য্যই পদার্থ সকলের বর্ণ প্রদানকর্ত্তা। কচি কচি শ্যামল পত্রগুলি সৌর কিরণেই বিবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই পক্ষান্তরে, আওতা লাগিলে বৃক্ষের তেজ হ্রাস হয়। মহাত্মা নিউটনও এই মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন পদার্থ সকলের নিজের কোন বর্ণ নাই, কিন্তু পীত কিরণ বিচ্ছিন্ন করিবার ক্ষমতা তাহাদের আছে। তাঁহার মতে সিন্দুর একটী পদার্থ, উহা স্বয়ং লাল নহে এবং উহার লাল কিরণ গ্রাস করিবার ক্ষমতা নাই। যে সকল বৃক্ষপত্র সবুজ, ঐ পত্র সকল সবুজ ভিন্ন সকল কিরণশলাকা গ্রাস করিতে সক্ষম। সাদা কথায়, সিন্দুর বা বৃক্ষপত্র সকল লাল বা সবুজ নহে। কিরণশলাকার বর্ণ ও তৎঘটিত আপনাদের কার্য্যোপযোগীই উহারা বিসর্গের ন্যায় আশ্রয়-ভাগী হইয়া থাকে। অর্থাৎ লালে, লাল, বেগুনে বেগুনী, জরদে জরদ, ও সবুজে সবুজ ইত্যাদি বর্ণ প্রাপ্ত হয়।

(ক্রমশঃ)

অক্ষয়চরিত-সমালোচনা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

অক্ষয় বাবু বাঙ্গালা ভাষার জীবন, এ বিষয়ে দ্বিমত নাই; কিন্তু সুযোগ্য অক্ষয়-চরিতলেখক, সেই অক্ষয় বাবুর ভাষা-সম্বন্ধেই কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ব-প্রস্তাবে বর্ণন করা গিয়াছে। তিনি কি উদ্দেশ্যে কি ভাবে জীবনচরিত লিখিয়াছেন, তাহা বুঝিতে এখন আর কাহারও বাকী নাই। তিনি মহোদয় অক্ষয়কুমার দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্য-লোপের প্রয়াস করিয়া কি প্রকার কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এস্থলে তাহাই দেখান যাইতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক্ষণেও বলিতেছি, লেখক মহাশয় আদি ব্রাহ্ম সমাজের যন্ত্রালয়ে পুস্তিকাখানি মুদ্রিত করিতে গিয়া স্বাধীনত্ব-রত্ন বিসর্জ্জন দিয়াছেন। অক্ষয় বাবু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মন হইতে বেদ-বেদান্ত-সংক্রান্ত ভ্রান্তি অপসারিত করিয়া দেন, ইহা অতি প্রসিদ্ধ কথা। চরিতাখ্যায়ক তাহা অস্বীকার করিতে গিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার লেখা অতিমাত্র অস্পষ্ট, সুতরাং সেই বিষয় বিশদ রূপে হৃদয়-ঙ্গম করাইবার জন্য শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায়-বিরচিত "অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত" হইতে সেই অংশ প্রদর্শিত হইল,—

"১।—পূর্ব্বে বেদান্তদর্শনের মতই ব্রাহ্ম সমাজের মত ছিল। সে মত এই, "একমাত্র পুরম ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; যেমন অন্ধকারে রজ্জুতে সর্পের ভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের সত্তাতে জগতের ভ্রম হইতেছে। কেবল ব্রহ্মই বিদ্যমান আছেন জগৎ সৃষ্টিও হয় নাই, এখনও নাই। জগৎ সৃষ্টি কখন হইবেও না। জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নাই, ঐ উভয়ই অভিন্ন। বেদান্ত দর্শনের এই অদ্বৈতবাদ মতই ব্রাহ্ম সমাজের মত বলিয়া গণ্য ছিল *।" অক্ষয় বাবু (তত্ত্ববোধিনী সভায় ও ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইবার পর হইতে) সর্ব্বদাই মনে করিতেন, একালে এরূপ অলীক মত অবলম্বন ও প্রচার করা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। ন্যূনাধিক ২১ একবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে এই ভ্রমাত্মক কুসংস্কার-মূলক মতের আপত্তি উত্থাপিত করিয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত বারংবার বিচার করেন, এবং শেষে এক দিন দেবেন্দ্র বাবুর বাটীতে বৈকালে তাঁহার পুষ্করিণীর নিকটে একটি একতালা ছোট কুঠরীতে বসিয়া শেষ বিচার করেন। তাহাতে তাঁহাকে অনেক যুক্তি ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করায় তিনি উহা বুঝিতে পারিয়া অক্ষয় বাবুর মত স্বীকার ও অবলম্বন করিলেন। * * ঐ মত তৎকালে সমাজে প্রবল ও প্রচলিত ছিল বলিয়া, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচার আরম্ভ হইলেও কতক সংখ্যক তত্ত্ববোধিনীতে উহা মুদ্রিত হয়। অতঃপর ঐ মত তত্ত্ববোধিনীতে প্রচার হওয়া রহিত হইয়া যায়। তখন ইঁহার বয়স প্রায় ২৩ ত্রয়োবিংশতি বৎসর।

* নববার্ষিকী, ১২৮৪ সাল, ১৮২ পৃষ্ঠা।

"২ ।—ইনি সমাজের মতে আর এক ঘোরতর ভ্রম দেখিয়াছিলেন। তাহা সংশোধিত করিতে ইঁহাকে ক্রমাগত অনেক বৎসর বিস্তর ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। সেই মত এই,—সমাজে যে-লোকেই সাক্ষাৎ ঈশ্বর-প্রণীত, সুতরাং অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস ছিল এবং বৈদিক ধর্ম্মকে অর্থাৎ বেদের জ্ঞানকাণ্ডকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা হইত যে বেদের অধিকাংশ প্রাচীন মনুষ্য-জাতির অসভ্যতা ও অজ্ঞান-প্রভাবের পরিচায়ক, খ্রীষ্টাব্দের উনবিংশ শতাব্দীতে অর্থাৎ এই জ্ঞানোজ্জ্বল সময়ে তাহা ঈশ্বর-প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করিলে ও তাহা ব্রাহ্ম-সমাজের মত বলিয়া প্রচারিত হইলে, সুশিক্ষিত লোকের নিকট লজ্জা ও ঘৃণার বিষয় হইবে; তাহা হইলে তাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি দৃক্‌পাতও করিবেন না, এইটি মনে করিয়া ইনি সর্ব্বদা ভগ্ন-চিত্ত হইতেন। ইনি তত্ত্ববোধিনী সভাতে ও ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া অবধি উহার প্রতিবাদ করেন। যেরূপ বয়ঃক্রমের সময়ে বৈদান্তিক মত আক্রমণ করেন, প্রায় তাদৃশ সময়ে বেদকেও মনুষ্য-বিরচিত ভ্রান্তি-মূলক বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছিলেন। "কিন্তু পূর্ব্বাবধি দেবেন্দ্র বাবু বেদকে অভ্রান্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া তদনুসারে চলিতেন। অক্ষয় বাবু পূর্ব্ব হইতেই কোন পুস্তক যে অভ্রান্ত হইতে পারে না, তাহা বুঝিয়াছিলেন। তিনি অনেক প্রকার তর্ক, যুক্তি ও বিজ্ঞান দ্বারা বুঝাইয়া দিলেও, দেবেন্দ্রবাবু সুদৃঢ় সংস্কার বশতঃ বেদকে ছাড়িতে চাহিতেন না †।"

† ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত, ১৪৫—১৪৭ পৃষ্ঠা।

ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুও কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজে আসিয়া যোগ দেন। * * রাজনারায়ণ বাবু অক্ষয় বাবুর পক্ষ সমর্থন করা দূরে থাকুক, দেবেন্দ্র বাবুর ভ্রমাত্মক মতের অনুমোদন করিলেন। অক্ষয় কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ বাবুকে এই মতের দোষকতা না করাতে একেই তো এতাবৎ, কাল নিতান্ত বিষণ্ণ মনে কালাতিপাত করিতেছিলেন, রাজনারায়ণ বাবুর ঐ ব্যবহারে তদপেক্ষা আরও অধিক দুঃখ হইলেন। তখন অক্ষয় বাবুকে দুই বীরের সহিত যুদ্ধ করিতে হইল। * * * *

"অক্ষয় বাবু ন্যূনাধিক ৭ সাত ৮ আট বৎসর, কিংবা তাহার অধিক কাল হইবে, ক্রমাগত কেবল দেবেন্দ্র বাবুর সহিত বিচার করেন। ইঁহার বুদ্ধিশক্তি ও তর্কশক্তি অতিশয় প্রখর সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কি রাজনারায়ণ বসু অথবা অন্য কেহই ইঁহার কথা খণ্ডন করিতে পারিতেন না। বহু আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক ইনি কয়েক বৎসর দেবেন্দ্র বাবু ও রাজনারায়ণ বাবু উভয়েরই সহিত তর্ক করিয়া বুঝাইয়া দিলে দেবেন্দ্র বাবু অবশেষে বুঝিতে পারিলেন যে, "ধর্ম্মের মূলভূমি কোন পুস্তক হইতে পারে না ‡।" এইরূপে ইনি "সমাজ হইতে বেদের আধিপত্য উঠাইয়া দিয়া সভাকে ধর্ম্ম পুস্তক-রূপে প্রতিপন্ন করতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া প্রথম প্রচার করেন ††।" ১৭৯২ শকের ৭ বৈশাখের পরে ব্রাহ্ম-সমাজ বেদ-শৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত হইল। * * *

‡ ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত, ১৪৭ পৃষ্ঠা।

†† ঐ ঐ

১২৫৭ সালে কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া অনন্য-সাধারণ সাধুতা সহকারে এই কার্য্য সংসাধন করিয়া ইঁহার কত দূর যে হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা উক্ত শক অর্থাৎ ১৭৭২ শক ও তৎ-পরবর্ত্তী ১৭৭৩ শকের সাংবৎসরিক বক্তৃতা পাঠ করিলেই সুন্দররূপ বুঝিতে পারা যাইবে‡। ব্রাহ্ম সমাজ-সংস্থাপক রাজা রামমোহন রায়েরও যে এই রূপ মত ছিল, তাহাও ইনি যুক্তি সহকারে প্রদর্শন করিয়াছেন।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার, ১৭৭২ শকের ফাল্গুনে, একবিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের প্রথম বক্তৃতা পাঠ করিলেই, তাহা সাধারণে বুঝিতে পারিবেন; বাহুল্য-ভয়ে এখানে উদ্ধৃত করিলাম না।

‡ বেদের অভ্রান্ততা-বিরোধী অক্ষয় বাবু যখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, তখন বেদের অভ্রান্ততা-বিষয়ে কিছু কিছু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে লিখিত হইত, ইহার কারণ কি? তাহা দত্তজ মহাশয়ের লেখনী-মুখ হইতে বিনির্গত হয় নাই। ইহার বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১৭৮৮ শকের পৌষ ও ফাল্গুন মাসের অপক্ষপাত নামক পত্রিকায় "বেদ-ঈশ্বর-প্রণীত শাস্ত্র নহে" এই কথাটি লিখিত হয়। এই কথার উত্তর লিখিবার জন্য দেবেন্দ্র বাবু অক্ষয় বাবুকে বলেন। অক্ষয় বাবু বলেন, "আমার লেখনী হইতে এরূপ বিষয়ের লেখা নির্গত হইবার নয়।" তৎপরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসু মহাশয়েরা একত্র হইয়া উক্ত শকের মাঘ ও চৈত্র মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে অপক্ষপাত পত্রিকার উত্তর লেখেন। তাহাতে বেদ ঈশ্বর-প্রণীত অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া লিখিত হইয়াছে।"

"১৭৭০ শকের ১১ই মাঘে সাংবৎসরিক সমাজের দিবসে অক্ষয় বাবু ব্রাহ্ম-সমাজ-মন্দিরের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া দিলেন,—

"এক এক অসীম-প্রায় সৌর জগৎ যে বিশ্বরূপ মূল গ্রন্থের এক এক পত্র-স্বরূপ, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, ধূমকেতু যাহার অক্ষর-স্বরূপ, এবং যাহার এই সমস্ত অবিনশ্বর অক্ষর অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়ী মসী দ্বারা লিখিতবৎ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই যথার্থ অবিকৃত অভ্রান্ত শাস্ত্র। যে দেশের যে কোন ব্যক্তি এই অতি প্রগাঢ় মূল গ্রন্থ ভক্তরূপে পাঠ ও তাহার যথার্থ অর্থ প্রতীতি করিতে পারেন, তিনিই স্বয়ং কৃতার্থ হইয়া অন্য লোকের ভ্রান্তি দূর করিতে সমর্থ হন। প্রকৃত জ্ঞান-উপার্জ্জনের আর অন্য উপায় নাই, যথার্থ ধর্ম্ম-শিক্ষার আর দ্বিতীয় পথ নাই। নানাদেশীয় পূর্ব্বতন শাস্ত্রকারেরা যদি এই মূল গ্রন্থের অভিপ্রায় সমুদায় সম্যক্-রূপে অবগত হইতে পারিতেন, এবং যে পর্য্যন্ত অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার সহিত মনঃকল্পিত ব্যাপার সমুদায় মিশ্রিত করিয়া না লিখিতেন, তবে ভূমণ্ডলের সর্ব্বস্থানে আমাদের ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম এত দিনে অতি প্রাচীন ধর্ম্ম বলিয়া গণিত হইত।"— [তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা, ১৭৭৩শক, ফাল্গুন।]

"৩।— কেবল চিন্তনাদি দ্বারা ব্রহ্মের আরাধনা করা সকলের পক্ষে তাদৃশ সুবিধা-জনক, সাধ্যায়ত্ত ও সহজ কাজ নহে, সুতরাং স্থূল-দর্শীর পক্ষে তাহা কঠোর ব্যাপার বলিয়া প্রথমতঃ অনুমিত হইতে থাকে। বিশেষতঃ এ-দেশীয় অশিক্ষিত নারী জাতি তো আবার দুর্ব্বল অধিকারী। এই নিমিত্ত

দেবেন্দ্র বাবু এই মত স্থির করেন ও প্রচার করিতে উদ্যত হন যে, স্ত্রীলোকেরা পুষ্প, চন্দন ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। এমন কি, তিনি এইরূপ কার্য্য করাইতে প্রবৃত্তও হইয়াছিলেন। কাঁচড়াপাড়ার কোন কোন বৈদ্য-পরিবারে† তন্ত্রোক্ত ব্রাহ্ম-মন্ত্র শ্রীধর ন্যায়রত্ন দ্বারা উপদেশ করান। এরূপ করার তাৎপর্য্য এই, দেবেন্দ্র বাবুর সিদ্ধান্ত এদেশীয় স্ত্রীলোকেরা যেরূপ দুর্ব্বল-মতি, তাহাতে তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া কঠিন; কিন্তু অক্ষয় বাবুর বুদ্ধি-শক্তি ও চিন্ত-প্রবৃত্তি যেরূপ বিশাল ও দূরদর্শী, তাহাতে ইনি কেন ঐ আপাততঃ মনোরম মতের অনুমোদন করিবেন? তজ্জন্য ঐ মতের প্রতিবাদ করিয়া ইনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত ঘোরতর তর্ক-যুদ্ধে তৃতীয় বার প্রবেশ করিয়াছিলেন। শেষে দেবেন্দ্র বাবুকে ঐ মত কাজে কাজেই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তদবধি ঐ দোষাকর মত আর সমাজ স্পর্শ করিতে পারে নাই।"

বাবু মহেন্দ্রনাথ রায়-প্রণীত অক্ষয় বাবুর জীবন-চরিতে ঐরূপ লেখা আছে। কিন্তু অক্ষয়-চরিত-লেখক কি বলেন, শ্রবণ করুন,—

"কে না বলিবেন অক্ষয় বাবু অনেক প্রকারে দেশের হিতসাধন করিয়া যান। কে না ইহাও বলিবেন যে তাঁহার কি, কাহারও অবথা গৌরব বৃদ্ধি করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। তিনি যাহা করেন নাই, সে বিষয়ের আমরা উল্লেখ করিতাম না; কিন্তু যখন দেখিতেছি যে, তিনি কতক গুলি কার্য্যের কারণ স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন অথচ প্রকৃত পক্ষে তিনি তাহা নহে, তখন সত্যের অনুরোধে আমাদিগের আর মৌনাবলম্বন করা বিধেয় নহে। 'বেদ অভ্রান্ত ও ঈশ্বর প্রণীত' এই মত, পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি আদি ব্রাহ্ম সমাজ হইতে নিরাকরণ ও 'ব্রহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থ সঙ্কলন বিষয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়তা করা, প্রভৃতি কার্য্য যে তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ ভুল। ব্রাহ্মধর্ম্ম সঙ্কলন করিবার সময়, তিনি কোনও রূপে মহর্ষির সহায়তা করেন নাই। তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্যে তাঁহার কোন কোন লেখা আছে। তাহাও মহর্ষির দ্বারা সংশোধিত। আদি ব্রাহ্ম সমাজে 'বেদ ঈশ্বর প্রণীত ও অভ্রান্ত' এই মত এক সময়ে ছিল। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহারা তদনুসারে উপদেশ দেন। ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন নামে জনৈক উপাচার্য্য রাম-অবতার বিদ্যা পর্য্যন্ত বেদি হইতে বক্তৃতা করেন, তিনি ইহাতে কখনও বিশ্বাস করেন নাই।* এস্থলে আমরা বলিতে বাধ্য হইলাম না, তখনকার সাপ্তাহিক নিয়ম

† "শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র রায় ও লোকনাথ রায়ের।"

* "The Indian Messenger, Sunday, May 30, 1886."

† "পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত ৩১ ও ৩২ পৃষ্ঠা; ৭ম কল্প ১ম ভাগ ১৯২ পৃষ্ঠা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় "প্রত্যভিজ্ঞান" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখ।"

দ্বারা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস এই ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়াছে। আদি ব্রাহ্মসমাজে কখনও পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিবার বিধি ছিল না; অক্ষয় বাবুর কর্তৃকও তাহা রহিত হয় নাই। একবার কাচড়াপাড়া নিবাসী লোকনাথ রায় ও জগচ্চন্দ্র রায় মহাশয়দিগের বাটীতে শ্রীধর ন্যায়রত্ন কর্তৃক এরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু দেবেন্দ্র বাবু বিশেষ রূপ অনুরুদ্ধ হইয়া ইহাতে মত দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই এক বিশেষ ঘটনা, এরূপ কার্য্যের আর কুত্রাপিও অনুষ্ঠান হয় নাই। ইহার জন্য আমরা ঠাকুর মহোদয়ের প্রতি কোন দোষারোপ করিতে পারি না; যেহেতু নিরীশ্বর হইয়া থাকা অপেক্ষা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া কোনও প্রকারে তাঁহার উপাসনা করা বরং ভাল।"—(অক্ষয়চরিত ৪০ ও ৪১ পৃষ্ঠা)।

উল্লিখিত স্থল এত জটিল করিয়া বর্ণিত হইয়াছে যে কাহাকেও তাহা বুঝাইতে হইলে, স্পষ্ট করিয়া দেওয়া আবশ্যক। উহা পাঠ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এক রূপ বুঝিবেন, আর ইতিহাসাভিজ্ঞ ভিন্ন রূপ বুঝিবেন, এই কারণে উহাকে প্রাঞ্জল করিয়া দিলাম।

১। 'বেদ অভ্রান্ত ও ঈশ্বর প্রণীত এই মত"

২। "এবং পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি আদি ব্রাহ্ম সমাজ হইতে নিরাকরণ"

৩। "ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সঙ্কলন বিষয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহায়তা করা প্রভৃতি যে কার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ ভুল।" ব্রাহ্মধর্ম্ম সঙ্কলন করিবার সময় তিনি কোনও রূপে মহর্ষির সহায়তা করেন নাই। তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্যে তাঁহার কোন কোন লেখা আছে। তাহাও মহর্ষির দ্বারা সংশোধিত।"

৪। "এস্থলে আমরা বলিতে বাধ্য হইলাম যে, তখনকার সাপ্তাহিক মিরর দ্বারা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস, ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়াছে।"

৫। "আদি ব্রাহ্মসমাজে কখনও পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিবার বিধি ছিল না; অক্ষয় বাবুর কর্তৃকও তাহা রহিত হয় নাই। একবার কাচড়াপাড়া-নিবাসী লোকনাথ রায় ও জগচ্চন্দ্র রায় মহাশয়দিগের বাটীতে শ্রীধর ন্যায়রত্ন কর্তৃক এরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু দেবেন্দ্র বাবু বিশেষ রূপ অনুরুদ্ধ হইয়া ইহাতে মত দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই এক বিশেষ ঘটনা।"

১ ও ২ চিহ্নের মতের অন্তর্গত উত্তরে কিন্তু পরেই আমরা রাশি রাশি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি। ৩ চিহ্নের মধ্যগত মতের বিষয়ে এস্থলে আলোচনা করা যাইতেছে। এই বিষয়ে দুইটী প্রমাণ আছে। লিওনার্ড প্রণীত ইংরেজী ভাষায় লিখিত ব্রাহ্মসমাজের পুরাবৃত্তে ও ইণ্ডিয়ান্ মেসেঞ্জার পত্রিকায় কি লিখিত রহিয়াছে, পাঠকেরা দর্শন করুন,—

(1) "Devendranath Thakur wrote the exposition of the first part, (Brahma Dharma) jointly with Akshaykumar Datta and

Rajnarayan Basu. The exposition of the second part was written long after by Pandit Ayodhyanath Pakrasi a minister of the *Samaj*"—[Leonard's History of the Brahma Samaj, pp – 89 and 90.)

(২) "Besides editing the *Tattwabodhini*, he helped the venerable Maharshi Devendranath Tagore, in compiling his celebrated book called Brahma Dharma.,'—
—[Indian Messenger, May 30, 1886.]

অক্ষয় বাবু, দেবেন্দ্র বাবুকে বেদ-বেদান্তের ভ্রম বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, এই কথা অস্বীকার করিতে গিয়া লেখক যে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইতেছে। তিনি ঐ সূত্রে অক্ষয় কুমারের অপরাপর কীর্ত্তিও অপলাপ করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ-প্রযত্ন হইলেন। এ স্থলে আমাদের বড়ই এক কৌতুক বোধ হইয়াছে। "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থ সঙ্কলন-বিষয়ে অক্ষয় বাবু দেবেন্দ্র বাবুর সাহায্য করিতেন, ইহা লিওনার্ডের উক্তিতে সপ্রমাণ হইল। মহেন্দ্রনাথ রায়ের জীবনীতে ইহা কেন উল্লিখিত হয় নাই, বলিতে পারি না। ঐ ঘটনা অস্বীকার না করিলেও, উহা প্রমাণিত হইল। আর, বিশুদ্ধ বাবু নিজেই স্বীকার করিয়া লইলেন, "ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্যে অক্ষয় বাবুর কোন কোন লেখা আছে।" ভরসা করি, মহেন্দ্র বাবু এই ঘটনা-দ্বয় ভবিষ্যতে স্বপুস্তকে লিপিবদ্ধ করিবেন।

৪ চিহ্নের মধ্যে যে সকল কথা দৃষ্ট হইতেছে, তদ্বিষয়ে এই মাত্র বক্তব্য যে দেবেন্দ্র বাবু বেদকে ঈশ্বর-বিরচিত শাস্ত্র অতএব অভ্রান্ত, এই রূপ বলিতেন কি না পাঠকগণ দেখুন,—

১। "প্রথমাবস্থায় ব্রাহ্মগণ বেদকে অভ্রান্ত ও স্বয়ং ব্রহ্মের রূপান্তর মাত্র বলিয়া স্বীকার করিতেন এবং নানা প্রকার অসত্য ও কুসংস্কার বিশ্বাস করিতেন। আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম সমাজে সংযুক্ত হইলে পরও ব্রাহ্মগণ দ্বারা ঐ সমস্ত মত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মত বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। আমাদিগের প্রধানাচার্য্য মহাশয় অনেক দিন পর্য্যন্ত সরল উৎসাহের সহিত তাঁহাদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন এবং প্রায় বিংশতি ব্রাহ্ম সংবতে ব্রাহ্মসমাজ ক্রমে ক্রমে ঐ সকল ভ্রমের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে।"—[ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৭৯৪ শক, ১৫ বৈশাখ, ৩১২ পৃষ্ঠা।]

"২। বেদাদি গ্রন্থের অভ্রান্ততা বিষয় যে ভয়ানক মত এই সমুদায় ব্যাপারের মূলে গূঢ়রূপে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহা যখনই বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চ্চাতে প্রকাশিত হইল, তখনই বিবেকের অনুরোধে ও ঈশ্বরের আদেশে আপনি উহা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম ভ্রাতৃদিগকে তাহা হইতে মুক্ত করিলেন।"—[ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত, ২৯৩ পৃষ্ঠা।]

৩ "It was with his (Babu Devendra nath Thakur's) sanction also that (after much conflict) the authority of the Veda was given up."—[Brahma Year Book 1876, p 9.]

লেখক এখনও কি বলিতে ইচ্ছা করেন, "তখনকার সাপ্তাহিক মিত্রের দ্বারা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস এই ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়াছে?" "ধর্ম্মতত্ত্ব," "ব্রাহ্ম

সমাজের ইতিবৃত্ত' মিস্ কলেটের ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ইয়ার্ বুকে অর্থাৎ বার্ষিক বিবরণে কি ভ্রমক্রমে ঐ কথা লিখিত হইয়াছে?

বিশ্বাস বাবুর লিখিত "বেদ অভ্রান্ত ও ঈশ্বর-প্রণীত এই মত এবং পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি আদি ব্রাহ্ম সমাজ হইতে নিরাকৃত" এই বিষয়টী মহানুভাব অক্ষয় বাবুর প্রযত্নে দেবেন্দ্র বাবুর মন হইতে তিরোহিত হয় কি না, তাহার প্রমাণ ক্রমান্বয়ে পাঠক মহাশয়েরা দৃষ্টি করুন।

১ম (প্রথম) প্রমাণ

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুনে (১২৮৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে) ইণ্ডিয়ান মিরারে লিখিত হয়,—

"These significant words in the History of the Brahma Samaj 'that the *Vedantic doctrines were untenable' flowed from the lips of Babu Akshaykumar ever since he joined it; and he strenuously fought for about eight years with Babu Tagore† to prove that, his beliefs in the Vedas as an infallible revelation were erroneous.* I consider it almost superfluous to cite, in support of my statements, the evidence of an old member of the Calcutta Brahma Samaj, as no one knows better than our Pradhan Acharya that, Babu Akshaykumar tried his heart and soul *before the arrival of the four Pandits from Benares* whither they had been sent to be indoctrinated in the knowledge of the Vedas,—*to erase out of his mind the beliefs in their infallible authority.*

"2. None of the authors of the History of the Calcutta Brahma Samaj has made any mention of its belief in Pantheism. Discourses after discourses appeared in the several numbers of the "*Tattwa-bodhini Patrika*" on the subject, and not a passing remark has been made in reference to it. It was believed that, the external objects which we perceive has no real existence in nature and consequently the most pernicious doctrine of the Vedânta, viz., "অহমাত্মা ব্রহ্ম" "অহং ব্রহ্মাস্মি" "সর্ব্বং" was inculcated by the Samâj and publicly preached by its leading members. The philosophic mind of the author of [illegible] successfully struggled to scratch out this belief from the mind of Babu Devendranath and from those of his brethren. Thus Brâhma Samâj got rid of its absurd belief in *Pantheism, through the exertions of Bâbu Akshaykumâr Datta.*

"3. The Hindu mind which was for centuries the hot bed of superstition and idolatry, and which was now learning to worship God in spirit, met with a serious reaction. Although it was believed in principle by the leaders of the Brâhma Samâj that, "adoration implies only the elevation of mind to the conviction of the existence of the Omnipresent Deity, as testified by His wise and wonderful works. And continual contemplation of His power as so displayed, together with a constant sense of the gratitude which we naturally owe to Him for our existence, sensation, and comfort" yet the old idea of administering *Mantras* (মন্ত্র) to individuals and families and to teach them to worship *Brahma* with offerings of flowers and viands caught hold of Babu Tagore's mind, so much so that, under his instructions, Pandit Sridhar Nyayaratna made the family of Jagatchandra Roy and Lokenath Roy of Kachrapara his শিষ্য (disciples) by administering Mantras to them from Mahanirvan Tantra. It was owing to the remonstrance of Akshaykumar that this most ridiculous practice was given up, and was no more thought of.

"4. The broad principles laid down by Raja Rammohan Roy in the Trust Deed of the Calcutta Brahma Samaj

† Babu Devendranath Tagore.

clearly indicate that it was his best endeavour to infuse into the Brahma Samaj the spirit of true and wide catholicity. But unfortunately it was lost sight of by his adherents after his death,—as evident from the early issues of the "*Tattwabodhini Patrika*," and also from the Book called the Brahmadharma published in 1850, containing extracts from the Hindu Sastras only, to the entire exclusion of the sublimer truths to be found in the Scriptures of other nations of the world. The sharp intellect of Babu Akshaykumar at once perceived the error into which his brethren had fallen, and in the two discourses published in the *Tattwabodhini Patrika* of Falgun 1772 & 1773 (Sak era) wrote about the catholicity of Brahmaism —discourses which I suppose even the Brahmas of the present day would do well to pursue with care. The liberal and broad views which the members of the Brahma Samaj of India have manifested by their late publication—of the Theistic Texts—had been about thirteen years ago, most emphatically preached by Babu Akshaykumar at the Bhawanipur Brahma Samaj (See Tattwabodhini Patrika No. 141, pages 10 and 11)"*

পাঠক দেখিলেন, পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা-প্রণালী অক্ষয়কুমার দত্ত রহিত করেন কি না।

২য় (দ্বিতীয়) প্রমাণ

১৭৯০ শকের ১৬ই বৈশাখে (১২৭৮ সালে) ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত মুদ্রিত হয়। তাহাতে দুই স্থানে উহা স্বীকৃত হইয়াছে।

১। "অক্ষয় বাবুর বুদ্ধি-শক্তি এবং তর্ক-শক্তি অতিশয় প্রখর ছিল। দেবেন্দ্র বাবু বেদকে সমূহ শ্রদ্ধা করিতেন এবং অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া তদনুসারে চলিতেন। অক্ষয় বাবু পূর্ব্ব হইতেই কোন পুস্তক যে অভ্রান্ত হইতে পারে না, তাহা বুঝিয়াছিলেন। তিনি অনেক প্রকার তর্ক, যুক্তি ও বিজ্ঞান দ্বারা বুঝাইয়া দিলেও, দেবেন্দ্র বাবু সুদৃঢ় সংস্কার বশতঃ বেদকে ছাড়িতে চাহিতেন না। অবশেষে বুঝিতে পারিলেন যে, ধর্ম্মের মূলভূমি কোন পুস্তক হইতে পারে না। কিন্তু মূলভূমি কি, তাহা তখন বিশেষ রূপে কাহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। অক্ষয় বাবু বুদ্ধিবৃত্তি এবং স্বভাবকে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া প্রচার করেন।"—[ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত, ১৪৫ ও ১৪৬ পৃষ্ঠা।]

২। "সমাজ হইতে বেদের আধিপত্য উঠাইয়া দিয়া স্বভাবকে ধর্ম্মপুস্তক-রূপে প্রতিপন্ন করতঃ তিনিই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া প্রথম প্রচার করেন।"—[ঐ, ১৫ পৃষ্ঠা]

৩য় (তৃতীয়) প্রমাণ

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মিস্ কলেট্ ব্রাহ্ম সমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে কি লেখেন, পাঠকগণ দেখুন,—

"Conflicts of opinion, which had for sometime past been going on between Devendranath Thakur and——Akshay kumar Datta, on the question of vedic infallibility, were now renewed with greater force. Finally truth triumphed; the Brahma Samaj abjured the infallibility of the Vedas."—[Miss Collet's Historical Sketch of the Brahma Samaj, 1873, p 7.]

৪র্থ (চতুর্থ) প্রমাণ

১২৮৪ সালে "নবযাত্রিকা" পুস্তকে অনেক খ্যাতিমান্ লোকদিগের জীবন-চরিত

* Indian Mirror, July 15, 1868.

প্রচারিত হয়। উহাতে অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনীও মুদ্রিত হয়। প্রথমে দেবেন্দ্র বাবুর জীবন চরিতে কি লেখা আছে, পাঠক দেখুন—

১। "শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের যত্ন-বলে ইনি বেদকে পরিত্যাগ করিলেন। ব্রাহ্ম সমাজ হইতে বৈদিক ধর্ম্ম বিদায় গ্রহণ করিল।"—[নববার্ষিকী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনচরিত, ২২৩ পৃষ্ঠা।]

৫ম (পঞ্চম) প্রমাণ

২। "ইহারই যত্ন-বলে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত-সংক্রান্ত কয়েকটী গুরুতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। "একমাত্র পরব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা; যেমন অন্ধকারে সর্পের ভ্রম হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের সত্তাতে জগতের ভ্রম হইতেছে, কেবল ব্রহ্মই আছেন, জগৎ সৃষ্টিও হয় নাই, এখনও নাই, জগৎ সৃষ্টি কখন হইবেও না। জীব ও ব্রহ্ম ভেদ নাই, ঐ উভয়ই অভিন্ন।" বেদান্ত দর্শনের এই অদ্বৈত বাদ মতই ব্রাহ্ম সমাজের মত বলিয়া গণ্য ছিল। দত্তজ এই মতের ভ্রম প্রদর্শন করেন এবং তদবধি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উহা ব্রাহ্ম সমাজের মত হইতে পরিত্যাগ করেন। ইঁহারই যত্ন এবং যুক্তিবলে বেদের অভ্রান্তত্বও অস্বীকৃত হয়। ক্রমাগত ৭ সাত বৎসর কাল ইঁহাকে এই বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতে হইয়াছিল।" —[নববার্ষিকী, ১২৮৪ সাল, ১৮৯ পৃষ্ঠা।]

৩। "এদেশীয় স্ত্রীলোকেরা যেরূপ দুর্ব্বলমতি, তাহাতে তাঁহাদিগের পক্ষে ব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া কঠিন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সিদ্ধান্ত করিয়া এই রূপ অবধারিত করেন যে, স্ত্রীলোকেরা পুষ্প, চন্দন ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। এমন কি, তিনি এইরূপ কার্য্য করাইতে প্রবৃত্তও হইয়াছিলেন। পরিশেষে দত্তজ ইহারও প্রতিবাদ করায়, তিনি বিরত হইলেন।"—[নববার্ষিকী, অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনী ১৮৯ ও ১৯০ পৃষ্ঠা।]

৬ষ্ঠ (ষষ্ঠ) প্রমাণ

স্বয়ং কেশবচন্দ্র সেন নববার্ষিকীর সমালোচনা উপলক্ষে ইণ্ডিয়ান্ মিরারে লেখেন,—

"How wonderfully the intellectual keenness and love of research, which for 16 sixteen years nearly characterized this remarkable man, drove away a vast amount of error and superstition from the Brahma Samaj, is known almost to every member of our Church. Babu Devendranath Tagore owes to a very great extent to Akshay Babu his deliverance from the Pantheism and errors of the Vedas and Upanishads. This fact should be widely known in justice to the latter. The negative, critical, and destructive part of the work of the Brahma Samaj, thirty years ago, was principally done by him; without him the *Tattwabodhini Sava* could not have done half the work it has performed; and but for the power of his pen, and boldness of his thought, the Tattwabodhini Patrika could never have reached the high and brilliant position which it once occupied."

—[Indian Mirror, 15th July, 1877.]

৭ম (সপ্তম) প্রমাণ

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে লিওনার্ড সাহেব ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্তে যাহা লিপিবদ্ধ করেন, তাহা এই,—

"There were conflicts of opinion between Devendranath Thakur and Akshaykumar Datta, on the question of Vedic infallibili-

ty, the Latter being against the doctrine of such infallibility. Finally truth triumphed, the Brahma Samaj abjured the said doctrine (theVedas as the revealed word of God)"—[*Leonard's History of the Brâhma Samaj, p. 90.*]

৮ম (অষ্টম) প্রমাণ

সুবিখ্যাত ডাক্তার মোনিয়ার উইলিয়াম্‌স্ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ নবেম্বরে গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের রয়াল এসিয়াটিক সমাজে Indian Theistic Reformers অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় একেশ্বর-বাদী সংস্কারকগণ নামে যে বক্তৃতা পাঠ করেন, তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে,—

"This journal (Tattwabodhini Patrika) was started in August 1843, and was well edited by Akshaykumar Dutta, an earnest member of the theistic party. Its first aim seems to have been the dissemination of Vedantic doctrine, though its editor had no belief in the infallibility of the Veda, and was himself in favour of the widest catholicity. He afterwards converted Devendranath to his own views."—[Religious Thought and Life in India, by Prof. Monier Williams. M. A., C. I. E., Part I, 1883, p. 492.]

৯ম (নবম) প্রমাণ

পণ্ডিতবর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদিত "কল্পদ্রুম" পত্রে "দেবগণের মর্ত্তে আগমন" প্রস্তাবে কি লেখা আছে, দেখুন,—

"তিনি পিতামহের বেদ লইয়া ৭ সাত বৎসর কাল তুমুল আন্দোলন করেন এবং অনেক তর্ক বিতর্কের পর সাধারণকে বুঝাইয়া দেন যে, বেদ অভ্রান্ত নহে।"

—[দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত কল্পদ্রুম, ৭ম খণ্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা।

১০ম (দশম) প্রমাণ

"তাঁহারই চেষ্টায় ব্রাহ্ম সমাজ হইতে বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করা তিরোহিত হয়। তাঁহার নিকটে ব্রাহ্ম সমাজ ঋণী, সন্দেহ নাই।"—[ভেরি ও দুন্দুভি, ১২৯২ সাল, ১৩ই ভাদ্র।]

১১শ (একাদশ) প্রমাণ,

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায়ের প্রণীত অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত পুস্তক প্রচারের পর আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি, নানা-গ্রন্থ-প্রণেতা বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ১২৯২ সালের ৮ই আশ্বিনে "সুরভি" পত্রিকায় অক্ষয় বাবুর জীবনচরিতের প্রতিবাদ করিতে করিতেও স্বীকার করিতে বাধ্য হন,—

"মহেন্দ্র বাবু আমাদিগের অতিশয় কৃতজ্ঞতার পাত্র। তিনি এই জীবনী লিখিতে বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন। উহা সাধারণ দ্বারা আদরে গৃহীত হইলে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইব। কিন্তু আমি দুঃখিত হইয়া বলিতেছি যে, গ্রন্থের কোন কোন স্থল অতিরঞ্জিত * বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ যে স্থানে ব্রহ্মসমাজ দ্বারা বেদের প্রত্যাদেশের মত পরিত্যাগের কথা আছে। মহেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন যে, অক্ষয় বাবু এই মত পরিত্যাগের প্রধান কারণ। কথা যথার্থ।

আদি ব্রহ্মসমাজের সভাপতি মাননীয়

* মহেন্দ্র বাবুর বর্ণনা যে অতিরঞ্জিত নয়, তাহার বৃত্তান্ত মহেন্দ্র বাবু ১২৯১ সালের ২১ আশ্বিনে সুরভিতে লেখেন। ১২৯৩ সালের চৈত্রের নব্যভারত দেখ।

নারায়ণ বাবুও কি বক হইয়াছেন বলিয়া "সাপাহিক ব্রিরার" সহসা ভ্রমে নিপতিত হইলেন, এইটী নকুড় বাবু বলিতে সাহস করিবেন?

১২শ (দ্বাদশ) প্রমাণ

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী অক্ষয় বাবুর লোকান্তর গমনের পর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০এ মে তারিখে ইণ্ডিয়ান্ মেসেঞ্জার পত্রিকায় যাহা প্রচার করেন, তাহার একাংশ এই;—

"During his (Akshayakumar Datta's) connection with the Samaj he represented the rational element of the body and had a principal hand in discarding the doctrine of the infallibility of the Vedas. In that connection his name will be forever remembered in the history of the Brahma Samaj."—[The Indian Messenger, 30th May, 1886.]

১৩শ (ত্রয়োদশ) প্রমাণ

ব্রাহ্ম সমাজের পুরাবৃত্ত-লেখক, সম্মানভাজন, শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল পাইন্, অক্ষয় বাবুর স্বর্গারোহণের পর The Akshaykumar Datta and his principal work in the Adi Brahma Samaj অর্থাৎ লোকান্তরিত অক্ষয়কুমার দত্ত ও আদি ব্রাহ্ম সমাজে তাঁহা কর্ত্তৃক সম্পাদিত প্রধান প্রধান কার্য্য" এই শিরস্ক এক প্রস্তাব ইণ্ডিয়ান্ মেসেঞ্জার পত্রিকায় মুদ্রিত করেন। তাহাতে স্পষ্ট লিখিত আছে—,

"He with his clear perception of things, saw unmistakably the errors and absurdities of Vedantism. He therefore could not agree with his colleagues ever since he entered the *Sabha* at the close of 1839 or in the beginning of 1840 (during the cold season of 1761.) With the light of Western literature and science, and of his deep researches into the Hindu scriptures, he waged a continued war with the errors and prejudices of Babu Devendranath Thakur on the subject of Vedic infallibility for about eight years during which time he succeeded in correcting and removing them one after another. Babu Devendranath was convinced that the Vedantic doctrines of Pantheism and annihilation of the soul were untenable, that the practice of administering *mantras* from the Aryan Scriptures to individuals and families while initiating them into Brahmoism was not in consonance with the spirit of that religion, that the offering of flowers and viands to the invisible and formless Deity, while engaged in adoring Him, was inconsistent with the spiritual worship inculcated in the Brahmo Dharma, that the belief in the transmigration of the soul as taught in the Vedas, was perfectly opposed to the law of progress established by the divine hand, and that his belief in the Vedas as an infallible revelation was erroneous.

"Thus through the continued exertions of our late and respected friend, Babu Devendranath relinquished in 1949 his faith in the Vedas as the sole foundation of belief. Vide the following extract from his reply to a letter addressed to him in 1867 by Babu Keshub Chandra Sen and others.—

"কিন্তু যখন আবার এই উপনিষদে দেখিলাম, "অয়মাত্মা ব্রহ্ম," "সোঽহমস্মি" "তত্ত্বমসি" 'এই আত্মা ব্রহ্ম,' 'তিনি আমি' 'তিনি তুমি' তখনই বুঝিলাম যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল তত্ত্বের সহিত ইহার সকল বাক্যের ঐক্য নাই। আবার যখন কাহাতে দেখিলাম যে, যাঁহারা গ্রামে থাকিয়া যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে,

তাহারা মৃত্যুর পর ধূমকে প্রাপ্ত হয়, ধূম হইতে রাত্রিকে, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষকে কৃষ্ণপক্ষ হইতে দক্ষিণায়নের মাস সকলকে, দক্ষিণায়নের মাস সকল হইতে পিতৃলোককে পিতৃলোক হইতে আকাশকে, আকাশ হইতে চন্দ্রকে প্রাপ্ত হয়, এবং সেই চন্দ্রলোক হইতে বিদ্যুৎ হইয়া আকাশকে প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ুকে প্রাপ্ত হয়, বায়ু হইয়া ধূম হয়, ধূম হইতে বাষ্প হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বর্ষিত হয়; তাহারা এখানে ব্রীহি, যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল, মাষ হইয়া উৎপন্ন হয়। সেই ব্রীহি, যব, তিল, মাষাদি অন্ন যে ভক্ষণ করে, সেই স্ত্রী পুরুষ হইতে তাহারা এখানে জীব হইয়া জন্ম গ্রহণ করে,—তখনই এ সকল বাক্যকে অমোঘ কল্পনা বলিয়া বোধ হয়। আবার যখন তাহাতে দেখিলাম ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের মুক্তি নির্ব্বাণ মুক্তি, তখন আমার আত্মা তাহাতে ভয় দর্শন করিল। "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপং বিহায়। তথা বিদ্বান্ নামরূপাৎ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং॥" যেমন নদী সকল স্যন্দমান হইয়া নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রেতে লীন হন, সেই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির নাম রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর পুর্ণ পুরুষকে প্রাপ্ত হয়। ইহা তো মুক্তির লক্ষণ নহে, ইহা ভয়ানক প্রলয়ের লক্ষণ। কোথায় ব্রাহ্ম ধর্ম্মে আত্মার অনন্ত উন্নতি, আর কোথায় বেদান্তে তাহার এই নির্ব্বাণ মুক্তি পরস্পর অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় পরস্পর বিভিন্ন। বেদান্তের এই নির্ব্বাণ মুক্তি আমার আত্মাতে স্থান পাইল না।"—[Indian Messenger, 16th June, 1886.]

১৪শ (চতুর্দশ) প্রমাণ

১৮০৮ শকের কার্ত্তিক মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, মহেন্দ্র বাবুর প্রণীত অক্ষয় বাবুর জীবন-বৃত্তান্তের প্রতিবাদ করিয়া যাহা লেখেন, তাহার মধ্যে স্বীকার করিয়াছেন,—

১ "এই বেদ-বেদান্ত লইয়া শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত অক্ষয়কুমার দত্তের তুমুল তর্ক উপস্থিত হয়।"—[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৮০৮ শক, কার্ত্তিক মাস, ১৩৬ পৃষ্ঠা।]

"এই বেদকে বহিষ্কৃত করিবার জন্য শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার ব্যাপক কাল তর্ক হয়।"—[ঐ, ১৩৬ ও ১৩৭ পৃষ্ঠা দেখ।]

১৫শ (পঞ্চদশ) প্রমাণ

"এই বেদ ও বেদান্ত লইয়া শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত অক্ষয়কুমার দত্তের তুমুল তর্ক উপস্থিত হয়।"—[ব্রাহ্ম সমাজ ও অক্ষয়কুমার দত্ত, ৫ পৃষ্ঠা।]

২। "এই বেদকে বহিষ্কৃত করিবার জন্য শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার ব্যাপক কাল তর্ক হয়। * * স্থলতঃ এই তর্ক বিতর্ক দ্বারা এবং নিজের আলোচনার এবং বারাণসী হইতে প্রত্যাগত বেদজ্ঞ পণ্ডিতদিগের বেদ ব্যাখ্যায় শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বুঝিলেন, কর্ম্ম ও জ্ঞান এই উভয় কাণ্ডাত্মক বেদের সমগ্র হইতে কেবল পরমাত্ম-তত্ত্ব সত্যজ্ঞান উদ্ধৃত করিয়া তাহাই লোকের মুক্তির জন্য প্রচার করা আবশ্যক।"—[আদি ব্রাহ্ম-সমাজে মুদ্রিত

ব্রাহ্ম সমাজ ও অক্ষয়কুমারদত্ত, নামক পুস্তক ৭ ও ৮ পৃষ্ঠা।]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার "সাপ্তাহিক মিরর" মত নিঃসন্দেহ ভ্রমে পড়িয়াছেন।

১৬শ (ষোড়শ) প্রমাণ

"তত্ত্ববোধিনীর সুবিখ্যাত সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে (বেদ-বেদান্তের ভ্রম-বিষয়ে) তাঁহার (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের) সর্ব্বদা তর্ক বিতর্ক হইত।"—[সখা, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ, ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন-চরিত প্রস্তাব দেখ।]

১৭ (সপ্তদশ) প্রমাণ

"অক্ষয়কুমারের অসাধারণ প্রতিভায় ও পাণ্ডিত্য-বলে তত্ত্ববোধিনীর শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাঁহার যুক্তি ও তর্ক দ্বারা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেদের অভ্রান্ততা-বিষয়ক ভ্রম ও কুসংস্কার-পূর্ণ মত তিরোহিত হয়, এ সকল বিষয় সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ ও চির-বিদিত।"

—[নব্যভারত, ১২৯১ সাল, ফাল্গুন।]

পাঠকেরা এখন বিচার করিয়া দেখুন, কেবল "সাপ্তাহিক মিরর দ্বারা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেদের অভ্রান্ততার বিশ্বাস এই ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়াছে" কি না। দেবেন্দ্র বাবুর নিজের সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও কি ভ্রমবশতঃ স্বীকৃত হইয়াছে, "বেদবেদান্ত লইয়া শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত অক্ষয়কুমার দত্তের তুমুল তর্ক উপস্থিত হয়?" বলি, আদি ব্রাহ্ম সমাজের বাবুও ভ্রম-ক্রমে ঐ বিষয় স্বীকার করিলেন না কি?

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত যে যে বিষয়ের কোনই সম্পর্ক নাই, এরূপ ঘটনাও "অক্ষয়চরিত" পুস্তকে সমাবেশিত নাই। ব্রাহ্ম-সমাজে সেই সেই কার্য্যগুলি দত্তজ মহোদয়ের কীর্ত্তি। উদার মত ও ধর্ম্মের বিজ্ঞানসিদ্ধ ভিত্তি, এই দুই বিষয়ও কি কারণে হে বিশ্বাস বাবু! আপনি বর্ণন করিলেন না? সেই দুই বৃত্তান্ত পশ্চাৎ বিবৃত হইল।

১। "ব্রাহ্মধর্ম্ম-সংক্রান্ত সমুদয় তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, আর কিছুই নির্দ্ধারিত হইবার সম্ভাবনা নাই, আমাদিগের এরূপ অভিপ্রায় নয়। ধর্ম্ম-বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যাহা নির্ণীত হইয়াছে, এবং উত্তর কালে যাহা নির্ণীত হইবে, সে সমুদয়ই আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্গত। সহস্র শতাব্দী পরেও যদি কোন অভিনব ধর্ম্ম-তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়, তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম। আমরা ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সম্প্রদায়ের ন্যায় ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষা করিতে ভীত হই না এবং ইয়ুরোপীয় খ্রীষ্টান্ সম্প্রদায়ের ন্যায় কোন অভিনব বিদ্যার প্রচার দেখিয়াও কম্পিত হই না। আমরা অবনীমণ্ডল ঘূর্ণন শুনিয়াও শঙ্কিত হই না এবং তদর্থে ক্রুদ্ধ হইয়া সিসা-নগরীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে নিগ্রহ করিতেও প্রবৃত্ত হই না। আমরা ইতিপূর্ব্বে ভূতত্ত্ব বিদ্যার উৎপত্তি শুনিয়াও সচকিত হই নাই, এবং অধুনা জর্জ্জ কুম্ব্-প্রণীত অদ্ভুত পুস্তক-প্রচার-বিষয়েও প্রতিকূল হই নাই। অখিল সংসারই আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদিগের আচার্য্য। ভাস্কর ও আর্য্যভট্ট এবং নিউটন ও লাপ্লাস্ যে কিছু যথার্থ বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র গৌতম ও কণাদ এবং বেকন্ ও কোম্ত্ যে কোন প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। কণ্ঠ ও তলবকার, মুষা ও মহম্মদ্ এবং যিশু

ও চৈতন্য পরমার্থ-বিষয়ে যে কিছু তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও আমাদের ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্রমে ক্রমে কেবলই বৃদ্ধি হইবে এবং শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উত্তরোত্তর অনির্ব্বচনীয় রূপ উৎপন্ন হইবে।"—[১৭৭৭ শক, বৈশাখের তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা অথবা মহেন্দ্র বাবুর প্রণীত অক্ষয় বাবুর জীবনবৃত্তান্ত ৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা দেখ।]

জিজ্ঞাস্য করি, ব্রাহ্ম সমাজে মত বিষয়ে এত দূর উন্নত অভিপ্রায় অক্ষয় বাবুর পূর্ব্বে কেহও প্রকটন করিয়াছেন কি?

২। "ইহার পর ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম-সংক্রান্ত আর একটি মত প্রবর্ত্তিত করিবার মানস করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানই প্রকৃত নিশ্চিত জ্ঞানের আকর, সুতরাং বিজ্ঞান-লব্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম মনুষ্যের কার্য্যের নিয়ামক হওয়া উচিত। তদনুযায়ী কার্য্য করা বিজ্ঞানবিৎ প্রধানতম পণ্ডিত-কুলের স্থির নিশ্চয় হইয়াছে; কিন্তু অদ্যাপি কোন দেশের ধর্ম্ম-শাস্ত্রে এবম্ভূত উচ্চ মত সন্নিবিষ্ট হয় নাই। বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ মত শিক্ষিত-সমাজে স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। বিজ্ঞান-বলে পরাভূত হইয়া হিন্দুধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পাইতেছে। বিজ্ঞান-প্রভাবে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বার বার ম্লানমান হইয়াছে। ম্লানমান কেন? বিজ্ঞানবিৎ প্রধানতম শিক্ষিত-সমাজের অসেব্য হইয়া উঠিয়াছে। অবশেষে বিজ্ঞানেরই অধীনত্ব অঙ্গীকার করিয়া এবং স্ত্রীলোক, অশিক্ষিত লোক ও অবিশুদ্ধ-বুদ্ধি অন্য লোকের শরণাপন্ন হইয়া কোন রূপে জীবন রক্ষা করিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিজ্ঞান-সম্মত ও অবনী-মণ্ডলের হিতগর্ভ মহোপকারিক হয়, অর্থাৎ ব্রাহ্মেরা বিজ্ঞান-সিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে আপনার আত্মপরিজনের, স্বদেশীয় জনসমাজের ও সমগ্র মানব-কুলের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক সর্ব্বাংশে ভূলোকের হিত-সাধন করাকে পরমেশ্বরের প্রকৃত উপাসনা ও আপনাদের প্রকৃত ধর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন, ইহাই ইহাঁর অভিপ্রেত। এই হেতু ইনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধর্ম্মনীতি ও বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশ করেন।"* *

বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপনের শেষ ভাগে তদ্বিষয়ের বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায়। যাঁহারা তাহা জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

কেবল যে মহেন্দ্র বাবুর প্রণীত জীবনীতেই উক্ত মত আমরা দেখিতে পাই, তাহা নহে, অন্যত্রও লিখিত হইয়াছে,—"ইহার মতে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কার্য্য করাই ধর্ম্ম এবং না করাই অধর্ম্ম।" [নববার্ষিকী, ১৯০ পৃষ্ঠা।]

আরও কিছু দেখাইতেছি,

"মহাত্মা রামমোহন রায় যে যথার্থকর পারসীক বচনটি সচরাচর আবৃত্তি করিতেন * সেই বচনে এবং পশ্চাল্লিখিত মহাভারতীয় বচনে যে মহোচ্চ পরম ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, ইহার মতে তাহাই প্রধান ধর্ম্ম ও তাহাই ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনা।

---

* "মানব-কুলের হিত-সাধন করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসনা"—[ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের ইং ১৮৫৫ সালের বিজ্ঞাপনিকার ৮০ পৃষ্ঠা দেখ।]

"নহীদৃশং সংবন্ধনং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে। দয়া মৈত্রী চ ভূতেষু দানঞ্চ মধুরা চ বাক্॥"

"ত্রিভুবনে প্রাণিগণের প্রতি দয়া প্রকাশ, বন্ধুভাব প্রদর্শন, সুমিষ্ট বাক্য প্রয়োগ, এবং দানানুষ্ঠান—এই সমুদায়ের সদৃশ ঈশ্বরোপাসনা আর নাই।

"অক্ষয় বাবুর মত এই যে, যাহাতে শরীর, বুদ্ধি ও ধর্ম-প্রবৃত্তির যুগপৎ সদ্গতি-সাধন হয়, ব্রাহ্মধর্ম্মে তাহার ব্যবস্থা থাকা উচিত, এবং সেই সমুদায়কে আপনাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্ম-গণের তাহা অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-পুস্তকের ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বা পরিচ্ছেদে উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নিয়ম-পরিপালনের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন ও তৎ-সংক্রান্ত উপদেশ প্রদান করা বিধেয় এবং ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ে তদনুযায়ী অনুষ্ঠান-প্রণালী প্রচলন করা আবশ্যক। ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘনে ভৌতিক পাপ, শারীরিক-নিয়ম লঙ্ঘনে শারীরিক পাপ, বুদ্ধি ও ধর্ম্মনীতি-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘনে মানসিক পাপ উৎপন্ন হয়। সেইরূপ, ভৌতিক-নিয়ম-পালনে ভৌতিক ধর্ম্ম, শারীরিক-নিয়ম-পালনে শারীরিক ধর্ম্ম এবং বুদ্ধি ও ধর্ম্মনীতি-বিষয়ক নিয়ম-পালনে মানসিক ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম কখন কি এই অভ্রান্ত প্রমাণ অবলম্বন করিয়া সকল ধর্ম্মের শিরোভাগ হইতে পারিবেন? যাহাবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার গ্রন্থের উপসংহারে এই বিজ্ঞান-সম্মত বিষয় অতিপ্রায় সুস্পষ্ট ব্যক্ত রহিয়াছে।"

পাঠকেরা একটু মনোযোগ করিলেই বুঝিতে পারেন, নানা স্থানে নানা লোকে অক্ষয়কুমার দত্তের নিকট ব্রাহ্ম সমাজ ঋণী, এইরূপ বলিয়া থাকেন কেন? অক্ষয় বাবু যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের উপকার না করিতেন, তবে তাঁহার মৃত্যুর পর ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম-মন্দিরে ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার গুণকীর্ত্তন কেন হইয়াছিল? কয়েকটী প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে,—

১। "অক্ষয় বাবুর নিকট ব্রাহ্ম সমাজ বিশেষ রূপে ঋণী আছেন, সন্দেহ নাই।"—[ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত, ২৬ পৃষ্ঠা।]

২। "Babu Akshaykumar Datta was in his days the life and soul of the Brahma Samaj."—[Indian Mirror, September 1, 1878.]

৩। "The Tattwabodhini Patrika (Started in 1843 and still continuing) was then edited by Akshaykumar Datta who * * was a *bold* and *acute thinker* to *whom* Brahmic Samaj *owes much*."—[Brahma Year Book, 1877, p 30.]

৪। "In that connection his name will be long remembered in the History of the Brahma Samaj."—[Indian Messenger, 30th May, 1886.]

৫। "Our heartfelt gratitude is due to Babu Akshaykumar, the father of Bengali Literature and Science, and once the most progressive element in the Calcutta Brahma Samaj by repudiating so many of its erroneous and fallacious belief, and that our Samaj is highly indebted to him for the elaborate and unrivalled essays and discourses on scientific, social, moral and religious subjects, which he for twelve years published in the Patrika (Tattwabodhini Patrika)—its organ."—[Indian Mirror, July 15, 1868.]

৬। "Resolved that the committee has received with deep sorrow, the mournful news of the death of Babu Akshaykumar Datta and greatly remembers the many valuable services that he once rendered to the cause of Brahma Samaj and his self-

denying labours for the promotion of religious and social reform."—12th June, 1886. Sadharan Brahma Samaj.

৭। "তাঁহার নিকটে ব্রাহ্ম সমাজ ঋণী হইতে নাই।"—[ভেরি ও কুশদহ, ১২৯২ সাল, ৩ ভাগ।]

৮ "We are glad the book has been published, as it is a tribute not only to the literary genius, but also to the early growth and principles of the Brahma Samaj of which *Akshay* Babu was at one time the *brightest ornament*.—[*Interpreter, Sept.* 1885.]

জন সাধারণ এখন বুঝিতে পারিলেন, নকুড়চন্দ্র বাবু কিরূপ সত্যপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি এতই সত্যনিষ্ঠ ধার্ম্মিক ব্যক্তি যে, অক্ষয় বাবুর প্রাপ্য গৌরবও তাঁহাকে সমর্পণ করিতেও কুণ্ঠিত। তাঁহার সাড়ম্বর উক্তি "কাহারও অযথা গৌরব বৃদ্ধি করা কাঁহারও উচিত নহে" কোথায় রহিল? অক্ষয় বাবুর যশঃ বিলোপ করা এই রূপ লোক দ্বারা কখনই সম্ভবপর নয়। বিশ্বাস বাবু প্রমাণ ব্যতিরেকেই অম্লান বদনে অক্ষয়কুমারের কীর্ত্তি ধ্বংসের প্রয়াস পাইয়া বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হইলেন! এবার এই পর্য্যন্তই আলোচিত হইল। বারান্তরে অন্যান্য কথা লিখিত হইবে।*

শ্রীগোবিন্দদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাঙ্গালার নবীন কবি ও কাব্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কবি পো (Poe) অতি অল্প কথায় ভাবময় অর্থপূর্ণ ও হৃদয়-সংবেদ্য কবিতার একটি সংজ্ঞা করিয়াছেন। The poetry of words is the rhymical creation of beauty. যে কবির হৃদয়ে সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি নাই, যিনি নূতন সৃষ্টি করিতে অশক্ত তাঁহার কবিতার মধ্যে মাধুর্য্যের উৎস উৎসারিত হইয়া পাঠকের হৃদয়কে উর্ব্বর ও সরস করিতে সমর্থ হয় না; তাঁহার কাব্য বিড়ম্বনা, তাঁহার চেষ্টা বা উদ্যম প্রশংসা লাভের হেতু মাত্র, তিনি স্থূলসূক্ষ্ম-জ্ঞানবিরহিত পাঠকের স্তুতি-বাক্যে হাতে স্বর্গ পান

নীলাময়ী প্রকৃতি নিয়তই ভাবে তরঙ্গায়িত—এই প্রকাণ্ড অণ্ডকটাহ মধ্যে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, শিশু, যুবা, রমণী, গিরি, নদী, বন, উপবন, মেঘ, বজ্র, বিদ্যুৎ প্রভৃতি আধারে জীবন্ত নব রস নিয়ত খেলা করিতেছে। মেঘমন্দ্রে, সিংহ-গর্জ্জনে, আগ্নেয়গিরির ধাতুপ্লাবনে, রৌদ্র রস নানা রাগ রুদ্রতালে আলাপ করিতেছে। উষার বদনে, পাখির কূজনে, শিশুর আননে শান্তিরস জ্যোৎস্নাপ্লাবনী ভাবের উৎপত্তি করিতেছে। এই বোধরসময়ী ভাষার অর্থবোধ জগতের পক্ষে অসম্ভব। সত্যানুসন্ধিৎসু ভূ-দেবতা কবি ভাষায়িত

* এই প্রস্তাবের ৩৬৭ পৃষ্ঠায় "মতের অন্তর্গত" স্থলে "অন্তর্গত মতের" এবং "কিন্তু" স্থলে "কিন্তু" হইবে।

কবিরা প্রভৃতির ভাষা আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। তাঁহার বিবৃতি দ্বারা জগতের সংকীর্ণতা অপনোদিত হয়। মানুষের পৌনঃপুনিক অবস্থা প্রসর হইয়া দাঁড়ায়। হেমচন্দ্র কবিতা লিখিয়া প্রথিতনামা হইয়াছেন। কবি দুই প্রকারের অবোধকী ও সত্বপ্রভাবহারী। আমরা হেমচন্দ্রকে আপাততঃ কোন শ্রেণীভুক্ত করিতে চাহি না, দেখা যাউক ইনি প্রাণময়ী কবিতার স্রষ্টা কি না। হৃদয়ময় কবি ভাবসাগরের গভীরতার মধ্যে ডুবিয়া স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল ও প্রাণরঞ্জক রত্ন সংগ্রহ করিতে অক্ষম, তাঁহার দৃষ্টি অপূর্ণ, যাহা সকলে দেখিতে পায় তিনি তাহাই দেখেন। মুদ্রিত নয়নে তিনি বিচিত্রতার সুন্দর শ্যামল ও হৃদয়লোভনকারী সুষমা দেখিতে পান না। ভাষার জটিল বেণী বিনাইতে, শব্দের সহিত শব্দের মিলন রূপ উদ্বাহ বন্ধন করিতে তিনি আপনাকে নিয়োগ করেন। সহজেই হউক আর বলপূর্ব্বকই বা হউক ঘটকালীর কারীকুরি তাঁহাকে দেখাইতেই হইবে। স্থূল ভাব লইয়া স্থূল কথায় স্থূলদর্শিস্থূল পাঠকের জন্য তিনি কবিতা লিখিয়া থাকেন। এই প্রকারের কবিকেই আলঙ্কারিকেরা সত্বপ্রভাবহারী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। হৃদয়ের, ভাবের ও প্রাণের কবি যাহা সত্য, অনবদ্য ও মহাভাবে পূর্ণ—যাহার ধ্বংস নাই বিনাশ নাই, পরিবর্ত্তন নাই—যাহা চিরদিন সমান রহিয়াছে ও চিরকাল সমান থাকিবে তাহারই গান গাহিয়া মাটির মানুষে অভিনব প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। তুমি আমি সে গান সে ভাষা বুঝিতে পারি বা না পারি তাহাতে যায় আসে না। তাঁহার আবার হৃদয় মধ্যে কুদ্র ভয় ও আশঙ্কাবিহীন অবস্থিতি বলিয়া কবির স্কন্ধে অস্পষ্টতা দোষ কেন দিতে যাইব? সরল ভাবের কবিতা যেরূপ কঠিন, বুদ্ধি (Receptiveness) তদপেক্ষা ন্যূন নহে। অনেক পাঠক যদি কবিতা পড়িয়া প্রথম পাঠেই সমস্তটা বুঝিয়া ফেলিলেন ও যদি সেই কবিতার মধ্যস্থ ভাবগুলি তাঁহার পূর্ব্ব চিন্তার সহিত মিলিয়া যাইল এমন মনে করিলেন, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। সে কবিতার মধ্যে উচ্ছ্বাস, আবেগ ও নূতন ভাবের সমাবেশ না থাকিলেও তাহাকে সুন্দর বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে ইতস্ততঃ করেন না।

মহামতি Semonides বলিতেন Painting is silent poetry and poetry is vocal painting. চিত্রের মধ্যস্থিত ভাষালোক জনিত সৌন্দর্য্য দেখিতে হইলে যেমন সূক্ষ্মদর্শিনী ও ভাবগ্রাহী নয়নের প্রয়োজন, ভাষাসঙ্কলিত কবিতা, চিত্রের মাধুর্য্য অনুভব করিবার নিমিত্ত সেইরূপ যোগশক্তিবিশিষ্ট হৃদয়ের আবশ্যক। প্রাণের স্পর্শকারিতার ইতর বিশেষে আমরা কবিতার অন্তর্ভূত ভাবকুসুমের কোমলতা ও কাঠিন্য অনুভব করিতে সক্ষম হই।

হেমচন্দ্রের "ইন্দ্রের সুধাপান" নামক কবিতার চিত্রটি আমরা পাঠকবর্গের সম্মুখীন করিতেছি। কবি Drydenএর Alexander's Feast নামক অপূর্ব্ব কবিতাটির ভাষা লইয়া ইন্দ্রের সুধাপান রচনা করিয়াছেন। প্রাগুক্ত কবিতা সম্বন্ধে কোন লেখক বলিয়াছেন—'It is the loftiest and most imaginative of all his compositions. পারসিপোলিস (Persepolis)—ধ্বংস ভূমিরা

যে সমর্থ মহাবীর অলেকজন্দর প্রিয় বিড়ম্বনা-স্বরূপা Thaïsকে লইয়া আমোদ উপভোগ করিতেছেন কবি সেই সময়ের চিত্রটি কেমন উজ্জ্বল ও সুরঞ্জিত ভাষায় অঙ্কিত করিতেছেন—

The lovely Thais by his side
Sat, like a blooming Eastern bride
In flower of youth and beauty's pride
Happy, happy, happy pair;
None but the brave
None but the brave
None but the brave deserves the fair.

Thais যেন সৌন্দর্য্যের নির্ঝর; ইহার লীলোল্লাস করনীর কাস্তিমালা উচ্ছ্বসিত হইয়া কর কর ধারে বাহির হইতেছে। কবি সমস্তের এক একটি মনোমদ কুসুমে গ্রথিত অষ্টাদশ কুসুমের যুবতী-মালিকার প্রতি সুরাপায়ী মহাবীর অপাঙ্গভঙ্গীতে চাহিতেছেন, কবি অমনি, বলিতেছেন None but the brave deserves the fair. আর, হেমচন্দ্রের ইন্দ্রের সুধাপানের প্রতিপাদ্য বিষয়, আকণ্ঠ অমৃত দলন করিয়াছেন এক্ষণে সুধাপান ও সঙ্গীত শ্রবণের বাসনা বলবতী। তাই শচীকে ডাকিয়া পীযূষ আনিতে আদেশ করিতেছেন ও নহাবন্তী গন্ধর্ব্বগুরু বিশ্বাবসুকে সঙ্গীত আলাপনের নিমিত্ত ডাকিতেছেন। বর্ণনা একই প্রকারের। স্বর্গের গায়ক Timotheus আর অমরাবতীর গায়ক বিশ্বাবসু। ইন্দ্র আদেশ করিতেছেন—

যাও চিত্ররথ সুধাভাণ্ড ভরি
আন ত্বরা করি পীযূষ লহরী
আন বাদিবর-বাদকে ডাকি।

কবি দেবতা, এই দেবতা নিজ সৃষ্টিতে সর্ব্বত্র স্বর্গানুভূতির অবতা-রণে আরোহণ করিয়া স্বর্গে মর্ত্ত্য মর্ত্তলোকে অমানুষিক কথা যাহা আমা-দিগকে বলিয়া দেন আমরা তাহাই সত্য বলিয়া মনে করিয়া লই। ইন্দ্র ভাণ্ড ভরিয়া "পীযূষ লহরী" আনিতে বলিয়াছেন, তাহাতে লহরীর আবির্ভাব যে কেমন তাহার স্বরূপ আমাদিগের উপলব্ধি হয় না। নর-লোকের ভাণ্ডজাত তৈল ঘৃত প্রভৃতির আধেয় ভিন্ন বৃহৎ বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া অসম্ভব; তবে স্বর্গে যদি নন্দনবী-প্রসাদ ভাণ্ড থাকে তাহা হইলে তাহার ভিতর সুধার উচ্ছ্বাস অসম্ভব নহে।

অলেকজন্দর ও থিয়ের যুগল মূর্ত্তির বর্ণনা আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি, মন্দার-কুসুমধারী নন্দনবিহারী ইন্দ্রের বামে শচীর রূপ পাঠকবর্গকে একবার দেখাই:—

বামে দৈত্যবালা রূপে করে আলা,
কোথা সে চঞ্চল তড়িত উজ্জ্বল,
কোথা বা উমার রূপ নিরমল?
পলকে পারে যে জগতে ভুলাতে।
আহা মরি মরি কিবা ভাগ্যধর,
যার কোলে হেন নারী মনে হয়,
কত সুখ তারি হয় রে।

—সুন্দরীর শিরোমণি পুলোমনন্দিনীর রূপের তুলনায় রূপবতী উষা ও বর্ণময়ী যামিনী কোথায় লাগে! এ রূপ পলকের মধ্যে জগত ভুলাইতে পারে। কোথায় সৌন্দর্য্যের আকর, সুরভির আলয়, অমৃত-পায়িনী সুরবালাকুলতিলকস্বরূপা শচী আর কোথায় বনোয়ার অর্দ্ধস্ফুটিত গোলাপ থিয়ে। শচী যে সুন্দরী তাহাতো আমা-দিগের মনে প্রতিভাসিত হইল বাহ্য রূপ...

বর্ণনা করিতে হইলেই "তিল-ফুল জিনি নাসা," "খঞ্জন-গঞ্জন নয়ন" প্রভৃতি শব্দ যে বসাইতেই হইবে এ কথা আমরা স্বীকার করি না। কিন্তু যতটুকু বলিতে হইবে তাহা জড়তা-বিহীন হইলেই যথেষ্ট হইল। চকল তড়িতের সহিত স্থির সৌদামিনী স্বরূপ, শচীর সাদৃশ্য তত মনোজ্ঞ হইল না। মহাজনেরা এইরূপ স্থলে 'স্থির বিজরী বরণ কিশোরী পহুঁ ঘাটের কূলে" লিখিয়া গিয়াছেন। কোন অপুষ্ট দেহের পরিচ্ছদ পুষ্ট করের অঙ্গশোভা বর্দ্ধনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইলে তাহার বৈষম্যের ন্যায় উপমানে ও উপমেয়ের মধ্যস্থলে অ-স্বরূপ গুণক্রিয়াদিসম্পর্কের স্থাপনও তদ্রূপ বিসদৃশ হইয়া দাড়ায়। কবিতার স্থূল শরীর ভাষা, আর সূক্ষ্ম শরীর ভাবময়ী প্রতিকৃতি,—অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে যে পরা বিদ্যা বাহ্য ও অন্তরের আকার এক ভাবে প্রকাশ করিয়া চিত্রের কল্পনা করে সেই কল্পনাই কবিতার প্রাণ বা সূক্ষ্মদেহ। সে প্রাণের ধর্ম্ম, ভাষা-দেহী হইয়া কাব্য-তীর্থে অটন করা। কত কাল হইল কোন এক মহাজন কমলবাসিনীর কেমন এক মনোহর চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন। পড়িবা মাত্র মনে হয় নিপুণ ভাষর অপেক্ষা এ চিত্র উজ্জ্বল ও মনোহর যথা—

তস্যাঃ শকল মিন্দো বিভর্ত্তী শুভ্রকান্তিঃ
কুচস্তবপরিতাপী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজকর কমলোদ্যদ্বেদনী পুস্তক শ্রীঃ
সকল"

Dryden এর Timotheus আর হেম-চন্দ্রের বিদ্যারম্ভ এই উভয়ের মধ্যে তুলনা করিতে হইলে বিদ্যাবসুর সঙ্গীতই যে সর্ব্বোত্তম যোগ্য তাহা স্বীকার করিতে হইবে। বিদ্যাবসু স্বর্গের সঙ্গীতগায়ক, তাঁহার বীণার মাধুর্য্যের মধ্যে ভুবিয়া কোথায় আমরা পথ ভুলিয়া স্বর্গের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইব—না কোথায় আমরা রসাতলের দিকে উপস্থিত হইয়া পড়ি।

সমস্বরে হইয়া দেবতারা গাহিতেছেন—

"সুধার প্রেমেতে বাজ্‌রে বীণা,
বল সুধা বই ধন চাহিনা,
অমর মধুর নাই পিপাসা!
সুধা কিবা ধন সুধা সে কেমন,
সাধক বিনে কি জানিবে চাষা।"

বাস্তবিক এই কবিতাটির শেষ পংক্তি ছাড়া অন্য কএক ছত্রই মধুর হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত ভাষা ও গলিত সুতরাং ঘৃণ্য "সাধক বিনা কি জানিবে চাষা" এইরূপ তুলনা দেবতাদিগের মুখে শুনিলে স্বর্গের উপর কেমন একটা বিতৃষ্ণা জন্মে। জ্যোৎস্নাময়ী মধু-নিশীথে রজততরঙ্গোৎক্ষিপ্ত তটিনীর কুলু কুলু নাদের সহিত দূরস্থিত মুরলী কাকলির সম্মিলনের ন্যায়—কানন-বিহারিনী বল্কলপরিধানা প্রিয়ম্ভাবিনী মধুরা শকুন্তলার প্রেমের ন্যায় দেবতাদিগের ভাষা যদি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া, সুখের আবেশে প্রাণকে অবশ করিতে না পারিল তবে সে দেবসঙ্গীতের প্রয়োজন কি? কবির নির্ব্বাচিত শব্দমালা "কর্ণেষু বমতি মধুধারাং"-বৎ শ্রুতিমধুর হইবে। মিল-নের নিমিত্ত তাঁহাকে যুঝিতে হইবে না। 'চাষা" শব্দ ব্যবহার করিয়া কবি কাব্যগত সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছেন।

বেগেতে=প্রাণেতে; হৃদয়ে=পাষাণে; দেবতা=গৃহীতা; এইরূপ মিলনের পক্ষ

সমর্থন করিতে হইলে জনসনের বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া দেখাইতে হইবে যে জনসন অপেক্ষা তাঁহার পত্নীর বয়স অনেক বেশী হইলেও যেখানে বিবাহরূপ আধ্যাত্মিক মিলন হইয়াছিল, সেখানে শারীরিক মিলনের অল্পমাত্র বৈষাদৃশ্য থাকায় কোন দোষ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

প্রেমের পবিত্রতা সুধার মহিমা গাহিতে গাহিতে বিশ্বাবসু যখন অমরদর্প চূর্ণ করিবার জন্য গাহিলেন—

"যখন প্রলয় হবে,
যখন ঈশান হর হর বোলে,
বাজাবে বিষাণ ঘন ঘোর রোলে,
জলে জলময় * হবে ত্রিভুবন,
না রবে তপন শশীর কিরণ,
জগত মণ্ডল কারণ বারিতে,
ছিঁড়িয়া পড়িবে ত্রিলোক সহিতে,
তখন কোথা এ বিভব রবে।
এই সুরপুরী ও সব সুন্দরী
এ বিপুল ভোগ কোথায় যাবে!"—

এমন রসভাবের স্রষ্টা বিশ্বাবসুকে দেবতারা কোন্ গুণে স্বর্গে আশ্রয় দিয়াছেন বলিতে পারি না। বাসর ঘরে জামাইয়ের মুখে 'কোথায় আনিলে আমায়, আনিয়ে তরঙ্গ মাঝে তরী ডুবাইলে হায়' এরূপ গানও সহ্য হয়, কিন্তু গুণী বিশ্বাবসুর মুখে সুরাপানকালীন অনুচিত ভাব ও রসের প্রবর্ত্তন অসহ্য। Dryden এর Timotheusও গাহিয়াছিলেন।

..."Darius great and good
By too severe a fate
Fall'n, fall'n, fall'n fall'n,
Fall'n from his high state
And welt'ring in his blood ; &c."

কবির গানে দেবস্পর্দ্ধী দেবাভিমানী দার্ম্ভিক আলেকজন্দর মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। গম্ভীর মনে শ্মশান-বৈরাগ্যের উদয় দেখিয়া বীণার গানে প্রেমের গান আরম্ভ করিলেন. বিরাগের ছায়া দূরে পলাইল।

The prince, unable to conceal his pain,
Gaz'd on the fair
Who caus'd his care,
And, sigh'd and look'd, sigh'd and look'd,
Sigh'd and look'd and sigh'd again.
At length, with love and wine at once
oppress'd,
The vanquish'd victor sunk upon her
breast.

আলেকজন্দর যাহা, কবি তাহাই দেখাইয়াছেন। হেমচন্দ্রের বিশ্বাবসুকে Timotheusএর প্রতিধ্বনি বলিয়া বোধ হয়। কিলিপ্ তনয়ের বিলাসগৃহের বীণাধারীর কাকলি স্বর্গে বিশ্বাবসু অনুকরণ করিয়া উচ্চারণ করিতে যাইতেছেন, বিকৃত হইয়া পড়িতেছে, শুনিতে লজ্জা বোধ হয়। আলেকজন্দর বিলাসী, পিয়াসী, বিলাসসাগরের মধ্যে পড়িয়া জলভ্রমে কণ্ঠতালু শুষ্ককারী বারি পান করিতেছেন, তৃষ্ণা কমিতেছে না; প্রবৃত্তিবহ্নি ধক্ ধক্ ভাবে জ্বলিতেছে, সে আলেকজন্দর পারিপার্শ্বিকগণের সম্মুখে Thaisএর দুষ্যন্তময় রসাল বক্ষে ঢুলিয়া পড়িবে," তাহার আর আশ্চর্য্য কি? অনলে পুড়িবার জন্যই পতঙ্গের জন্ম, কিন্তু সেই বেদস্পর্দ্ধী 'ইন্দ্রায়াহি চিত্রভানো" পুরন্দর তাঁহার এমন দুর্দ্দশা—

"মরে জর জর দেহ থর থর,
হেরে ঘন ঘন দেব পুরন্দর,
হৃদয়ে বান্ধিয়ে রাখিতে চায়,

* জলময় নয় কি?

নিমেষে হেরিছে নিমিষে ফিরিছে,
নিমেষে নিশ্বাস বহিছে তার।
শেষে পরাজিত অচেতন চিত,
শচী-বক্ষঃস্থলে ঘুমায়ে রয়।

মর্ত্তের মাইকেল পাপতমিস্রার মধ্যে ডুবিয়া বলিয়াছিলেন—

Stars hide your fires,
Let not light see my black deep desires

কিন্তু ইন্দ্র!—লজ্জাহীন ইন্দ্র! তোমার দুর্ব্বলতার পসরা মস্তকে করিয়া তোমার লজ্জা বোধ হইল না? তুমি বাঙ্গালার মদন চমপায়ী নবাব অপেক্ষাও হীনমতি! Drydenএর অনুকরণে ইন্দ্রের সুরাপান লিখিতে গিয়া কবি 'ফিলিস্তিণ' ইন্দ্রের শৌর্য্য বীর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের অকালমৃত্যুর কারণ হইয়াছেন। অন্ধ অনুকরণের দ্বারা অনুপদোৎকর্ষতার অভাব লক্ষিত হয়। কবি তাঁহার ত্রিলোকবিহারিণী কল্পনাকে বাঁধা দিয়া ছন্দের নিমিত্ত পাগল হইয়া পড়িয়া ছন। কারলাইল্ বলিয়াছেন—"To every poet, to every writer, we might say Be true, if you would be believed. Let a man but speak forth with genuine earnestness the thought the emotion, the actual condition of his own heart." বারোয়ারি পূজার নাচের সময় এক ব্যক্তির কর্ম্মেথিত "বাহোবা" শব্দের অনুকরণে অন্যান্য অসামঞ্জস্যিক "বাহোবা" যেমন শ্রবণের যন্ত্রণাকর হইয়া দাঁড়ায়, কবিদিগকে ভাবাভিব্যক্তি কবিবার সময় আদর্শ কবির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত না হইয়া উচ্ছ্বাসের ভঙ্গিমা প্রকাশও তদ্রূপ প্রাণের অপ্রীতিকর হইয়া পড়ে। হেমবাবুর মধুময়ী ভাষার গুণে ইন্দ্রের সুরাপান পড়া যায় মাত্র।

এই কবিতার মধ্যে "দনুজঘাতা" নামক একটি নূতন শব্দের সহিত পরিচিত হইলাম। হন্তা অপেক্ষা ঘাতা শব্দটি শ্রুতিমধুর; কিন্তু ব্যাকরণের superstitious সূত্র মহাশয়েরা উহাকে সাহিত্যে স্থান দিতে অসম্মত। অব্যাকরণী শব্দের পক্ষ সমর্থন করিতে হইলে "কবির উক্তি" নামক প্রায়শ্চিত্তের পাতি আবৃত্তি করিলেই চলিতে পারে. এই বিশ্বাস সাধারণ পাঠকের মধ্যে প্রচলিত আছে। একজন পাঁচালীকার লিখিয়াছিলেন—"ওহে সত্যপীর তুমি যথা করামাত্র"—ক্ষুদ্র কবিগণের অজ্ঞানতার মধ্যে খল, কুজ ও বধির শব্দ যদি আশ্রয় না লইবে তবে উহাদের স্থান হইবে কোথায়? শব্দসুন্দরীকে ব্যাকরণরূপ গৃহাশ্রমের বাহির করিয়া স্বৈরচারিণী হইতে শিক্ষা দেওয়ার পাপ আছে বলিয়া বোধ হয়। বঙ্গের পাঠকগণের অপবাদের কথা এই যে, তাঁহারা কোন লেখার চারি দিক বজায় আছে কি না, না দেখিয়া সমস্ত অংশ না বুঝিয়া সন্তুষ্ট হন। হেমচন্দ্র লব্ধনামা কবি, অশিষ্ট শব্দের প্রয়োগ তাঁহাকে দিতে দেখিলে মনে বড় কষ্ট হয়।

আবিসিনিয়ার রাজপুত্রের ন্যায় যুক্তপক্ষ নির্ম্মাণ করিয়া, যে কবি গগনমণ্ডলে উঠিতে যান পতন তাঁহার পক্ষে অনিবার্য্য। কল্পনার বলাকাধৌত ক্লান্তিহীন পক্ষযুগলে ভর দিয়া গগনবিহারী ভক্তিরস-ভাবিত কবি চাঁদের কিরণ পান করিতে করিতে অনন্তের দুর্জ্ঞেয় অপরিমেয় গম্ভীরতার মধ্যে ডুবিয়া যান! প্রফুল্লতা ও পবিত্রতা

তাহার হৃদয়-তন্ত্রীতে অদৃশ্য ভাবে অবস্থান করিয়া ঘাত প্রতিঘাতের অনাহত ধ্বনি রণন করিতে থাকে। এই ধ্বনিগত স্বরলহরীই রসের অনুষ্ঠান। হৃদয়ের মধ্যে স্ফাটিকপাতস্থিত জবা পুষ্পের প্রতিবিম্বের ন্যায় প্রতিফলিত ক্রিয়ার আবির্ভাবকেই emotion বা রাগ কহে। বালক-মণ্ডলে হেম বাবুর "হতাশের আক্ষেপ" উপাদেয় বলিয়া বিখ্যাত। এ হতাশ অপরিণামদর্শী চরিত্রহীন অসংযত অসংযত ভাব-পরায়ণ যুবা; ইহার ইন্দ্রিয় দমনের শক্তি নাই; এ উন্মত্ত সমাজের বন্ধন ছিঁড়িবার জন্য ব্যস্ত।

"লোক লজ্জা মান ভয়ে,
মা বাপ নিদয় হ'য়ে,
আমার হৃদয় নিধি অন্য কারে সঁপিল
অভাগার যত আশা জন্মশোধ ঘুচিল।"

বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবিকে সমাজের প্রতি এইরূপ হতাশের ভেদিলে আমরা ভীত, স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক হইয়া পড়ি। অনিয়ন্ত্রিত, কলুষিত ও পাশব প্রণয়ের একমাত্র শিবপ্রদ অন্তরায়, সমাজ ও লোকলজ্জাকে যে কবি অতল জলে নিমগ্ন করিয়া বৈরচারিতা ও কলুষ কামনাকে প্রশ্রয় প্রদান করিতে অভিলাষী, তাঁহাকে আমরা শত হস্ত দূর হইতে অভিবাদন করি। হেম বাবুর হতাশের এক প্রকার কুপোচ্ছ্বাসের কারণ তাঁহার প্রণয়াস্পদীভূতা ললনাকে পিতা মাতা সৎপাত্রে দান করিয়াছেন তরলমতি সরল বালিকা এক্ষণে কুলবধূ হইয়াছে; তাই হতবুদ্ধি উন্মাদ কলুষিত প্রণয়ের কণ্টক-পরিবৃত পথে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে বৃংহণ ধ্বনি করিতেছে। মনমতি হতাশ যখন বলিল "সে আমার আমি কার অন্য কারো হবো না" যে একদিন এ কথা বলিয়াছিল, এখন সে অন্যের হইয়াছে, তবে পুনর্ম্মিলন কালে পর-পরিণীতা রমণীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে কবি। তোমার হতাশ কেন সাহসী হইল? আর তুই উন্মার্গ-গামিনী কুল-কলঙ্কিনী—উন্মত্তের কুহকে পড়িয়া বিবাহের পর পর-পুরুষের বদন চুম্বন করিতে করিতে বঙ্গ-রমণীর লজ্জা-রঞ্জিনী লজ্জাকে দূরে কি বলিয়া নিক্ষেপ করিলি, বল দেখি?

ভালবাসা হৃদয়ের অনুভাবা—যিনি বাস্তবিক ভাল বাসিয়াছেন কামলিপ্সায় তিনি কলঙ্কিত হন না। প্রকৃত প্রণয়ী জগতের পূজ্য। আবেগের ভাবে লীন হইয়া তিনি আত্মভাবকে নির্ব্বাসিত করিয়া থাকেন।

বঙ্কিম বাবুর নগেন্দ্র, শৈবলিনীকে ভাল বাসিতেন, কামগন্ধশূন্য সে স্বর্গীয় প্রেমের স্পর্শে সমাধি আত্মজ্ঞান হয়। মনুষ্য কঠোর ব্রত অবলম্বন করিতে শিক্ষা করে, স্বর্গ ও মর্ত্তের মধ্যস্থিত আবরণ স্খলিত হইয়া পড়ে। যে শক্তি আত্ম-নির্ভরতার প্রসূতি মতে, তাহাকে দুর্ব্বিনীতার ধাত্রী বলিয়া গণনা করা যায়। মনুষ্যের আশাতরু নীলকণ্ঠবর্ণ ভাবী স্বপ্নসম্ভূত নীরব নীলিমার স্পর্শসুখে লীন হইবার ইচ্ছায় ধীরে ধীরে চন্দ্রকলাপ বিস্তার করিতে থাকে। এই বিস্তারের কুঞ্চিত ভাবের নাম নিরাশা। হৃদয়ে স্বার্থের অভাব যত পরিমাণে অধিক হইবে শোণিতপায়ী ভাবের গতিবিধি তত বাড়িবে। বাসনার মোটা কণ্ঠের আশাতরু অপেক্ষা নীরব আনিলীল আশার নীরক হইতে উদ্ধারিত

ভগবান চিত্তদর্শন কুতূহলী রামানন্দস্বামী পরহিত-ব্রতধারী নিরাশ প্রতাপকে মৃত্যু-কালে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রতাপ! তুমি কি শৈবলিনীকে ভাল বাসিতে?" সুপ্ত সিংহ সিংহগর্জ্জনে পৃথিবীর কেন্দ্র অবধি বিকম্পিত করিয়া বলিলেন "সন্ন্যাসি—তুমি কি বুঝিবে সন্ন্যাসি—এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে আমার এ ভালবাসা বুঝিবে! কে বুঝিবে আজি এই ষোড়শ বৎসর আমি শৈবলিনীকে কত ভাল বাসিয়াছি। পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি—আমার ভালবাসার নাম জীবন বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা। এ হুতাশকে বুকের ভিতর রাখিতে ইচ্ছা করে এই দেবতার চরণ পূজা করিয়া মনুষ্য কৃতার্থ হয়। হেম বাবুর হুতাশ যত দিন অদৃষ্ট থাকিবে, বুঝিব, ততদিন বঙ্গীয় পাঠকসমাজ কুরুচির মোহমন্ত্রে অভিভূত আছে।

শ্রীবেণোয়ারিলাল গোস্বামী।*

দ্রব্যগুণ-সংগ্রহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আয়াপান।

অন্য নাম—বিশল্যকরণী। উত্তেজক, বলকারক, ঘর্ম্মজনক। ইহা সর্প দংশনের উৎকৃষ্ট প্রতিবিষ বলিয়া কথিত আছে। ক্ষত স্থানে ইহার মূল বাটিয়া মাখাইয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহার পাতা বাটিয়া কাটা ঘায়ে দিলে ২।৩ দিনে ঘা পুরিয়া উঠে, এবং ক্ষত স্থানে পূঁজ হয় না।

আরগ্বধ।

অন্য নাম—রাজবৃক্ষ, সুবর্ণক, সোঁদাল, সোনালী। চূড়াকৃতি স্বর্ণ বর্ণ পুষ্প, দীর্ঘফল, মধ্যমাকৃতি বৃক্ষ বিশেষ। ইহার ফুলের শাঁস, বাঁহু, মধুর, শুক্রবর্দ্ধক, বাতপিত্তহারি, মৃদু-বিরেচক। জ্বর, হৃদ্রোগ, কুষ্ঠ, মেহ, শূল, কাস, কৃমি রাতরক্ত কোষ্ঠবদ্ধ ও বিষ্টম্ভরোগে বিশেষ উপকারক। ইহার পাতাও মৃদুবিরেচক। ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে ২।৩ ঘণ্টার মধ্যেই বিরেচন হয়। জ্বর রোগে কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে, ইহার দ্বারা মহোপকার দর্শে।

---

* "পাক্ষিক সমালোচকে" এই প্রস্তাবের পূর্ব্বাংশ মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু সেই সংখ্যা হইতে 'পাক্ষিক সমালোচক' আর প্রকাশিত হয় নাই। তাহাতে ইহার লেখকের নাম ছিল—পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী। গত বারে সেই মুদ্রিত অংশ দেখিয়াই ইহা প্রকাশিত হয়, সেই জন্য আমরাও ঐ নাম দিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে জানিলাম তাহা ভুল। লেখক স্বয়ং পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী নহেন, তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত বেণোয়ারিলাল গোস্বামী।

ক স

আরারুট।

পুষ্টিকর, লঘু পাক, স্নিগ্ধ কারক; দুর্ব্বল ও শিশুদিগের পক্ষে লঘু পাক বিধায় সর্ব্বদা সুপথ্য।

আরাম-শীতলা।

অন্য নাম—আনন্দা, সুগন্ধিনী, মহানন্দী সুগন্ধি পত্রবিশিষ্ট বেত বিশেষ। ইহার ভাষায় পাটী বেত বলে। ইহা স্নিগ্ধ, শীতল, পিত্তনাশক, দাহ ও শোথ নিবারক। ইহার কোমল শাখাগ্র বাটিয়া লেপ দিলে বিস্ফোট ও দুষ্ট ব্রণ আরাম হয়। ইহার ত্বক হইতে একরূপ সুন্দর পাটী প্রস্তুত হয়, তাহাকে সচরাচর আমাদের দেশে শীতল পাটী কহে।

আর্দ্রক।

কাঁচা অবস্থায় ইহাকে আদা, এবং শুষ্কাবস্থায় শুঁঠ বলে। আদা উষ্ণ, কটুরস, লঘু, বলকর, রুচিকারক, উত্তেজক, অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্রকারক, কফ বাতের শান্তিকারক। মল মূত্রের বিশুষ্ক স্থলে বিশেষ উপকারী।

শুঁঠ অগ্নিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকর, মলসংগ্রাহক, লঘুপাক, মধুর, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, কফনাশক। কাসি, সর্দ্দি ও বিষম জ্বরের শৈত্যাবস্থায় ইহা পরমোপকারী। দন্তবেদনায় ইহা চর্ব্বণ করিলে, লালা নিঃসরণ হইয়া উপকার হয়। হাতে পায়ে, খিল ধরিলে ইহার চূর্ণ দ্বারা মর্দ্দন করিলে উপকার দর্শে। শুঁঠ চূর্ণ কর্পূর ও পুরাতন ঘৃত সহ উত্তম রূপে মিশাইয়া, স্থানিক প্রয়োগে, বাতজনিত বেদনা ও কামড়ানি নিবারিত হয়। শুঠের গুড় দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া নস্য লইলে সর্ব্বপ্রকার শিরঃপীড়া নষ্ট হয়।

আদার রস মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, শ্বাস, কাস, অরের মূর্চ্ছা অপনোদিত হয়। আদা ও নুনসহ একত্র বাটিয়া লেপ দিলে বাত বেদনা নষ্ট হয়। দুগ্ধ মিশ্রিত আদার রসের নস্যে শিরোবেদনা নিবারিত হয়। আদার রস ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণ-শূল দূরীকৃত হয়। প্রত্যহ প্রাতে আহারের পূর্ব্বে গোটা কতক ভিজা ছোলা ও ২।৪ টুকরা আদা একত্র চিবাইয়া খাইলে, বলবৃদ্ধি, ধাতু পুষ্টি ও আহারের রুচি উৎপন্ন হয়।

আলকাতরা।

গাঢ় কৃষ্ণ পাটল বর্ণ, উগ্রগন্ধযুক্ত। উত্তেজক, মূত্রকারক, কফনিঃসারক। স্থানিক প্রয়োগে উগ্রতা সাধক, দুর্গন্ধহারক। পুরাতন শ্বাসনালী প্রদাহ ও যক্ষ্মাকাসে ইহার ধূম গ্রহণে উপকার হয়। পুরাতন পচা ক্ষতে আলকাতরা মাখাইয়া রাখিলে সত্বর ক্ষতের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়। আভ্যন্তরিক ব্যবহার হয় না। ইহা চুঁয়াইয়া এক প্রকার আরক প্রস্তুত করা হয়। সেবনার্থে তাহাই কখন কখন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আলকুশী।

অন্য নাম—আখুপর্ণী, কপিকচ্ছু, বানরী, কণ্ডলী। কণ্ডবহুল শুষ্কাধিত শিম্বীজাতীয় লতা বিশেষ। ইহার মূল ও ফলের মজ্জা ঔষধার্থে প্রয়োজিত হইয়া থাকে।

মূল—বাতঘ্ন, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক

বিকৃত ব্রণ বায়ু ও কফ নাশক। বায়ু পীড়ায় বিশেষ উপকারী।

বীজ—কৃষ্ণবর্ণ, মর্কটবদন সদৃশ। বীজাভ্যন্তরস্থ শস্য বায়ুনাশক, বলপ্রদ, স্তন্যকর। ৫ হইতে ১৫ রতি মাত্রায় শুষ্ক বা চিনি মিশ্রিত দুগ্ধের সহিত সেব্য।

আলু।

আলু অনেক প্রকার। তন্মধ্যে গোল-আলু, রাঙ্গা আলু, ঝাঁকি আলু, মৌ আলু, পিণ্ডালু (চুনড়ী আলু) শকরকন্দালু এ দেশে বিস্তর ব্যবহৃত হয়। সকল প্রকার আলুই প্রায় সমান গুণযুক্ত।—স্বাদু, শীতল, শুক্র রক্ত পিত্ত নাশক, শুক্র ও স্তনদুগ্ধ-বর্দ্ধক। গোল-আলু অপেক্ষাকৃত সারক ও পুষ্টিকর। পূর্ব্বে এ দেশে ইহা উৎপন্ন হইত না, দেশান্তর হইতে আনীত হইয়া রোপিত হইয়াছে, এ জন্য লোকে ইহাকে বিলাতী আলুও বলে। দগ্ধ স্থানে ইহা বাটিয়া লেপন করিলে সত্বর জ্বালা নিবৃত্ত হয়, এবং ফোস্কা উঠে না।

কোলকন্দ নামে আর এক প্রকার আলু আছে। কাশ্মীর অঞ্চলে উহাকে পুটালু বলে। উহার গাত্রে শ্লেষ্মাবৎ একরূপ পিচ্ছিল পদার্থ দৃষ্ট হয়। তাহা বস্ত্রে লাগিলে বস্ত্র লালবর্ণ হয় এবং তদ্দ্বারা ধৌত করিলে বস্ত্রাদির ময়লা দূর হয়।

এ দেশে আলতা গোল নামে এক জাতি কন্দালু আছে, বোধ হয় ইহাই কোলকন্দ হইবে। ইহা কটু, উষ্ণ, কৃমি, বমি ও বিষদোষ নিবারক।

ইক্ষু।

চলিত নাম—আখ্। বর্ণ ও আকৃতি ভেদে আখ্ অনেক প্রকার। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক জাতি এ দেশে সচরাচর পাওয়া যায়। যথা—

১। পৌণ্ড্রক (পুড়ে)
২। তীরক (ভোরী)
৩। বাংশক (বোম্বাই বা সামলাড়া)
৪। কান্তার (কাজলা)
৫। নীলপোর (নেপালী বা পাহাড়ে)
রক্তেক্ষু (রাঙ্গা)
৭। সূচিপত্র।

সকল ইক্ষুই সাধারণতঃ সমগুণযুক্ত। স্বাদু, স্নিগ্ধ, মুখ প্রহ্লাদকারী, ধাতু-পোষক, বায়ু ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক, তৃপ্তিজনক, বল, শুক্র ও কফ বর্দ্ধক, মূত্র-শুদ্ধিকারি।

ইক্ষু সকলের মূল ভাগ অত্যন্ত মধুর, মধ্যভাগ মধুর, অগ্রভাগ লবণরস বিশিষ্ট—মুখপ্রিয় নহে। ইক্ষু রস অধিক পরিমাণে সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়।

ইন্দ্রযব।

অন্য নাম—ভদ্রযব, কুটজবীজ। স্বনাম-খ্যাত তিক্ত বীজ বিশেষ। সঙ্কোচক, আগ্নেয়, কটু, তিক্ত ও শীতল। অজীর্ণ-সার, রক্তার্শ, বমি, কৃমি, কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও পিত্ত অম্লিত রোগে বিস্তর ব্যবহৃত হয়। ইন্দ্রযব চূর্ণ ২ তোলা মধুর সহিত মিশাইয়া লেহন করিলে ঘন শ্বাস ও প্রবল উর্দ্ধহিক্কা নিবারিত হয়।

ইন্দ্রবারুণী।

অন্য নাম—রাখালশশা, আমরা, চিত্রা, অমৃতা, শিশুপ্রিয়া। কাঁকুড়ের জাতীয় লতা বিশেষ। জাতিভেদে ইহা দ্বিবিধ।

একের পুষ্প পীতবর্ণ, ফল ক্ষুদ্র, সুচিত্র রেখাঙ্কিত, পক্কাবস্থায় রক্তবর্ণ হয়। অপরের পুষ্প শুক্লবর্ণ, ফল অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ স্থূল। গোপ বালকেরা শীড়ার জন্য প্রায়ই ব্যবহার করে।

ফলের আভ্যন্তরিক শস্য তিক্ত, কটু, শীতল ও অভিবিরেচক। কামলা, কৃমি, প্লীহা, উদরী, শ্বাস, কাশ, মেহ, ব্রণ, কোষ্ঠবদ্ধ ও বিষদোষ নাশক। মাত্রা ১ হইতে ৫ রতি। ইহার মূল বাটিয়া লেপ দিলে স্তনের স্ফীততা ও বেদনা নিবারিত হয়। বীজের তৈল কেশে মাখিলে শুভ্র কেশ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হয়।

ইশারমূল।

অত্যন্ত তিক্ত, উত্তেজক, বলকারক, রজোনিঃসারক। ইহা সর্পদংশনের মহৌষধ বলিয়া অনেকেই বর্ণনা করেন। ইহার তরুণ পত্র ও রস সেবনে সর্পবিষ নষ্ট হয়। ইশার মূল মধুর সহিত বাটিয়া লেপ দিলে ধবল আরোগ্য হয়।

ইষপগুল।

স্নিগ্ধ কারক, তরল কারক, ঈষৎ সংকোচক। অম্ল কাসি সর্দ্দি ও মূত্রযন্ত্রের পীড়ায় ইহা ব্যবহারে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। ইহা সেবনে প্রমেহ রোগের জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হয়। উদরাময় ও রক্তামাশয় রোগে ইহা মহোপকারক। দিকি তোলা মাত্রায় চিনির সহিত ব্যবহার্য্য। জলে ভিজাইয়া রাখিলে ইহা হইতে যথেষ্ট পিচ্ছিল আটাবৎ পদার্থ নির্গত হয়।

ইষপগুল ১ তোলা ও মিছরি ॥০ তোলা পরিমাণে প্রত্যহ খাইলে বহুদিনের কষ্টদায়ক গ্রহণী পীড়ারও ক্রমে ক্রমে শান্তি হয়।

উচ্চটা।

অন্য নাম—চুড়ালা, চেঁচুয়া, নির্ব্বিষী। লতান জাতীয় তৃণ বিশেষ। ইহার মধ্য ভাগ হইতে নলাকার শীষ উঠে। তদগ্রে ঈষৎ রক্তবর্ণ ছত্রাকৃতি পুষ্প জন্মে। ইহার পত্র সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত সবুজ। ইহা বাটিয়া লেপ দিলে সকল প্রকার বিষপীড়া নিবারিত হয়।

এরণ্ড

অন্য নাম—ভেরেণ্ডা, এণ্ডী, রেড়ী। লতা মধ্যে নানাকৃতি কাণ্ড, স্নেহবীজ গুচ্ছফল বৃক্ষ বিশেষ। ইহার মূল—কফ বায়ু নাশক, মৃদুল ও শুক্রকারি পত্র—দুগ্ধ স্রাববর্দ্ধক। প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ অল্প হইলে এরণ্ড পত্রের ঝোল দ্বারা স্তন ধৌত করিয়া তদ্দ্বারা লেপ দিলে উপকার হয়। এরণ্ডবীজ—উগ্র বিরেচক। ২।৩টী বীজ জলে বাটিয়া সেবন করিলে বিরেচন হয়। ছাগ দুগ্ধের সহিত বাটিয়া লেপ দিলে বাতরক্ত নিবারণ হয়। ভেরেণ্ডার আটা ক্ষতের বা ফুলায় সংলগ্ন করিলে সংকোচ ক্রিয়া দ্বারা উপকার হয়।

এলাচ।

বড় ও ছোট ভেদে ইহা দুই প্রকার। বড় এলাচ—বায়ু নাশক, আগ্নেয়, উত্তেজক, কফোৎক্লেদ, লঘু। তৃষ্ণা, হৃল্লাস, বমি, শ্বাস ও কাস রোগের হিতকারক। ইহা ঘোল দিয়া বাটিয়া লেপ দিলে দাহ আরাম হয়। বড় এলাচ চূর্ণ ।০ তোলা মাত্রায় চিনির সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে পিত্ত নাশ হয়।

ছোট এলাচ—বিশেষ সুগন্ধযুক্ত, রুক্ষ, বায়ুনাশক, আগ্নেয়। অজীর্ণ, আধ্মান, ও অন্ত্রের আক্ষেপিক বেদনা ও মারবীয় অবসন্নাবস্থাতে প্রয়োজ্য। মাত্রা ৫ হইতে ১০ রতি। ছোট-এলাচ ৭ দানাটী এক পোয়া দেশী কুয়ড়ার জলে বাটিয়া সেই জল তিন দিবস প্রাতে সেবন করিলে দেহস্থ পারা প্রস্রাবের সহিত নির্গত হইয়া যায়। ছোট এলাচকে অনেকে গুজরাটী এলাচ বলে।

ওল।

অন্য নাম—সূরণ। ঈষৎ কষায় রস যুক্ত, কটু, রুক্ষ, গুরুপাক। মলমূত্র রোধক, কফ পিত্ত নাশক, রুচিকর, বায়ু বর্দ্ধক, অগ্নিকারক। অর্শ রোগে সদা পথ্য। ওলের কন্দ মাটীর লেপ দিয়া দগ্ধ করত, তাহার রস তৈল ও লবণ সহযোগে সেবন করিলে অর্শ আরোগ্য হয়।

[ক্রমশঃ

শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়।

জীব ও ব্রহ্ম।

ব্রহ্মময় জগৎ। ব্রহ্ম ছাড়া কোথাও আর কিছুই নাই। এই দৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মের একটী অণুমাত্র। এইরূপ অসংখ্য অণু-ব্যক্ত হইয়া আছে। ব্যক্ত জগতের ন্যায় আবার অব্যক্ত জগৎ আছে। যোগীগণ সেই সকল অব্যক্ত জগতের মধ্যে প্রবেশের অধিকারী, ভোগীগণ নহেন। যোগীর নিকট ব্যক্ত ও অব্যক্ত দুই সমান। ভোগী অব্যক্ত জগতের সংবাদে বিশ্বাস করেন না। কারণ, ব্যক্ত জগতের ন্যায় আবার যে একটী অব্যক্ত জগৎ আছে এ কথা তাহার মনে ধারণা হয় না। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই উভয় অবস্থার অতীত এক অবস্থা আছে তাহাতেই যুক্ত থাকেন। সেই অবস্থার নাম তুরীয় চৈতন্যাবস্থা। তিনি সকলেতেই থাকেন, অথচ কিছুই তাঁহাতে থাকে না। অর্থাৎ তিনি সকলেতেই নির্লিপ্ত।

যেমন এক বিন্দু জল মহান্ সমুদ্রেরই অংশ, একখণ্ড প্রস্তর মহোচ্চ পর্ব্বতের অংশ, বা এক কণা বালি বিস্তৃত মরুভূমির অংশ, তদ্রূপ জীব অনন্ত ব্রহ্মের অংশ। ব্রহ্ম ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার অতীত, কিন্তু জীব ইহার অধীন। সুতরাং বদ্ধ। ঘট ভগ্ন হইলে যেমন ঘটাকাশ মহাকাশে মিলিত হয়, সেই রূপ এই মায়াবন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলেই জীব ব্রহ্মে বিলীন হন। এই মিলনের নাম যোগ। এ অবস্থায় অস্থির চিত্ত স্থির হয় ও ইহার বৃত্তিসমূহ স্বতঃই রুদ্ধ হইয়া যায়। ইহজীবনে এই মিলনের নাম জীবন্মুক্তি, ও দেহ গত হইয়া মিলিত হইলে বিদেহ কৈবল্য।

ব্রহ্মের ন্যায় মায়াও অনাদি। ব্রহ্ম মায়ায় উপহত হইয়া জীব হন, এবং বদ্ধ জীব মায়ার অতীত হইলেই শিব

হন। এই শিবত্ব প্রাপ্তির নাম মোক্ষ। এ অবস্থায় বাসনার বিরাম হয়, কিন্তু পূর্ব্ব বাসনা কৃত কর্ম্মফল ভোগের বিরাম হয় না। আসক্তির সহিত কর্ম্ম করিলেই তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী। আসক্তচিত্ত ব্যক্তির মুক্তি নাই। শুভই হউক বা অশুভই হউক বাসনা কৃত কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে। সেই সকল ফল ভোগের জন্যই এই দেহ ধারণ, এবং বাসনার বিরাম হইবার পূর্ব্বে দেহ পতন হইলে পুনর্জ্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। বাসনার ও তৎকৃত কর্ম্ম সমূহের ভাল মন্দ ফল অনুসারে মনুষ্যের সদসৎ যোনিতে জন্ম হয়। পুণ্যবান্ সদ্গতি ও তদ্বিপরীত লোক অসদ্গতি প্রাপ্ত হয়। এই দেহেই কর্ম্মানুসারে সংসারে স্বর্গ নরক ভোগ করিতে হয়। চিত্ত শান্ত না হইলে বাসনার উৎপত্তি সাগরস্থ উর্ম্মিমালার ন্যায়একটীর পর একটী এইরূপ ক্রমাগত হইবেই হইবে। শ্বাস স্থির হইলেই মনঃস্থির হয়, মনঃ স্থৈর্য্যেই চিত্তস্থৈর্য্য, ও ইহাতেই বাসনার বিরাম ও ব্রহ্মের সহিত তন্ময়ত্ব লাভ হয়।

মন অতি সূক্ষ্ম বায়ু মাত্র ও সর্ব্বদাই চঞ্চল। তাহাকে রুদ্ধ করিতে পারিলেই অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকলকে বশে আনা সম্ভব। মন ইন্দ্রিয় সমূহের রাজা। এই রাজাকে যিনি জয় করিয়াছেন তিনি বাকী ইন্দ্রিয়গণকেও বশে আনিতে সমর্থ হইয়াছেন। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনকে সংযত করা যায়। প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা সময়ে সময়ে মনের চঞ্চলতা বিনষ্ট হয়। প্রাণায়াম যোগের একটী অঙ্গ। অনেকের মতে যোগের অঙ্গ আটটী, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। কিন্তু মহামুনি গোরক্ষনাথ যম ও নিয়মকে যোগাঙ্গের মধ্যে গণ্য করেন নাই। তাঁহার মতে ছয়টী। আসন ও প্রাণায়াম হইতে ভক্তি পূর্ব্বক আরম্ভ করিলে অন্যান্য গুলি ক্রমে আয়ত্বে আসে এবং যম নিয়ম সাধনার দ্বারা ফল ভক্তি সহকারে যথারীতি আসন ও প্রাণায়াম করিয়া গেলে স্বতঃই তাহা হইয়া থাকে। গোরক্ষ সংহিতায় লেখা আছে ;—

"আসনং প্রাণসংরোধ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি ষ্ বানিবং"

প্রাণায়াম নানা প্রকার। সাধকেরা প্রথমতঃ সহজ প্রকার হইতেই আরম্ভ করেন। পাতঞ্জলে আছে "প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য।" প্রচ্ছর্দ্দন অর্থাৎ উদরস্থ বায়ু নাসিকার দ্বারা প্রবলে বমন, ও বিধারণ অর্থাৎ উপায় বিশেষ দ্বারা নিশ্বাস ফেলাকে প্রাণায়াম কহে। কেহ কেহ বলেন প্রাণ বায়ুর বিস্তার করিবার যে কৌশল তাহাকে প্রাণায়াম কহে। গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ২৯ শ্লোকে প্রাণায়াম কাহাকে বলে লিখিত আছে। গীতার মতে প্রাণ বায়ুকে অপান বায়ুতে ও অপান বায়ুকে প্রাণ বায়ুতে লইয়া যাওয়া আসার যে কৌশল তাহাই প্রাণায়াম। ধ্যানবিন্দু উপনিষদে লেখা আছে যেমন উৎপলনাল দ্বারা উর্দ্ধে জল টানা যায় তেমনি যোগী যোগপদ্মে অবস্থিতি করিয়া বায়ুকে উর্দ্ধে টানেন। শিবসংহিতাতেও নানারূপ প্রাণায়ামের কথা উল্লিখিত আছে। কিন্তু বই পড়িয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করা চলে না। করিলে নানারূপ উৎকট পীড়া উপস্থিত

হইবার সম্ভাবনা। সদ্‌গুরুর কাছে ইহা শিক্ষা করিতে হয়। যাঁহার চিত্ত স্থির হইয়াছে ও যিনি ব্রহ্মে তন্ময় হইয়া আছেন তিনিই সদ্‌গুরু।

যোগাভ্যাস দ্বারা মন শান্ত হয় ও ক্রমশ স্বতঃই ব্রহ্ম জ্ঞানের উদয় হয়। আমি যে দেহ হইতে পৃথক ইহা তখন অল্পে অল্পে বুঝিতে পারা যায়। অভ্যাস যত ঘনীভূত হয়, জ্ঞান ও আনন্দের তত বৃদ্ধি, বিষয়াসক্তি ও বাসনার তত ক্ষীণ ভেদ অনুভূত হইতে থাকে। পরে অহংজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া মুক্তাবস্থা সন্নিকট হয়। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিবার কালে এ অবস্থার বিষয় অতি সুন্দর ও বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু বিষয়াসক্ত ভোগী ব্যক্তি এ সকল ব্যাপার একবার চিন্তা করেন না। তাঁহার সে প্রবৃত্তি নাই। তিনি স্বকৃত বাসনায় বদ্ধ হইয়া সংসারে বার বার যাতায়াত করিতে থাকেন ও আপনাকে আপনি চিনিতে না পারিয়া চণ্ডালগৃহে প্রতিপালিত রাজপুত্রের ন্যায় আপনাকে সর্ব্বদা চণ্ডালই জ্ঞান করিয়া থাকেন। এরূপ ব্যক্তির উদ্ধারের জন্যও হিন্দু শাস্ত্র মতামতবান। শাস্ত্রে যে যেমন অধিকারী তাহার জন্য সেইরূপ সাধনার দ্বার উন্মুক্ত আছে, লোকে অনুরূপ সাধনা গ্রহণ করিলেই কালে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে আরোহণ করিতে সক্ষম হইবে।

যোগীরা বলেন বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় মানবদেহ একটী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় চন্দ্র সূর্য্য নদ নদী প্রভৃতি সমস্তই আছে। জ্ঞানের উদয় ভিন্ন এ সকল প্রত্যক্ষ হয় না। বায়ুই এই ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা ও বিধাতা। তাঁহারা বলেন—

"বায়ু র্আয়ু বলং বায়ুঃ বায়ুর্দাতা শরীরীণং।
বায়ু র্বিশ্ব মিদং সর্ব্বং প্রভু র্বায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ"॥

তৈত্তিরীয় উপনিষদে বায়ুর স্বরূপের সমর্থ ঋষিরা বলিয়াছেন "বায়ো, ত্বং ব্রহ্মাসি।" এই বায়ুর বিকারেই নানারূপ রোগ উৎপন্ন হয় ও বায়ু সকল (পঞ্চ বায়ু—প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান, ও অপর পঞ্চ—নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়.) যথা স্থানে স্থির ভাবে থাকিলে দেহ সুস্থ থাকে। এই জড় দেহই স্ত্রী ও তদন্তর্গত শ্বাস বায়ুই পুরুষ। শ্বাস শিব ও দেহ কালী। শ্বাস দেহ ছাড়িয়া গেলেই দেহ বিধবা হয় ও স্বামীর পশ্চাৎ অগ্নি প্রবেশ করে। ইহাই সহ-মরণ। দেহে এই সহমরণের কথাই উল্লিখিত আছে ও হিন্দু সমাজে ইহা আবহমান কাল হইতে প্রচলিত আছে। রাজা রামমোহন রায় বা বেন্টিঙ্ক সাহেব এ প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারেন নাই।

এই বায়ুর চঞ্চলতাতেই জীবের চঞ্চলতা অনুভূত হয়। এরূপ চঞ্চল অবস্থাই বদ্ধাবস্থা। জীব ব্রহ্মের অংশ হইয়াও চাঞ্চল্য নিবন্ধন মায়াময়। এই মায়ার প্রভাব অতি তীক্ষ্ণ। কেহই ইহাকে সহজে অতিক্রম করিতে পারেন না। সাধনা দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ ইহার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়। ইহার হস্ত হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হওয়ার নামই জীবন্মুক্তি, কৈবল্য, মোক্ষ, বা সিদ্ধাবস্থা ইত্যাদি। অনিত্য বস্তুতে আসক্ত করায় এই মায়া; ব্রহ্মকে বুঝিয়াও ইহার প্রভাবে বুঝিতে

পারা যায় না। যাহা আমার নহে তাহাকেই আমার বলিয়া পরিচয় দেয়, যাহা আমি নহি তাহাকেই আমি জ্ঞান করিতে বলে। বিচারকে ইহা ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দেয়। পরকে আপনার ও আপনাকে পর জ্ঞান করিতে উপদেশ দেয়, যাহা আমার ছিল না ও পরে থাকিবেও না তাহাতে এমন ভাবে আসক্ত করায় যে তাহা যেন আমাকে কখনই ছাড়িতে হইবে না। অনিত্য বস্তু বিচার বা উপদেশ বলে অনিত্য বুঝিয়াও তাহার অভাবে হাহাকার করি ও মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধ হইতে থাকি। ইহাই সংসারকে আমার ও ব্রহ্মকে স্বতন্ত্র জ্ঞান করায়। ইহার প্রভাবে অসারকে সার ও সারকে অসার জ্ঞান করিয়া বিড়ম্বিত হই। ইনি অদ্বৈত জ্ঞানের ঘোর বিরোধিনী ও দ্বৈত-জ্ঞান প্রসবিনী। ইহার কুহকে পড়িয়া প্রিয় ও অপ্রিয়, ইষ্ট ও অনিষ্ট ঠিক করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না, কেহ বুঝাইয়া দিলেও মনে ধারণা হয় না। ধারণা হইলেও তাহা স্থায়ী হয় না—কার্য্যে পড়িলে ঠিক উল্‌টা হইয়া যায়। ইহা চক্ষে এমনি ভেল্কী লাগাইয়া দেয় যে দড়িকে সাপ দেখি, বাঘিনীকে প্রিয়তমা স্ত্রী ভাবি, ও পরম হিতৈষীকে আমার সুখের পথের কণ্টক জ্ঞান করিয়া থাকি। ইহার ধাঁধা অতিক্রম করা বড়ই দুরূহ। ইনি ইচ্ছারূপিণী হইয়া দেহ-বিবরে সর্পের ন্যায় বাস করিতেছেন এবং ইন্দ্রিয়গণের সহিত বিষয় সংযোগ করিয়া মাটীর পুঁতুলের ন্যায় আমাদিগকে সর্ব্বদাই নাচাইতেছেন। ইহা হইতেই অবিশ্রান্ত বাসনার উৎপত্তি হইতেছে ও জীবকে অষ্ট পাশে বদ্ধ করিয়া জন্ম মৃত্যুর দ্বার দিয়া সংসারে বার বার যাতায়াত করাইতেছে। জীবকে চুষিকাটী দিয়া এমনি মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে তাহার আর পালাইবার উপায় নাই। জীব ইহার ভেল্কীতে ভুলিয়া কখন হাসিতেছে কখন কাঁদিতেছে, এক মুঠা ধূলি লইয়া কত যত্নেই লৌহ সিন্দুকের মধ্যে চাবি দিয়া রাখিতেছে, কেউটীয়া সর্পকে ক্রোড়ে লইয়া সাদরে কতই মুখ চুম্বন করিতেছে, কৃমিময় বিষ্ঠা লইয়া কত যত্নেই সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতেছে; যাহা থাকিবে না তাহাকেই রাখিবার জন্য কত যত্ন, কত আগ্রহ, কত পরিশ্রম, আর যাহা অক্ষয় ধন, জীবন মরণের সম্বল তাহার প্রতি দৃষ্টি নাই! ইনি জীবের হস্ত পদ বদ্ধ করিয়া ইন্দ্রিয়গণের পদতলে তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, জীব আনন্দে তাহাদের পদ সেবা করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেছে! মোহে অন্ধ হইয়া নারীর শ্লেষ্মা রক্ত বিষ্ঠা মূত্রসংযুক্ত দেহ লইয়া কত যত্নে তাহাতে অনুরক্ত হইয়া তাহা লেহন করিতেছে! সুখ্যাতি যশ মান প্রভৃতির ফাঁকা আওয়াজে মুগ্ধ করাইয়া কত দিকে কত রকমে জীবকে নাচাইয়া লইয়া বেড়াইতেছেন। হায়রে! জীব বুঝিয়া ও বুঝিতে পারে না এমনি মায়ায় ভেল্কী।

সাধনা দ্বারা কেবল ইহাকে অতিক্রম করিতে পারা যায়। মন স্থির না হইলে মায়ার হস্ত এড়ান যায় না। চঞ্চলতাই সর্ব্বনাশের মূল, ও স্থিরতাই শান্তি ও অক্ষয় স্বর্গ। চিত্তস্থির হইলে বুঝিতে পারা যায় আমি কেহ নহি

এ দেহ আমার নহে, ইন্দ্রিয় আমার মনিব নহে, আমি ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। তখন আমি ত্রিগুণের অতীত, ত্রিতাপের অতীত, শান্ত ও নিশ্চল, দ্বন্দ্বের অতীত ও নির্ভয়, শোক নাই দুঃখ নাই, চিন্তা নাই ও ইচ্ছাও নাই। ইহাই ব্রহ্ম-পদ-অভিলাষীর পরম পদ বা মোক্ষপদ, নির্ব্বাণাবস্থা বা কৈবল্য। সাধক বহু পরিশ্রম ও যত্ন দ্বারা বহু জন্মে এই পদ লাভ করিয়া অমর হয়েন।

জনৈক হিন্দু।

নিধু বাবু।

রামনিধি গুপ্ত, ওরফে নিধুবাবু, ১১৪৮ সালে ত্রিবেণীর সন্নিহিত চাপতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হরিনারায়ণ কবিরাজ। হরিনারায়ণ বর্গীর হাঙ্গামায় স্বীয় জন্মস্থান—কলিকাতার কুমারটুলী পরিত্যাগ করিয়া, সপরিবারে মাতুল রামজয় কবিরাজের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নিধু বাবুর জন্ম রামজয়ের গৃহেই হয়।

বালক রামনিধি, বিদ্যা শিক্ষার্থে প্রথমে গ্রামস্থ পাঠশালায় প্রেরিত হন। তিনি বৎসরেক মধ্যেই ক খ হইতে আরম্ভ করিয়া শতক পর্য্যন্ত সমাপ্ত করেন। এতাদৃশ বুদ্ধিমান পুত্রকে সুশিক্ষা দিবার জন্য—বা অন্য কোন কারণেই হউক, ১১৫৩ সালে হরিনারায়ণ সপরিবারে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তখন নিধুর বয়স ছয় বৎসর মাত্র।

রামনিধি, কলিকাতায় আসিয়া প্রথম দুই তিন বৎসর পাঠশালে তৎকাল-প্রচলিত বাঙ্গালা বিদ্যা লাভ করেন। পরে জনৈক পাদ্রীর নিকটে ইংরাজি শিক্ষার নিমিত্ত প্রেরিত হন। তিনি শিক্ষাসম্বন্ধে, বুদ্ধিশক্তি-গুণে শিক্ষকদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট আদর ও স্নেহ পাইয়াছিলেন।

শিক্ষান্তে, তিনি সেরেস্তান রামতনু পালিতের সুপারিসে, ছাপ্‌রা নগরের কালেক্টরী আফিসে একটী কেরাণী-গিরি কর্ম্ম পান। ইতিপূর্ব্বে তিনি ১১৬৮ সালে কলিকাতার সন্নিহিত সুখচর গ্রামে প্রথম পক্ষের বিবাহ করেন।

নিধু বাবু বাল্যকাল হইতেই সুশীল ও মেধাবী ছিলেন। ইংরাজি শিক্ষা সত্ত্বেও তাঁহার দেবদ্বিজে বিশেষ ভক্তি ছিল। যে কেহ তাঁহার সংসর্গে আসিত, সকলেই তাঁহার বিনীত স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া যাইত।

গুণের ন্যায়, তাঁহার রূপেরও যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। তিনি একজন সুকণ্ঠ ও সুপুরুষ ব্যক্তি ছিলেন। বিশেষ তাঁহার মুখশ্রী অতি সুন্দর ছিল। পথের পথিকেরাও নাকি শত মুখে তাঁহার রূপের প্রশংসা করিয়া যাইত।

ছাপ্‌রার কর্ম্মকালে, তাঁহার সঙ্গীত-শিক্ষেচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। বাল্যকাল

হইতেই তাঁহার সঙ্গীতানুরাগ প্রবল ছিল। কোন স্থানে গান হইতেছে, শুনিবামাত্র, তিনি অনভিবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইতেন।

রামতনু পালিত কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় নামা অনেক জনাই-নিবাসী তৎপদে অভিষিক্ত হন। জগন্মোহন একজন সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। জগন্মোহনের সহিত নিধুর অত্যন্ত প্রণয় ছিল। তিনি সুকণ্ঠ নিধু বাবুকে একজন ওস্তাদের নিকট হইতে রীতিমত রূপে গান শিক্ষা করিবার পরামর্শ দেন।

এমন সময়ে ছাপ্‌রা নগরে অনেক ওস্তাদ আসেন। নিধু, গায়কের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া, তাঁহার ছাত্র হন। অতি অল্পকাল মধ্যে, নিধু, ধ্রুপদ খেয়াল প্রভৃতি অনেকগুলি কাশোয়াতি সুর গান ও আলাপাদি আদায় করেন।

১১৭৫ সালে নিধুর একটী পুত্র সন্তান জন্মে। কিন্তু বৎসরেক মধ্যেই সেটী পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। শোকে রোগে অল্প দিন পরেই পুত্রের গর্ভ-ধারিণীও ইহলোক পরিত্যাগ করেন। নিধুর দৃতদারাবস্থার অনেকগুলি শোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে।

১১৭৮ সালে নিধু, কলিকাতার অন্তঃপাতী জোড়াসাঁকো পল্লীতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীও প্রথমার পথানুসরণ করেন।

নিধুবাবু ছাপ্‌রা-নগরে যে ওস্তাদজীর নিকটে গান শিক্ষা করিতেন, ফলে তাঁহার—ওস্তাদদিগের রীত্যনুযায়ী অসম্পূর্ণরূপ সুরাদি শিক্ষা দিবার—চাতুরী বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। প্রতিজ্ঞা করেন, যে কখন আর মুসলমানদিগের নিকট হইতে গান শিক্ষা করিবেন না।

এই সময়ে তিনি কার্য্যে পেন্সন পাইয়া কলিকাতায় কুমারটুলীতে আসিয়া, বাস করিতে লাগিলেন এবং নির্ব্বাটে সরিমিয়ার টপ্‌পার অনুকরণে গীতাদি রচনা করিতে লাগিলেন। ইহার পূর্ব্বে, বাঙ্গালায় টপ্‌পা প্রচলিত ছিল না। সুতরাং তাঁহার গান, শীঘ্রই সর্ব্বস্থানে আদৃত হইয়া উঠে। নিধু বাবুই বাঙ্গালার মজলিসী বা বৈঠকী গায়নার প্রবর্ত্তক।

ভাল ভাল গায়কদিগের মুখে শুনা যায় নিধুর গানই প্রকৃত টপ্‌পা। সরির টপ্‌পার ন্যায় ইহাতে ঠিক সুর ও লয় বজায় থাকে। বড় বড় মুসলমান বা পশ্চিম দেশীয় ওস্তাদজীদিগকে বাঙ্গালার টপ্‌পা গাহিতে অনুরোধ করিলে, তাঁহারা নিধুর টপ্‌পাই গাহিয়া থাকেন।

মুরসিদাবাদ-নিবাসী মহারাজা মহানন্দ রায় বাহাদুরের সহিত নিধুর বিশেষ সখ্যতা ছিল। মহানন্দের শ্রীমতী নাম্নী একটী রক্ষিতা বারবিলাসিনী ছিল। শ্রীমতী, নিধুর রূপে গানে রসিকতায় মুগ্ধ হইয়া, নিধুকে গোপনে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। সত্য মিথ্যা জানি না, কিন্তু, শ্রীমতীর নামে নিধুর অনেকগুলি গান প্রচলিত আছে।

১২০১ সালে নিধুবাবু হাবড়ার এলেকাভুক্ত বরিজহাটী গ্রামে তৃতীয়বার বিবাহ করেন। তার পর চারিটী পুত্র ও দুইটী কন্যা রাখিয়া, ১২৩১ সালের চৈত্র মাসে ৮৩ বৎসর

বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। নিধুর মৃত্যু কলিকাতাতেই হয়।

নিধুবাবুর সম্বন্ধে অনেকগুলি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। সকলগুলিই এই প্রমাণ করে যে, নিধু বাবুর উপস্থিত গান রচনা করিবার ক্ষমতা বিলক্ষণ ছিল। আমরা তাঁহার তিনটী গানের সম্বন্ধে তিনটী মাত্র কিম্বদন্তী প্রকাশ করিতেছি।

একদা তাঁহার জননী বলিয়াছিলেন, "হ্যাঁরে রাম, শুনলাম তুই নাকি বড় গাইতে হয়েছিস্? আমাকে একটা গান শোনা।" এমন সময়ে অনেক বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী বলিলেন, "ভাই, নাত্‌বৌয়ের পায়ে ধরার গানটী যেন হয়।" নিধু সহাস্যে এই স্বার্থ-ভাবাত্মক সঙ্গীতটী গান।—

খিঁঝিট খাম্বাজ, মধ্যমান।

'আমি সাধ ক'রে কি ধরি তারি পায়।
সে ধন সহজে কি পাওয়া যায়।
সে যে জগদ্‌গুরু, কল্পতরু, মন দিতে হয় তারই পায়।
সে যে সাধনের ধন, অমূল্য রতন, তারে সাধন বিনা কেবা পায়?
সে যে অধমতারিণী, দুখ-নিস্তারিণী, তারে প্রেম বিনা বাঁধা যায়॥"

একদিন সায়ংকালে তিনি বাগবাজারের ঘাটে বসিয়া ছিলেন। শুনিলেন অনেক স্নানার্থী পুরস্ত্রী তাহার সখীকে বলিতেছে, "চোখই যত অনর্থের মূল।" নিধু গাহিলেন—

মূলতান, আড়া।

"নয়নেরে দোষ কেন?
মনেরে বুঝাতে বল, নয়নেরে দোষ কেন?
আঁখি কি সাধিতে পারে, না হ'লে মনোমিলন?
আঁখিতে যে যত হেরে সকলি কি মনে ধরে
যে যাহারে মনে করে, সেই তার আঁখি-রঞ্জন॥"

নিধু শ্রীমতীর সহিত কিছুদিন সাক্ষাৎ করেন নাই। পরে, একদিন দ্বিপ্রহরকালে দেখা করিতে যান। শ্রীমতী অভিমানে বলিল.—"কি মনে ক'রে? দেখা দিতে না কি?" নিধু গাহিলেন,—

সিন্ধু-ভৈরবী মধ্যমান।

ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসিনে,
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।
শ্রীমুখে মধুর হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
তাই তোমারে দেখ্‌তে আসি, দেখা দিতে আসিনে॥"

নিধুর এই শেষোক্ত গানটী সাধারণ আবাল বৃদ্ধ-বনিতাদিগের মধ্যেও প্রচলিত। স্মরণ হয়, এই গানটী বিশ্লেষণ করিয়া কেহ কেহ নিঃস্বার্থ প্রেম সম্বন্ধে দুই একটা প্রবন্ধও লিখিয়াছেন। ঠিক এত সুন্দর না হৌক, তাঁহার এই ধরণের আর একটী গান প্রকাশ করিতেছি।

মুম খিঁঝিট, পোস্তা।

শিখেছি মন দিতে, না জানি মন হরিতে,
জানিলে কি এত দুখ পাবে সে আমারে দিতে!
বাঁধিয়া প্রেমে আমায় ক'রেছে পাগল প্রায়,
না দেখি আর উপায় নিজ মন ফিরে নিতে!

আমরা নিধুর অধিকাংশ টপ্‌পা পাঠ করিলে তাঁহার কোন বিশেষ ক্ষমতা দেখিতে পাই না। বুঝিতে পারি না, নিধুর টপ্‌পা কি কারণে এত বিখ্যাত হইয়াছে! কিন্তু তাঁহার যে টপ্‌পাগুলি পাঠ করিয়া বিরক্ত

হইয়াছি; সেই টপ্পাগুলিই কখন কোন কোন গায়কের মুখে শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। ভাবিয়াছি, ইহা অপেক্ষা সুন্দর গান হইতে পারে না।

নিধুর "মধুর টপ্পার" প্রাণ—ভাব নহে, সুর। তাঁহার সুরোপযোগী বাঁধন-গুণে ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখা যায় না। কোন ছত্রে বা অর্দ্ধ ছত্রে যদি একটু ভাব থাকে, সুরে সেটুকু এমনি জমিয়া উঠে, যে, সমস্ত গানটা বুঝিবার আর অবসর থাকে না।

বারোঁয়া. ঠুংরি।

"আগে তারে দিওনারে মন.
সখি. সে নহে আপন।
আমি তারে ভাল জানি,
সে শঠের শিরোমণি.
শঠের পিরীতি যেন. জলেরি লিখন॥"

এই "জলেরি লিখন" কথাটা বলিতেছিলাম।

নিধুর টপ্পার একমাত্র গুণ—সুরোপযোগী রচনা। কখন দেখি নাই যে, তাঁহার গানে সুর ভঙ্গ হইয়াছে। তাঁহার কখন কোন গানে সুরকে টানিয়া বুনিয়া ছোট বড় করিতে হয় না। সুরে বাঁধনে এত মেশামিশি বাঙ্গালা গানে কদাচিৎ দেখা যায়।

সুরের দিক দিয়া দেখিলে, তাঁহার গান বাঙ্গালায় অতুলনীয়। ভাবের দিক দিয়া দেখিলে তাঁহার গানের মূল্য অত্যল্প। তাঁহার গানের বিষয়—বিরহ, মান ও রসিকতা। প্রেমিকের তো বিরহ অভিমান নহে; লম্পট ও কুলটার মান ও বিরহ।

আমরা এ চঞ্চল বিরহ ও মানের পক্ষপাতী নহি। নিধুর কালে এইরূপ বিরহ ও মান দেশ প্রচলিত ছিল। বাঙ্গলার গান এইরূপ বিরহ ও মানে পরিপূর্ণ। জানি না, বোধ হয় বাঙ্গালা গানের ধাতুই এই চঞ্চল বিরহ ও মান।

যে দেশে পরিণয় আছে, প্রণয় নাই, যে দেশে মিলন আছে, কিন্তু প্রেমিক বা প্রেমিকার মৃত্যু ভিন্ন বিচ্ছেদ নাই, সেদেশে প্রোষিতপতীক ও ভর্ত্তিকার বিরহ ভিন্ন অন্য বিরহ সম্ভবে না। কিন্তু, সে বিরহ-টুকুতেই কি হৃদয়ের সমস্ত বিরহ-কাতরতা ফুটাইতে পারা যায়? আমাদিগের আদি কবিরাও এই সমাজ-প্রথায় হৃদয় ব্যথা চাপিতে না পারিয়া পরকীয়া রসে শত সহস্র বিরহ-গান গাহিয়াছেন। আধুনিক কবি-দিগের বিরহ কবিতা বা সঙ্গীত, যাহা এখন প্রত্যহ রাশি রাশি দেখিতেছি, তাহার অধিকাংশ কি পরকীয়া-রস-মূলক নহে? একা নিধুকে চাপিয়া ধরিলে কি হইবে? বিরহ আমাদের দেশে নাই, হৃদয়ে আছে।

গান বিন্দু মাত্র শিশির। কিয়ৎক্ষণ মাত্র সূর্য্যালোকে খেলিয়া, সমীরণে দুলিয়া, সংসার-কোলে মরিয়া যায়। তাহা পার্থিব কি স্বর্গীয়, ইত্যাদি বুঝাইবার জন্য, উপন্যাসের মতন আগে-পাছে দু-দশটা পরিচ্ছেদ আনিতে পারে না। কাজেই তাহার অনেক কথা সুরের উপর বরাৎ থাকে। সুর ছাড়াইয়া নিধুর গান সমালোচনা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

নিধুর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, নিটোল ভাব-পূর্ণ গান অতি অল্পই আছে। তাঁহার অনেক-গুলি গানের প্রথম ছত্র অতি সুন্দর। পরাংশ দেখিয়া মনে হয় যেন জোড়ে-তাড়ে রচিত, বা প্রক্ষিপ্ত। যথা,—

সিন্ধু. আড়া।

,ভালবাসি ব'লে কি রে আসিতে ভালবাসনা?
আমার কপাল দোষে না পূরিল বাসনা।
হেরে তব মুখশশী, সুখের সাগরে ভাসি.
তাই বুঝি রেখেছ দাসী, ভাসিতে তব ভাবনা॥"

ঝিঁঝিট. আড়া।

"আমার নয়ন ল'য়ে কেউ যদি হেরে তারে,
মমাধিক সুখী হ'তে অনশ্য সে জন পারে।
সবে বলে নহে ভাল, সেই সে আমার ভাল,
সে মুখ হেরিলে মম দুখ যায় দূরে॥"

ঝিঁঝিট খাম্বাজ মধ্যমান।

"মরমে মরম যাতনা, ভালবাসার অযতনে।
কুক্ষণে এ কাজে মজে, (এখন) বাজের
অধিক বাজে প্রাণে।
যে জন পিরীতে নাচায়, সে যদি ফিরিয়ে
না চায়,
মন প্রাণ যাহারে চায়. সে যদি না বাঁচায়
প্রাণে॥"

এ গানগুলির মধ্যে অন্যের রচনা থাকা অসম্ভব নহে। নিধুর গান মুখে মুখেই প্রচলিত হয়। কবি-প্রকৃতি গায়কেরা সুর ও ভাব মনে থাকিলে কিন্তু অন্তরা বা আস্থায়ীর দ্বিতীয় ছত্রটা মনে না থাকিলে, প্রায়ই গানের ও সুরের অনুরোধে বিস্মৃত ছত্রটী নিজে পূরণ করিয়া গাহিয়া থাকেন। বাঙ্গালায় কবির অভাব আছে সত্য, কবি-প্রকৃতির তো অভাব নাই। এইরূপে নিধুর কোন কোন গানের দুই তিনটা রূপান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক কবিদিগের মুদ্রিত গানগুলাও মুখে মুখে প্রচলিত হইয়া, কতদূর বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয়, প্রত্যহই তো আমরা তাহা দেখিতেছি।

নিধুর ভাল গানগুলি কতদূর সুন্দর, তাহার নিদর্শন-স্বরূপ আমরা দুই-চারিটী গান পাঠক-বর্গকে উপহার দিলাম।

খাম্বাজ বাহার. মধ্যমান।

"কপটে আমারে এত সুখ দেওয়া ভাল নয়।
আগে দুখ দিলে পরে শেষে সুখ পেতে হয়।
কথায় কথায় প্রবঞ্চনা, ভালবাসা পেতে
ভালা,
যে যাহারে ভালবাসে বাজারে তা জানা
যায়।
মুখেতে মধুর হাসি. অন্তরে গরলরাশি,
সদা বল ভালবাসি ও কথা না প্রাণে সয়॥"

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ. মধ্যমান।

"দেখো, ভুল না দাসীরে।
এই অনুরাগ যেন থাকে চিরদিন তরে।
তোমা বিনা অন্য আর, কি ধন আছে
আমার.
প্রাণে মরি ও বদন ক্ষণ না হেরিলে পরে.
লোক-লাজ, মান ভয়, পরিহরি সমুদয়,
সঁপেছি জনম মত এ জীবন তব করে॥"

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ. মধ্যমান।

সে কেন রে করে অপ্রণয়, ও তার উচিত
নয়।
জানি আমি তার মনে, কভুতো বিচ্ছেদ
নয়।
কবে কি ব'লেছি মানে, আজও তার কি
আছে মনে,
তাই ভাবি কি মনে মনে অভিমানে রইতে
হয়?

সখি গো, আমার হ'য়ে বলো তারে বুঝাইয়ে
পিরীতি করিতে গেলে, দুখ দুখ সইতে
হয়।"

ঝিঁঝিট, আড়া।

"বিচ্ছেদ হেরিয়া প্রাণ, কেন রে এত কাতর!
শীত না থাকিলে কোথা বসন্তের সমাদর?
দুখ না হইলে পরে, দুখ কে জানিতে পারে?
নিশি বিনে, শশী-শোভা
মনোহর?"

বাঙ্গালার অনেকগুলি বিখ্যাত গান, কোথাও বা নিধুর কোথাও বা শ্রীধরের নামে প্রচলিত। এমন কি, আমরা যে কয়েকটী গান উদ্ধৃত করিয়াছি, সে গুলি যে ঠিক নিধুরই বা শ্রীধরেরই, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

নবদ্বীপের প্রাধান্য।

নবদ্বীপ—নাম শুনিলেই মনে হয়, অন্যান্য স্থানাপেক্ষা ইহা অপেক্ষাকৃত অ-প্রাচীন। 'নব' শব্দের অর্থ "নূতন" কথাতেই তাহা সংসূচিত হইতেছে। নবদ্বীপ স্থানটী অপ্রাচীন বটে, কিন্তু নবদ্বীপের প্রাধান্য আবার তদপেক্ষাও আধুনিক সময়ে সংঘটিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নবদ্বীপ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এক জন সিদ্ধপুরুষ নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন। এরূপ কিংবদন্তী শ্রুত হওয়া যায়, তিনি দেবী-বিশেষের এক ঘট-স্থাপনা করেন। তদবধি নবদ্বীপের খ্যাতি-প্রচারের সূত্রপাত হয়।

১। পূর্ব্বকালে দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে এবং আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে মিথিলাদি অঞ্চলে শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা প্রবল ছিল। বিদ্যার্থিগণ বঙ্গদেশ হইতে মিথিলায় গিয়া ন্যায়, পাতঞ্জল, বেদান্তাদি গ্রন্থের অনুশীলনে ব্যাপৃত থাকিতেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও পূর্ব্ব-প্রথানুসারে মিথিলায় গিয়া জয়দেব মিশ্রের* নিকট ন্যায়-দর্শনাদি অধ্যয়ন করেন। তৎকালে এরূপ নিয়ম ছিল, কোন ছাত্রই মিথিলা হইতে কোন শাস্ত্রের কোন গ্রন্থই ক্রয় বা প্রতিলিপি করিয়া আনিতে পারিবেন না। এই জন্যই এত দিন নবদ্বীপাদি প্রদেশে চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হইতে পায় নাই। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের অত্যন্ত প্রখর স্মারকতা শক্তি ছিল। তিনি বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াই অধীত গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে নবদ্বীপের সমীপবর্ত্তী বিদ্যানগর

* ইনি জয়দেব মিশ্র, পক্ষধর মিশ্র, জয়দেব উপাধ্যায়, জয়দেব মিশ্র উপাধ্যায় ইত্যাদি আখ্যায় পরিচিত। এই প্রস্তাবে উক্ত আখ্যার যে কোন নামে তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিব।

নামক গ্রামে এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলেন এবং অবসর ক্রমে মিথিলা-নিবাসী গঙ্গেশ উপাধ্যায়-বিরচিত প্রত্যক্ষখণ্ড, অনুমানখণ্ড, উপমানখণ্ড ও শব্দখণ্ড এই চতুর্ধা বিভক্ত "তত্ত্বচিন্তামণি" গ্রন্থের টীকা লিখিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌমের গুরুদেব জয়দেব উপাধ্যায় মিশ্র 'তত্ত্বচিন্তামণির' এক টীকা প্রণয়ন করেন। তাহা "আলোক" আখ্যায় সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত সার্ব্বভৌমের বিরচিত টীকা "সার্ব্বভৌমনিষ্কৃক্তি" নামে পরিচিত। এ বিষয়ে এক শিরো সমানধর্ম্মা ছিলেন বলিতে হইবে। রঘুনাথ শিরোমণি, চৈতন্য, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, হরিদাস সার্ব্বভৌম, শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভৃতি অনেকজন সার্ব্বভৌমের প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন। রঘুনাথ শিরোমণিই গুরুদেব বাসুদেবের ও জন্মভূমি নবদ্বীপের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজ-গুরুদেব সার্ব্বভৌম হইতে লব্ধ-বিদ্যা-বলেই অদ্বিতীয়-শক্তিশালী মহাগুরু জয়দেব মিশ্রকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই কারণে নবদ্বীপের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহাতে তাঁহার স্বীয় গুরু সার্ব্বভৌমের খ্যাতি প্রতিপত্তির আর সীমা রহিল না। শিরোমণি লোক-সমাজে যথার্থই শিরোমণি হইয়া উঠিলেন।

শিরোমণি কৃতবিদ্য হইয়া পাঠচ্ছলে দিগ্বিজয়ে যখন নির্গত হন, তখন মিথিলায় মিশ্র মহোদয়, সোপান-রাজি-বিরাজিত চতুষ্পাঠীর সর্ব্বোচ্চ আসনে আসীন হইয়া শিষ্যদিগকে উপদেশ প্রদানে ব্যাপৃত ছিলেন। রঘুনাথকে দর্শনমাত্র আচার্য্য মিশ্র মনে করিলেন, ইনি একজন বিদ্যার্থী হইবেন। তদ্ভিন্ন তাঁহাকে সর্ব্বনিম্ন-সোপানে উপবেশন করিতে বলিলেন। শিরোমণি প্রথমতঃ মিশ্রের শিষ্যবৃন্দকে বিচারে পরাস্ত করেন। তৎপরে অধ্যাপকের সহিত বহুল তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। ভারতবর্ষীয় অধ্যাপকদের প্রচলিত অভ্যাস-অনুসারে মিশ্র মহোদয় রহস্যচ্ছলে শ্লোক রচনা করিলেন,

"সহস্রাক্ষঃ স্মৃতঃ শক্রঃ, শঙ্করস্য ত্রিলোচনঃ।
অন্যে দ্বিলোচনাঃ সর্ব্বে, কো ভবানেক-
লোচনঃ?"

ইহার তাৎপর্য্য,—ইন্দ্রের সহস্রলোচন, মহাদেবের ত্রিনয়ন, আর সকলের দুই নেত্র, একচক্ষু তুমি কে?

রঘুনাথ ইহার যে উত্তর দেন, তাহাতেই মিশ্র প্রসন্ন হন। দুঃখের বিষয়, সেই উত্তরজ্ঞাপক শ্লোক পাওয়া যায় না।

রঘুনাথ শিরোমণি কাণা অর্থাৎ একচক্ষু ছিলেন, সেই জন্য জয়দেব ঐরূপ শ্লেষ-সম্ভাষণ করেন। একচক্ষুহীন বলিয়া রঘুনাথ 'কাণা ভট্ট শিরোমণি" বলিয়াও অভিহিত হইতেন।

শিরোমণি, যে জয়দেব মিশ্রকে পরাজিত করেন, তিনি সামান্য ব্যক্তি নহেন। তাঁহার নামান্তর পক্ষধর। পক্ষধর শব্দের অর্থালোচনা করিলেই, উহা সুন্দর প্রতিভাত হইবে। পক্ষধর শব্দের ৩ তিন অর্থ।

(১) তিনি এক পক্ষের পঞ্জিকার বার, তিথি নক্ষত্রাদি ভূতাগ্রে রাখিতে পারেন।

(২) মাস-মধ্যে তিনি যে দুই বার মাত্র (একপক্ষে একবার) শাস্ত্রানুশীলন করেন, তাহাতেই সমগ্র পঠিত বিষয় তাঁহার স্মৃতিপথে জাগরূক থাকে।

(৩) পণ্ডিতগণের মধ্যে দুই দলে

কোন বিষয়ের বাদানুবাদ চলিতেছে, তিনি যে পক্ষ প্রথমেই অবলম্বন করেন, মীমাংসা হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ।

এই ত্রিবিধ অনন্যসাধারণ গুণসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া জয়দেব মিশ্র পক্ষধর নামে সুবিখ্যাত হন। স্মারকতা শক্তি ও বিতণ্ডা-ক্ষমতা যাঁহার এত বলবতী, তিনি কি অলৌকিক সামর্থ্যশালী, সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। এমন লোক রঘুনাথের বিচারে পরাভূত হন, ভাবিলেই বিদ্বেষীর গুণগ্রাম উপলব্ধি হয়।

কিছু দিন আলাপ পরিচয়ের পর এক দিন মিশ্র মহাশয় শিরোমণিকে প্রশ্ন করিলেন,—

"অপি দিবসময়ৈষীঃ পদ্মিনীসঙ্গনিষ্ণঃ,
রজনীষু রমিতোঽসি কৌমুদিন্যাং রতজ্ঞাং।
কথয় কথয় ভৃঙ্গ! স্বচ্ছভাবেন ভাবং,
সুখমধিকমবাপ্সীরত্র বা তত্রবেতি॥"

আপনার দেশে ভৃঙ্গ-স্বরূপ হইয়া সুখে পদ্মিনীর সহবাসে (বাসুদেব সার্ব্বভৌম-সকাশে) জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীতে কাল-যাপন করিয়াছ; হে ভৃঙ্গ! সরল ভাবে বল দেখি, সেখানে আনন্দ পাইয়াছ, কি এখানে আনন্দ সম্ভোগ করিতেছ? কোথায় অধিক সুখ অনুভব করিয়াছ?

শিরোমণি উত্তর দিলেন,—

"স্বঃ পীযূষাদিরোপভুবণমণি-ভ্রাংক্ষে!
পরীক্ষেত কঃ?
মাধুর্য্যং তব বিশ্বতো হি বিদিতং সাক্ষী চ
মাধ্বীকতা।
কিন্ত্বেকন্ত পরস্বভুক্ত মপি ভ্রমো নোচেৎ
কৃপাসে,
মধুরিমা নান্যত্র
কুত্রাপি সঃ॥"

ইহার অর্থ এই,—

হে ভ্রাংক্ষে! (জয়দেব!) তুমি স্বর্গাভরণ মহামূল্য নিধি। তোমাকে কে পরীক্ষা করিতে সমর্থ? তোমার মাধুর্য্য বিশ্ববিদিত; তোমার উন্মাদিনী শক্তিও চিরচমৎকারিণী। কিন্তু একটি বড়ই মর্ম্মান্তিক-ক্লেশকর বিষয় দেখিতেছি; যদি কোপাবিষ্ট না হও, তবে বলিতে সাহস করি। কান্তের (সার্ব্বভৌমের) অধর-পল্লবে যে মধু আছে, অন্যত্র কোথায়ও তাহা নাই।

এই শ্লোকটী শ্লেষঘটিত। এ স্থলে সরলার্থই প্রকটিত হইল।

শিরোমণি অতঃপর কিছু কাল উপাধ্যায়ের নিকট শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করেন, এ প্রকার প্রবাদ শুনা যায়। রঘুনাথ-প্রণীত দীধিতি নাম্নী তত্ত্বচিন্তামণির টীকা নিতান্ত মান্য গ্রন্থ। ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে (১৪৭১ সংবতে) শিরোমণি বর্ত্তমান ছিলেন।

২। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সম্পাদিত কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিবার জন্য একটু বিশেষ ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। তাঁহার আবির্ভাবের কত শত শতাব্দী পূর্ব্বে বৈদিক সময়ে এক প্রকার স্মৃতি প্রচলিত ছিল। তাহা 'স্মৃতি' নামে খ্যাত ছিল না বটে, কিন্তু তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় স্মৃতি-ঘটিত। গৃহ্যসূত্রই বৈদিক কালের স্মৃতি। গোভিল গৃহ্যসূত্র, আশ্বলায়ন সূত্র, সাঙ্খ্যায়ন সূত্র, লাট্যায়ন সূত্র প্রভৃতি বৈদিক কালের স্মৃতি গ্রন্থ। তাহার বহু পরে মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি,

পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ বিংশতি জন বিংশতি স্মৃতি প্রণয়ন করেন। এই সমুদায় গ্রন্থের প্রভুত্ব বহুকাল অপ্রতিহত ভাবে প্রবল থাকে। পরে মিথিলাবাসী জীমূতবাহনের দায়ভাগ ও ধর্ম্মরত্ন, মাচস্পতি মিশ্রকৃত বিবাদ-চিন্তামণি, কামরূপাধিপতি শূলপাণির শ্রাদ্ধবিবেক, প্রায়শ্চিত্তবিবেক, নীলকণ্ঠের ব্যবহারময়ূখ, নন্দ পণ্ডিতের দত্তক-মীমাংসা প্রভৃতি গ্রন্থের প্রাদুর্ভাব হয়। তৎপরে পঞ্চদশ শতাব্দীতে রঘুনন্দন স্বাধীন ভাবে তিথিতত্ত্ব, শুদ্ধিতত্ত্ব ইত্যাদি ২৮ অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব স্মৃতিগ্রন্থ সংগ্রহ করেন। অদ্যাপি সেই সমুদায় গ্রন্থই বঙ্গদেশে স্মৃতিসংহিতা নামে মান্য রহিয়াছে। রঘুনন্দন ও নবদ্বীপের পক্ষে ইহা যে অসামান্য শ্লাঘার বিষয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গোঁসাই ভট্টাচার্য্য ও কাশীরাম এই দুই জন ২৮ তত্ত্বের দুই টীকা-কার।

৩। সর্ব্বাপেক্ষা চৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার দ্বারাই নবদ্বীপের যশঃ দেশ বিদেশে প্রধাবিত হইতে থাকে। চৈতন্যের পিতা-মুহের নাম জিত মিশ্র। তিনি শ্রীহট্টবাসী। জিতমিশ্রের সাত পুত্র জন্মে। ৬ষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্র মিশ্র (চৈতন্যের পিতা) শ্রীহট্টের বাস পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আগমন করেন। চৈতন্য প্রথমতঃ বিশ্বরূপ নামে পরিচিত ছিলেন। তার পর, সুন্দরবর্ণ বলিয়া "গৌরাঙ্গ" নাম হয়, এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপ সংসারত্যাগী হন বলিয়া, তাঁহার মাতা শচী দেবী "নিমাই" বলিয়া ডাকিতেন।

চৈতন্যের প্রথম অধ্যাপক গদাধর পণ্ডিত। তিনিই চৈতন্যকে ব্যাকরণ শিক্ষা দেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট দর্শনাদি শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন। তিনি এই শাস্ত্রে এতদূর পণ্ডিত হইয়া উঠেন যে, উপরকালে চৈতন্য, ন্যায় শাস্ত্রের এক টীকা রচনা করেন। ঐ টীকাতে তিনি যশস্বী হন নাই। যে জন্য চৈতন্যের নাম দেশ দেশান্তরে বিঘোষিত হইয়াছে, তাহা কৃষ্ণনাম-প্রেম প্রচার। তাঁহার তৃতীয় গুরু কেশব ভারতী। তিনিই শ্রেষ্ঠ গুরু। কেশব ভারতী দণ্ডাই তাঁহাকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তদবধি তাঁহার ও তাঁহার জন্মস্থানের সুখ্যাতি সর্ব্বসাধারণের সুগোচর হইয়াছে।

৪। নদীয়া জেলার অন্তর্গত কাঞ্চনপল্লী গ্রামে কবি কর্ণপুর ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া নবদ্বীপের প্রাধান্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিরচিত অলঙ্কার-কৌস্তভ, চৈতন্য-চন্দ্রোদয়, বৃহদ্গণোদ্দেশদীপিকা, শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা, আনন্দ-বৃন্দাবন-চম্পু প্রভৃতি সমধিক আদৃত। চৈতন্যই তাঁহাকে "কবিকর্ণপুর" উপাধি দেন। তাঁহার প্রকৃত আখ্যা পরমানন্দ দাস তিনি বৈদ্য জাতীয় ও শিবানন্দ সেনের পুত্র।

রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, ও চৈতন্য বঙ্গসমাজে এত দূর প্রভুত্ব প্রাপ্ত হন যে, তদ্বিরক্ত কেহ কেহ তাঁহাদের কার্য্যে বিরক্ত হইয়া শ্লোক রচনা করিয়া তাঁহাদের নিন্দাবাদ প্রচার করেন। সেই নিন্দাও তাঁহাদের যশের নিদান। তাঁহারা বলেন,—বোপদেব গোস্বামীর মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রচারিত হইলে পর, পাণিনি প্রভৃতি

মুনিগণের ব্যাকরণের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়; জীমূতবাহন, শূলপাণি, রঘুনন্দনের স্মৃতি শাস্ত্রে অন্যান্য স্মৃতির প্রাধান্য তিরোহিত হয়; গঙ্গেশোপাধ্যায়ের দর্শনে অপরাপর দর্শনের প্রাদুর্ভাব বিনষ্ট হয়, কুবিন্দ কবির পুরাণে অন্য পুরাণ নষ্ট হয়।

জাতে ব্যাকরণং হতং প্রথমতঃ শ্রীশেষ-
দেবে কবৌ,
জীমূত প্রভৃতৌ কলৌ কলিভটে নষ্টা
স্মৃতিঃ শাশ্বতী।
গঙ্গেশ প্রভৃতৌ প্রসুপ্তমপি তন্ত্রান্যাদি
শাস্ত্রং পরং,
শ্রীমদ্ভাগবতে কুবিন্দকবিনা খ্যাতে পুরাণং
হতং॥

ষটকড়ের বাঙ্গালা কারিকায় ইহার সুন্দর বর্ণনা দৃষ্ট হয়,—

"বাসুদেবের তিন শিষ্য চৈধে, রঘো,
কানাই।
নদের লোকে এদের নামে জলে মরে
ভাই॥
'চৈধে' বেটা বড় দুষ্ট, নিমে তার নাম।
'রঘো' বেটা মোটা বুদ্ধি, ঘটে করে ধাম॥
'কাণা' ছোঁড়া বুদ্ধে দড়, নাম রঘুনাথ।
মিথিলার পক্ষধর, বারে করে সাথ॥
তিন বেটা তিন পথে কাঁটা দিল শেষ।
ন্যায়, স্মৃতি, ব্রহ্মচর্য্য হইল নিঃশেষ॥
কাণার সিদ্ধান্তে ন্যায়, গৌতমাদি হত।
প্রাচীন স্মৃতির মত, নব্য হাতে গত॥
শচী-ছেলে নিমে বেটা নষ্টমতি বড়।
মাতা দারা দুই ত্যাগী সন্ন্যাসেতে দড়॥
সেই বেটার সঙ্গেতে, আরো দুটো
যুবো।
'নিতে' দ্বিজদ্বয় বলে ততো
ততো॥

(দোষমালা।)

"দোষমালা" রচয়িতা চৈতন্যকে "চৈধে", রঘুনাথ শিরোমণিকে "কাণা", রঘুনন্দন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যকে "রঘো" বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, চৈতন্য ও রঘুনন্দনকে মধুর বিশেষণ "বেটা" এবং রঘুনাথকে "ছোঁড়া" শব্দে পরিচিত করিয়াছেন। উক্ত গালি তাঁহাদের ভূষণ হইয়াছে।

তার পর মধুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার, শিরোমণি ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, হরিদাস তর্কাচার্য্য, রামভদ্র সার্ব্বভৌম, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি নৈয়ায়িকদিগের গ্রন্থে নবদ্বীপের অক্ষয় কীর্ত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

অনন্তর জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয়, কাণাভট্ট শিরোমণির সঙ্গে বিহুত প্রদেশে গিয়াছিলেন। পরাধর শিরোমণি গোকুলনাথ উপাধ্যায়ের সকাশে পরীক্ষা দিতে গমন করেন, এরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। কালের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। ইহার পর এমন ঘটনা হইল যে, মৈথিলগণ নবদ্বীপে ন্যায় শাস্ত্রের অধ্যয়নার্থ গতিবিধি করিতে লাগিলেন।

৫। দর্শন, স্মৃতি ও সন্ন্যাস বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত তিন মহাত্মা যেমন নবদ্বীপের মুখ উজ্জ্বল করেন, কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্যও তন্ত্র বিষয়ের তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়া দিয়া, নবদ্বীপকে সাধারণ লোকের অধিকতর আলোচ্য করিয়া তোলেন। তিনি সমুদায় প্রামাণিক তন্ত্র গ্রন্থের সংগ্রহ পূর্ব্বক

এক সংগ্রহ পুস্তক প্রচার করেন। তাহা তাঁহার স্বনামে প্রচলিত ও "কৃষ্ণানন্দ তন্ত্র" বলিয়া বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র খ্যাত। সংস্কৃত ভাষাব্যবসায়ীর নিকট তাহার সমাদর যথেষ্ট আছে।

৬। নৈয়ায়িকাগ্রগণ্য জগদীশ তর্কালঙ্কার অসাধারণ পণ্ডিত ও মহাস্থানী। তিনি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। জগদীশ, রঘুনাথ শিরোমণি প্রণীত চিন্তামণিদীধিতির চিন্তামণিদীধিতিপ্রকাশিকা নাম্নী টীকা, ব্যাপ্যত্বমানদীধিতি-টিপ্পনী, লীলাবতীদীধিতি-টিপ্পনী, তর্কামৃত, শব্দশক্তিপ্রকাশিকা প্রভৃতি প্রগাঢ় চিন্তা ও যুক্তি সম্পন্ন অনেকগুলি পুস্তক রচনা করেন। তর্কালঙ্কারের প্রিয় ছাত্র রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ স্বর্গীয় গুরুর রচিত শব্দশক্তিপ্রকাশিকা পুস্তিকার প্রবোধিনী নাম্নী টীকা করেন। বৈশেষিক দর্শনের মত অবলম্বন করিয়া 'তর্কামৃত' প্রণীত হয়। ইহারও দুই টীকা বিদ্যমান আছে।

এতদ্ভিন্ন নবদ্বীপে অনেক মনস্বী ব্যক্তির উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট বঙ্গভূমি চির-ঋণী। অবকাশ ক্রমে আমরা বারান্তরে নবদ্বীপের মাহাত্ম্য-বর্ণনচ্ছলে তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ ঘোষণা করিব, ইচ্ছা রহিল।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

পুলিষমাহাত্ম্যে সার্কুলার সংবাদ।

(প্রস্তাবনা)

কহ মাতঃ বীণাপাণি বরকরধরণি,
উদারা মুদারা তারা যেবা গ্রামে হয়,
আলাপিতে পার ভাল, নহে ক্ষতি নাই,
কোন মতে আবাদিরা কহ গো সন্তানে
সহসা ভারতে আজি না ফুটিতে রোদ,
না কাটিতে ডালে ডালে সজিনার খাড়া,
যতনে রক্ষিত অতি মাথার ভিতরে
সুকোমল—সুশীতল—সুতরল সদা
ঘুনিবিড় চাঁচর চিকুর তার পর—
তবু কিসে সে মস্তিষ্ক হ'লো বিদারিত?
শুনিয়াছি—পড়িয়াছি চারুপাঠে বটে—
সত্য মিথ্যা নাহি জানি—কিন্তু পড়ে মনে,
শ্যামতৃণাস্তীর্ণ ক্ষেত্র ভেদি আচম্বিতে
বিদীরিলে কোথা কভু আগ্নেয় ভূধর
যোজন ব্যাপিয়া দেশ কাঁপি সে আঘাতে
ছারে খারে যায় শেষে মলয় অঙ্গারে।
একি অগ্নিগিরি? নাকি তারো চেয়ে বড়?
গণনায় কি ছার যোজন? এ যে মা গো
সমগ্র ভারত কাঁপে প্রচণ্ড কম্পনে,
কি জানি বা যায় কবে, কিবা হয় শেষে!
কহ দেবি, কেমনে এ হইল ঘটনা?
কেমনে লভিলা জন্ম - শুনেছি পুরাণে
ত্রিপুরনাশন শূলী দক্ষে কবি যবে
ভীমরবে উৎপাটিয়া নিক্ষেপিলা জটা,
ছিন্ন জটে বীরভদ্র লভিলা জনম

প্রতাপে ভীষণতাপ শমন-সোদর।
শিব মহাদেব, অসম্ভব নহে কিছু
তাঁর, কিন্তু মাগো, মনুষ্য-মস্তিষ্কে, কহ—
কেমনে লভিলা জন্ম বীরভদ্রবীর
শতাব্দভীষিকাময় হেন সাকুলার।
জন্ম মাত্র কি করিলা সে অহিরাবণ,
কি রূপে বা নিজ কার্য্য লাগিলা সাধিতে,
কহ মাত গদ্যে, পদ্যে, নাটকে, নভেলে,
যেবা ছাঁদে যেবা ভাবে ইচ্ছা তব যায়,
তুমি তো মা বঙ্গদেশে বিরাজিছ আজি,
ঘট পট ছাড়ি সদা কালির আঁচড়ে,
কিবা কাজ পদ্যে গদ্যে, যাতে বাড়ে পুঁথি
'কল্পনার' স্তম্ভ গুলা যাতে যায় পূরে
হেন ভাবে ব'লে যাও, লিখে যাই আমি,
শুনুক গৌড়ীয় জন অপূর্ব্ব সম্বাদ।

(উপক্রমণিকা।)

বিভাস রাগেন ঠুংরি তালেন চ গীয়তে :

একি এনু শুনে, বুঝি এত দিনে,
পয়সাকার বিনে গতি নাহি আর।
কাগজে কাগজে, সমাজে সমাজে
সবে যে ইংরাজে বলে মার মার। ওঃ—
কেন না ভাবিনু, আপনা খাইনু,
কত না করিনু ভারতের তরে ;
অকৃতজ্ঞ জাতি, পেয়ে জ্ঞান-ভাতি,
করে মাতামাতি নগরে নগরে।
ছিল দাস সবে, চিরদাস রবে,
মনে হেন ভেবে কিবা শেষ ভেল।
চুপ পেখনিয়া, দখিয়া ভাবিয়া
যতনে ভখিয়া পুছে গাল গেল।
নিজ কর্ম্ম দোষে, বুঝি ধর্ম্ম রোষে,
অরি আপশোষে সদা প্রাণ দহে,
হবে না হবে না, কভু তা ভেব না,
কর রে মন্ত্রণা আর নাহি সহে।

(মন্ত্রণা।)

স্থান—মনুমেণ্ট চূড়ালগ্ন হেলিংবথ্যাম্মমন্ত্রকক্ষ ;
কাল—রজনী ১২-৪৫'-১৫" ; পাত্র—জন,
পোয়ান, পালোয়ান প্রভৃতি সদস্যগণ
আসীন।

জন। অতি সুন্দর, অতি সুন্দর। যদিও এই কাল রজনী পোহাইতে না পোহাইতে, এই পরিদৃশ্যমান গ্যাসালোক-শ্রেণী (হস্তান্দোলন পূর্ব্বক দর্শানানন্তর) নিভিতে না নিভিতেই ইহার সম্যক কোন ফল উপলব্ধি হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না, তবুও ইহা অতি সুন্দর, অতি সুন্দর! শঙ্কা নাই, ভঙ্কা মার, জয় জয় জয়, নিশ্চয় ; এমন মন্ত্রণা আর হয় নাই, হইবে না, হইতে পারাও অতি দূরের কথা। বড় আহ্লাদে তাই আবার বলি, অতি সুন্দর, অতি সুন্দর, অতি সুন্দর!!!

পোয়ান। প্রথম বক্তার প্রস্তাবে আমি সম্পূর্ণ দ্বিতীয় করি। ঐ যে সম্মুখে ভাগীরথী বঙ্গোপসাগরে মিশিবার জন্য আকুল হইয়া তরঙ্গভঙ্গে উছলিয়া উছলিয়া চলিয়াছে, আমারও হৃদয় (বক্ষে হস্ত প্রদান)—বিশ্বাস না হয় যার ইচ্ছা হাত দিয়া দেখ, কামারের জাঁতা নয়, ঘড়ির পেণ্ডুলাম নয় তবু কি ভয়ানক ভাবে ধড় ফড় করিতেছে!—ওঃ আমারও হৃদয় সেইরূপ এই মন্ত্রণা অচিরাৎ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। হয় না কি—হয় না কি? এই

রাতারাতিই ইহার একটা হেস্তনেস্ত করা যায় না কি ?

পালোয়ান। যাবে না কেন ? অথবা সব না যায়, যতদূর যাইতে পারে তাহা করা উচিত। 'শুভস্য শীঘ্রং' কথাটা ঘৃণিত বাঙ্গালিদের বটে, কিন্তু কথাটা ভাল।

(সকলের প্রতি) কি বলেন, আপনারা ?

সকলে। হাঁ হাঁ, বটে বটে, তাত বটেই।

জন। যখন আপনাদের সকলেরই এক মত, তখন আমার অন্য মত হইবার কোন কারণ নাই। তবে, কথা হইতেছে (মৃদুস্বরে) প্রচণ্ডপ্রকৃতি লোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী দণ্ডমুণ্ডবিধাতৃবর পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করা। কিন্তু পুলিশ নিদ্রার জন্য বড়ই বিখ্যাত, তজ্জন্য তাঁহার আর একটী নাম নিদ্রাসিংহ। শুনিয়াছি, দিবা দ্বিপ্রহরে গলা কাটাইয়া ডাকাডাকি করিলেও তাঁহাদের বড় একটা সাড়া পাওয়া যায়, সুতরাং এই ত্রিযামপ্রাপ্তা ঘোরা রজনীতে ডাকাডাকি করিলেও যে তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইবে সে বিষয়ে সম্ভাবনা কোথায় ? পুলিশ-কর্ত্তার সহিত আমার বিশেষ আলাপ—নিকট সম্বন্ধ—পিসির পিস্ শ্বশুরের সাক্ষাৎ পিসতুতো ভাই—কল্য প্রত্যূষেই আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সব ঠিক করিব। হাজার হউক, তাঁহারা বড় লোক, এত রাত্রে তাঁহাদিগকে বিরক্ত করাও ভাল দেখায় না।

(সকলের প্রতি) কি বলেন, আপনারা ?

সকলে। হাঁ হাঁ, বটে বটে, তাত বটেই।

ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সকলের একরায় ; সভাভঙ্গ, পটক্ষেপ।

গুপ্ত মন্ত্রকক্ষ, সুতরাং ঐক্যতান বাদন নিষেধ।

(সংকল্প)

বাসী চরণে।

বসন্ত কাল। সূর্য্য ডুবিল, সন্ধ্যা আসিল, তারা উঠিল, বক উড়িল, কাক ডাকিল, কেরাণী ছুটিল, দখিনা বহিল ; তবে খড়খড়ি না খুলিবে কেন ?

চৌরঙ্গীর উপর একখানি প্রকাণ্ড বাড়ী ; ঠিক্ পড়ের মাঠের দিকে তাহার একটা জানালা, সেই জানালার খড়খড়ি খোলা। জানালার ধারে কৌচের উপর অর্দ্ধশায়িত অর্দ্ধোপবিষ্ট ভাবে একজন শ্বেতকায় মহাপুরুষ। ইনি কে ? ইনি কে তাহা ইনিই জানেন। কিন্তু এমন করিয়া কেন অবস্থিত ? চক্ষু মুক্তপথাক্ষপথপ্রবিষ্ট হইয়া কি কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব বিষয় লক্ষ্য করিতেছে ? অথবা ঐ যে চৌঘুড়ি করিয়া কে দুই কিন্নর কিন্নরী চলিয়া যাইতেছে, একদৃষ্টে কি তাহাই দেখিতেছেন ? না, সে শকট অনেকক্ষণ তো দৃষ্টিপথবহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। তবে, কি ঐ যে গৃধিনীটা যে পূর্ব্বে দিনের বেলায় লাট সাহেবের বাড়ীর ছুড়ার উপর বসিয়া আপনাকে লাটের লাট ভাবিয়া সগর্ব্বে দেহ দুলাইতেছিল, সে এখন সন্ধ্যা আগত দেখিয়া ধীরে ধীরে চোরের মতন কেমন করিয়া ঝোপের

ভিতর লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে, তিনি কি একাগ্র ভাবে তাহাই লক্ষ্য করিতে করিতে 'চিরদিন কখন সমান না যায়' ভাবিতেছেন? না, ঝোপের ঘনবিন্যস্ত শাখাপত্রের অন্ধকারে আর তো তাহাকে দেখা যায় না। তবে, কি ঐ যে ট্রামওয়ের কণ্ডক্টার ইতিপূর্ব্বে পানওয়ালির সঙ্গে তাহার যে দুই একটা রসিকতা হইয়াছিল তদ্গতচিত্তে তাহাই ভাবিতে ভাবিতে একটী আরোহীর ডাক শুনিতে না পাওয়ায়, বাবুটী ছুটিতে ছুটিতে অতর্ক্য ভাষায় তাহাকে নানা কটু বলিতেছিলেন, আর সেও আত্ম-রক্ষা করিতে গিয়া তদপেক্ষা আরও দুই একটা কড়া শুনাইয়া দিতেছিল; এবং সেই গোলেমালে একখানা ছেকড়া গাড়ীর একটা পিচুটীপড়া ঘোড়া ক্ষেপিয়া জোত ছিঁড়িয়া যেমন দৌড়াইবে অমনি তাহার ধাক্কা লাগিয়া একজন রুটিবিস্কুটওয়ালার চেঙ্গারি সমেত সমস্ত রুটীবিস্কুট ও তদুপরি স্বয়ং পপাত ধরণীতলে হইল, তিনি কি নিমেষে এক কারণে এত ভলা কার্য্যকল দৃষ্টে উৎসুক নয়নে বারবার তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছেন? না, ট্রাম তো চলিয়া গিয়াছে, গাড়ান ঘোড়াটা তো সে তল্লাটেও নাই, বিস্কুটওয়ালা তো এতক্ষণ হাসপাতালে। বেশি কি বলিব, তিনি কিছুই দেখিতেছেন না, বা শুনিতেছেন না। অথচ, তাঁহার মূর্ত্তি অতি গম্ভীর, ললাট চিন্তা-প্রদীপ্ত, মুখে চোখে, চোখের প্রতি পলক-পতনে কোন গুরুতর মীমাংসার গুরুতর আন্দোলন সূচিত হইতেছে। কিসের মীমাংসা? কিসের চিন্তা? কে বলিবে কিসের?

পাঠক, এতক্ষণে গল্প জমিল। এ আখ্যায়িকা নায়িকাশূন্য নহে। চাহিয়া দেখ, পূর্ব্বদিকের দরজা খুলিয়া কে ঐ রমণী ধীরে ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিল। আমাদের নিশ্চয় বিশ্বাস, যদি নায়ক ইহার আগমনবার্ত্তা জানিতে পারিতেন, তৎক্ষণাৎ কালিদাসের কুশের ন্যায় বলিয়া উঠিতেন—"কা ত্বং শুভে ... কিংবা মদভ্যাগমনকারণং তে।" কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি এতই অন্যমনস্ক যে ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে ধীরে রমণী আসিয়া পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলেন। তখনও অন্ধকারের সঙ্গে যুঝিতে যুঝিতে কতকটা আলো ঘরের এদিক্ ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিল। সেই অস্পষ্টালোকে স্তব্ধ কক্ষে সোফাতলে রমণী দেখিল, এক খানি কাগজ পড়িয়া। ছাপা কাগজ নহে, হাতের লেখা। লেখা উজ্জ্বল, পরিষ্কার, বড় বড়। রমণী কম্পিতকলেবরে তাহা পাঠ করিলেন। সর্ব্বনাশ! কেহ নাই—এ বিস্তৃত ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান, শিখ পাঞ্জাবী, উড়িয়া মাইটী,—কেহই নাই—সবাই বিদ্রোহী! বিদ্রোহী প্রকাশ্যে নহে—অন্তরে অন্তরে! উপায়? সমস্ত গৃহে যাহার বাস, তাহার কি গতি? হা, অবলা-বান্ধব, হা মেরীপুত্র, তুমি কোথায়! মাথা ঘুরিয়া আসিল। চক্ষু কর্ণ দিয়া তাড়িত ছুটিতে লাগিল। একবার ঘরের দেয়ালের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন যেন স্পষ্ট করিয়া লেখা রহিয়াছে—সবাই বিদ্রোহী! একবার চক্ষু মুছিয়া জানেলার দিকে চাহিলেন, জানেলার সার্সীতে সার্সীতে সেই কথা—সেই, সবাই বিদ্রোহী! তখন সভয়ে এক

যার অদূরবর্ত্তী দুর্গের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন, বোধ হইল, যেন সে কেল্লা নাই, সে মাঠ নাই, গঙ্গার জলে সব ডুবিয়া গিয়াছে, কেবল অন্ধকার—ভীষণ অন্ধকার —অন্ধকারে জ্বলিতেছে কেবল কয়টী অক্ষর —সবাই বিদ্রোহী। রমণী কাঁদিতে লাগিলেন। কোমল অবলা-হৃদয়ে আর কত সহিবে? তৎক্ষণাৎ বাতাহতকদলীবৎ সেই সোফাতলে পড়িয়া গেলেন।

এতক্ষণে চিন্তামগ্ন নায়কের চমক ভাঙ্গিল। ধড় মড় করিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। কিসের শব্দ? চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। কিছুই লক্ষিত হইল না। একি! এ যে সেই স্পর্শ! সেই কর-পল্লব! "প্রিয়ে—প্রিয়ে, তুমি! তুমি কোথায়?"

অতি ক্ষীণ করুণ কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, —"দাসী চরণে।"

(উপসর্গ)

পঞ্চম সর্গ।

বন্দি মাত আরবার,
এত ক্ষণে
বহুকষ্টে জুটায়েছি রমণী রতন,—
কি ছার বিলম্ব তবে,
গাও গান,
নহে গদ্যে, নহে পদ্যে,
ছাঁদ বাঁধ না মানি আটক।
গদ্য পদ্য দুজনাই চিরদিন সেবক
তোমার,
কাজ কি একেরি ত্যজি, অন্যে করি ধরা,
ভীষণ সমরে তার,
লোকে কবে একচখো কবি?
তাও বটে,
বিশেষ,
নিশ্চয় আরো ভাল জানি মনে
এ মোর নাটক হবে অভিনয়
মরকতে,
কিম্বা,
রঙ্গরঙ্গভূমে;
চলিলে চলিতে পারে অথবা বীণায়।
কিন্তু, মাগো,
খাঁটি গদ্য কিম্বা খাঁটি কবিতার ঘর
নাহি আজ নাটকের হাটে,
না জোটে দর্শক,
তাইতে তাই যত নটচূড়ামণি
গদ্যে পদ্যে সন্ধি সংস্থাপিলা।
আপনি নাটক আপনার বেশ লইল
চিনিয়া।
বড়ই সুবিধা,
লিখিতে হবে না বেশি,
অথচ কেমন,
হস হস শব্দ করি পুথি যাবে বেড়ে।
প্রণেতার লাভ,
লাভ পাঠকের,
ততোধিক লাভ প্রেসওয়ালার।
হেন লাভ কেন মা ছাড়িব?
না,
কখনই নহে।
এস তবে, মাতা পুত্রে লিখি কাব্য—
উহুঁ,—
দৃশ্যকাব্য—
নহে পুরাণমূলক, এ যে সকলি নূতন
অদ্ভুত অপূর্ব্ব কথা—
লিখি এস, অদ্ভুত অপূর্ব্ব সেই

ধারমোটা ছন্দে।
কিন্তু,
পেড়েছিনু কোন্ কথা?
"বহু কষ্টে জুটায়েছি রমণীরতন"—
রমণী
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের হেতু;
রমণী বিহনে
কাব্যের কাব্যত্ব নাহি থাকে;
রমণী বিহনে
কৃতীর কৃতিত্ব লো
রমণী
প্রবৃত্তিরূপিণী;
কোথা থেকে হবে কার্য্য প্রবৃত্তি অভাবে।
প্রবৃত্তি জুটিল যদি,
কেন না হইবে কার্য্য তবে?
অবশ্য হইবে।
তাহাই হইল।
সোফা হ'তে এক লম্ফে নামিয়া ত্বরিতে
তুলিল শিরাবে আহা উহু করি।
কোথায় লেগেছে কমেনে বেজেছে,
কেন কি হ'য়েছে, করিল জিজ্ঞাসা।
ভাবিনী সে কথার না দিল উত্তর।
চাহিয়া শূন্যের পানে,
চাহিয়া কড়ির দিকে,
চাহিয়া গবাক্ষ পথে,
কাতরে নিশ্বাস ছাড়ি কহিল তখন
"কেহ নাই—কেহ নাই—ভারতের—
অহো, মশা মাছি আ-টিকটিকি,
সবাই বিদ্রোহী!"
বিদ্রোহী!
নায়কের বুকে
বিঁধিল সহসা যেন রক্তসের ছুরি তীক্ষ্ণধার।
বিদ্রোহী!
অহো, কে দিল এ নাম!
কেমনে পাইল স্থান অভিধান মাঝে!
ছিঁড়ে ফেল—ছিঁড়ে ফেল!
বিদ্রোহী!
আবার ধ্বনিল তাহা হৃদয়ের কানে।
আবার—আবার—
বড়ই অস্থির হ'লো নায়ক সুমতি।
হেন কালে কাল মেঘ উদিল আকাশে।
আয়া আসি জানিল সম্বাদ,
মধ্যম কুমার নাকাতে নাকাতে ছাদে
গিয়াছে পড়িয়া,
ভাঙিয়াছে দাঁত
বুঝাইয়া পড়িছে শোণিত।
সভয়ে শুনিলা মেম,
সভয়ে শুনিল শ্বেতদীর,
সভয়ে শুনিল তাহা নিস্তব্ধ সে ঘর।
লাগিল কাঁদিতে আয়া,
কিন্তু মিছা কান্না তার—
নীরবে দাঁড়ায়ে রৈল সাহেব সাহেবী।
ইঙ্গিতে আকুল নাড়ি
কেবল বারেক
আয়ারে কহিল যেতে।
চলে গেল আয়া।
সাহেব কহিল সাহিবানে,—
'নিশ্চয়—নিশ্চয়—সুনিশ্চয়—
এতক্ষণে খুলে গেল জ্ঞানের দরজা
ঝনাৎ করিয়া;
পড়ে গেল নয়নের ঠুলি
ধপাৎ করিয়া।
নিশ্চয়—নিশ্চয়—সুনিশ্চয়
বাঙ্গালীর হাড়ে হাড়ে শিরায় শিরায়
ইংরাজ-দ্রোহিতা মাখা।
বড় নষ্ট!—

জানে মনে এই বাড়ী
অবশ্য ইংরাজ কোন লইবেক ভাড়া,
তেঁই সে নির্শ্মিল ছাদ হেন ভাবে,
তেঁই তো সে পড়িল কুমার।
বিদ্রোহের জলন্ত দৃষ্টান্ত!
কিন্তু,
কি!—
ইংরাজে মারিবে বাঙ্গালী!
হু!
হু!
হাই!!
!
কেশরীর সাথে লাগিবে কেন্দু।
চল রাণি, চল যাই, দেখিগে কুমারে,
দেখিব—বুঝিব বটে,
কত বল ধরে এবে বাঙ্গালীর বাহু!
কত তার বিদ্রোহ-চাতুরী!"
কাঁপিতে লাগিলা রোষে সু-ইংরাজ!
শুনিলা সকলি রামা,
বলিল,
"চল যাই—কিন্তু, করহ প্রতিজ্ঞা,
বাঙ্গালীর বাড়ী আর না লইবে ভাড়া।"
কুমারে দেখিতে বড়ে ধাইলা উভয়ে।

(প্রয়োগ)

একে দারুণ রোগ, তার উপর আবার যখন উপসর্গের উপদ্রব আরম্ভ হইল, তখন তাহার ব্যবস্থা নিতান্তই অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। কিন্তু এজন্য কোন ডাক্তার ডাকিতে হইল না, কবিরাজ ডাকিতে হইল না, কোন হাকিমি মিক্চাকে খবর দিতে হইল না। খবর নিজের হাতে। নিজের হাতে থাকিতে এতদিন কেবল অবহেলার জন্যই এতটা বাড়িয়া উঠিয়াছে; সুতরাং আর বিলম্ব অকর্ত্তব্য। তখন, সেই শ্বেতকায় মহাপুরুষ—সে মহাপুরুষ কে, তাহা এতক্ষণ বলা হয় নাই, তিনিই সেই সর্ব্বজনবিদিত মহাক্ষমতাশালিনী দণ্ডমুণ্ডবিধাতৃবর পুলিষপুঙ্গব, সেই দিনকার সেই নৈশসভার সভাগণ যাঁহার উপর তাঁহাদের সকল আশা স্থাপন করিতে ছিলেন, ইনি তিনিই—হায়, কোথায় ভাবিতেছিলেন কি উপায়ে বন্ধু বান্ধবকে স্বজাতিবৃন্দকে উদ্ধার করিবেন, না, নিজেই আজ উপদ্রুত! কি! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! এত আস্পর্দ্ধা। এ রাগ কি বর্দ্ধান্ত হয়, এ ক্রোধ কি সামলান যায়, এ ঝাল কি গায়ে মরে! রাগে গর গর করিতে করিতে, তেজে ফর ফর করিতে করিতে সাহেব হাঁকিলেন 'বেহারা!' 'খোদাবন্দ' বলিয়া তৎক্ষণাৎ বেহারা আসিয়া সুদীর্ঘ সেলাম বাগাইল।

"দোয়াত কলম—জল্‌দি।"

বেহারা ভয়ে তা তাড়িতে হতমত খাইয়া দোয়াতে কালি ঢালিতে কতকটা কাপড়ে কতকটা মেজেয় ফেলিয়া দিল, তাহা মুছিতেও অবসর হইল না, তৎক্ষণাৎ তাহা হজুরের নিকট আনিয়া ধরিল। হজুর ততক্ষণ এক একবার ঘরময় পায়চারি করিতেছিলেন আর একবার গোঁফ ধরিয়া বড়ই জোরে জোরে টান দিতেছিলেন। মানুষের কোন একটা ভাবনা ফুটিলে গোঁফ বেচারিদের বড়ই বিপদের আশঙ্কা। বেহারা টেবিলের উপর দোয়াত কলম রাখিয়া গেলে সাহেব চেয়ারে গিয়া বসিলেন।

পাছে পাঁচে জুতায় জুতায় দুই একবার ঘর্ষণ করিলেন। একবার কাগজে কি একটা আঁচড় টানিয়া সজোরে কলমটা কামড়াইয়া ধরিলেন। তার পর, 'কালি কলম মন' এই তিনের একত্র সংযোগে ও বহু সংঘর্ষণে কি এক অপূর্ব্ব তাড়িতের জন্ম হইল, মুহূর্ত্ত মধ্যে কাগজ খানা যেন সামান্য জড়পদার্থ হইতে এক ভীষণ তেজোগর্ভ জ্বলন্তমূর্ত্তি ধারণ করিল, তাহার অক্ষরে অক্ষরে যেন অনবরত হুঙ্কার ধ্বনিত হইতে লাগিল। দেবগণ অসুরবিজয়ের জন্য যেমন অস্থিতে বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই দিনকার সেই প্রহরৈক কালে নিস্তব্ধ কক্ষে ভারতবিজয়ো-দ্দেশে ইংরাজকরচালিত কালিকলম-কাগজে বজ্রাপিভীষণতর এক অপূর্ব্ব অস্ত্র বিনির্ম্মিত হইল। সহসা বস্তিবাড়ীর কাকগুলা ভীষণরূপে চীৎকার করিয়া উঠিল; বালক পড়া বলিতে না পারায় মাষ্টারের নিকট মারি খাইল; পাড়া-কুঁদুলী কোন্দল করিতে করিতে খাই ভুলিয়া গেল; গৃহিণীর কার্পেট বুনিতে বুনিতে মাথাধরা রোগটা চাগিবার জোগাড় হইল, সুতরাং কর্ত্তার আগেই তাঁহার ভোজনকার্য্য পরি-সমাপ্ত হইয়া গেল।

সেই দুর্জ্জনদমন ইংরাজ গর্জ্জনগমন কলমে লিখিলেন:—

যেহেতু অপ্রকাশ নাই যে শ্রীল শ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর এলাকা-ভুক্ত অত্র ভারতের জেলা ব জেলার সর্ব্ব স্থলেই কি হিন্দু কি মুসলমান কি উড়িয়া কি বাঙ্গালী কি মারহাটী কি পাঞ্জাবী সকলেই সোপ্তভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত বৃটীস গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে এবং বাবদীয় ইংরাজ ও ইংরংরাজদের বিরুদ্ধে একে একে দলে দলে ছেলেবুড়োর ম্যুগিমিন্সের আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন কি অল্প দিনের মধ্যেই তাহাদিগের হইতে একটা বিষম বিভ্রাট ঘটিবার সূচনা হইয়াছে, অতএব লিখা যায় যে প্রতি মহকুমা ও কাঁড়ির যাবদীয় ইন্সপেক্টর কনেষ্টেবল ও চৌকিদার যে যেখানে মহারাজ্ঞীর চিহ্নিত শান্তিরক্ষক নাম ধারণ করে সকলেই না খাইয়া না শুইয়া, অথবা এঁটোহাতে ঘুমচোখে যেখানে যখন এইরূপ ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনা দেখিবে আস্তে আস্তে নাগরা খুলিয়া টিপি টিপি আড়ালে থাকিয়া তাহা লক্ষ্য করিবে, অথবা যে সব স্থানে এই সন্দেহের কারণ বলিয়া বোধ হয়, তাহা টাউন হলের সভা হউক, ওপেনএয়ার মিটিং হউক, থিয়েটার স্কুল বা জিমনেসিয়ম হউক, কিম্বা শয়নঘর খিড়কির ঘাট বা কেনগোজলা হউক, সর্ব্বত্র অতি সাবধানে অদৃশ্য থাকিয়া সকল কার্য্য লক্ষ্য করিবে। লক্ষ্যান্তে তাহার একটা রিপোর্ট খামের ভিতর পুরিয়া (যেন যে-সে লোক না বুঝে) অত্র সরকারে গোপন ভাবে পাঠাইয়া দিবা। বহুৎ তাগিদ জানিবা। যে জনা এই সরকারি জরুরি কাজে গাফিলি করিবে বা করিবার কারণ হইবে সে প্রতিনিধি আইনমতে দণ্ডনীয় হইবে। ইতি

অনুমত্যনুসারে

(তার পর)

তদনন্তর জনমেজয় কহিলেন, হে

মহাভাগ, আপনার অপূর্ব্ব কথা শ্রবণ করত আমার চিত্ত সমধিক ঔৎসুক্যাবিষ্ট হইয়াছে অতঃপর কি হইল আনুপূর্ব্বিক সবিস্তারে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ সেই রাজদ্রোহ-সন্দেহ রূপ সামান্য অঙ্কুর হইতে ক্রমে যে ভীষণ সার্কুলাররূপী মহাপাদপ বহুশাখা প্রশাখা বিস্তার করত ভারতের জনপদসমূহ সমাচ্ছন্ন করিল তাহা একে একে কহিতেছি অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। সেই রাজদ্রোহাশঙ্কারূপী অঙ্কুর হইতে ভারতবিদ্বেষরূপ কাণ্ড সমুত্থিত হইল, সেই কাণ্ড ক্রমে সভা সমিতি আলোচনা সমালোচনা প্রভৃতি শাখাপত্রে সমন্বিত হইয়া বৃহদাকার ধারণ করিল। ক্রমে কুমারপত্তন রূপ মুকুলের উৎপত্তি হইল, সেই মুকুল হইতে সার্কুলারসম্বাদ নামক অদৃষ্টপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব ফলের জন্ম হইল। সেই ফলের আবির্ভাব দেখিয়া শ্বেতদ্বীপবাসীগণ মহারবে অট্টহাস করিয়া উঠিল। সেই উল্লাসধ্বনি ভীমশব্দে সহসা ভারতের ঘরে ঘরে প্রতিশব্দিত হইল। মুহূর্ত্তমাত্রে আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষ থর থর বিকম্পিত হইয়া পড়িল। অথচ এই আকস্মিক ভয়পাতের কারণ কেহই বোধগম্য করিতে সক্ষম হইল না। দূরে সেনাপতির তূর্যধ্বনি শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র পুলিষ-বাহিনী মহানিদ্রাভঙ্গে বিজৃম্ভণ পূর্ব্বক অঙ্গোত্তোলন করতঃ বীরদর্পে মহাভাকে সজ্জ হইতে আরম্ভ করিল। সে সজ্জা অতি বিচিত্র। কেহ কেহ শস্ত্র পারিপাট্যের ও তীক্ষ্ণসৌকার্য্যের ধুম পড়িয়াছে, কচিৎ কেহ নিম্নদণ্ডতাড়নায় নীলকণ্ঠপ্রিয় সিদ্ধি সংঘট্টিত করিতেছে, কচিৎ কেহ অমলধবল বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আচিবুক মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত ভাবৎ বদনমণ্ডল স্বয়ং সমৃদ্ধ করিতেছে, কচিৎ কেহ লোহিতবর্ণাক্ত অপূর্ব্ব উষ্ণীষ আপনার শিরোদেশে আপনি সংন্যস্ত করিতেছে, কচিৎ কেহ প্রাণানন্দবর্দ্ধন মমমসারমান নাগরা যতনে তৈলসম্পৃক্ত করিতেছে। কতেক ক্ষণ এই সমস্ত অত্যাবশ্যক অবশ্যকর্ত্তব্য সমাধানের পর সেই মহাকটক মহাসাজে সজ্জীভূত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। তদনন্তর প্রতি দলের উপসেনাপতিগণ আপনাদিগের সৈন্যাঠাট পর্য্যবেক্ষণ করত মহা হর্ষে যুদ্ধ যাত্রা করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। কিন্তু শত্রুরা ছদ্মবেশী, গোপনকর্ম্মা, দ্বন্দ্বাচারী, সুতরাং তদনুসারোগী সমরকৌশল অবলম্বন প্রয়োজনীয়। উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতিও তাহাই। অতএব কটকপরিবৃত না হইয়া অনন্যানুচর অবস্থায় একে একে সংগোপনে সন্তর্পণে শত্রুশিবির অধিকার করিবার জন্য কেহ ছদ্মবেশে কেহ বা যোদ্ধৃবেশেই সেনাপতির নিয়োগ পরিপালনে প্রবৃত্ত হইল।

অনতিদিনের মধ্যেই, হে রাজন্, রাশি রাশি রিপোর্ট নামক কাগজস্তূপে সেনাপতির প্রকাণ্ড গৃহ পরিপূরিত হইয়া উঠিল। সে রিপোর্ট ব্যাঘ্র নহে, ভল্লুক নহে, অসুর বা রাক্ষস নহে, সামান্য কতকগুলা কাগজ মাত্র, কিন্তু তাহা ভয়ানক হইতেও ভয়ানক। সে অসংখ্য অগণ্য রিপোর্টের অসংখ্য অগণ্য তালিকা কত বর্ণন করিব? একবা হঠাৎ তাহার মধ্যে যে একখানি পাঠ করিতে করিতে মস্তকের ভাবৎ সত্য চাল

সার্দ্ধ দ্বিসপ্ত বিংশতিপল ষোড়শ অনুপল ব্যতিক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, অতঃপর তাহার বৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ করুন।

(বিবরণী)

সাতদিনের সাতকাণ্ড।

মহামহিম অন্বেষণবিভাগের দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপান্বিত ইন্সপেক্টর শ্রীল শ্রীযুক্ত সুপারিটেন্ডেন্ট মহাশয় বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীকানুলাল ভুকা, চৌকি মোহকমাই, ষ্টেশন কড়পোতা, পরগণে নিশ্চিন্দিপুর, হরা নুনুকমারি কস্য রিপোর্ট পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে হুজুর মালিক, হুজুর ছনিয়ার সা আলম, হুজুরের আজ্ঞাপত্রী অত্র মোকামে পঁহুছিবা মাত্র বন্দা বহুৎ বহুৎ তাগিদ মালম করিয়া রোঁদগোস্তকালীন এ নাগাইদ যে সকল তদন্ত করিয়াছে তাহার একটা সংক্ষপ্ত রিপোর্ট হুজুরের গোচরাধীন করিবার জন্য রোজনামচা কিতাবৎ নিম্নে আজাম করিতেছে। হুজুর দিষ্ট করিয়া মতলবমত আস্থা করেন, এই প্রার্থনা।

[রিপোর্টটী অবশ্য, পূর্ব্ববৎ অপূর্ব্ব ভাষায় লিখিত, কিন্তু সে অপূর্ব্ব ভাষা পাছে সাধারণের বোধগম্য না হয়, এজন্য আমাদের জনৈক বন্ধু তাহার যে একটা সহজ বাঙ্গলা করিয়াছেন এখানে তাহাই সন্নিবেশিত হইল।

১। শনিবার (রাত্রি ১১—৩৬—১৮) টাবাবেড়ে গ্রামে ষোলগোবিন্দ পুতিতণ্ড ও তাহার স্ত্রী কথোপকথন করিতেছিল, সেই সময় আমি টিপি টিপি পায়ের বুড়া আঙ্গুলের উপর ভর দিয়া দরজার পাশ দিয়া যাহা শুনিলাম, তাহা বড়ই ভয়ানক। পুতিতণ্ড বাবু চাপকান ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন—"আজ একেবারেই আস্‌তে পার্ত্তেম কি না সন্দেহ।"

স্ত্রী। (শিহরিয়া) কেন?

ষোল। পাঁচটার পর হাত-টাত ধুইয়াছি এমন সময় বড় সাহেব বেটা কতকগুলো কাগজ এনে বল্লে, শীঘ্র লও, এখনই চাই।

স্ত্রী। ও মা! তা, তুমি কিছু বল্‌লে

ষোল। কি করি, তবু বল্লুম বৈ কি— আজ শনিবার, বাড়ী যেতে হবে, দূর-দেশে বাড়ী, এটা আর কাহাকেও দিন— কত বল্লেম, তা, সে কি শোনে? কাজেই সে কাজ কর্ত্তে আপিসেই ৮টা বেজে গেল। তার পর হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে ট্রেণ ধরলেম। এই রাত্রি, অন্ধকার, তার উপর দৌড়াদৌড়ি, প্রাণটা গেছে একে-বারে।

স্ত্রী। আহা হা! তা, হেঁগা, সাহেব গুলোর কি মাগ ছেলে নেই! আ মর মর—

'বন্দা' আর লিখিতে অক্ষম। আমি সেই খানে দাঁড়াইয়া স্পষ্ট শুনিলাম সেই স্ত্রীপুরুষ দুইজন সাহেববংশ যাহাতে অচিরে নির্ব্বংশ হয় তাহার উদ্দেশে অনেক কামনা করিল। তার পর কিষ কিষ করিয়া ঐ সম্বন্ধে আরও কি একটা বিশেষ চক্রান্ত করিতেছিল, কিন্তু তাহা আর শুনিবার অবসর পাইলাম না। বাবু হাত মুখ

খুইবার জন্য বাহিরে আনিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিবা মাত্র ধীরে ধীরে চলিয়া আসিলাম।

২। রবিবার (সন্ধ্যা ৭॥টা) অত্র ষ্টেশনে বহুদিন যাবৎ একটী হরিসভা আছে। হরিসভা জিনিষটা কি তাহা এতদিন আমি জানিতাম না, জানিবার ইচ্ছাও হয় নাই। প্রতি রবিবার এখানে অনেক লোক আসিয়া নাচে, বক্তৃতা করে, ভজন গায়, কাঁদে। কিন্তু যাই হউক আজ দেখিয়া বুঝিয়াছি হরিসভায় আর কিছুই হয় না কেবল সাহেবদের ধর্ম্মকে নিন্দা করিয়া তাহাদিগের বিরুদ্ধে লোকের মন লওয়াইবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে মাত্র। আমি স্বকর্ণে শুনিলাম তাহাদের যে গুরু সে দাঁড়াইয়া উচ্চ খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিস্তর নিন্দা করিয়া যীশু ও মাতা মেরীর প্রতি নানান্ গালি-গালাজ করিতে লাগিল। সে এতই অসহ্য যে আর দাঁড়াইয়া শুনিতে পারিলাম না। বিশেষ দেখিলাম বক্তা ছাড়া অনেকেই বসিয়া বসিয়া চুলিতেছিল তাহাতে বক্তা সমেত শীঘ্রই সবাই ঢুলিয়া পড়িবে এই স্থির সিদ্ধান্তে সেখান হইতে প্রস্থান করিলাম। কিন্তু কি ভয়ানক! ধর্ম্মের দিক্ দিয়া সাহেবদের উপর যদি সবার ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মাইয়া দিতে পারে তাহা হইলে সিপাই মিউটিনীর ন্যায় আবার এক বিদ্রোহ নিশ্চয়ই অনিবার্য্য।

৩। সোমবার (অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা)—জেলা স্কুলের আজ প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউষন। বহুলোকের সমাবেশ হইয়াছে। প্রাইজ-বিতরণ হইয়া গেলে অনেকেই উঠিয়া উঠিয়া বক্তা হইতে লাগিলেন। সবাই বলিলেন—হে বালকবৃন্দ তোমাদের উপরেই দেশের ভাবী আশা ভরসা সমস্ত নির্ভর করিতেছে, এই বেলা মন দিয়া শিক্ষা কর। শিক্ষা কেবল চাকুরির জন্য নহে। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য স্বদেশ ও স্বজাতির শ্রীবৃদ্ধিসাধন। সোণার ভারত আজ অধঃপতিত—পরপদ-লাঞ্ছিত, সেই ভারতের অন্য আশা আর নাই, এক মাত্র আশা তোমরা। তোমাদের মাথার উপর বিস্তর কর্ত্তব্যভার, সেই কর্ত্তব্য বুঝিয়া সাবধানে আপনাদের পথে অগ্রসর হও।—ইত্যাদি, ইত্যাদি।" কি স্পর্দ্ধা! শিক্ষা চাকুরির জন্য নহে, দেশ উদ্ধারের জন্য! দেশ পরপদলাঞ্ছিত! সে পর কাহারা? ইহারা বাল্যকাল হইতেই যখন বালকদিগের মনে এই বিষম সংস্কারের সঞ্চার করিতেছে তখন এই সকল বালক যখন শিক্ষিত যুবক হইয়া উঠিবে তখন নিশ্চয়ই ইংরাজরা অত্র ভারতে স্থায়ী হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিবে। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট শিক্ষার বিস্তার করিতেছেন, Mass Education দিতেছেন, বুঝিতেছেন না যে আপনাদের পায়ে আপনারা কুড়ালি মারিতেছেন!

৪ মঙ্গলবার। হরহরাল সরকারের বাড়ী আজ বড় সমারোহ। তাঁহার কন্যার বিবাহ। পাত্র সভাস্থ, বরপক্ষ কন্যাপক্ষ পণের টাকা লইয়া বিষম গোলযোগ করিতেছে। এই অবকাশে সেই গোলের মধ্যে একবার ঢুকিয়া আমি যাহা বুঝিলাম তাহা আর লিখিব কি? ইহাদের বিবাহের মধ্যেও বিদ্রোহচিহ্ন দেদীপ্য-মান। বরপক্ষ নাকি প্রশস্করা ছেলে বলিয়া দর হাঁকিয়াছিলেন চারি হাজার তিনশত আটচল্লিশ দশ আনা দুকড়া

চুক্তি।; কন্যাপক্ষ তাহাতেই স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তার পর, বর আসিলে বরকর্ত্তা টাকার দাবী করিলে কন্যাকর্ত্তা ৪৩৪৮৶০ আনিয়া দিলেন, বরকর্ত্তা বাকি চুকড়া চুক্তাক্তির জন্য বিস্তর আপত্তি করিতে লাগিলেন। কন্যাকর্ত্তার ঘরে তখন এমন কিছুই নাই যাহাতে ঐ চুকড়া চুক্তাক্তি পূরণ করিতে পারেন, যে থালাখানা ঘটটা ছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বেই সমস্ত বন্ধক পড়িয়াছে, সুতরাং দিতে নারাজ। বরকর্ত্তা নাছোড়বান্দা, বিশেষ, পত্রের গর্ভধারিণী স্বয়ং এইবিষয় করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে তিনি কেমন করিয়া বাদ দিয়া লইবেন? তখন, বড়ই গোল উঠিল। কন্যাকর্ত্তা আর কিছুই না পাইয়া ইংরাজের উপর গালি পাড়িতে লাগিলেন। ইংরাজের দোষ, তাহারা দেশে কেন এমন শিক্ষার প্রচলন করিল! পোড়া পাপের জন্যই তো ছেলে মেয়ের বিয়ে বন্ধ হইল, লোকে সর্ব্বস্বান্ত হইল, দেশ ছারে খারে গেল! তখন দেখি, কন্যাকর্ত্তার সেই রোদনে বহুতর ব্যক্তি যোগ দিল। সকলেই প্রতিজ্ঞা করিল যদি গণ্ডমূর্খ দেখিয়া কন্যার বিবাহ দিব তথাপি কখন ইংরাজি পাশ করা ছেলের জন্য সম্বন্ধ খুঁজিব না। এইতো গেল সেদিনকার ঘটনা। এখন ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ইংরাজদের শুভ অশুভ সকল কার্য্যই ইহাদের চক্ষুঃশূল হইয়াছে। কারণ, পাশ পদ্ধতি ইংরাজি শিক্ষার ফল, ইংরাজি শিক্ষা না হইলে আমরা ইংরাজদের এখানে কাজ কর্ম্ম চালান কঠিন, কাজ কর্ম্ম না চলিলে কাজেই পাত-তাড়ি গুটাইতে হইবে; সুতরাং পাশ পদ্ধতি উঠাইতে হইলেই ইংরাজি শিক্ষা উঠাইয়া দিতে হইবে, এবং শিক্ষা উঠাইতে বলাও যাহা আর ইংরাজদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়ার কথা বলাও যে তাহা তাহাতে আর অন্য সন্দেহ নাস্তি।

৫। সুধবার। গ্রামের প্রান্তভাগে শুনিলাম একটা নাকি জিমনাষ্টিকের আখড়া হইয়াছে। সন্ধ্যার কিয়ৎপূর্ব্বে সেইদিকে বেড়াইতে গিয়া দেখি, বড় গোলমাল, চেঁচামেচি। আখড়াটী খোলা নহে, চারি দিকে হোগ্‌লার বেড়া। বাহির হইতে হোগ্‌লা একটু সরাইয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, কেহ কুস্তি করিতেছে, কেহ ডন করিতেছে, কেহ মুগুর ভাঁজিতেছে, কেহ লাফাইতেছে, কেহ বারে ঝুলিতেছে, কাঁধে চড়িতেছে—নানা লোকে নানা কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ একটা ছেলে বলিয়া উঠিল "দেখ্, থানার মাতাদীন চৌওয়ারি সে দিন পুঁটী বাগ্‌দিনীর উপর বড় অত্যাচার করিয়াছে, পুঁটী আসিয়া আমাদের বাড়ী আজ কাঁদিতেছিল একি ভাই অরাজক!" তখন কেহ বলিল, 'মার'; কেহ বলিল, বেশ করিয়া ঠেঙ্গাইয়া দাও; কেহ বলিল, সেই ভোজপুরী মেড়াটার ঘাড়টা ভাঙ্গিয়া দাও। কেহ বলিল, "না হলে যে আমাদের অপমান, আমাদের আখড়ার অপমান।" তখন ভয়ানক একটা গোল উঠিল। ভয়ে আমার ভালু শুখাইয়া আসিল। পড়িয়া যাইতে-ছিলাম, বেড়া ধরিয়া বসিয়া পড়িলাম। তাহারা কত কথাই বলিতে লাগিল, সব বুঝিতে পারিলাম না, বুঝিবার শক্তি তখন আমার ছিল না। কেবল, মাঝে মাঝে 'থানা, মাতাদীন, ইন্‌স্পেক্টার, এই

শুনিতে লাগিলাম। শেষ কথাটা শুনিবা মাত্র ভয় আরও দ্বিগুণ হইল। তখন, ঊর্দ্ধশ্বাসে চম্পট ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিলাম। মাতাদীনের কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা! কেবল অছিলা মাত্র। কিন্তু কি ভয়ানক! ইহারা পুলিসকে মারিতে চায়! গবর্ণমেণ্ট নিজে যাহার শান্তিরক্ষক নাম দিয়া এত মান বাড়াইয়াছেন, তাহাকে ইহারা ঠেঙ্গাইতে উদ্যত! আর বিদ্রোহ কাহাকে বলে?

৬। বৃহস্পতিবার। বারোয়ারিতলায় আজ বৈকালে হঠাৎ বিস্তর লোক জমিয়াছে; বারোয়ারি নহে অথচ ইহার কারণ কি? অবৈধ জনতা অনুধাবনে তথায় গিয়া দেখি বিষম ব্যাপার। বিরাট সভা, বিরাট আয়োজন, বিরাট ভিড়। বক্তা স্বয়ং বিরাট না হইলেও বক্তৃতা অতি বিরাট। সভার নাম "গোধনরক্ষিণী।" ইংরাজেরা ভারতের সব গোরু খাইয়া ফেলিল, স্বয়ং ভগবান যাহার সেবা করিয়াছিলেন দুরাত্ম রাক্ষসেরা সেই সমস্ত চিরপূজ্য ভগবতীকুল অহরহঃ উদরসাৎ করিতেছে। কি অত্যাচার! অতএব সবাই প্রতিজ্ঞাপত্রে সাক্ষর কর ইতর ভদ্র যে কেহ স্বতঃ পরতঃ গোরু বিক্রয় করিবে বা তাহার কারণ হইবে সে তৎসমাজ কর্ত্তৃক তাড়িত হইবে। কি ভীষণ প্রতিজ্ঞা! এ প্রতিজ্ঞার প্রকৃত মর্ম্ম কি? সবাই জানে, ইংরাজ শীতপ্রধান দেশবাসী, গোরু ব্যতিরেকে তাঁহাদের প্রাণ ধারণ অসম্ভব। সুতরাং গোরুভোজন অভাবে হয় তাহাদিগকে শুখাইয়া মরিতে হইবে। না হয় এ দেশ ছাড়িয়া পলাইতে হইবে, ইহাকেই বলে, হাতে না মারি, ভাতে মারি। কিন্তু শুধু তাহাতেও তো ক্ষান্ত দেখিলাম না। একজন উঠিয়া লম্ফ ঝম্ফ করিয়া হাত দোলাইতে দোলাইতে বলিয়া উঠিল "জাগ জাগাও, উঠ উঠাও, তূর্ণ ধর, খুন কর, অসি খোল, ঘুসি তোল—জাগ জাগাও—ইত্যাদি।" কি সর্ব্বনাশ! শুনিলাম পার্শ্বের একজন বলিতেছে, "খুব মুখস্থ করেছে যা হউক।" তা যাই হউক, ইহার অপেক্ষা আর বেশি কি হইতে পারে? এত লোক না জমিলে নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ সেই লোকটাকে গ্রেপ্তার করিতাম; কিন্তু আমি একা, বিপক্ষেরা সংখ্যায় অসংখ্য, অগত্যা কিছু না বলিয়া থানায় চলিয়া আসিলাম।

৭। শুক্রবার। আজিকার কথা আর লিখিতে সাহস হইতেছে না। হুজুর অধীনকে অভয় দান করিবেন। হুজুরের অগোচর নাই যে দেশে অনেকগুলা দেশীয় সংবাদপত্র হইয়া বড়ই জঞ্জাল বাড়াইয়াছে; এ পর্য্যন্ত আমি তাহার একখানিও পড়ি নাই; পড়িতে প্রবৃত্তি হয় নাই। হঠাৎ আজ আমার চৌকির উপর বড় হারপোক্সের দৌরাত্ম্য হওয়ায় যেমন একখানা কাগজ পাতিয়া বসিতে যাইব এমন সময়ে কেমন তাহার উপর নজর পড়িল। পূর্ব্বদিন একজন কনষ্টেবল কিছু মসলা কিনিয়া আনিয়াছিল, কাগজখানা তাহাতেই বাঁধা ছিল। কাগজখানার নাম দেখিলাম, "পক্ষিপাতি।" শুনা ছিল, বাঙ্গালা কাগজ সব গাঁজা খাইয়াই লিখিত হয়, নামটা দেখিয়া তাহার সার্থকতা বুঝিতে পারিলাম বটে। কিন্তু, একি! হুজুর, শত্রুরা কি দেবতার বরে অন্তর্যামী? কি ভয়ানক! কি ভয়ানক! এ যে হুজুরেরই সারকুলার সম্বন্ধে নানা কথা। যাহার জন্য এত সংগোপন, এত সতর্কতা, শত্রুরা তাহারই কথা লইয়া আন্দোলন করিতেছে! দেখিয়া, সর্ব্বশরীর হইবার উপক্রম হইল। আর লিখিব কি? লিখিবে কে? সেই পত্রক আমাতে আমি নাই বলিলেই হয়। অধীনের 'গোস্তাখি মাফ' করিয়া হুজুর যথাকর্ত্তব্য আদেশ করেন, এই প্রার্থনা, ইতি।

(মন্ত্রকক্ষ)

জন, জোয়ান, পালোয়ান প্রভৃতি সদস্যগণ আসীন।

জন। না না, নিশ্চয় আপনার ভুল হইয়া থাকিবে।

জোয়ান। নিশ্চয়—নিশ্চয়, ইহাও কি একটা কথা হ্যাঁ!

পালোয়ান। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়, নিশ্চয়ই আপনার নজরের ব্যত্যয় ঘটিয়াছে; আমার চস্‌মা গ্রহণ করুন, ভাল করিয়া পাঠ করুন।

সুপারি। মহাশয়গণ আমার চক্ষুকে আপনারা অপ্রত্যয় করিতে পারেন, কিন্তু নিজে নিজের চক্ষুকে কেমন করিয়া অবিশ্বাস করিব? যাহা পাঠ করিলাম তাহা সত্য, সম্পূর্ণ সত্য, তেমনি সত্য যেমনি এখানে আমরা কয়জন উপস্থিত আছি।

সকলে। আমরা একবার দেখিতে পাই কি?

সুপারি। স্বচ্ছন্দে।

(সকলের রিপোর্ট দর্শন)

জন। অাঁ—অাঁ—অাঁ—

(পতন ও মূর্চ্ছা)

জোয়ান। ওঃ কি আঁধার—কি আঁধার! মুহূর্ত্ত মধ্যে যে চারিদিক্ সব আঁধারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। আর যে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না! কৈ, কোথায় আমি? কোথায় স্ত্রীপুত্র! ওঃ কোথায়! ভীষণ আঁধারে আমি কোথায়? কোথায়—কোথায়—কো-থা-য়— (পতন ও মূর্চ্ছা)

পালোয়ান। ঐ—ঐ—ঐ! আবার সেই অট্টহাস! ও কে হাসে, কে ভাষে? কি বিকট! কি ভ্রূকুটী! না না, আর যে চক্ষু চাহিতে পারি না (চক্ষু মুদ্রণ)। কিন্তু কৈ, ঐ—ঐ সেই দন্তকড়মড়ি, ঐ সেই জিহ্বা-লকলকি, খল খল হাসি! আবার এল—আবার এল! ঐ—ঐ—ঐ—ওঃ!

(পতন ও মূর্চ্ছা)

সুপারি। হা গর্ব্ব, তুমি খর্ব্ব হলে! হা স্বজাতিভক্ত, তোমরা বঞ্চিত হ'লে! হা শ্বেতদ্বীপ, তোমার গৌরব রক্ষা হলো না! বুদ্ধি লুপ্ত হলো, কৌশল ব্যর্থ হলো! উপায় নাই—উপায় নাই! হা শ্বেত-সীমন্তিনীগণ তোমাদের এত কষ্ট করিয়া গির্জ্জায় গিয়া ভজন গাওয়া সব বৃথায় হ'লো! ও! এ প্রাণ কি কঠিন! এখনও বিদীর্ণ হলো না। এই ভয়ানক সংবাদে এখনও ইহা এই দেহ মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে! হা মূর্চ্ছা, হা অচৈতন্য, তোমরা কোথায়? একবার আসিয়া এ অধমের দেহকে অধিকার কর। ওঃ অসহ্য! অসহ্য! (দূরে কোলাহলের মিশি শুনিয়া) আঃ কোন্ বিধাতা দয়া করিয়া এমন সময়ে ইহা আমার নিকটে প্রেরণ করিলেন! ধন্যবাদ! তিনি যেই হউন, এই অদৃশ্য উপকারীকে শত শত ধন্যবাদ! (ক্রমান্তর) আঃ—ইঃ—উঃ—ওঃ (পতন ও মূর্চ্ছা)

(শেষ)

[গাহিতে গাহিতে অপ্সরাগণের প্রবেশ]

বিহঙ্গড়া—পোস্তা।

আয় লো আয় পরী আয় লো আয় পরী।
চল না ধরা করে ধরা গিয়ে অপেরা করি।
গেছে গেছে বয়েস গেছে ঘরে তো পাউডার আছে,
সাজে গোজে চাকবে বয়েস কাজ কি লো আর ভাবনা করি।
চুলে চুলে বিনাইয়ে ফুলে ফুলে ঢাকা দিয়ে
চুলে চল্ লো ধেয়ে পুরুষ বধে হানবে ছুরি।
দেখ দেখ দেখ সখি আসিতে আসিতে একি
দূর হতে আমাদের দেখি পড়ে আছে চেতন হরি।
মরি মরি আহা মরি কিবা রূপের মাধুরী
আয়লো আয় বন্ধন করি তুলে নেবাই ধরাধরি।

ধীরে ধীরে অপ্সরাগণের সকলকে অচেতন অবস্থায় উত্তোলন, পুনর্গীত, প্রস্থানোদ্যম, চতুর্দ্দিক হইতে encore-encore শব্দ, আবার সঙ্গীত, আবার নৃত্য;

যবনিকা পতন।